প্রণাম জানাই—





রাজা রামমোহন রায়

জন্ম : ১০ই মে, ১৭৭৪ :: মৃত্যু : ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ :: মৃত্যু :: ২৯শে জুলাই, ১৮৯১



শ্রীরামকৃষ্ণ

জন্ম : ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ :: মৃত্যু : ১৬ আগষ্ট, ১৮৮৬



রবীন্দ্রনাথ

জন্ম : ৭ই মে, ১৮৬১ : : মৃত্যু : ৭ই আগস্ট, ১৯৪১



স্বামী বিবেকানন্দ

: ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ : : মৃত্যু : ৪ঠা জুলাই, ১৯০২



সুভাষচন্দ্র

জন্ম : ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭



আনন্দ
১৩৭৩

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

—রবীন্দ্রনাথ



দাদুর চিঠি

এক

পরম কল্যাণীয়েষু,

'বন্দে মাতরম্'—ভারত স্বাধীনতার এ বীজমন্ত্রকে স্মরণ করিয়াছ, নিশ্চয়ই। ভারতের সত্য স্বাধীনতার বিমুক্ত দ্বারে তোমার লিপিখানি তরুণ বসন্তের, রঙিন স্বগন্ধ ফুলের মত আসিয়াছে। সুসদ্য প্রস্ফুটিত ও নির্মল পুষ্পকে, অন্তর আদরে, স্বাধীনতার বেদীমূলে রাখিয়া দিলাম। তোমার প্রণামখানি, সমস্ত অন্তরে গ্রহণ করিয়া এই কামনা করিলাম, তাহা ভারতের নিত্য আরতির ধূপ-সৌরভে পরিণত হউক। ভারতের সর্ব গৌরবকে ঘিরিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক তোমার আশাময়, সঙ্কল্পময়, সাধনমধুর পবিত্র জীবন। পূর্ণ কর ভারত মন্দিরের অর্চনকে।

সর্বকল্যাণ কামনা করি।

দীপ্ত হও। ইতি।

পরমাশীর্বাদক
দাদু
(দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)

দুই

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার মধুর পত্র। শ্রীঅরবিন্দের জন্য দেশের ও জগতের শোক, এও বড় মধুর। শোক নয়, ইহাই মানবজগতের সত্য, সুখ ও গৌরব। বীর প্যাটেলের জন্য যে শোক, ইহা এদেশের ও জগতের অন্তর সৌরভ। এটিও প্রকৃত গর্ব। দেহে ইহারা রহিলেন না, কিন্তু ইহারাই অক্ষয় হইয়া রহিলেন—চির প্রদীপ্ত। সুপ্রণত হও। ইতি।

পরমাশীর্বাদক
দাদু
(দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)

চিঠি দু'খানি রাণা বসুকে লিখিত।



সিপাহী যুদ্ধে বাঙালী বীর * যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আগুন জ্বলিয়াছে।

সে আগুন সিপাহী বিদ্রোহের। বিদ্রোহী সিপাহীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে মত্ত। মুক্তিকামী তারা,—চায় তারা দেশের স্বাধীনতা। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ইংরাজেরা আপনাদের প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত। এ সময়ে কলিকাতার মন্ত্রণা-সভার ইংরাজ রাজপুরুষেরা হুকুম জারি করিলেন—যেভাবে পার, বিদ্রোহী সেনাদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর।

এ আদেশ প্রচারের পরে বিচারকেরা নিরীহ নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের অমূল্য জীবন ধ্বংসের পর ধ্বংস করিতেছিল। সৈন্যাধ্যক্ষই শুধু নয় বিচার বিভাগের যে-কোন ব্যক্তি, নিরীহ লোকদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে লাগিল। ইংরাজ যেখানে জয়ী হয়, সেখানেই নেয় সে প্রতিহিংসা। এইরূপ অন্যায় বিচারে শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্মম দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ফলে চারিদিকে বিদ্রোহী দল দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করিল ইংরাজদের। সেই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ইংরাজের ছিল না। ঝড়ের মত বেগে আসিয়া বিদ্রোহী সৈনিকদল চিকিৎসালয়, পল্লী প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি, উত্তেজনাবশে তাহারা ইউরোপীয় মহিলা ও শিশু সন্তানদেরও তরবারির আঘাতে বিনাশ করিয়া হাতে কলঙ্কের কালিমা মাখিয়াছিল।

এলাহাবাদের চারিদিকে বিদ্রোহীরা আরম্ভ করিয়াছে—ভীষণতম অত্যাচার। ইংরাজেরা যেমন কৃষ্ণকায় হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি নিপীড়ন করিয়া সগৌরবে বলিয়াছিলেন, "ইহাদের মেরে ফেল" আদেশ দিয়াছিলেন, সৈন্যদের—ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে—যুবক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলকেই নিহত কর", এই আদেশের ফলে পথে, বাজারে, যাহাদের ফাঁসী দেওয়া হইত তাহাদের সব গাদায় ফেলিয়া দেওয়া হইত।

এইরূপ বীভৎস আচরণে সিপাহীদের মনেও প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়াছিল। এলাহাবাদ ছিল সিপাহী বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। ১৮৫৭ সাল। এলাহাবাদের ভীষণ দুর্দিন। ইংরাজ হীনবল। প্রাণভয়ে ভীত। আশে-পাশে দেখা যায় জ্বলিতেছে প্রলয়ের আগুন, শোনা যায় হাহাকার। চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে "হর হর বম্ বম্" "আল্লা হো আকবর" রবে। শহরের বিদেশী ইংরাজ অধিবাসী, পুরুষ ও নারী নিরুপায় হইয়া হাহাকার করিতেছে। স্ত্রীলোকের ও শিশুদের করুণ ক্রন্দনে পুরুষেরাও ভীত, চকিত এবং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া সিপাহীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে? মৃত্যু যে অতি নিশ্চয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতজনই বা সৈন্য আছে, তাহাদের মনের অবস্থাই বা কে জানে? ইংরাজ রাজকর্মচারী ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমন সময় এক বাঙালী বীর ভীত ও চকিত পুরুষ এবং নারীদের উদ্ধারের জন্য কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মাভৈঃ!"

দুই

এই বীর বাঙালীর নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালে অনেক বাঙালী যেমন নানা কার্যোপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য অঞ্চলে বিবিধ ব্যবসায়—বাণিজ্য বা রাজকার্য বা ওকালতি করিতে আসিতেন এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেন—প্যারীমোহনও ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। সেকালের প্রথামত প্রথমতঃ উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যুক্তপ্রদেশে আসেন এবং এলাহাবাদের মুন্সেফ হইয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় তিনি এলাহাবাদের মুন্সেফী করিতেন।

সিপাহী বিদ্রোহের দারুণ দুঃসময়ে যখন চারিদিক হইতে সিপাহীরা এলাহাবাদ সহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং ধ্বংসের পর ধ্বংস করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, সে সময়ে বিপন্ন ইংরাজদের তিনি শুনাইলেন অভয়-বাণী।

লেখনী ছাড়িয়া ধরিলেন তরবারি। নিজে সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া এক সৈনিকদল গঠিত করিলেন্ এবং বীর বিক্রমে এলাহাবাদ নগরপ্রান্তে বিদ্রোহী সৈনিকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

কামান ছুটিতেছে। অশ্বারোহী সৈনিকগণ ঘোড়া ছুটাইয়া বাঙালী বীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে—কিন্তু নির্ভীক প্যারীমোহন আপনার অপূর্ব রণ-নৈপুণ্য ও ক্ষমতা-বলে বীরদর্পে তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদের চারিদিকের এক সামান্য অংশ দখল করিতেও পারিল না বিদ্রোহী সিপাহীরা।

প্রলোভন আসিল বিদ্রোহী দল হইতে—"তোমাকে আমরা করবো এ অঞ্চলের সুবাদার। মিলে যাও আমাদের সঙ্গে।"

প্যারীমোহন বলিলেন—"আমি যুদ্ধ করছি অসহায় নারী ও শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়, জায়গীরদার বা মনসবদার হইবার সাধ আমার নাই। আমি পুরুষের বাচ্চা—পুরুষের মত লড়াই করবো।"

একদিন একজন বিদ্রোহী সিপাহী যুদ্ধের সময় তীরবেগে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল এক ভীষণ বর্শা। বিদ্রূপ করিয়া সে কহিল, "মজা দেখ লেও বাঙালী বীর! মজা দেখো বেইমান!"

বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন প্যারীমোহন সেইদিকে—আক্রমণকারীর শিরশ্ছেদ করিলেন তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে।

একদিন নয় প্রায় একপক্ষ কাল তাঁহাকে এইরূপ নানারূপ ক্লেশ সহিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল। যুদ্ধের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—প্যারীমোহন। তাঁহার আক্রমণের রীতি ছিল অভিনব। শুধু তাই নয়—তিনি বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের পল্লী শহর জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ বীরের অসামান্য সাহস ও রণ-নৈপুণ্যে এলাহাবাদ রক্ষা পাইল, রক্ষা পাইল ইউরোপীয় অসহায় পুরুষ ও নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। যুদ্ধে বিজয়ী বীর বাঙালীকে ইংরাজ পুরুষ ও নারী অভিনন্দিত করিলেন।

সকলে ধন্যবাদ দিলেন তাঁহাকে—যুদ্ধজয়ী মুন্সেফ বলে। সেনাপতি পরে যখন এলাহাবাদ আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, সে সময়ে ইংরাজ সরকার প্যারীমোহনকে জায়গীর দান করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বীরত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

একজন ইংরাজ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন— "এই লড়াইয়ে মুন্সেফ দেওয়ানী আদালতের একজন দক্ষ বিচারক বাঙালীবাবু আপনার অসাধারণ বীরত্ব ও নির্ভীকতার দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। তিনি যে শুধু এলাহাবাদ শহর রক্ষা করিয়াছেন তাহাই নহে, তিনি আক্রমণের নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদের অধ্যুষিত পল্লী ধ্বংস করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাষায় প্রতিদিনের ঘটনা, নিজ মন্তব্য এবং তাঁহার অধীনে যে সমুদয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যেরা যুদ্ধে তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন— তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিয়াছেন। এই বীর বাঙালী যেমন ছিলেন শাসনকার্যে দক্ষ, তেমনি তিনি বুদ্ধির প্রখরতা এবং বীরত্বের যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন—ইহাতে বাঙালী মাত্রেরই গৌরব বোধ করা উচিত।"

আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা পুরুর রণহস্তী দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। পুরুর রণহস্তী ছিল মাত্র পাঁচশো। পুরুর ব্যূহ রচনার ত্রুটির জন্য সেই রণহস্তী লড়াই করার সুবিধা পায়নি, নাহলে সেকেন্দারকে পঞ্চনদ থেকেই ফিরে যেতে হতো। মগধরাজের এই রণহস্তী হাজার হাজার আছে শুনে গ্রীক সেনারা আর অগ্রসর হতে চায়নি।



বেচারাম কেনারাম * উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(জামা রিপু করিতে করিতে কেনারাম চাকরের প্রবেশ)

কেনা—ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল। ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়। তা রিপু করব কি? ভাল মনিব জুটেছে যাই হোক—এই জামাটা দিয়ে ক' বছর কাটালে। তিন বছর তো আমিই এই রকম দেখছি আরও বা ক'বছর দেখতে হয়। তবু যদি চারটে পেট ভরে খেতে দিত! তাও কেমন? সকালে মনিব চারটি ভাত খান, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্তিরে তিনি হাঁড়ি চাটেন, আমি শুঁকি। তার উপর শ্রবণশক্তিটি কী প্রখর! বাড়িওয়ালা সেদিন টাকার জন্যে কী-ই না বললে। বাড়িওয়ালা বলে 'টাকা দেও, ঢের টাকা বাকী।' মনিব বলেন, 'তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ি আজ নেমন্তন্ন?' বাড়িওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলে কি?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা, চাকরটিও সঙ্গে যাবে।' বাড়িওয়ালা বেচারি, রেগে মেগে চলে গেল। বড়লোক হতে হলে বোধ হয় আমার মনিবের মতই কর্তে হয়, কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড়লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড়লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ এই তিন বছরে একটি পয়সা মাইনে দিলে না! দেখি আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ করা হচ্ছে না।

[প্রস্থান

(বেচারাম মনিবের প্রবেশ)

মনিব—চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথাই বলছিল। সব শুনেছি। বেটা ভেবেছে, আমি সত্যিই কালা। আরে আমার মত যদি কান থাকত তা হলে আর চাকরি কত্তে হত না। আমি যা করে খাই, তাই করে খেতে দাও। ঘরের ভিতরে ক'জন লোক, ক'জন জেগে আছে, ক'জন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি। কোথায় সিন্ধুকের ভেতর আরশুলা কড়কড় কচ্ছে, বাইরে থেকে বুঝে নি। বাপু হে। কানে শুনি, কানে শুনি। কানে শোনাটা তো বেশ ভালই, কিন্তু না শোনার যে সুবিধা আছে, তা তো বুঝবে না? এই সেদিন বাড়িওয়ালা বেটা ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় কত্ত। কানে না শোনার কত সুবিধা দেখো—পাওনাদারের টাকা দিতে হয় না, বাড়িভাড়া দিতে হয় না। চাকরের মাহিনা দিতে হয় না—

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা—(উচ্চৈঃস্বরে) মশাই, হয় এই তিন বছরের মাইনে দিন না হয় আপনার এই সব রইল, আমি চললাম।

মনিব—ডাকওয়ালা? চিঠি? দেখি?

কেনা (স্বাগত)—এই মুশকিল কল্লে! তা এবারে বাপু এক ফন্দি এঁটেছি—সব লিখে এনেছি। (প্রকাশ্যে) চিঠিই বটে, এই নিন্।

মনিব (পাঠ)—'মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসরের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।' তাই তো, তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় তো কোন বন্দোবস্ত হয় নি, কাজকর্মও তেমন ভাল করে কর নি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশি তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নেও। (তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা—এই বড়লোক হলাম আর কি! তিন তিন বছরের মাইনে; ঢের টাকা—ঢের টাকা। এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়, দশ এগার বার। (পয়সা তিনটি পকেটে স্থাপন।)

(ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূতের প্রবেশ)

স্বর্গীয় দূত—আরে ভাই, তোর যে ভারি ফুর্তি ?

কেনা—কে ও ? ছোট্ট মানুষ ? দাঁড়াও চশমাটা বার করে নি।

দূত—কেন ! চোখে কম দেখ বুঝি ?

কেনা—তা কেন ? বড়লোক হয়েছি যে, ছোট মানুষ আর তেমন চট করে চোখে মালুম পড়ে না।

দূত—বটে। এত বড়লোক কী করে হলি ভাই ?

কেনা (পকেট চাপড়াইয়া)—তি-ন-টি ব-ছ-রে-র মা-ই-নে। (এক একটি পয়সা বহিষ্করণ ও গম্ভীরভাবে গণন) এ-ই এ-ক, দু-উ উ-ই, তি-ই-ই-ই-ন (পকেট উল্‌টাইয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান।)

দূত—তাই তো ভাই, এত টাকা নিয়ে তুই কি করবি ? আমি গরীব, আমাকে কিছু দেনা।

কেনা—নিবি ? এই নে, ভগবান আমাকে খেটে খাবার শক্তি দিয়েছেন, খেটে খাব। (পয়সা তিনটি প্রদান।)

দূত—তুই তো বেশ লোক, তোর মনটা খুব ভালো। আমি ঈশ্বরের দূত। ভাল লোক দেখলে পুরস্কার দি। তোর ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি। তুই কী চাস্ বল, যা চাস্ তাই পাবি।

কেনা—অ্যাঁ, আপনি ঈশ্বরের দূত ? তবে তো আপনার সম্মুখে আমি বড় বেয়াদবি করেছি ?

দূত—তোর কিছু ভয় নেই, তুই আমাকে 'তুই' 'তুমি', যা খুশি বল, কিছুতেই বেয়াদবি হবে না, এখন তুই কী নিবি বল।

কেনা—তা দাদা, যদি দেবে তবে এমন একখানা বেয়ালা দাও যে, যে তার আওয়াজ শুনবে তাকেই তিড়িং তিড়িং করে নাচতে হবে।

দূত—(ঝুলি হইতে বেয়ালা বাহির করিয়া) এই নে।

কেনা—বাঃ, বেশ হল, আমাকে তো সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে না ?

দূত—না সে ভয় তোর নেই। যা এখন ফুর্তি করগে (দূতের প্রস্থানোদ্যম ও কেনারামের বাদ্যোদ্যম) আরে দূর হতভাগা, আমারই উপর পরীক্ষা করে বসলি।

কেনা—তুমিই তো ফুর্তি করতে বললে দাদা।

দূত—আমি আগে যাই, তারপর করবি।

কেনা—আচ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা—ঐ ঝোপটাতে ফেলে গিছলুম। পুলিশ বেটা এমনি তাড়া কল্লে, ধরেই ফেলেছিল আর কি। চট করে টাকার থলেটি ঐ ঝোপটাতে ফেলে পালালুম, এখন পেলে বাঁচি। (থলি খুঁজতে ঝোপে প্রবেশ) বাপ রে, কী ভয়ানক কাঁটা, এই পেয়েছি।

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা (স্বাগত)—ঐ যে বেচুবাবু কাঁটাবনে ঢুকেছেন, এইবারে এক গৎ বাজিয়ে নি, পুরানো মনিবটে! (বেয়ালাবাদন)

বেচা—(নৃত্য করিতে করিতে) আরে! আরে! ও কী? উঃ আঃ। আরে তুমি কি—উঃ হু হু—আরে আর না—জামাটা—উঃ হু জামাটা গেল যে, উঃ—গায়ের চামড়াও যে ছিঁড়ে গেল—উঃ।

কেনা—আজ্ঞে, আমি আপনার বকেয়া চাকর কেনারাম, মাইনে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে কি এমন মনিবকে ভুলতে পারি? আপনাকে বাজনা শুনিয়ে আমার বেয়ালা সার্থক হল। (পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বাদন)

বেচা—(নৃত্য) কী মুশকিল। বাবা কেনারাম, রক্ষে করো বাবা। এ কী বাজনা যে শুনলেই নাচতে হয়। বাবা আর কাজ নেই, আমি খুব খুশি হয়েছি, এই টাকার থলি তোমায় দিচ্ছি, তোমার মাইনে এ থেকে পুষিয়ে নাও, দোহাই বাবা, আমায় নাচিও না। (টাকার থলি কেনারামের হাতে প্রদান।)

কেনা—(বিনীত অভিবাদন করিয়া) আজ্ঞে, না হবে কেন? আপনার মত মনিব না হলে গুণ কে বোঝে। দেখছি বেয়ালার আওয়াজে আপনার 'কানে খাট'র ব্যারামটাও বেশ সেরে গেল। ভাল ভাল, আর এ ব্যারামের সুত্রপাত দেখলে আমায় খবর দেবেন, আমি বেয়ালা নিয়ে এসে চিকিৎসা করব। (দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।)

বেচা—হতভাগা বেটা, লক্ষ্মীছাড়া বেটা, জোচ্চোর, বাটপাড়, ডাকাত—বেটাকে দেখাচ্ছি। পুলিশ! পুলিশ! চোর—চোর!

চতুর্থ দৃশ্য

(বিচারালয়। ব্যস্তভাবে বেচারামের প্রবেশ)

বেচা—দোহাই হুজুর, আমাকে ধনেপ্রাণে মেরেছে। ও হো হো! (ক্রন্দন)।

বিচারক—আরে ব্যাপার কী? তোমার কী হয়েছে?

বেচা—(কাঁটার আঁচড় ও ক্ষত-বিক্ষত শরীর দেখাইয়া)—আর কী হবে, আমি ধনেপ্রাণে গিয়েছি। বড় রাস্তার ধারে ঐ কেনা বেটা আমাকে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে—এঁ হেঁ হেঁ (ক্রন্দন)। বেটাকে তিন বছর আমি খাইয়ে মানুষ কল্লুম, আর তার এই প্রতিশোধ দিলে। বেটা দিনরাত বেয়ালা নিয়ে ফেরে, এখনি ধরতে পাঠান, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন।

বিচারক—চারজন লোক এখনি গিয়ে কেনারামকে ধরে নিয়ে এসো।

(কেনারামকে লইয়া চারজন লোকের প্রবেশ)

বেচা—ঐ! ঐ! ঐ বোধ হয়! হুজুর! ঐ কেনারাম বেটা আমার সর্বনাশ করেছে, বেটাকে আচ্ছা করে—

বিচারক—চুপ। (কেনার প্রতি) তুমি একে মেরে এর টাকা কেড়ে নিয়েছ?

কেনা—সে কী? হুজুর! উনি আমার বেয়ালা বাজানো শুনে আমায় এক থলি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন—আমি যথার্থ বলছি।

বিচারক—ওর যে চেহারা দেখছি, তাতে ও যে বেয়ালা শুনে তোমায় এতগুলো টাকা দিয়েছে তা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে। আর ওর গায়ে এইসব দাগ দেখছি। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে তুমিই ওকে মেরে টাকার থলি কেড়ে নিয়েছ। এ ডাকাতি, ডাকাতির শাস্তি ফাঁসি,—তোমার ফাঁসি হবে। এখন তোমার যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে তো বলো।

কেনা—হুজুর, আমার আর কোন সাধ নেই। খালি জন্মের মত বেয়ালাখানা একবার বাজাতে চাই।

বেচা—সর্বনাশ! হুজুর এমন হুকুম দেবেন না।

চাপরাসী—(বেচারামকে রুলের গুঁতা মারিয়া) চুপ রও।

বিচারক—আর কোন সাধ তোমার নেই? আচ্ছা বাজাও। (কেনারামের

উৎসাহের সঙ্গে বেয়ালাবাদন ও বিচারক হইতে চাপরাসী পর্যন্ত সকলের নৃত্য।)

বিচারক—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আরে বাপু! থাম্ থাম্। থাম্ থাম্, শিগ্গির থাম্, তোকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি, প্রাণ যায়—থাম্। বাপরে, এ কী রকম বেয়ালা বাজনা!

কেনা—(সেলাম করিয়া) হুজুর! বেচুবাবুকে এখন সমস্ত সত্য ঘটনা বলতে হুকুম হয়! নইলে আমি পুনরায় বেয়ালায় ছড়ি দিলাম।

বিচারক—(বেচারামের প্রতি সরোষে) বল্ বেটা কী হয়েছিল, সত্যি করে এখনি বল্।

বেচা—ওগো, না গো, আর বেয়ালা ধরো না। ও টাকা আমিই দিয়েছি—দিয়েছি।

বিচারক—তুই এত টাকা কোথা পেলি, বল্।

বেচা—আমি আমি—

কেনা—এই বেয়ালা ধরেছি।

বেচা—না না আমি, হুজুর আমি—কাল রাত্তিরে হুজুর, চুরি করেছিলাম। দোহাই হুজুর।

কেনা—ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। দেখলেন তো বেচুবাবু?

বিচারক—একে পঁচিশ বেত মারো।

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস মিছরি খেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বলেন—'ভারতবাসীরা একরকম গাছের রস থেকে এক জাতের স্ফটিক তৈরী করে, তা চিবিয়ে খেলে মধুর চেয়েও মিষ্টি লাগে।'



অ-আ-ই-উ * অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বাগবাজার সিটি হাইস্কুলের 'নাইন-বি' শ্রেণীতে যে সব ছেলে পড়িত, তাহাদের মধ্যে 'অ-আ-ই-উ' সমস্ত শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি যেভাবে এবং যতটা পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমন আর কেহ পারে নাই।

অ অর্থে অবিনাশ
আ „ আশু
ই „ ইন্দু
উ „ উমাপদ

ইহারা চারিজনে এক এবং একেতেই চারি। রাত্রিটা ছাড়া, সারাদিনের মধ্যে, কি স্কুলের ভিতরে, কি স্কুলের বাহিরে, এই চারিটি কিশোরকে সর্বদাই একত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। এই চারিজন সহপাঠীর সম্বন্ধে হেড পণ্ডিত মশায়ের স-রস অভিমত এই যে, ইহারা ত্রেতার রাম-লক্ষ্মণ ইত্যাদির কৈলিক সংস্করণ; এবং এই কারণেই স্কুলের মধ্যে ইহাদের সংক্ষিপ্ত যৌগিক নাম —'অ-আ-ই-উ'।

হেড পণ্ডিতমশায়ের ছিল—সিংহ রাশি। ক্লাসের ছেলেরা তাঁহাকে ভয়ও করিত যত, নির্ভয়ে মনে মনে গালাগালিও দিত তত। 'অ-আ-ই-উ' প্রায়ই আড়ালে অন্য ছেলেদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে বলিত, দেখিস্ তোরা,

যে-হাতে বেত নিয়ে উনি আস্ফালন করেন, সেই হাতটি শীঘ্রই ওঁর পক্ষাঘাতে ধরবে।

তাহাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন ভৃগুসংহিতার গণনার মত আশ্চর্যরূপে মিলিয়া গেল। ঐ কথা বলিবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই, পক্ষাঘাতে না হউক, কলতলায় পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া পণ্ডিতমশায়ের দক্ষিণ হস্তটি এরূপ বিষম-রূপে জখম হইয়া গেল যে, ডাক্তার ডাকিতে হইল, ঔষুধের হাট বসাইতে হইল, শয্যা গ্রহণ করিতে হইল, স্কুল হইতে এক মাসের ছুটি লইতে হইল এবং আরও কত-কি করিতে হইল।

এক মাসেরই মধ্যে যদিচ তাঁহার হস্ত ভাল হইল বটে, কিন্তু বুকে-পিঠে কিসের একটা ব্যথা দেখা দিল এবং সেই ব্যথা তাহার অনেক সাঙ্গোপাঙ্গকে ডাকিয়া আনিল; যথা—অল্প জ্বর, মাথা ধরা এবং ঘোরা, হাত-পা জ্বালা, অরুচি, গা-বমি, পেট ফাঁপা—ইত্যাদি। সুতরাং স্কুলের এক মাসের সমস্ত ছুটি ফুরাইয়া গেলে, ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে আরও তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করিতে হইল এবং ছুটি মঞ্জুর হইলে, তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে ছুটিতে হইল—যেখানে তাঁহার মামাতো ভাইয়ের শ্যালিকার নন্দাই শ্রীযুত কৃষ্ণদাস ভিষকরত্ন কবিরাজী ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

এদিকে পণ্ডিতমশায়ের স্থানে স্কুলে তিন মাসের জন্য যে নূতন পণ্ডিতমশায় আসিলেন, তাঁর নাম—নিবারণ চক্রবর্তী। তিনি 'মেস'-এ খান, শনিবার স্কুল করিয়া 'উইক-এণ্ড'-এ দেশে যান, সোমবার প্রথম ট্রেনে ফিরিয়া আসিয়া স্কুল করেন, হেসে হেসে সকলের সঙ্গে কথা কহেন, সর্বদা শুদ্ধবেশে থাকেন এবং নিত্য প্রাতে পূজান্তে 'শিখায়' একটি করিয়া পূজার ফুল বাঁধিয়া ছাত্রদের পড়ান। এ-হেন নির্মল চরিত্র এবং নিরীহ নিবারণ চক্রবর্তী বার বার বারণ করিয়াও যখন সেদিন 'অ-আ-ই-উ'-কে পড়ার সময় গল্প করা হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়াই এবং 'ই-উ'-কে, অর্থাৎ ইন্দু ও উমাপদকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিলেন।

যাহা কখনও ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল। সূর্যদেব স্থানভ্রষ্ট হইল, পৃথিবী নিশ্চল হইল, আকাশ নামিয়া আসিল, সমুদ্র শুকাইয়া গেল, বৈশাখে উত্তর বাতাস বহিতে লাগিল। অন্য ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এইবার কি হয়—কি হয়। 'অ-আ-ই-উ'কে দাঁড় করিয়ে রাখা! বুকের পাটাখানা ত কম নয়! ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই স্কুলের ছুটির পর 'অ-আ-ই-উ' পরামর্শ করিল, দাঁড় করিয়ে রাখার মজাটা কালকেই দেখিয়ে দিতে হবে ভাল করে। তাহার পর পরস্পর প্রকাশ্যভাবে যে পরামর্শটা করিয়া রাখিল, আর সকলের কাছে তাহা অপ্রকাশ্যই রহিল।

পরদিন নিবারণ পণ্ডিত ক্লাসে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার চেয়ারের সামনে টেবিলের উপর একখানি কাগজে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

নিবারণ চক্কোত্তি······
মেসে করেন উদরপূর্তি।
টিকিতে বাঁধেন ফুল,
নিজেও একটি Fool।
শনিবার যান দেশে ;
মরবেন অবশেষে।
মলে পরে টানতে টানতে
নিয়ে যাব নিমতলাতে।

সেইদিন 'অ-আ-ই-উ' পাশাপাশি না বসিয়া সমস্ত বর্ণমালার মধ্যে ছড়াইয়া বসিয়াছিল। নিবারণ পণ্ডিত লেখাটি মনে মনে পাঠ করিয়াই ভীষণ গরম হইয়া কহিলেন, এটা কে লিখেছে ?

কোথা হইতে উত্তর আসিল, আমি পণ্ডিতমশাই।

চারিদিকে রক্তবর্ণ চক্ষুর বক্রদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া নিবারণ পণ্ডিত কহিলেন, কে ?

একটি ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, ইন্দু।

'ই'-র দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া পণ্ডিত কহিলেন, তুমি লিখেছ ?

'ই' কহিল, কবিতা লেখা শিখছি একটু একটু।

—দাঁড়িয়ে উত্তর দাও।

'ই' দাঁড়াইল। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, ঐভাবে সমস্ত ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে। আজ থাকবে, কাল থাকবে, পরশু থাকবে।

—১৩৪৮ সালটাই থাকবো। বলিয়া 'ই' বসিয়া পড়িল।

নিবারণ পণ্ডিত তখন দমকা হাওয়ার মত 'ই'-র সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গর্জন করিয়া কহিলেন, শুধু দাঁড়ানো নয়, বেঞ্চির উপর

দাঁড়াও। দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাঁড়াও! বলিয়া দুই হাতে তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া ভীষণভাবে একটা ঝাঁকানি দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে টানিয়া, ঠেলিয়া, ধাক্কা দিয়া, অবশেষে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিতে বাধ্য করিলেন। যৎপরোনাস্তি নির্যাতিত হইয়া 'ই' বেঞ্চের উপর দাঁড়াইল। তখন তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল, যেন সর্বদেহ তাহার কাঁপিতে লাগিল। 'আ' একস্থান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, স্যার, অমন করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন; ওর যে ফিটের ব্যায়রাম আছে, ঐ দেখুন কাঁপছে।

রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া পণ্ডিত কহিলেন, কাঁপুক।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা কোলাহল উঠিল। 'ই' দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বেঞ্চের উপর হইতে ধড়াস্ করিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গিয়াছে। 'অ-আ-উ' ছুটিয়া 'ই'-কে ঘিরিয়া বসিল। 'অ' কহিল, যা ভয় কচ্ছিলুম—তাই। একেবারে সেন্সলেস্! হায় হায়, কেন স্যার, ওকে দাঁড় করাতে গেলেন! 'আ' মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া কহিল, ঈস্—একেবারে দাঁতকপাটি। 'উ' নাকের কাছে হাত রাখিয়া বিষম চিন্তিতভাবে কহিল, নিশ্বাস পড়ছে ত?

নিবারণ পণ্ডিত ছুটিয়া আসিলেন। তিনিও কাঁপিতে লাগিলেন; তবে বাইরে নয়, ভিতরে; অর্থাৎ দেহে নয়, মনে। ভয়-চকিত নেত্রে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, শিগ্‌গির এক ঘটি জল নিয়ে এস, আর একখানা পাখা।

'আ' কহিল, আর পাখা! এ যে গা ক্রমেই ঠাণ্ডা আর কাঠ হয়ে আসছে। স্যার, নাড়ীটা একবার দেখুন দেখি, যেন নেই বলে মনে হচ্ছে। নিবারণ পণ্ডিত কম্পিত হাতে নাড়ীটা দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল, সত্যই যেন নাড়ী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। 'উ' কহিল, আর কি হবে! স্কুলের ভেতর পণ্ডিতমশায়ের হাতেই ওর প্রাণটা এইভাবে যাবে, এইটেই হয়ত ওর কপালে লেখা ছিল!

'অ' কহিল, সকলে মিলে হট্টগোল করো না। অন্য সব মাষ্টারমশাইরা যেন একথা টের না পান।

সুবিধার মধ্যে, সেকেণ্ড ক্লাসের ঘরখানা রাস্তার দিকেই ছিল এবং রাস্তার দিকেই তার একটা দরজা ছিল। 'অ-আ-উ'র সঙ্গে তখন নিবারণ পণ্ডিতের এইরূপ পরামর্শ হইল যে, একখানা ট্যাক্সিতে করিয়া 'ই'-কে তাহার গৃহে লইয়া

যাওয়া হউক এবং একটি ডাক্তারকে ডাকা হউক। যাহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা না যায়, সেজন্য পণ্ডিতমহাশয় অনেক ধরিয়া সকলকে—বিশেষ 'অ-ই-উ'-কে অনুরোধ করিলেন এবং 'আ'-র হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিলেন, এই থেকে খরচ-পত্র করো। নোটখানা ট্যাকে গুঁজিয়া 'আ' কহিল, খুচরো একটা টাকা থাকে ত দিন, ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দেবো।

সন্ধ্যার পূর্বে পার্কে বসিয়া চারি বন্ধুতে কথা হইতেছিল। তাহাদের পরামর্শের সুফল দর্শনে সকলেই সবিশেষ স্ফূর্তিযুক্ত। নোটখানা অবিনাশ পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, কাল বুধবার, সকলে দক্ষিণেশ্বরে গমনং এবং সেখানে এই টাকাতে ভাল করে ফীস্ট করণং। তোমরা রাজী ত?

সকলেই সোৎসাহে রাজী হইল। রাজী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশু প্রস্তাব করিল, এস, আজ সকলে এই পার্কে কাটানো যাক। প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল।

এই চারিটি ছেলে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিত এবং এইজন্য গৃহে তাহাদের যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইত। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের এইসব স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই। তাহারা বলিত—

"চল্‌চি মোরা সুমুখ পানে—
মোরা নবীন দীপ্ত,
এগিয়ে চলার নেশার টানে
চিত্ত মোদের ক্ষিপ্ত।"

কিন্তু ইহার ভিতর আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস আছে। লেখাপড়ার দিক দিয়াও 'চিত্ত ইহাদের ক্ষিপ্ত।' পরীক্ষায় প্রথম চারিটি স্থান ইহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এ বিষয়ে ক্লাসের কেহই কখনও ইহাদের পরাভব করিতে পারে নাই।

ইন্দু কহিল, আজ রাতে পার্কে কাটানো নেহাৎ মন্দ হবে না। লাইফের এ হ'ল একটা ছোট-খাট য়্যাডভেঞ্চার। আমরা যেন সাবেক কালের সেই রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, পাত্রের পুত্র আর কোটালের পুত্র। চার বন্ধুতে যেন বিদেশে এসেছি। কিন্তু ভাই, তা হলে এক কাজ করতে হবে। খানিক খানি সময় তিনজন করে ঘুমুবে আর একজন পাহারায় থাকবে।

ব্যবস্থামতই কার্য হইল। সারারাত্রি পালা করিয়া, পাহারা দিয়া এবং ঘুমাইয়া পার্কের মধ্যেই তাহাদের কাটিয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। প্রত্যুষে সকলে জাগরিত হইলে দেখা গেল যে, অবিনাশের পকেটের সেই দশ টাকার নোটখানি নেই; তাহা যেন ভানুমতীর বাজীর মত কোথাও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি একদিকে উপেক্ষারও নয় এবং অপরদিকে ইহা লইয়া হৈ-চৈ করাও চলে না। যে হউক একজন নিশ্চয়ই নোটখানি লইয়াছে। হয়ত সকলের জামা-কাপড় অনুসন্ধান করিলে, কাহারও না কাহারও কাছ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু কেহই যখন স্বীকার করিতেছে না, তখন সেরূপ কার্য করিতে যাওয়ার মানে—পরস্পরের বন্ধুত্বের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের ভাব জাগাইয়া তোলা। চারিজনের মধ্যে যে নোটখানি লইয়াছে, নিশ্চয়ই বন্ধুত্বের অপেক্ষা লোভই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। আবার এমনও হওয়া আশ্চর্যের নহে যে, সেই লোভের অন্তরালে এমন একটা প্রয়োজন বা অভাব তাহার বর্তমান যে, আর কোনও দিক সে বিচার করবার অবকাশ পায় নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারে সকলেরই মুখে একটা বিস্ময় এবং ক্ষুণ্ণভাব দেখা দিল।

পাড়ায় নেড়ামামা বলিয়া এক সরকারী মামা ছিলেন। তিনি ইহাদের চারিজনকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। ইহারাও তাঁহাকে একদিকে আপন মাতুলের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, অপরদিকে বয়স্যের ন্যায় তাঁহার সহিত নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ করিতেও ছাড়িত না।

অবিনাশ কহিল, চল সকলে, নেড়ামামার ওখানে যাওয়া যাক। ওখান থেকে চা খেয়ে, যে যার বাড়ী যাবে। তবে আজ আর স্কুলে যাওয়া নয়।

নেড়ামামার গৃহে আসিলে, তিনি কহিলেন,—সকালবেলাতেই সব কি মনে করে রে? চা খাবি নাকি সব এক কাপ করে?

ইন্দু কহিল, সেইজন্যেই ত সকলের মামার বাড়ী শুভাগমন, মামা।

অতঃপর কোন ফাঁকে একটু আড়ালে গিয়া অবিনাশ নেড়ামামাকে তাহাদের পার্কে রাত্রিযাপন এবং নোট চুরির কথা জানাইল। সমস্ত শুনিয়া নেড়ামামা কহিলেন, আমি কাজীর বিচারে এই দণ্ডেই নোট চোরকে ধরে ফেলবো। তবে তোদের মধ্যে কাকেও জানতে দেব না। তাতে বন্ধুত্বের প্রণয়ে একটা দাগ এসে পড়বে। তবে, আমি জানতে পারবো এবং তার কাছ থেকে নোটখানাও বার করে দেব।

তারপর সকলের চা খাওয়া হইলে নেড়ামামা কহিলেন, আজ তোদের একটা গল্প বলব, সকলে মন দিয়ে শোন্। বলিয়া তিনি এক গল্প সুরু করিলেন।

নেড়ামামা কহিলেন—

বহুকাল আগে দক্ষিণ দেশে বিক্রমবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে—নাম বলাদিত্য। বলাদিত্যের বয়স যখন বারো বৎসর তখন এক সন্ন্যাসী ঠাকুর একদিন রাজবাটীতে এসে রাজার অনুরোধে তার বিষয়ে গণনা করতে বসলেন। গণনা করে তিনি বললেন, রাজপুত্রের একটা ফাঁড়া আছে। সেই ফাঁড়ার সময় অতি নিকটে। এই সময় একটি কাজ করলে ঐ ফাঁড়া থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারবে। রাজা বললেন, কি কাজ? সন্ন্যাসী বললেন, আসছে অষ্টমীর দিন বেলা তিন প্রহরের সময় মহাবনের মধ্যে যে বনদেবীর মন্দির আছে, রাজপুত্রকে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে একলা সেই স্থানে গিয়ে দেবীর পায়ে প্রণাম করে আসতে হবে! তা হলেই ফাঁড়া কেটে যাবে। যথাদিনে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে রাজপুত্র একলা মহাবনে প্রবেশ করলেন। খানিক যেতেই এক কাপালিকের সঙ্গে দেখা। কাপালিক কহিল, তোমার মতই একটি সুন্দর বালক আমি চাই, পূজায় বলিদান দেব, চলো।

রাজপুত্র বললেন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি; আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। কাপালিক রাজপুত্রের কথায় ভুলে সেইখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আর কিছু দূরে গেলে এক বিষধর সর্প রাজপুত্রের সামনে এসে ফণা তুলে বললে, অনেকদিন মানুষকে ছোবল দেবার সুযোগ পাইনি। আজ তোমাকে ছোবল দেবো।

রাজপুত্র তাকে বললেন, তাতে আর কি; ছোবলই দেবেন। আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি, আপনিই এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এলেই ছোবল দেবেন। সর্পও অপেক্ষা করে সেইখানে থাকলো।

আরও খানিক অগ্রসর হ'লে সহসা এক ভীষণ দর্শন সিংহ রাজপুত্রের সামনে এসে বলল, মানুষের মাংস বহুকাল পেটে যায় নি, আজ তোমাকে পেটে পুরবো। রাজপুত্র বললেন, আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব;

তখন আপনি আমায় পেটে পূরবেন। তার জন্য আর কথা কি? সিংহ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রাজপুত্রের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

আরও কিছু পথ অগ্রসর হলে, এক দস্যু এসে রাজপুত্রের হাত ধরলো। সে বললে, আজ আমার ভারি লাভের দিন, নইলে এত সব দামী সোনা, হীরে, মুক্তার গহনা শুদ্ধ তোমাকে পাই? এখন এস, সব অলঙ্কার তোমার গা থেকে খুলে নি।

রাজপুত্র বললেন, আমি বনদেবীকে, প্রণাম করতে যাচ্ছি। ফিরে এলে সব অলঙ্কার নিয়ে নেবেন। এইখানে অপেক্ষা করে একটু থাকুন, আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব।

দস্যু সেইখানে রাজপুত্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারছ যে, সে-পথে রাজপুত্র আর ফিরে এলেন না। সকলকে স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে রেখে রাজপুত্র অন্য পথে বাড়ী ফিরে গেলেন।

ছেলেরা তখন প্রশ্ন করিল, তারপর কি হল মামা?

নেড়ামামা কহিলেন, তারপর যা হ'ল, তা তোমাদের একে একে আমি বলব। তোমরা চারজনেই ওদিককার বারান্দার ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে বসো; আমি এক একজনকে ডেকে বাকী গল্পটা শোনাব।

সকলেই বারন্দার সেই বেঞ্চে গিয়া বসিল। নেড়ামামা প্রথমে অবিনাশকে ডাকিয়া কহিলেন, আচ্ছা, গল্পটা ত শুনলি। এখন বল্ দেখি, কাপালিক, সাপ, সিংহ আর দস্যু—এদের মধ্যে কে বেশী বোকা?

অবিনাশ কহিল, কাপালিকই বোকা, মামা। রাজপুত্রকে যে ছেড়ে দিলে, তা বনের ভেতর আর বলিদানের ছেলে সে পাবে কোথায়? সেই সবচেয়ে বোকা।

মামা কহিলেন, তুই ঐ ওদিককার ঘরের ভেতর গিয়ে বোস্। অবিনাশ চলিয়া গেল।

তারপর মামা আশুকে ডাকিয়া ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আশুও কহিল যে, কাপালিকটাই বিষম বোকা। সে নির্দয় কাপালিক হয়ে রাজপুত্রের স্তোকবাক্যে ভুলে গেল।

মামা তাহাকেও ঐ ঘরে গিয়া বসিতে বলিলেন। তারপর ডাকিলেন ইন্দুকে। ইন্দু মামার প্রশ্নের উত্তরে কহিল, সিংহটাই বোকা। পশুরাজ হয়ে

যে এমন বোকারাজ হয়, এত ভারী আশ্চর্য। শিকার হাতে পেয়ে কখন কেউ ত্যাগ করে ?

মামার আদেশে, ইন্দু সে ঘরে গিয়া বসিল। তারপর উমাপদকে ডাকিয়া মামা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, সবচেয়ে বোকা হচ্ছে মামা—ঐ চোরটা। অত সব দামী দামী গয়না, সোনা, হীরে, মুক্তো—এমন সুযোগ হেলায় হারায় যে, তার মত বোকা ত দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

মামা কহিলেন, উমাপদ আমি কারও কাছেই প্রকাশ করবো না। কিন্তু নোটখানা তুই-ই নিয়েছিস্। কাজীর বিচারে আমি ধরে ফেলেছি। তা তোর কোন লজ্জা বা ভয় করবার দরকার নেই। এ কথা তুই আর আমি ছাড়া এদের ভেতর কেউ জানতে পারবে না। খুবই হয়ত দরকারে পড়ে তুই এ কাজ করেছিস্, তা আমি বুঝেছি। কিন্তু এ নোটখানা তোকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কোথায় রেখেছিস্, বার করে দে।

উমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মামা কি করে জানলেন যে, আমি নিয়েছি ?

—ঐ যে বললুম, কাজীর বিচার। চোরকে তুই যখন সবচেয়ে বোকা বলেছিস্, তখন বুঝেছি যে, তোরও লোভ ঐ গয়নাগুলোর ওপর। সুতরাং নোটখানার লোভও তুই কিছুতেই সংবরণ করতে পারিস্ নি।

এই কথা বলিয়া মামা উমাপদকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক প্রকার বুঝাইলে, উমাপদ নোটখানি বাহির করিয়া মামার হাতে দিল। সে নোটখানা জুতার শুকতলার নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

তাহার পর মামা চারিজনকে এক সঙ্গে ডাকিয়া নানা প্রকার বাজে গল্প-গাছা করিবার পর, নোটখানি অবিনাশের হাতে দিয়া কহিলেন, দেখ দেখি রে, এই নোটখানাই কি নয় ?

অবিনাশ কহিল, এক কোণে 'অ-আ-ই-উ' লেখা আছে, হ্যাঁ মামা —এইখানাই।

সকলেই তখন এই ব্যাপারে অতিমাত্রায় চকিত হইল। মামা কিন্তু কাহাকেও জানিতে দিলেন না যে, কে নোট চুরি করিয়াছিল। শুধু বলিলেন যে, নোটখানা পণ্ডিতমশায়কে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তিনি নোট সংক্রান্ত সকল কথাই অবিনাশের মুখে শুনিয়াছিলেন।

সেদিন কেহই আর স্কুলে গেল না। কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত সকালেই

দুইবার অবিনাশের বাটীতে আসিলেন, ইন্দু কেমন আছে দেখিতে। সমস্ত রাত দুর্ভাবনায় তাঁহার ভাল করিয়া নিদ্রা হয় নাই। প্রথমবার তাঁহার সহিত অবিনাশের দেখা হয় নাই; সে তখন নেড়ামামার বাড়ীতে। দ্বিতীয়বার যখন আসিলেন, তখন শুধু অবিনাশের সঙ্গে নয়, সকলেরই সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। নোটখানা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং 'অ-আ-ই-উ' তাঁহাকে পরামর্শ দান করল, স্যার, আমাদের ওপর একটু 'স্পেশ্যাল ফেবার' করবেন। পড়া-শুনোতে আমরা ঠিকই আছি এবং ঠিকই থাকব স্যার।

বাস্তবিকই পড়াশুনাতে তাহারা বরাবর ঠিকই ছিল। অবিনাশ, আশু এবং ইন্দু এই বৎসর এম-এ এবং নোট চোর উমাপদ এম-এস-সি পাশ করিয়াছে।

এখনকার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কথা মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে পাওয়া যায়—'পাটলিপুত্র থেকে পেশোয়ার অবধি ১১৫০ মাইল পথ। পথের প্রতি মাইলে পাথর বসানো ছিল, সেই পাথরের গায়ে লেখা ছিল সংখ্যা ও দূরত্ব। পথের তদারক করার জন্য রাজকর্মচারীও ছিলেন।'



তুর্কি * যামিনীকান্ত সোম

[দিল্লীর কয়েক ক্রোশ দূরে ছোট একখানি গ্রাম। গ্রামের শেষ সীমায় একটি কুঁড়েঘর। ঘরের ভেতর তখন আর কেউ ছিল না, কেবল এক বুড়ী উনুনের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছিল। উনুনের উপর একটা হাঁড়ি চড়ানো, তাতে ডাল সিদ্ধ হচ্ছিল। পাশে একখানা বড় থালাতে মোটা মোটা অনেকগুলো রুটি, আর তার পাশেই এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল।]

বুড়ী—ও জয়মল, কোথায় গেলি!—তা যাক্ গে, যেখানে খুসি। আমি যখন ছোট ছিলুম, একটু কোথাও গেলেই মা অমনি বলে উঠতেন, 'যাস্ নে বাছা, যাস্ নে—তুর্কি ধরে নেবে।' সে আজ কত কালের কথা! ছোট ছেলেরা দুরন্তপনা করলে, অমনি তুর্কির নাম করলেই একেবারে ভয়ে কাঁচুমাচু।—অ্যাঁ, অত গোলমাল কিসের!

[বাইরে দুম্‌দাম্ পায়ের শব্দ। তিন চার জন গ্রামের লোক ছুটে এসে ঘরের ভেতর ঢুকলো।]

১ম গ্রামবাসী—ও বুড়ী!—ও আয়ী! সর্বনাশ হয়েছে—তুর্কি এসেছে। পালা, পালা, শিগগির বলছি। মেয়েদের সব একসঙ্গে জড়ো করে এক্ষুনি পালা। নইলে গেলি এবার!

বুড়ী—(একটুও ব্যস্ত না হয়ে) তুর্কি? তুর্কি মরে এদ্দিনে কবরের ভেতর ঢুকেছে। সে কি আজকের কথা রে? সে আমার ঠাকু'মার আমলে একবার এসেছিল। কি হয়েছিল শুনবি—?

২য় গ্রামবাসী—দোহাই তোমার আয়ী! এখন তোমার ঠাকু'মার আমলে শুনতে গেলে, তুর্কি এক্ষুণি এসে ঘাড় মট্‌কাবে। যা বলছি শোন। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর পালাও, আর দেরী না।—এই তারা এসে পড়লো বলে। আমি নিজের চোখে দেখে এলুম। তুর্কিরা পঙ্গপালের মত যা পাচ্ছে তাই পেটে পুরে ফেলছে। পালাও আয়ী, শিগগির। (বিড়বিড় করতে করতে আয়ী বুড়ী কুলুঙ্গি হাতড়াতে লাগলো) হাঁ হাঁ, যা পারো, সোনা চাঁদি যা পারো নিয়ে পালাও—শিগগির পালাও।

[আয়ী বুড়ীর পলায়ন

৩য় গ্রামবাসী। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) জয়মল যে এখনো এলো না।

১ম গ্রামবাসী। আর জয়মল। এখন যে যার নিজের প্রাণ নিয়েই পালাতে পারলে হয়। কে তোমার জয়মলের জন্য বসে থাকবে? নিজের উপায় সে নিজেই করবে এখন।

২য় গ্রামবাসী। জিনিসপত্র কি নেবে, নাও না হে, চট্‌ করে, হল্লা শুনছো না? এসে পড়লো যে!

[সকলের দ্রুত পলায়ন

[তারপর সঙ্গে সঙ্গেই একদল তুর্কি এসে ঘরে ঢুকলো, আর জিনিসপত্র হাতড়াতে লাগলো।]

সেনাপতি—কি। লোকজন কেউ নেই। বড্ড পালিয়েছে যা হোক। বাহবা, ক্যা তোফা, খানা যে তৈরী। (এক গোছা রুটি হাতে তুলে নিয়ে হাঁউ হাঁউ করে খেতে সুরু করে দিল) আরে, তোরা ওদিকে কি হাতড়ে বেড়াচ্ছিস্‌?—ত্যাখ এদিকে।

[সকলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়লো আর রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিল। এমন সময় আর একজন লোক, এদেরই মতন দেখতে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঘরের ভেতর ঢুকলো। একে দেখেই কিন্তু সকলে ভড়কে গিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। এ আর কেউ নয়—তৈমুর নিজে।]

তৈমুর। তোমাদের না হুকুম দিয়েছিলুম, বরাবর অমরকোট পর্যন্ত ধাওয়া করতে? তবে যে বড় এখানে মজা করছ? আচ্ছা, মনে থাকবে আমার এ সব!—সেনাপতিমশায়ের নামটি কি ভুলে যাচ্ছি যে!

সেনাপতি। হুজুর খোদাবন্দ্। অধীনের নাম নসীব বেগ।

তৈমুর। তোমার যা নসীব, তাতে সত্যিই তোমায় অনেক বেগ পেতে হবে। এখন বেরোও সব এখান থেকে।

[সেনাপতি ও সৈন্যদলের প্রস্থান। তৈমুর লোলুপ দৃষ্টিতে রুটির খালি পাত্র আর জলের খালি ঘড়ার দিকে চেয়ে রইলো।]

তৈমুর। রুটির একটা টুকরোও রাখে নি—জল এক ফোঁটাও নেই। ওদের আর কি দোষ? আমি হলেও ঠিক এই রকমই করতুম, অর্থাৎ নিজে যখন খিদেয় মরছি তখন অপরে বাঁচলো কি মলো, সে কথা একবারও মনে আনতুম না।

[উনুনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো]

যাক্, আমার কাজ এক রকম শেষ হয়েছে। তুর্কি হিন্দুস্থানে এসে আর একবার বেশ ক'রে দেখিয়ে গেল। হতভাগা কাফেরগুলো তুর্কির কথা আরো অন্ততঃ একশ' বছর ভুলবে না।

[দরজা খুলে গেল, আর একটি দশ বছরের ছেলে এক ঘটি দুধ হাতে করে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। ছেলেটির নাম জয়মল।]

জয়মল। ঠাকু'মা, এই নাও দুধ—(অমনি তৈমুরকে দেখে আঁৎকে উঠে ছুটে পালাবার উপক্রম।)

তৈমুর। কি বল্‌লি ছোঁড়া?—দুধ—আচ্ছা, নিয়ে আয় এদিকে।

জয়মল। (ইতস্ততঃ ভাবে) এ আমার নয় কিন্তু!

তৈমুর। (কাষ্ঠহাসি হেসে) তোর নয়? তবে তো ভালই! দে, আমায় দে।

[খাপের ভেতর থেকে সড়াৎ করে তলোয়ারটা বার করেই মাথার উপর উঁচালো। আবার কি ভেবে সেখানা একটা তাকের উপর রেখে দিল। তারপর এক লাফে জয়মলের উপর পড়ে তার হাত থেকে দুধের ঘটি কেড়ে নিয়ে, মারলে তাকে এক ধাক্কা। ধাক্কা খেয়ে জয়মল গড়াতে গড়াতে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকলো। এদিকে চক্ষের নিমেষে এক ঘটি দুধ ঢক্ ঢক্ করে তৈমুরের পেটের ভেতর চালান গেল। জয়মল ততক্ষণে উঠে

দাঁড়িয়েছে। এবার সে পালাবার চেষ্টা তো করলই না, বরং চোখমুখ লাল করে রুখে দাঁড়ালো।]

তৈমুর। তোর বড্ড জোর বরাত রে ছোঁড়া, বেঁচে গেলি। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, তাই দুধের ঘটি নিতেই সময় গেল, তা তোকে মারবো কি? এখন তোর দুধ খেয়েছি, আর হাত উঠছে না মারতে। তা যাক্, তোর সাহস আছে। আমার লোকজন যে সব চলে গেল, নইলে তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতুম, আর তোফা এক মুসলমান বানিয়ে নিতুম। তা তোর বরাতে কালিয়া-পোলাও খাওয়া নেই, আমি তার কি করবো বল? যেমন কাফের আছিস্ তেমনি কাফের থেকেই এই জাহান্নামে পড়ে থাক। কিন্তু মনে রাখিস্ ভাল করে যে, তুই তুর্কিসর্দার তৈমুরকে দেখেছিলি, অথচ সে তোকে প্রাণে মারেনি। তৈমুরের হাতে পড়েও নিস্তার পেয়েছিস্, এ কথা তুই ছাড়া কেউ বলতে পারবে না কোনদিন।

[তলোয়ারখানা খাপের ভেতর পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।]

[বুড়ী আবার ফিরে এলো, আর বিড়বিড় করতে করতে গিয়ে উনুনের ধারে বসে আগুন উস্কাতে লাগলো।]

বুড়ী। ওদের সঙ্গে যেতে পারলুম না। ওরা চট্ পট্ সব পালিয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ, আর ওরা সব জোয়ান।—কিন্তু তুর্কি আমায় ধরতে পারবে না। তা কি পারে? আমি যে বড্ড বুড়ী।

জয়মল। ঠাকু'মা, আমি তাকে দেখেছি।

বুড়ী। (চম্‌কে উঠে) কাকে রে?

জয়মল। তুর্কিসর্দার তৈমুরকে।

পম্পেই নগরীর ধ্বংসশেষের মধ্যে গজদন্ত নির্মিত ভারতীয় শিল্পের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।



বীরবলের রসিকতা ✻ সুলতা কর

সম্রাট আকবর রাজসভায় বসে রয়েছেন। চারদিকে মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদেরা ঘিরে রয়েছে। রাজসভার কাজ চলছে। হঠাৎ সম্রাট তাঁর পরিহাস রসিক সদস্য বীরবলের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "বীরবল, তুমি হলে আমার রাজসভার নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। শুধু তাই নয়, আমার প্রজারা বলে যে তোমার মত বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ দাও। এমন একটা বুদ্ধির পরিচয় দাও যার ফলে প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদেরা সবাই বোকা বনে যাবে, আমি বোকা বনে যাব।"

সম্রাটের কথা শুনে বীরবল দু-চার মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মজার ফন্দী ভেবে নিলেন, তারপর বললেন—"সম্রাট, আপনি যা বলেছেন আমি তা করতে পারি, কিন্তু সেজন্য আমাকে লক্ষ টাকা দিতে হবে আর এক বছর সময় দিতে হবে।"

সম্রাট বললেন—"রাজকোষ থেকে যত ইচ্ছা টাকা নাও, এক বছর সময়ও নাও। তাছাড়া যা বলেছি তা করতে গিয়ে যদি দু'চারজন লোকের কোন ক্ষতি হয় বা কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তাতেও তোমাকে কিছু বলব না।"

বীরবল সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সম্রাট, আপনি যা চান তাই হবে।"

সেদিন রাজসভায় বীরবলের সঙ্গে এই রকম কথাবার্তা হল। সম্রাট আকবর কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই নানা কাজের মধ্যে তাঁর কথাটা একেবারে ভুলে গেলেন।

কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন বীরবলের বাড়ী থেকে একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে সম্রাটকে জানাল যে বীরবলের খুব শক্ত অসুখ করেছে। রাজবৈদ্য বলেছেন বীরবলকে বাঁচান যাবে না, শীঘ্রই তিনি মারা যাবেন।

সম্রাট তাঁর অন্য সব মন্ত্রীর চেয়ে বীরবলকে বেশী ভালবাসতেন। এই খবর শুনে তাঁর মন এত খারাপ হল যে, রাজসভার কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং কয়েকজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তখনি বীরবলকে দেখবার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে বীরবলকে খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। রাজবৈদ্য শুকনো মুখে পাশে বসে রয়েছেন। বীরবলের স্ত্রী আর ছেলেরা খাটিয়ার চারপাশ ঘিরে বসে 'হায় হায়' করে কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

সম্রাটকে দেখে রাজবৈদ্য উঠে দাঁড়াল, অভিবাদন করে বলল—"সম্রাট, বীরবল আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে। আপনি তার প্রিয় বন্ধু। তার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করুন।

রাজবৈদ্যের কথা শুনে আর বীরবলের স্ত্রী-পুত্রের কান্না দেখে সম্রাটের চোখে জল এসে গেল। তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন, তারপর রাজবৈদ্যের নির্দেশ মত রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। দু'ঘণ্টা পরে সম্রাটের কাছে খবর পৌছল যে বীরবল মারা গেছেন।

সম্রাট আদেশ দিলেন যে দু'দিন ধরে তাঁর রাজ্যে বীরবলের জন্য শোক-দিবস পালন করা হবে।

এর পর চার মাস কেটে গেছে। সম্রাট আকবর যথারীতি সভায় বসে রাজকার্য করছেন এমন সময় একজন প্রতিহারী ছুটতে ছুটতে সভায় এসে ঢুকল। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ঠিক যেন ভূত দেখছে এইভাবে

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে সম্রাটকে কুর্নিশ করে সে বলল—"সম্রাট বীরবল···" এই বলেই তার মূর্ছা হল।

প্রতিহারীর কথা শুনে ও হাব-ভাব দেখে সম্রাট আকবর ও সভাসদেরা অবাক হয়ে গেলেন। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

প্রধান মন্ত্রী বললেন—"লোকটার জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না এ সব কথা খুলে বলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিছু বোঝা যাবে না।"

প্রধান মন্ত্রীর কথা সবেমাত্র শেষ হয়েছে এমন সময় হঠাৎ রাজসভার বাইরে ভীষণ হট্টগোল শোনা গেল। হাজার হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করছে—"বীরবল বীরবল !"

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দামী রেশমী পোষাক পরে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বীরবল রাজসভায় ঢুকে হাসিমুখে সম্রাটকে অভিবাদন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। সম্রাট আকবর আর তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদেরা হতভম্ব হয়ে বীরবলের মুখের দিকে চাইলেন। এ কি ব্যাপার, ভেবে উঠতেই পারলেন না। এমন আচম্বিতে ব্যাপারটা ঘটল যে ভয় পেতেও যেন তাঁরা ভুলে গেলেন।

বীরবল সম্রাটকে আবার কুর্নিশ করে হাসিমুখে বললেন—"সম্রাট, ভয় পাবেন না। আমি ভূত নই। আপনার প্রিয় সদস্য বীরবল। তবে একথা ঠিক যে আমি চার মাস আগে মারা গিয়েছিলাম। মারা যাবার দু'মাস পরে আমি স্বর্গে গেলাম। সেখানে দু'মাস থাকলাম। স্বর্গে দেবরাজ আর দেবদূতদের আমি চমৎকার চমৎকার গল্প শোনাতাম। দেবরাজ আর দেবদূতেরা বললে—এমন মজার গল্প তাঁদের কেউ কোনদিন শোনাতে পারেনি।

খুব খুশি হয়ে তাঁরা আমাকে বর দিতে চাইলেন। আমি বললাম—'আমি মর্ত্যে আমার বয়স্য সম্রাট আকবরের কাছেই ফিরে যেতে চাই।' তাঁরা বললেন—'তথাস্তু।' কাজেই আজ স্বর্গ থেকে নেমে আমি সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।"

ব্যাপারটা যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং ব্যাপারটার মধ্যে যে কিছু আছে বুঝতে পেরে সম্রাট আকবর বীরবলকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু চতুর বীরবল কৌশলে সে সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন—

"হে মহানুভব সম্রাট, আমি স্বর্গ থেকে আসবার সময় স্বর্গের এক রাণীকে সঙ্গে করে এনেছি। অপূর্ব সুন্দরী তিনি। তাঁকে আমি এক গভীর বনে রেখে এসেছি। শিগগিরই আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে। কেননা বেশীক্ষণ একলা থাকলে তিনি রাগ করে স্বর্গে চলে যাবেন।

তাছাড়া আমি স্বর্গ থেকে কতকগুলো আশ্চর্য সুন্দর পোষাক এনেছি। স্বর্গের দেবতারা আর দেবদূতেরা সেই সব পোষাক পরেন। সেই সব পোষাকও আমি সেই বনে রেখে এসেছি। এই পোষাকগুলোর এমন অসাধারণ শক্তি আছে যে ওগুলো যে গায়ে পরবে সে সোজা উড়ে স্বর্গে চলে যেতে পারবে। কাজেই সম্রাট, আমাকে এখনি সেই বনে যেতে হবে। দেরী করলে স্বর্গের রাণী আর স্বর্গের পোষাক সব আবার স্বর্গে চলে যাবে। সেজন্য আপনি যে সব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর এখন দিতে পারছি না। পরে আবার এসে সময়মত উত্তর দেব।"

বীরবলের কথা শুনে সম্রাটের মনে আরও সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলেন—"বীরবল, তুমি সেই স্বর্গের রাণীকে আর স্বর্গের পোষাকগুলো তোমার সঙ্গে এই রাজসভায় আনলে না কেন?"

বীরবল বললেন—"সম্রাট, তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। রাজসভায় আসতে হলে তাঁকে যোগ্য সম্মান দেখাতে হবে ত। আপনি হুকুম দিন মন্ত্রী আর অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে, হাতী-ঘোড়া নিয়ে বাজনা বাজিয়ে দামী চতুর্দোলায় চড়িয়ে স্বর্গের রাণীকে আর স্বর্গের পোষাকগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি।"

সম্রাট প্রধান মন্ত্রীকে বললেন—"বীরবল যা বলছে তাই কর। স্বর্গের রাণী আর স্বগের পোষাক দেখতে আমার মন উৎসুক হয়ে রয়েছে।"

প্রধান মন্ত্রী বীরবলের নির্দেশ মত মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদদের নিয়ে বীরবলের সঙ্গে চললেন। রাজধানী ছাড়িয়ে অল্প দূরে গিয়ে তাঁরা এক বনের সামনে এলেন। বনে ঢুকে তাঁরা এক প্রাসাদ দেখতে পেলেন। গাঢ় লাল আর সোনালী পাথরে তৈরী সেই প্রাসাদের সৌন্দর্যের আর তুলনা নেই।

অবাক হয়ে মন্ত্রী অমাত্য সভাসদেরা প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখছেন এমন সময় বীরবল বলে উঠলেন—"এই প্রাসাদে স্বর্গের রাণী থাকেন। আমি তাঁকে ডাকছি, এখনি তিনি স্বর্গের পোষাক পরে এসে দাঁড়াবেন। প্রাসাদের লাল পাথরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখুন।"

বীরবলের কথা শুনে মন্ত্রী আর সভাসদেরা লাল পাথরের বারান্দার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

বীরবল মন্ত্র পড়বার মত স্বর করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—"হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও, হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও, হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও।"

মন্ত্রী অমাত্য সভাসদেরা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। চোখের পলক আর পড়ে না। কিন্তু কোথায় কি—কোথায়ই বা স্বর্গের রাণী, কোথায়ই বা স্বর্গের পোষাক।

বীরবল তাঁদের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন—"আমার একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। একটা কথা আপনাদের বলা উচিত ছিল। কথাটা এই যে স্বর্গের রাণী আমাকে বলেছেন যে তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। তাঁর মন স্বর্গের নন্দনকাননের মত পবিত্র। সেজন্য যে সব লোকের মনে দুষ্ট বুদ্ধি নেই, যারা অসাধু নয়, শুধু তারাই তাঁকে দেখতে পাবে।

এইবার আপনারা লাল পাথরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখুন। ওই যে স্বর্গের রাণী এসে দাঁড়ালেন। ওঃ কি রূপ, চোখ আমার ঝলসে গেল। দেখতে পাচ্ছেন ত? দেখুন দেখুন, পৃথিবীর কোন লোক স্বর্গের রাণীকে এ পর্যন্ত দেখেনি।"

প্রধান মন্ত্রী কিংবা সভাসদেরা কেউ কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু কি করে সে কথা স্বীকার করেন। স্বীকার করা মানেই হল নিজেদের দুষ্ট লোক আর অসাধু বলে মেনে নেওয়া।

সর্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রী বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বই কি! ওঃ কি রূপ স্বর্গের রাণীর। ওই যে তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, যেন হীরা মাণিক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।"

প্রধান মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতে অন্য সব মন্ত্রী আর সভাসদেরা এক সঙ্গে বলে উঠলেন—"আমরাও দেখতে পাচ্ছি, আমরাও দেখতে পাচ্ছি। স্বর্গের রাণীর রূপের ছটায় চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে। এত রূপ কি আর পৃথিবীতে কারও আছে।"

নিজেদের সাধু প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা সবাই যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। বীরবলকে বলতে লাগলেন—"চলুন চলুন, এখনি প্রাসাদে ঢুকে সমারোহ করে স্বর্গের রাণীকে নিয়ে সম্রাটের কাছে যাই।"

বীরবল তাঁদের উচ্ছ্বাস দেখে হেসে বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন। সম্রাটের কাছ থেকে আর একবার অনুমতি নিয়ে আসি।"

তখন সবাই মিলে সম্রাট আকবরের কাছে গিয়ে বললেন—"সম্রাট, আমরা সেই স্বর্গের রাণীকে দেখেছি? আশ্চর্য রূপ তাঁর। গভীর বনের মধ্যে বিরাট এক প্রাসাদে তিনি রয়েছেন। আপনি অনুমতি দিন আমরা জাঁকজমক করে তাঁকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে আসি।"

মন্ত্রী ও সভাসদদের কথা শুনে সম্রাটের নিজেরও খুব কৌতূহল হল। তিনি বললেন—"চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। স্বর্গের রাণীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি।"

জাঁকজমক করে রাজপ্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বেরোল। সম্রাট আকবর শোভাযাত্রার সামনে দামী রাজপোষাক পরে সাদা হাতীর পিঠে চড়ে চললেন, তাঁর পাশে তেজীয়ান ঘোড়ায় চড়ে বীরবল চললেন। তাঁদের পিছনে সভাসদেরা, মন্ত্রীরা আর হাতী ঘোড়া উট চলল। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটা খালি সোনার চতুর্দোলা বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলল।

শিগগির সবাই বনের মধ্যে, সেই প্রাসাদের সামনে এসে পৌছলেন। সেখানে পৌছে বীরবল সেই একই কথা সম্রাট আকবরকে বললেন। বললেন—"সম্রাট, চেয়ে দেখুন, স্বর্গের রাণী লাল পাথরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনার দিকে চেয়ে হাসছেন। তিনি বলেছেন—'পৃথিবীর কোন অসাধু লোক কিংবা দুষ্ট লোক তাঁকে দেখতে পাবে না'।"

সম্রাটও বীরবলের কূটবুদ্ধির ফাঁদে পড়লেন। মন্ত্রী অমাত্য সভাসদদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অসাধু আর দুষ্টলোক বলতে পারলেন না। কাজেই তাঁকেও বলতে হল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও দেখতে পাচ্ছি। কি আশ্চর্য সুন্দরী ওই স্বর্গের রাণী।"

প্রধান মন্ত্রী আর সভাসদেরা বলতে লাগলেন—"সম্রাট! অনুমতি দিন। আমরাই প্রথমে প্রাসাদে ঢুকে সাত তলায় উঠি। সেখানে গিয়ে স্বর্গের রাণীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।"

বীরবল বললে—"মন্ত্রীমশায়, একটা কথা মনে রাখবেন। তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। স্বর্গের পোষাক না পরলে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।"

এই বলে বীরবল হাসতে হাসতে প্রধান মন্ত্রী আর সভাসদদের দিকে হাত বাড়িয়ে পোষাক বিলি করবার অভিনয় করতে লাগলেন।

তাঁরাও সবাই এমনি বোকা বনে গেছেন যে সেই অদৃশ্য পোষাক হাত দিয়ে ধরে নেবার ভান করলেন। আর নিজেদের সুন্দর পোষাক খুলে ফেলে সেই পোষাক পরবার ভান করতে লাগলেন। কেউই সাহস করে বলতে পারলেন না যে কোন পোষাক দেওয়া হয়নি। কেননা তা হলেই নিজেদের অসাধু ও দুষ্টলোক বলে মেনে নিতে হবে। সেই অবস্থায় মাত্র ভিতরের সামান্য পোষাক পরে তাঁরা সবাই প্রাসাদের সাত তলায় উঠলেন, সেখান থেকে আবার নেমে এলেন। ভান করতে লাগলেন যেন স্বর্গের রাণীকে নিয়ে চলেছেন।

তারপর সেই বিরাট শোভাযাত্রা জাঁক-জমক করে বাজনা বাজিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে চলল। শোভাযাত্রা রাজধানীর কাছে এসে পড়ল।

স্বর্গের রাণীকে দেখবে বলে দলে দলে প্রজারা এসে দাঁড়িয়েছে। শোভা-যাত্রা সামনে আসতেই অবাক হয়ে প্রজারা দেখল প্রধান মন্ত্রী আর সভাসদেরা অতি সামান্য ভিতরের পোষাক পরে চলেছেন। শুধু সম্রাট আর বীরবল নিজেদের পোষাক পরে রয়েছে। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটি খালি সোনার চতুর্দোলা বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। এই দৃশ্য দেখে প্রজারা ঠাট্টা করে হাসতে আরম্ভ করল।

প্রধান মন্ত্রী আর সহ্য করতে পারলেন না। রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন—"সম্রাট, এ সবই বীরবলের ধাপ্পাবাজি। এই চতুর্দোলায় স্বর্গের রাণীও নেই, আর আমরাও স্বর্গের পোষাক পরিনি। এ শুধু আমাদের বোকা বানান হল আর প্রজাদের কাছে অপদস্থ করা হল।"

প্রধান মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই সভাসদেরা চীৎকার করে উঠলেন "সম্রাট, প্রধান মন্ত্রীর কথা সত্য। বীরবল আমাদের সবাইকে প্রজাদের সামনে অপদস্থ করেছে। আমরা প্রতিকার চাই।"

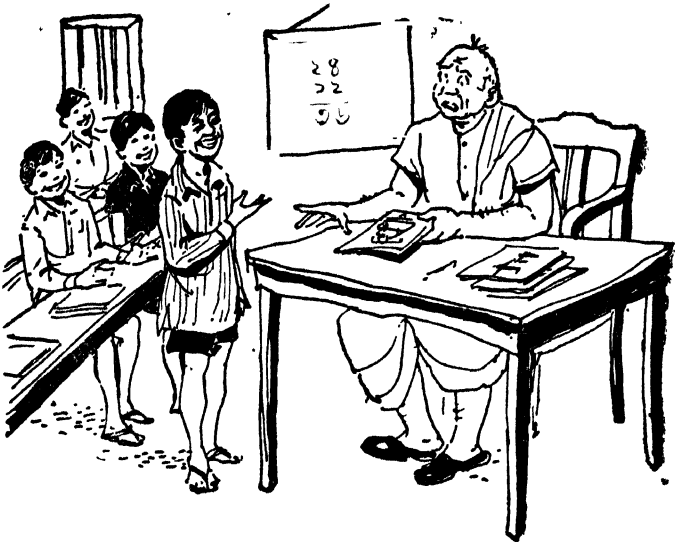
সম্রাট অনেক আগেই সব ব্যাপারটা বুঝেছিলেন আর বীরবলের সবাইকে ঠকাবার কৌশল দেখে খুব মজা পাচ্ছিলেন। কাজেই তিনি একটুও রাগ করলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন—"বীরবল, এঁদের অভিযোগ শুনলে ত? এখন তোমার কি বলবার আছে?"

বীরবল বললেন—"সম্রাট, এঁদের কথা যে সত্য সে আপনি বুঝেছেন। কিন্তু চার মাস আগে রাজসভায় আপনি যে কথা বলেছিলেন তা মনে করুন। সেদিন আপনি বলেছিলেন—যদি আমি রাজ্য শুদ্ধ সবাইকে এমন কি স্বয়ং সম্রাটকে, প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদদের পর্যন্ত বুদ্ধির কৌশলে হারাতে পারি তা হলে আপনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। সেজন্য যদি—কারো অনিষ্ট হয় বা কেউ বিরক্ত হয় তাতেও আমার কোন ক্ষতি হবে না। সম্রাট, এখন আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন।"

সম্রাট হাসতে হাসতে বললেন—"বীরবল, সেকথা আমার মনে আছে। তুমি যে বুদ্ধির কৌশলে আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছ এতে আমি খুশি হয়েছি। তোমায় আমি যথেষ্ট পুরস্কার দেব। আর প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদেরা সবাই স্বীকার করলেন যে তোমার রসিকতার তুলনা নেই।"

সম্রাটের কথা শুনে প্রধান মন্ত্রী এবং সভাসদেরাও রাগ ভুলে গিয়ে বীরবলের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য সম্রাট প্রিয় বয়স্য বীরবলকে তাঁর রসিকতার জন্য প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ার্কাস লিখে গেছেন—'ভারতবাসীরা সাদা চামড়ার জুতা পরে, জুতোর সোল খুব মোটা হয়। সিংহচর্ম ব্যাঘ্রচর্ম মৃগচর্ম কাঠবিড়ালীর চামড়াতেও জুতো হয়। গরীব লোকেরা খড়ম পরে। গাছের পাতা দিয়ে বোনা, ঘাস দিয়ে বোনা এবং পশমের জুতোও হয়। নানা রঙের জুতো তৈরী হয়—লাল নীল হলদে কালো গোলাপী। জুতোর উপর নানা ধরণের শিল্পকর্ম করা থাকে—সোনা রূপা মুক্তা তামা কাঁচ টিন সীসা ব্রোঞ্জ প্রভৃতির কারুসজ্জা দিয়ে জুতো সুদৃশ্য করা হয়।'



আমরা যখন স্কুলে পড়ি * শ্রী নরেন্দ্র দেব

স্থান—শহরের কাছাকাছি একটি গ্রাম।

কাল—রাত্রি, সকাল ও বিকেল।

পাত্র—মা, মাস্টারমশাই, অশোক, অভীক ও অন্যান্য ছাত্রগণ।

প্রথম দৃশ্য

রাত্রি

[অশোকদের খড়ের চাল মেটে বাড়ী—অশোক সদর বাড়ীর পড়ার ঘরে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনে বই খোলা। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা টেবিলের উপর নিবু-নিবু করছে, আর একটি হ্যারিকেন হাতে অশোকের মা এসে প্রবেশ করলেন সে ঘরে।]

মা। খোকা ওঠ্। খাবি আয়। রাত হয়ে গেছে ঢের। খোকা! এই! (গা ঠেলে)।

অশোক। (ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে) কি বলছো মা?

মা। আহা বাছা রে। ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? খিদে পেয়েছে খুব—না রে অশোক?

অশোক। হ্যাঁ মা। তোমার আজ রান্না করতে এত দেরী হল কেন?

মা। ওমা! তুই বুঝি কিছুই জানিস্ নি? এত হৈ হল্লা হল।

অশোক। কেন মা? আমি তো কিছুই শুনতে পাইনি।

মা। কি করে পাবি বল। ঘুমুচ্ছিলি যে। রান্নাঘরে একটু আগে একটা সাপ বেরিয়েছিল আজ।

অশোক। সাপ! ওরে বাবা!

মা। হ্যাঁরে! সাপটার সঙ্গে আবার কিলবিল করছিল অনেকগুলো বাচ্চা সাপ!

অশোক। (ভয়ে আঁৎকে উঠে) ঈশ! কি সর্বনাশ। তারপর?

মা। আমাকে আর একটু হলেই ছোবল মেরেছিল আর কি!

অশোক। (চমকে উঠে) বলো কি! কি করে বেঁচে গেলে মা?

মা। সাপকে আমি ভীষণ ভয় করি জানিস্ তো? হাতের কাছেই দেখি বাটনা-বাটা শিলখানা পড়ে রয়েছে! টপ করে শিলখানা দু'হাতে তুলে নিয়ে ঝপ করে সাপের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে উঠলুম। আমার আওয়াজ শুনে লোকজন সব ছুটে এল। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তুলে দেখা গেল সাপটার পিঠের ওপর ঠিক মাঝামাঝি শিলখানা চাপা পড়েছে। ভারী শিলখানা ঠেলে সাপটা বেরুতে পারছিল না। নিস্ফল আক্রোশে ছটফট করছে। লক্‌লকে জিভ বার করে মাথাটা কেবলই ডাইনে বাঁয়ে নাড়ছিল।

অশোক। আর বাচ্চাগুলো?

মা। সব শিলের তলায় চাপা পড়েছিল। লোকজন যারা দৌড়ে এসেছিল তারা লাঠির ঘায়ে সাপের মাথাটা থেঁতো করে দিলে। তারপর সেই লাঠির খোঁচা দিয়ে ঠেলে শিলখানা সরিয়ে দেখে বাচ্চাগুলো সব সেই শিলের তলায় চাপা পড়ে অক্কা পেয়েছে।

অশোক। উঃ। বড্ড বেঁচে গেছ মা। ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে শিলখানা তুলে চাপা দিয়েছিলে। ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন। তারপর কি হল মা?

মা। তারপর আর কি? যা কিছু রান্না করেছিলুম সব ফেলে দিলুম। কি জানি যদি সাপে মুখ দিয়ে থাকে। আবার নতুন করে রান্না চড়াতে হল। তাই রাত হয়ে গেল। চল, খাবি চল, খুব খিদে পেয়েছে না রে? আহা—

অশোক। চল যাই। কিন্তু আমি ভাবছি মা, শীতকালে তো সাপগুলো গর্তে ঢুকে অসাড়ে ঘুমোয়। বাইরে তো বেরোয় না। তবে এ সাপটা তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকলো কেমন করে ?

মা। কে জানে বাপু। শীতটা আজ খুব জোর পাড়ছে কিনা, তাই হয়তো গরম উনুনের ধারে সাপটা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আগুন পোয়াতে এসেছিল। চল্ খাবি চল্—

অশোক। চলো মা। কিন্তু ভাবছি …

[অশোক মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কুল যাবার পথ

[সময় সকাল। দুটি ছাত্র অশোক ও অভীক কথা বলতে বলতে আসছে]

অশোক। কাল সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি ভাই। ওঃ সে যে কী দুঃস্বপ্ন তোমায় কি বলবো। যতবার লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি তত বারই নেই ভীষণ স্বপ্ন দেখে ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

অভীক। কী এমন দুঃস্বপ্ন রে, যে সারারাত ধরে জেগে জেগে দেখলি।

অশোক। জেগে জেগে দেখিনি, ঘুমিয়ে দেখেছি।

অভীক। এই যে বললি, সারারাত কাল ঘুমুতে পারিনি।

অশোক। পারিনি তো। যেই একটু ঘুম আসছিল চোখে অমনি সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের দফা-রফা।

অভীক। সারারাত সেই একই স্বপ্ন দেখছিলি বারবার ?

অশোক। হ্যাঁ ভাই, আশ্চর্য। একে অন্ধকার ঘর, রাত থমথমে করছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। শেয়াল কুকুর দূরে থাক একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকারও ডাক শোনা যাচ্ছে না। শীতের চোটে সব জড়সড়। আমি যেই লেপমুড়ি দিয়ে চোখ বুজিয়েছি অমনি সেই দুঃস্বপ্ন।

অভীক। আরে দুঃস্বপ্নটা কি তাই বল না। কেবল দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন !

অশোক। ওঃ। সে যে কী ভীষণ দুঃস্বপ্ন। শোন্ তবে তোকে বলি। কাউকে বলিস্ নি যেন।

অভীক। কেন বললে কি হবে ?

অশোক। যদি আর কেউ সেটা দেখে ফেলে?

অভীক। ফেললেই বা। স্বপ্ন বই তো নয়। যদি আর কেউ দেখেই ফেলে তাতে তোর এত লজ্জা কিসের? আর লোকসানই বা কি?

অশোক। না না ছি ছি! কী মনে করবে হয়তো আর সব ছেলেরা।

অভীক। এতে আর মনে করবার কী আছে? স্বপ্ন বই তো নয়। তবে খারাপ নয়ত খুব?

অশোক। আহা হা। তুই বুঝতে পারিস্‌নি ব্যাপারটা। এতো যেমন-তেমন একটা সাধারণ স্বপ্ন নয়! হ্যাঁ খারাপ বই কি। ভীষণ রকমের একটা দুঃস্বপ্ন যে!

অভীক। দুত্তোর দুঃস্বপ্নের নিকুচি করেছে। বল কি দুঃস্বপ্ন তোর শুনি?

অশোক। এখন থাক, স্কুলে গিয়ে বলবো। নইলে ক্লাসে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।

অভীক। (হাতঘড়ি দেখে) ঢের দেরী আছে ক্লাসের। বলে ফেল্‌ এই বেলা।

অশোক। তবে শোন বলি।

[উভয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্কুলের পথ

[স্কুলের পথে অশোক আর অভীক কথা বলতে বলতে যাচ্ছে]

অশোক। ভাবছি সেই সাপগুলো যদি হাওয়া পেয়ে আবার বেঁচে ওঠে, আবার কিলবিল করে তেড়ে আসে। কোনও রকমে খেয়ে নিয়ে চট করে শোবার ঘরে এলুম। মশারির ভেতর ঢুকে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম; কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। যতবার চোখ বোজবার চেষ্টা করি অমনি স্বপ্ন দেখি সেই সাপটা যেন একপাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সুড় সুড় করে লেপের ভিতর ঢুকে পড়ে কিলবিল করে ঘুরছে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম। মা ছুটে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'কী হয়েছে খোকন? ভয় পেয়েছিস্‌ বুঝি?' মাকে বললুম—'ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি মা।' মা বললেন—'বোকা ছেলে! স্বপ্ন দেখে ভয় পায় কখনো? ভয় নেই। স্বপ্ন তো আর সত্যি নয়। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ। 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বল, দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। ঘুমো দেখি।'

অভীক। মাথার শিয়রে মা এসে বসায়—ঘুমিয়ে পড়লি তো?

অশোক। তাহলে তো বেঁচেই যেতুম। আমি ঘুমিয়েছি মনে করে মা যেই উঠে গেছেন আমিও চোখ বুজতে না বুজতে দেখি আবার সেই দুঃস্বপ্ন। লেপের ভেতর ছানাপোনা নিয়ে সেই সাপটি ঢুকে পড়ে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে লেপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। মাকে আর ডাকিনি। সারারাত জেগে বসে রইলুম।

অভীক। দুর দুর, তুই ভারি বোকা। যেই স্বপ্ন দেখলি লেপের ভিতর সাপ ঢুকে কিলবিল করছে অমনি তুই কেন একটা বেজীকে স্বপ্ন দেখলি না? জানিস্ নি বেজি হলো সাপের সাক্ষাৎ যম। আজ আবার রাত্রে যদি লেপের ভিতর সাপ ঢুকেছে স্বপ্ন দেখিস্—সঙ্গে সঙ্গে বেজির স্বপ্ন দেখবি; বেজিটা যেন সাপগুলোকে তাড়া করছে আর তারা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবি। বেজি দেখলে সাপ আর সে ত্রিসীমানায় থাকবে না।

অশোক। (ম্লান মুখে) স্বপ্ন কি আর ইচ্ছেমতো দেখা যায় ভাই? স্বপ্নে যদি বেজি না আসে।

[স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠলো]

অভীক। চল চল ক্লাসে যাই, ঘণ্টা পড়ে গেল।

[অশোক ও অভীক ছুটে স্কুলের দিকে চলে গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

[স্কুল—ক্লাসের ছেলেরা জটলা করছে; মাস্টারমশাই ঢুকতে সব চুপ। এমন সময় অশোক আর অভীক এসে ঢুকলো]

মাস্টার। দেরী করে এলে কেন তোমরা?

অভীক। না স্যার,একপাল বাচ্চা শুদ্ধ একটা সাপ—

মাস্টার। বলো কি?

ছেলেরা। সাপ! কী সাপ? কোথায় দেখলে?

মাস্টার। সাপটা কি এখনও আছে সেখানে?

অভীক। না স্যার, বেজি তাড়া করতেই পালিয়েছে। অশোক ভীষণ ভয় পেয়েছিল—

ছেলেরা। সাপের ছানাগুলোর কি হলো?

অশোক। মা শিল চাপা—

অভীক। না স্যার, ও ভয়ে যা-তা বলছে। ছানাগুলোকে সব বেজিতে খেয়ে ফেললে: তবে তো স্কুলে আসতে পারলুম।

মাস্টার। আচ্ছা, কি জাতের সাপ চিনতে পেরেছিলে?

অশোক। না স্যার, স্বপ্নে ঠিক বুঝতে পারিনি—

মাস্টার। স্বপ্নে—

অভীক। হ্যাঁ স্যার, স্বপ্নে—সেই স্বপ্নেটাকে জানেন না? স্বপনকুমার—সাপুড়ে বেদেদের ছেলে। সে-ও ঠিক বুঝতে পারেনি কি জাতের সাপ। সড় সড় করে সরে পড়লো কি না। বেজি দেখে কি আর দাঁড়ায়?

ছেলেরা। কোথায় দেখলে সাপটাকে?

অশোক। মা—

অভীক। ওই অশোকদের বাড়ীর পথে রান্নাঘরের পিছনে গর্ত আছে বোধ হয়। স্বপ্নে সেটাকে ধরে আনবে বলেছে।

মাস্টার। আচ্ছা, আর না। যেতে দাও সাপকে। এইবার সব পড়ায় মন দাও। আজ তোমাদের প্রথম ঘণ্টায় কি পড়া আছে—রুটিনে?

ছেলেরা। অঙ্ক, স্যার।

অভীক। না স্যার, ভূগোল আছে।

মাস্টার। আচ্ছা আচ্ছা, আগে অঙ্ক হয়ে যাক তারপর ভূগোল।

অভীক। না স্যার, আগে অঙ্ক হলে যোগ বিয়োগ করতে আমার মাথা গুলিয়ে যাবে। তারপর—

মাস্টার। তারপর ভূগোল পড়া তো তোমার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। অঙ্কে মাথা গোল হলে ভূগোল আর শক্ত ঠেকবে না। আচ্ছা, তোমায় খুব সহজ অঙ্ক দিচ্ছি,—বলো তো তোমার হাতে কটা আঙ্গুল?

অভীক। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) গুণে দেখে বলবো স্যার?

ছেলেরা। ও বাড়ী থেকে কিছু পড়ে আসেনি স্যার।

মাস্টার। চোপ! আচ্ছা গুণেই বলো তুমি।

অভীক। (চেঁচিয়ে আঙ্গুল নিয়ে) একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চতুর্বেদ, পঞ্চবাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নবগ্রহ, দশদিক—হয়েছে স্যার! দশটা আঙ্গুল।

ছেলেরা। না স্যার, ও ভুল গুণেছে। ওর বুড়ো আঙুলের সঙ্গে জোড়া লাগা আর একটা করে ছোট আঙুল আছে।

মাস্টার। আছে নাকি ?

অভীক। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

মাস্টার। তবে ভুলে দশটা বললে কেন ?

অভীক। ও স্যার, ঠিক আঙুল নয়। আঙুলের গায়ে আঁটা ছোট্ট বাচ্চা আঙুল। যেন মায়ের কোলে চড়া কচি ছেলে।

মাস্টার। না না, ওদের হিসাব ধরে নিয়ে গোণো। মোট কটা আঙুল তোমার ?

অভীক। আজ্ঞে ও দুটো ধরলে এক ডজন পুরো হয়ে যায়।

মাস্টার। আচ্ছা বেশ, এখন যোগ শিখলে তো ? দশের সঙ্গে দুই যোগ করলে কত হবে ?

ছেলেরা। বারো স্যার।

মাস্টার। চুপ। তোমাদের আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আচ্ছা অভীক, এইবার বলো দেখি, তোমার ওই ছোট্ট আঙুল দুটি কেটে বাদ দিলে কটা আঙুল বাকি থাকবে ?

ছেলেরা। দশটা স্যার।

মাস্টার। আবার ! একদম চুপ। অভীক বলবে—আচ্ছা, তোমার একটা হাত থেকে দুটো আঙুল আর একটা হাত থেকে তিনটে আঙুল যদি কেটে দিই—

অভীক। (কাতর ভাবে) দেবেন না স্যার। অতগুলো আঙুল কাটলে মরে যাবো।

মাস্টার। (হেসে ফেলে) কতগুলো আঙুল তোমার কেটে বাদ দিতে চাইছি বলতো ?

অভীক। আজ্ঞে, এক হাতে দুটো, একহাতে তিনটে।

মাস্টার। তাহলে দু'হাত মিলিয়ে কটা বাদ গেল ?

অভীক। তা অনেকগুলোই তো বাদ গেল স্যার !

অশোক। মোট পাঁচটা গেল।

অভীক। ওরে বাবা। তাহলে একটা হাত যে একেবারে নুলো হয়ে যাবে।

মাস্টার। তুমি ওকে বলে দিচ্ছ কেন অশোক? ও নিজে হিসেব করে বলুক। থাকবে কটা?

অভীক। আজ্ঞে পাঁচটা গেলে পাঁচটা থাকবে?

[ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠলো]

মাস্টার। আহা হা! তোমরা হাসছ কেন? ও তো ঠিকই বলেছে। তোমাদের মতো ওর দশটা আঙ্গুল যে নয়। বারোটা আঙ্গুল। বেচারা এটা ভুলে গেছে।

অশোক। হাতেই তো ওর আঙ্গুল রয়েছে, তবু ভুল হয়ে গেল স্যার?

মাস্টার। তা কি হয় না? কানে কলম গোঁজা থাকলেও অনেকে কলম খুঁজে বেড়ায়, জানো না?

অশোক। আঙ্গুল তো আর কানে গোঁজা নেই স্যার, আঙ্গুল তো হাতেই রয়েছে।

[ছেলেরা আবার হেসে উঠলো]

মাস্টার। তোমার বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো থেকে যদি তিনটে আঙ্গুল কেটে বাদ দিই কটা থাকবে অভীক?

অভীক। আজ্ঞে স্যার, তা কি করে বলবো? তিনটে কাটতে গিয়ে যদি ভুলে চারটে কেটে ফেলেন?

মাস্টার। আচ্ছা, তা যদি হয়, চারটেই যদি কেটে ফেলি, তাহলে কটা থাকবে?

অভীক। আজ্ঞে, চারটে আঙ্গুলের মধ্যে কি বাড়তি কচি আঙ্গুলটাও থাকবে?

মাস্টার। ধরো যদি থাকে—

অভীক। তাহলে দেড়টা আঙ্গুল থাকবে।

মাস্টার। দেড়টা! দেড় হয় কি হিসেবে?

অভীক। আজ্ঞে কচি আঙ্গুলটা তো আর পুরো এক নয়। রেলে ছোট বাচ্চাদের হাফ টিকিট নেয়, মানে রেল কোম্পানি ওদের অর্ধেক লোক বলে ধরে।

মাস্টার। আচ্ছা, অঙ্কে পাস হয়ে গেছ। এইবার ভূগোলের পরীক্ষা শুরু হবে। বলো দেখি Atlas কাকে বলে?

অভীক। Atlas স্যার ? Atlas হল অসুরের মতো শক্তিশালী একটা দৈত্য যে এই পৃথিবীটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

[ছেলেরা সবাই হেসে উঠলো]

মাস্টার। তোমরা হাসছ কেন ?

অশোক। পৃথিবীর সব দেশের মানচিত্র যে বইয়ে আছে, তাকেই তো আমরা Atlas বলি স্যার।

মাস্টার। হ্যাঁ, তা বলি বটে, কিন্তু অভীকও যা বলছে তাও ঠিক। গ্রীক পুরাণে আছে Altas নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য স্বর্গরাজ্য জয় করতে গেছলো। টাইটান পৃথিবীটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জব্দ করে রেখেছেন।

অভীক। আজ্ঞে তা তো জানি না স্যার।

মাস্টার। তবে তুমি বললে কি করে ?

অভীক। আজ্ঞে ছবি দেখে। মানচিত্রের বইয়ের মলাটের ওপর ছবিটা আছে।

[ছেলেরা সবাই হেসে উঠলো। তারপর টিফিনের ছুটির ঘণ্টা পড়লো। ছেলেরা হুড়মুড় করে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[স্কুল। টিফিনের পর ছেলেরা ক্লাসে এসে বসেছে। মাস্টারমশাইর প্রবেশ।]

মাস্টার। এ বেলা তোমাদের আমি সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে চাই। ভয় নেই। যা জানতে চাইবো মন খুলে তার জবাব দিও। শোন একটা গল্প বলি। একদিন রাস্তায় এক গরীব ভিখিরী মোটর চাপা পড়ে পা ভেঙে পড়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী সেই পথ দিয়ে যাবার সময় তাকে সেই অবস্থায় দেখে তুলে নিয়ে গেলেন, আশ্রমের হাসপাতালে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম সে এই আশ্রমে এসে প্রথম শুনলে। সাধুদের সেবা যত্নে ও চিকিৎসার গুণে লোকটি ক্রমে আরোগ্য হয়ে সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে গেল। যতদিন সে আশ্রমে ছিল, রোজই ধর্মালোচনা ও ভাগবতী কথা শোনবার সুযোগ পেতো। আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার পর এ সুযোগ আর পায় না বেচারা ; কিন্তু তার সমস্ত মন চাইতো ধর্মকথা শুনতে। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে কি, কেমন করে তার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে ?

[ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।
কারুর মুখে আর কথা নেই।]

অভীক। (অনেক ভেবে) আচ্ছা স্যার, লোকটা যদি আর এক পা ভেঙে আবার রাস্তায় গিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তো তার আশা পূর্ণ হতে পারে।

[ছেলেরা হেসে উঠলো।]

মাস্টার। (রেগে উঠে) তোমার পা ভেঙে দেওয়া দরকার দেখছি তার আগে।

অশোক। স্যার, এবার আমাদের ড্রয়িং ক্লাস নেবার সময় হয়েছে।

মাস্টার। বেশ তো, ড্রয়িংএর খাতা বার করো সব। তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনে যে যা হতে চাও খাতায় এঁকে এনে দেখাও আমাকে। দশ মিনিট মাত্র সময় পাবে।

[ছেলেরা সবাই আঁকতে বসে গেল।
একটি ছেলে দশ মিনিট পরেই খাতা নিয়ে এল দেখাতে।]

মাস্টার। ইস্। তুমি যে দেখছি আকাশে উড়তে চাও। জেট বিমানের পাইলট হবার ইচ্ছে। বেশ, বেশ। (আর একটি ছেলে খাতা নিয়ে এল) আরে! তোমার দেখছি এঞ্জিনে ড্রাইভার হবার সখ! ট্রেন চালাবে। (আর একটি ছেলে খাতা এনে দেখালে) তাই তো! তুমি শেষে ডাক পিয়ন হয়ে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করে বেড়াতে চাও? খুব তো উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দেখছি তোমার! (আর একটি ছেলে খাতা এনে দেখালে) এ কি! তোমার কি বিয়ে করার সখ হয়েছে? বর এঁকেছ কেন?

ছেলেটি। না স্যার, বিয়ে করতে আমি চাই না। কিন্তু বর সাজতে খুব ইচ্ছে হয়।

[ছেলেরা হেসে উঠলো। এবার আর একটি ছেলে খাতা নিয়ে এল]

মাস্টার। এ যে এক স্কুল-মাস্টারের ছবি দেখছি, অভীক, তুমি কি শিক্ষক হতে চাও?

অভীক। হ্যাঁ স্যার, যদি আপনার মতো ছাত্র পাই।

[ছেলেরা হেসে উঠলো।]
মাস্টারমশাই কিছু বলার আগেই ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল।
হৈ হৈ করে ছেলেরা উঠে পড়লো।]

যবনিকা



খোঁড়া ফকিরের চরিত্র-কথা * শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র

লোকে বড় বড় লোকেরই চরিত্র-কথা লেখে। আমি লিখছি ফকিরের, খোঁড়া ফকিরের। না লিখবো কেন বল? বিড়ালছানা, কুকুর বাচ্চা নিয়ে যদি গল্প হতে পারে তবে একটি মানুষের ছেলে নিয়ে তা সে যেমনই হোক গল্প হবে না কেন, তা তো বুঝতে পারি না। এই ছেলেটার বাপ ঠাকুরদা, ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিল চাষী।

ছেলেটার বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে পেয়েছিল বিঘে তিনেক ক্ষেত, এক জোড়া বলদ, একটা হাল, আর এক চিলতে ভূঁয়ের ওপর খান দুই কুঁড়ে। ছেলেটার চোদ্দপুরুষে কেউ লেখাপড়া জানতো না, জানার দরকারও মনে

করতো না, যারা লেখাপড়া জানতো তারাও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। ওদের গাঁয়ের ত্রি-সীমানায় ইস্কুল পাঠশালা ছিল না, লেখাপড়া জানা লোক ছিল তিনটে, তাদের দুটো থাকতো শহরে, একটা থাকতো গাঁয়েই, লোকটার অনেক জমি-জমা ছিল যে।

ফকিরের বাবা চাষ-আবাদ করতো, মনিষ খাটতো। পাঁচটা পেট, মানে ফকিরের বাবা, ফকিরের মা, সাত বছরের ফকির আর হালের বলদ জোড়া। তারাও মাঝে মাঝে ভাড়া খাটতো, কাজেই এক রকম চলে যেত।

পড়তে পড়তে ভাবছো, খোঁড়া ফকিরের চরিত-কথার নাম করে তার বাবার কথা লিখি কেন? লিখি এই কারণে যে, কারো চরিত-কথা বলতে বা লিখতে হলে তার মা-বাবার কথাও বলতে বা লিখতে হয়। না হলে চরিত-কথা অসম্পূর্ণ থাকে।

তা' খোঁড়া ফকিরের মুখখানা ছিল পানের মত, চোখ দুটো যেন তিত-পুঁটির, রঙটা কালই। তবে গলায় ছিল মিঠে সুর।

একবার তাদের অঞ্চলে হলো অনাবৃষ্টি। কাজেই ফসল বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। খোঁড়া ফকিরের বাবা ছেলে-বউ আর বলদ জোড়াকে নিয়ে এক রকম উপোস করে কয়েক মাস কাটালো। পরের বছর প্রকৃতি সব জলে ডুবিয়ে ধ্বসিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে শান্ত হলো। এমন সময়ে খোঁড়া ফকিরের মা পড়লো জ্বরে। সে জ্বর আর ছাড়ে না। উপোস আর অসুখ হাত ধরাধরি করে তাদের ঘরে এসে ঢুকলো।

গাঁয়ে ছিল এক হাতুড়ে বদ্যি। সাড়ে তিন ক্রোশ তফাতে সরকারি চিকিৎসা-কেন্দ্র। বদ্যির ওষুধে কিছু হলো না। লোকটা বউকে হাসপাতালে পাঠাবারও উপায় করতে পারলে না। এদিকে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। গাঁয়ে প্রায় সব ঘরেই চাল বাড়ন্ত, কেবল সেই লেখাপড়া জানা লোকটির ধানের গোলার মাথায় রাতে বসে লক্ষ্মীপ্যাঁচা, দিনের বেলা চারধারে চরে গোলাপায়রার ঝাঁক।

খোঁড়া ফকিরের বাবা একদিন তার কাছে গিয়ে বলে, 'দা-ঠাকুর এখন কি করি? পেটে ভাত নেই, পরণে নেই ট্যানা, বউটা ব্যামোয় মরে, ছেলেটা খিদেয় কাঁদে, কিছু কর্জ দেবে?'

দা-ঠাকুর বলে, 'শুধবি কোত্থেকে? কি আছে তোর?'

'কেন, জমি।'

'টাকা নিয়ে করবি কি?'

'মহাপেরাণীকে বাঁচাবো, বউটার চিকিচ্ছে করাবো। ওকে নে যাবো সেই শহরের হাসপাতালে।'

দা-ঠাকুর বলে, 'তাতে ঝামেলিটা কি পোয়াতে হবে, বিবেচনা করেছিস্? হাসপাতালের ভাত খাওয়ালে তোর জাত থাকবে? যখন হাসপাতাল ছিল না, তখন গাঁয়ের মানুষের ব্যামো হলে চিকিৎসা হতো না?'

খোঁড়া ফকিরের বাবা বলে, 'যথার্থ কথা। গাঁয়ে বাস করতে গেলে জাত ঠিক রাখতে হয়। কিন্তু বউটার ব্যামো—'

লেখাপড়া জানা লোকটি বলে, 'বুড়ো গোকুল বদ্যির ওষুদে যখন ব্যামো বাগ মানছে না তখন বুঝতে হবে তোর বউটার গায়ে বাতাস লেগেছে। ওকে ঝাড়-ফুঁক করা, তাগা-তাবিজ পরা, ঘুন্‌সির শ্মশানে গে হত্তে দে—'

খোঁড়া ফকিরের বাবা মূর্খ চাষী। লেখাপড়া জানা লোকের, তার ওপর মহাজনের কথা অবিশ্বাস করে, এমন মন তো তার হতে পারে না। সে বললে, 'আপনি যা বলেছো, তাই করি গে।'

সে লেখাপড়া জানা লোকটার কাছে জমি বাড়ি বন্ধক দিয়ে কেতাবাঁধা নোট এনে মহাপেরাণীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করলে। সেই সঙ্গে গুণীন্ ডেকে খোঁড়া ফকিরের মায়ের ঝাড়-ফুঁক করা, মসজিদের জলপড়া, বামুনের চন্নামেত্য খাওয়ানো, তার হাতে গলায় কোমরে তাগা-তাবিজ-মাদুলি বাঁধা শুরু হলো। বাপ-বেটা-বলদের মহাপ্রাণী দেহ টিকে রইলো বটে, তবে খোঁড়া ফকিরের মায়ের হাড় জিরজিরে দেহ-খাঁচাটি ছেড়ে প্রাণ-পাখীটি একদিন ভোরের আবছা আলোয় উড়ে চলে গেল। বাপ-বেটা দুজনেই দুঃখে খুব কাঁদলো।

তারপর একটি একটি করে তিনটি বছর কেটে গেল। খোঁড়া ফকির হয়ে উঠলো দশ বছরের। সে মাঠে যায়, গান গায়, খেলা করে। একদিন শহর থেকে আদালতের পিয়াদা এসে ঢোল বাজিয়ে তাদের জমি আর ভিটেয় বাঁশগাড়ি করলে। খোঁড়া ফকির মনে করলে, ঢোল বাজিয়ে যখন বাঁশ পোতা হচ্ছে, আর লাল কাগজ হাতে, লাল চাদর কাঁধে, কোমরে তক্‌মা আঁটা পিয়াদা এসেছে তখন তাদের মান বাড়লো আর ভারি একটা তামাসা হলো। কারণ, ঢাক-ঢোল বাজে বিয়ে-সাদি পাল-পার্বণে, পিয়াদা আসে মানী লোকের বাড়ি। কিন্তু তার বাপ মাথা চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লো শহরের দিকে।

শহরটার নাম, মনে করা যাক কার্তিকপুর। সেখানে ছিল কয়েকটা বড় বড় কারখানা। প্রায় হাজার দুই বিঘে ধেনো জমি ছিল তাদের তলায়। তাদের চিমনির ধোঁয়ায় আকাশ হয়ে থাকে কালো। খোঁড়া ফকিরের বাবা, সাতপুরুষের চাষী, সেখানে গিয়ে হলো দিন-মজুর। দিনে রোজগার হতে লাগলো তিন চার টাকা। কাঁচা পয়সা, আসে যায়, জমে না। হাজার লোকের মধ্যে বাপ-বেটা গেল মিশে। দু'জনেরই সঙ্গ-সাথী হলো, মেলা। দু'জনেই নেশা-ভাঙ ধরলো। খোঁড়া ফকির চট্‌পট্ চালাক হয়ে উঠতে লাগলো। বাপ তার খোঁজ খবর বড় একটা রাখে না। সে-ও বাপের তোয়াক্কা করে না।

এমনি করে সেখানে দুটো বছর কেটে গেল। এমন সময়ে একদিন তার বাপের সঙ্গে তার এক স্যাঙাতের কি নিয়ে তর্কাতর্কি হতে হতে ব্যাপারটা শেষ হলো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মাথা ভাঙা-ভাঙিতে। খোঁড়া ফকিরের বাবা হাসপাতালে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরলোকে পাড়ি জমালো আর সেই লোকটা হলো ফেরার।

এবার চাষী-মজুরের ছেলে খোঁড়া ফকির হলো অনাথ, এতদিনে তার 'ফকির' নাম সার্থক হলো। সে না জানে কারিগরী, না জানে চাষ-আবাদ, না জানে লেখাপড়া। এই অবস্থায় বেঁচে থাকতে গেলে হয় তাকে চুরি-ডাকাতি অথবা ভিক্ষে করতে হবে।

এমন সময়ে গাঁয়ের সেই লেখাপড়া জানা লোকটার সঙ্গে পথে ফকিরের হঠাৎ একদিন দেখা। সে ফকিরের মুখে সব কথা শুনে বলে, 'এমনটা যে হবে, এ জানা কথা। তা এখন চল্ আমার সঙ্গে। আমার বাড়ি থেকে রাখালী করবি।'

কিন্তু খোঁড়া ফকিরের চোখে লেগেছে শহুরে জৌলুস। গাঁয়ের অন্ধকার কি আর তাতে সয়? সে বলে, 'না' এবং ছুটে চলে যায় তার এক সঙ্গীর দিকে।

এখন, শহরের দুটি বড় কারবারি দলের নজর ছিল তার ওপর। এক দলের আড়কাঠি দেখে, ছেলেটার মুখখানা মোলায়েম, গানের গলা মিঠে। ওকে দিয়ে ভিক্ষে করাতে পারলে, দিনে পাঁচ টাকা। সে গিয়ে খোঁড়া ফকিরের সঙ্গে ভাব জমায়, বলে, 'রাজার হালে থাকবি। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, থাকার জায়গার অভাব হবে না। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘুরে বেড়াবি। ছেলেতে মেয়েতে তোর বন্ধু হবে অনেক।'

খোঁড়া ফকির বলে, 'ব্যাপারটা কি শুনি।'

আড়কাঠি তার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলে, 'তুই পথের ধারে বসে, কি রেলের কামরায় চড়ে বা বাসে ঢুকে গান গাইবি। সিনেমার গান নয় কিন্তু, শ্যামা সঙ্গীত, কি দেশকে ভালবাসার, কিংবা দুঃখের—সে ওরা শিখিয়ে লেবে আর মাঝে মাঝে বলবি, তুই অনাথ, অসুখে তোর চোখ দুটো—'

'কি বললে?'

'চোখ দুটো খালি কানা করে দেবে। সে তুই টেরও পাবি নে। নইলে কে তোকে ভিক্ষে দেবে? মেয়েদের কাছে আর জোয়ানদের কাছে ভিক্ষে চাইবি! বুড়োদের কাছে চাইবি না। ওরা ভারি ঘুঘু। দেখিস্ দিন দশ টাকা রোজগার। আধা তোর, আধা কর্তাদের।'

খোঁড়া ফকির বলে, 'মাইরি যা বললে। আমার কানা হবার কি দরকার? চোখ থাকলেও কানা হওয়া যায়। ঐ যে বাসের গুমটিতে আলুমুখী, ঝাঁকড়াচুলী, ছেঁড়া হাফপ্যান্ট-পরা কানীটা ভিক্ষে করে ও তো চোখে দেখতে পায়। বলে, 'আমি কি পরের চোখে দেখি? আমি না বললে, লোকে কিসে বুঝবে আমি কানা? তোরা কানা তাই আসলটা দেখতে পাস্ না।'

আড়কাঠি হো হো করে হাসে, বলে, 'ছুঁড়িটা ভারি বেয়াড়া। ও আমাদের লোক লয়। তুই আমাদের দলে ভিড়বি?'

খোঁড়া ফকির বলে, 'তোদের দলে ভিড়তে যাবো কোন্ দুঃখে? নিজেই রোজগার করবো। তবে মতলবটা দিয়েছিস্ ভালো। তোকে একদিন পেটভরে পকোড়ী খাওয়াবো—'

এবং সেদিন থেকেই সে অন্ধ সেজে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে শুরু করে দিলে।

কয়েকদিন পরে বিকেলের দিকে একটি মাঝ বয়সী লোক রাস্তার মোড়ে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার দিকে তাকিয়ে একমনে গান শুনতে শুনতে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে খপ করে তাকে ধরে টানতে টানতে একধারে নিয়ে গিয়ে বলে, 'তুই খাসা গাইতে পারিস্ তো! যাত্রাদলে কাজ করবি?

খোঁড়া ফকির বলে, 'আমি যে অন্ধ।'

লোকটি বলে, 'বাবা, আমি তো অন্ধ নই। সব পরিষ্কার দেখছি। কাজ করবি? খোরাকি ছাড়াও মাইনে পাবি মাসিক বিশ টাকা। তোর বাড়ি কোথায়? কে আছে তোর?'

'আমার বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা নেই—আমি অনাথ।' বলেই খোঁড়া ফকিরের বুক থেকে ছোট একটু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতেই সে নিজেই চমকে ওঠে।

লোকটি বলে, 'তবে চল্ আমার সঙ্গে। আমার একটা যাত্রাদল আছে।'

ফকির কি ভেবে অধিকারীর সঙ্গে চলে গেল। শুরু হলো তার নতুন জীবন। সে দলের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে। বারোয়ারিতলায়, মেলায়, ধনীর বাড়ীতে পালা হয়—দু' রাত, তিন রাত। ফকির অভিনয় করে, গান গায়। রাধা সাজে, লক্ষ্মী সাজে, একবার কৃষ্ণও সাজলো। বুড়ো-বুড়ী, ছোঁড়ার দল তার গান শুনে মেতে যায়। অন্য সময়ে তাকে দেখতে ভিড় জমে।

একবার অধিকারীর বায়না হলো। এক মহাত্মার জন্মদিনে তাঁর বাড়িতে পালা গাইবার। অধিকারী দল নিয়ে গেল সেখানে। মহাত্মা মণিরাম জন্মদিনটি পালন করেন তাঁর পল্লী-ভবনে, মানে গাঁয়ের বাড়িতে। তিনি মস্ত কারবারি—দুটো চালকলের আর একটা ময়দাকলের মালিক। গোটা তিনেক কেরোসিন তেলের ডিপোও আছে। জোত-জমা সব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এক লাখ, মেয়ে-ইস্কুলে পঞ্চাশ হাজার, কি একটা ফণ্ডে এক লাখ, এমনি করে লাখ লাখ টাকা দান করে মহৎ কাজ করেছেন। লোকে তাই তাঁকে বলে, মহাত্মা। মহাত্মা মণিরাম, সকালে গীতা পড়েন, রাতে কীর্তন শোনেন, কপালে চন্দনের মস্ত ফোঁটা। মহাত্মাজী সুতীর কাপড় পরেন না, অঙ্গে রেশমের ধুতি-চাদর-পিরাণ, পায়ে হরিণের চামড়ার সাদা চটি পরেন। এমন খাঁটি মানুষ, তবু গরীব ছোটলোকেরা বলে, 'ও তেলে জল, চালে কাঁকর, ময়দায় কাঁইবিচি মেশায়, লাখ লাখ টাকা আয়কর ফাঁকি দেয়। ওর জোত-জমা সব বেনামী।' যে যা বলে বলুক, সেই মহাত্মারই সেবার জন্মদিন।

শহর থেকে কত লেখাপড়া জানা লোক, কত মান্য গণ্য মানুষ এসেছেন তাঁর সুন্দর পল্লীভবনে শ্রদ্ধা জানাতে। জগদীশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান, খবর-কাগজের লোকেরাও এসেছেন হাতে ক্যামেরা, বুকে কলম এঁটে তাঁর ছবি তুলতে, তাঁর কথা লিখে নিতে। বুঝেছি, এ সব কথা তোমাদের ভাল লাগছে না। আমারও লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করছে।

তা ক'দিন খুব আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, দান-খয়রাত হলো। খোঁড়া ফকিরের কণ্ঠে, 'আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে নিয়ে

বেড়াই খেয়াতরী' গানখানি শুনতে শুনতে মহাত্মা মণিরামের চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো চক্ চক্ করে উঠলো। সেই সময়ে খবরের কাগজের লোকেরা 'ক্লিক' করে তাঁর চোখ-মুখের ছবি তুলে নিলে। কাগজে ছাপা হবে যে। যা হোক, একদিন উৎসব শেষ হলো। সকলে যে যার কাজ সেরে নিজের নিজের পথ ধরলো।

অধিকারীও দল নিয়ে রওনা হলো আর এক গাঁয়ে পালা গাইতে। কিন্তু বেচারীর কলেরা হলো এবং সেখানেই মারা গেল। তার দলটিও গেল ভেঙ্গে। খোঁড়া ফকির আবার হলো নিরাশ্রয়। কিন্তু অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়ে তার ধারণা হলো থিয়েটারে বা সিনেমায় গেলেই তাকে লুফে নেবে। কিন্তু আশা-নিরাশা দুই বোন পাশাপাশি থাকে। আশা আমল না দিলে নিরাশা চেপে ধরে। আবার, নিরাশার হাত থেকে আশা ছিনিয়ে নিয়ে খেলা করে। তাই খোঁড়া ফকির দুইয়েরই পাল্লায় পড়লো।

সে শহরে ফিরে এক থিয়েটারের কর্তার কাছে গিয়ে ডেঁপোমির জন্যে কানমলা খেতে খেতে বেঁচে গেল। আর, সিনেমার কর্তার হদিশই পেল না। সেখানে উঠতে নাকি সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয় বিস্তর। যার চোরা-খাঁজ আছে অনেকগুলো। এমন সময়ে তাকে পাকড়াও করলে, দ্বিতীয় দল, গাঁটকাটাদের আড়কাঠি।

সে বলে, 'বুঝলি ফকু, দিনে হাজার টাকা রোজগার। আধা তোর, আধা আমাদের। ভাল পোশাক পরবি, ফাস্‌কেলাস খানা লুটবি, বক্‌সে বসে সিনেমা দেখবি, ট্যাক্‌সি চড়বি। পুলিশ পাকড়ালে খরচ-পত্তর আমাদের। কত বড় বড় লোক এ কারবারের অংশীদার জানিস্? তবে দু' মাস তালিম দিতে হবে। তখনকার খরচা কোম্পানীর। পাস করলে, রোজগার হতে থাকলে দেনা মিটিয়ে দিবি। চল্ এক পিলেট কসা মাংস আর রুটি খেয়ে লিবি। নে, সিগরেট ধর।

খোঁড়া ফকির গাঁটকাটার দলে ভিড়ে দেখলে সে এক নতুন জগত। দিনে-রাতে সোনাদানা টাকাপয়সার বিরাট কারবার। সে তিনমাসে সব শিখে নিয়ে শহরের এক অংশে আঙ্গুল খেলানোর বিদ্যে খাটাতে লাগলো। তাদের দলে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মর্দ মানে সব বয়সের সরল ভাষা-ভাষীর মানুষ। এক একদলের এক এক হুদ্দো। তার ওদিকে গেলেই ছুরি-ছোরা বোমা-সোডার বোতল। সকলেই বেপরোয়া।

বছর দুই বেশ চললো। যেমন মোটা আয় তেমনি খরচ—টাকা-পয়সা, সোনাদানা যেন হাতের ময়লা। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একদিন রেসের মাঠে মহাত্মা মণিরামের ছোট ছেলের পকেট মারতে গিয়ে তার এক ইয়ারের হাতে খোঁড়া ফকির ধরা পড়লো। আর যায় কোথা? খুচরো পাইকিরি হারে মার তো খেলই আবার আদালতের বিচারে তার হলো ছ'টি মাস জেল।

খোঁড়া ফকিরের বয়স তখন বোধ হয় হবে, চৌদ্দ-পনেরো বছর। সে ভাবতে শিখেছে—ভাবতে শিখেছে জীবন ও জগতের কথা। জেলের নিঝুমতায় রাতের বেলা নুয়ে নুয়ে ভাবে। ভাবে, কি ছিল, কি হয়েছে! সেই গাঁ, সেই মজুর বস্তি, সেই যাত্রাদল, বাবা-মা—সব বায়স্কোপের ছবির মতো তার জীবনের ওপর দিয়ে চলে গেছে। আর ফিরে আসবে না! সে এখন চোর, গাঁটকাটা, জেলের কয়েদী। কেন সে এমন হয়েছে? কে এর জন্যে দায়ী? কিন্তু ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না।

একটি দুটি দিন করে ছ'টি মাস কেটে গেল—সে একদিন সকালে মুক্তি পেল! কিন্তু কোথায়, কার কাছে যাবে? তার নিজেকে মনে হচ্ছে ভারি নিঃসঙ্গ, নিতান্ত একা, নিরাশ্রয়। একটি বস্তির পাশ দিয়ে চলেছে। হঠাৎ পিছনে হৈ হৈ শব্দ। ফিরে দেখে, একটি দু' তিন বছরের মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার দিকে মত্ত ঐরাবতের মতো ছুটে আসছে একখানা মাল বোঝাই লরি। মেয়েটা নির্ঘাত চাপা পড়বে। ড্রাইভার ব্রেক কষেও ওকে বাঁচাতে পারবে না। ও পোকার মত পিষে যাবে। খোঁড়া ফকির ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে ছোঁ দিয়ে তুলে একধারে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতেই লরির চাকা এসে পড়লো তার একখানা পায়ে। তারপর আর সে কিছু জানে না।

সাত মাস পরে হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেল তখন তার ডান হাত আর ডান পা নেই, সেই ভাঙা খাঁচাতেই প্রাণপাখিটি আছে। আর, হাসপাতালের ফটকে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটার মা। ও রোজ এসেছে।

ফকির, খোঁড়া ফকির, সেই বস্তির ধারে বুড়ো বটতলায় একটা প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্সের মধ্যে বাসা নিলে। সামনে রাজপথ। সে নিজের খোঁড়া হাতা-পা দেখায় আর গান গায়—যাত্রাদলে শেখা গান। পথিকরা তার গান শোনে, ইচ্ছামত তাকে ভিক্ষে দিয়ে যায়।

ভিক্ষের কড়িগুলো নিয়ে যায় সেই মেয়েটার মা। সে ওকে খেতে দেয়। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোয় আর বলে, বাবা, তুই আমার আর-জন্মের ছেলে।'

খোঁড়া ফকিরের দু' চোখ বেয়ে জল ঝরে।

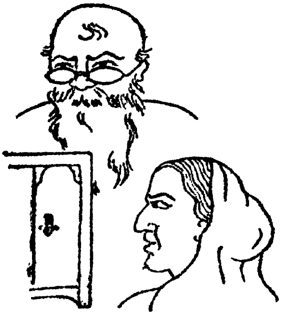
সেই লরিখানা ছিল মহাত্মা মনিরামের। আদালতে প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্যে বলে 'ড্রাইভার মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছোঁড়াটা লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে গিয়ে পড়েছিল। ড্রাইভারের দোষ নেই।'

আমরাও তাই বলি। ড্রাইভার বেকসুর খালাস পায়। মণিরাম খবরটা শুনেও ছোঁড়াটাকে দেখতে যান না। তিনি মহাত্মা, ঊর্ধ্বলোকবাসী। আর ওরা হলো নিচুতলার বস্তির মানুষ।

যাক ও কথা। ফকির সেই খোঁড়া। এখন শহর থেকে দূরে থাকি তাই খোঁড়া ফকির সম্বন্ধে আর কিছু জানি না।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস দেশে ফিরে গিয়ে বলেন—'ভারতীয়েরা গাছ থেকে একরকম পশম পায়, তা ভেড়ার লোমের চেয়ে সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য। তা থেকে বস্ত্র তৈরী করে ভারতীয়েরা পরে।'

এই সময় তুলোর কথা গ্রীকেরা জানতো না। এদেশে তখন নানা জাতের বস্ত্র তৈরী হচ্ছে: বদর (সূতী-বস্ত্র) ক্ষৌম (মসিনার ছালের বস্ত্র) দুকূল (সূক্ষ্ম ছালের বস্ত্র) অংশুক (মসলিন) লালাতন্তু, নেত্র, পুলকবন্ধ ও পুষ্পপত্ত (সাদা ও রকমারী রঙীন রেশমী বস্ত্র)।



থাকতো যদি

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

হাতীর শুঁড়ের মতন যদি
থাকতো দাদুর একটা শুঁড়।
কলাগাছের ফলার খেতো
উজাড় করে সিঙ্গাপুর!
বিড়াল মাসির গোঁফের মতন
দিদার যদি থাকতো গোঁফ
ভোজের ঘটায় দুই-জনাতে
ইঁদুর বংশ করতো লোপ!
ময়ূর নাচে পেখম তুলে,
লেজটি দাদু কোথায় পায়?
পেখম ধরার সখ মেটাতে
তাই তো শুয়ে ঠ্যাং নাচায়।
চিল-শকুনের মতন যদি
থাকতো পাখা দিদার পিঠে
স্পুটনিকেরে পিছন ফেলে
পৌছতো চাঁদে এক মিনিটে
লড়বে দাদু? শিং কি আছে
ভেড়ার মত তার মাথায়?
থাকতো যদি, বুঝতো ঠ্যালা—
ভূত দেখাতো এক গুঁতায়!
ভাগ্যে দিদা হয়নি শকুন
দাদুর ভাগ্য—হয়নি মেষ,
হলেই, হতো ভাগাড় ঘেঁটে
নয়, খেয়ে ঘাস জীবন শেষ।



আঙ্গুল-কাটা মহাবীর * দীনেন্দ্রকুমার রায়

যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন জিলায় একটি দস্যুর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। এই দস্যুর নাম মহাবীর চৌবে। এই দুর্দান্ত দস্যু দেরাদুন জিলার বহু স্থানের অধিবাসিগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহার ভয়ে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণকে দিবারাত্রি সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। মহাবীর ও তাহার অনুচরগণ কত নরহত্যা করিয়াছিল, কোনদিন তাহার সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই। যুক্তপ্রদেশের সরকার জীবিত বা মৃত অবস্থায় মহাবীরের গ্রেপ্তারের জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন।

মহাবীর প্রথম যৌবনে সরকারের বনবিভাগে কুলীগিরি কাজে লিপ্ত ছিল। একবার দেরাদুনের অরণ্যে একটা বড় গাছ কাটা হইতেছিল; সেই গাছের গুঁড়ি পড়িয়া মহাবীরের দক্ষিণ হস্তের বুড়ো আঙ্গুলটা ছেঁচিয়া গিয়াছিল। আঙ্গুলটি পচিবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাকে তাহা কাটাইতে হইয়াছিল, হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সে কুলীর পেশা ত্যাগ করে।

সেই সময় একদল দস্যুর সহিত তাহার পরিচয় হয়, সেই দস্যুদলের সর্দার বলিয়াছিল, 'চৌবেজী, তোমার দেহ ত মহাবীরের দেহের মত বলবান্; এমন

শরীর লইয়া তুমি এক মুঠা দানার জন্য কুলীগিরি করিতেছিলে। আমার দলে ভিড়িয়া যাও। আমি বুড়া হইয়াছি—কবে মরিয়া যাইব। তুমিই একদিন এই দলের সর্দার হইয়া এ অঞ্চলে রাজত্ব করিবে।'

মহাবীর চৌবে দস্যুদলে যোগদান করিয়া অল্পদিনেই সর্দারের প্রিয়পাত্র হইল এবং ছয়মাস পরে বৃদ্ধ সর্দারের মৃত্যু হইলে দলের সকল দস্যু মহাবীরকেই তাহাদের দলপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মহাবীর দস্যুদলের সর্দারী গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—'সে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দস্যুবৃত্তিতে রত থাকিবে', এই উক্তি সে কার্যে পরিণত করিয়াছিল।

সেই সময় দেরাদুনের বনবিভাগের ফরেস্ট রেঞ্জার ছিলেন রামাবতার স্কুল।

রামাবতারবাবু রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। দ্বারকায় গমনের পূর্বে কয়েকদিন গুজরাটের সিধপুরে বাস করেন। সিধপুর পশ্চিমভারতে 'পিতৃগয়া' নামে খ্যাত। রামাবতারবাবু সিধপুরে গমন করিলে সেখানে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তিনি তখন প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ।

একদিন তিনি আমার নিকট দস্যুসর্দার মহাবীরের কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন। তাঁহার বর্ণিত কাহিনী অতীব কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়াই মনে হইতেছিল।

স্কুল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "মহাবীর দস্যুদলের নেতৃত্ব গ্রহণের পর চতুর্দিকে লুঠতরাজ এবং অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ধিত হইল। কর্তৃপক্ষকে মহাবীরের দমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইল। পুলিস কর্মচারী সহদেব মিশ্রের অধীনে তিন শত পুলিস উক্ত অঞ্চলে প্রেরিত হইল।

কিন্তু দস্যুগণের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা পুলিসের পক্ষে দুরূহ হইল। কারণ, এই সকল দস্যু অরণ্যানীর প্রান্তভাগে অবস্থিত পল্লীসমূহেই সাধারণতঃ লুটপাট করিত এবং পলায়ন করিয়া দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সেই আশ্রয় হইতে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিসের অসাধ্য হইল।

মহাবীরের দলে তখন প্রায় ৬০ জন দস্যু ছিল, তাহারা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ডাকাতি করিতে যাইত। তাহারা কোন স্থানে ডাকাতি করিতেছে এই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিস তাড়াতাড়ি সেই স্থানে উপস্থিত হইত,

কিন্তু সেই স্থানে গমন করিয়া তাহারা শুনিতে পাইত—সেই রাত্রিতেই দশ ক্রোশ দূরবর্তী অন্য এক গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে। পুলিস সেই গ্রামে গমন করিয়া শুনিতে পাইত—দস্যুদল পলায়ন করিয়াছে।"

স্বকুল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "একদিন অপরাহ্ণে আমি আমার তাঁবুতে বসিয়া পূর্বদিনের চিঠিপত্রগুলির ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সেই সময় আমার একটি 'ডাক-বাহক' দ্রুতবেগে তাঁবুতে প্রবেশ করিল। তাহাকে আতঙ্কাভিভূত দেখিলাম।

'ডাক-বাহক' বলিল, সে একদল ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিল, তাহারা তাহার সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিল এবং হাফপ্যাণ্ট ভিন্ন অন্যান্য পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়াছিল। চিঠির ব্যাগে টাকা পয়সা না পাইয়া, তাহা তাহাকে ফেরৎ দিয়া বলে, 'তুমি জঙ্গলওয়ালা স্বকুল সাহেবের কারপরদাজ, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। স্বকুল সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই।'

সহদেবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল, তিনি দস্যুদলের গ্রেপ্তারের ভার পাইয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তাঁহাকে সদলে আমার তাম্বুতে আসিতে অনুরোধ করিলাম।

আমার তাম্বুর বার মাইল দূরে একটি রেল-স্টেশনের হাতার নিকট পরদিন রামনবমীর মেলা বসিবার কথা ছিল। এই শ্রেণীর মেলাগুলিতে নানা স্থান হইতে অশ্ব, গবাদি পশু বিক্রয়ের জন্য আমদানী হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মেলা পার্বণাদি উপলক্ষে প্রায়ই জমিয়া উঠে।

কোন বন্ধুর একটি আত্মীয় যুবককে কেরাণীর পদে নিযুক্ত করি। ছেলেটির নাম লছমন প্রসাদ। অফিসের কাজে তাহাকে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে ঘুরিতে হইত। সে বলিল, ছুটি পাইলে সে মেলায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়া-শুনিয়া তাহার পছন্দমত ঘোড়া একটু স্বলভে সংগ্রহ করিতে পারিবে। আমি এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম, লছমন মহা উৎসাহে ঘোড়া কিনিতে চলিল।

হাতের কাজ শেষ করিয়া আমি আমার পুলিস বন্ধু সহদেবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই সময় লছমন মেলা হইতে তাম্বুতে ফিরিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পছন্দমত ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছ? কি রকম ঘোড়া আনিলে—দেখি।"

লছমন বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, স্যার! ঘোড়া পাই নাই।"

সে বলিল, মেলায় কোন অশ্ববিক্রেতার নিকট একটি ভাল ঘোড়া দেখিয়া তাহা তাহার পছন্দ হয়। ঘোড়াটির দোষগুণ পরীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় একটি লোক জমকালো পোষাক পরিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, উপর-পড়া হইয়া, তাহারই দাম জিজ্ঞাসা করিল। অশ্ববিক্রেতা দাঁও মারিবার আশায় লছমনকে উপেক্ষা করিয়া সেই নূতন খদ্দেরটির সঙ্গে দরদস্তুর করিতে লাগিল। অশ্ববিক্রেতা মূল্য অনেক অধিক হাঁকিলেও লোকটা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ঘোড়াটি পরীক্ষা করিতে চাহিল, ঘোড়ার মুখে কাপড়ের একটা উঠবন্দী লাগাম আঁটিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়াটাকে কদমে চালাইয়া, দুই এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, 'খাসা ঘোড়া, এ ঘোড়া তাহার পছন্দ হইয়াছে।' সে অশ্ববিক্রেতার সম্মুখে হাত তুলিলে দেখা গেল, তাহার হাতের বুড়ো আঙুলটা নাই। সে হাত নাড়িয়া বলিল, 'শোন দোস্ত, মহাবীর চৌবে এ ঘোড়া তোমার নিকট নজরাণা লইলেন। তোমার বরাত ভাল।'

লোকটা ঘোড়ার পাঁজরে পায়ের গোড়ালীর গুঁতা দিয়া, ঘোড়াটাকে লইয়া বায়ুবেগে রেলের লাইন পার হইয়া অরণ্যের দিকে ছুটিল, ঘোড়ার হতভাগ্য মালিক হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

'ডাকু ডাকু' শব্দে চারিদিকে সোরগোল আরম্ভ হইল। কয়েকজন পুলিস মেলায় পাহারায় ছিল। মহাবীরের নাম শুনিয়া তাহারা তাহার অনুসরণ করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর লছমন তাম্বুতে ফিরিয়া আসিল।

একখানি পত্র লিখিয়া এই সকল বিবরণ সহদেবের গোচর করিলাম। অবিলম্বে আমার সহিত যোগদানের জন্য পুনর্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

দুইদিন পরে সহদেব ৮০ জন সিপাহীসহ উপস্থিত হইলেন। সহদেব বলিলেন, মহাবীরের হাতে বিস্তর গুপ্তচর আছে, মহাবীর তাহাদের নিকট পুলিসের গতিবিধির সংবাদ জানিতে পারে। অতঃপর সহদেব কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন।

আমার সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া সহদেব কুড়ি মাইল দূরবর্তী কোন রেল-স্টেশন যাত্রা করিলেন। স্থির হইল, তিনি সংবাদ পাঠাইলে আমি সেইস্থানে তাঁহার সহিত যোগদান করিব।

পাঁচদিন পরে একজন দোকানদারের নিকট মহাবীরের আড্ডার সন্ধান পাইলাম। এই দোকানদার দস্যুগণকে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য

সরবরাহ করিয়াছিল। সে চৈত্রমাসের কথা, হোলির অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার আর দুইদিন মাত্র বাকি ছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশোয়ালীরা দলে দলে এক এক স্থানে সমবেত হইয়া পেট ভরিয়া মদ্যপান করে এবং দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে মাদল বাজাইয়া সমস্বরে গান করে।

আমি দোকানদার গণেশরামকে ডাকিয়া বলিলাম, 'হোলির সময় উহারা স্ফূর্তি করিয়া মদ গিলিবে। অত্যন্ত উগ্র মদ যত পার উহাদিগকে গছাইয়া দিবে।' সেইদিনই সহদেবকে এক পত্র লিখিয়া হোলির রাত্রে আমার তাম্বুতে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তাঁহাকে ইহাও জানাইলাম যে, হোলির রাত্রে মহাবীরের আড্ডার চারি মাইল দূরে আমার তাম্বু পড়িবে। সেই রাত্রে মহাবীর কোন্ স্থানে আড্ডা করিয়া হোলির আমোদে মত্ত হইবে, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। স্থির হইল, গণেশরাম সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় আমার তাম্বুতে আসিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া মহাবীরের আড্ডায় লইয়া যাইবে।

সেইদিন ৩০শে মার্চ, হোলির উৎসব। সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় গণেশরাম আমার তাম্বুতে আসিয়া আমাকে জানাইল, সে দুইদিন হইতে মহাবীরের দলকে প্রচুর উগ্র সরাপ যোগাইয়াছিল। সেই রাত্রিতে তাহাদের দলে পুরাদমে পানোৎসব চলিবে।

রাত্রি বারটা বাজিল, সহদেব অনুচরবর্গসহ আমার তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর আমরা দস্যুদলের আড্ডা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া দুর্গম পথ, রাত্রি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, দুইটি মাত্র বিজলি-বাতি আমাদের সম্বল। আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিলাম। গণেশরাম আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিবার জন্য আমাদের পুরোভাগে চলিল। আমাদিগকে অনেকগুলি শুষ্ক পয়োনালা পার হইয়া চলিতে হইল। যে বেতবনের ভিতর দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম, তাহা এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখাগুলি পথের উপর এভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল যে, আমাদের মস্তক জানু পর্যন্ত অবনত করিয়া অতি কষ্টে সেই পথে চলিতে হইল। ক্রমাগত দুই ঘণ্টা চলিয়া আমরা গলদ্‌ঘর্ম হইলাম। টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সেই দুর্গম অরণ্য শ্মশানভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ, কোনদিকে কোন আরণ্য জন্তুরও সাড়া-শব্দ পাইলাম না।

সে বলিল, মেলায় কোন অশ্ববিক্রেতার নিকট একটি ভাল ঘোড়া দেখিয়া তাহা তাহার পছন্দ হয়। ঘোড়াটির দোষগুণ পরীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় একটি লোক জমকালো পোষাক পরিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, উপর-পড়া হইয়া, তাহারই দাম জিজ্ঞাসা করিল। অশ্ববিক্রেতা দাঁও মারিবার আশায় লছমনকে উপেক্ষা করিয়া সেই নূতন খদ্দেরটির সঙ্গে দরদস্তুর করিতে লাগিল। অশ্ববিক্রেতা মূল্য অনেক অধিক হাঁকিলেও লোকটা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ঘোড়াটি পরীক্ষা করিতে চাহিল, ঘোড়ার মুখে কাপড়ের একটা উঠবন্দী লাগাম আঁটিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়াটাকে কদমে চালাইয়া, দুই এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, 'খাসা ঘোড়া, এ ঘোড়া তাহার পছন্দ হইয়াছে।' সে অশ্ববিক্রেতার সম্মুখে হাত তুলিলে দেখা গেল, তাহার হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা নাই। সে হাত নাড়িয়া বলিল, 'শোন দোস্ত, মহাবীর চৌবে এ ঘোড়া তোমার নিকট নজরাণা লইলেন। তোমার বখাত ভাল।'

লোকটা ঘোড়ার পাঁজরে পায়ের গোড়ালীর গুঁতা দিয়া, ঘোড়াটাকে লইয়া বায়ুবেগে রেলের লাইন পার হইয়া অরণ্যের দিকে ছুটিল, ঘোড়ার হতভাগ্য মালিক হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

'ডাকু ডাকু' শব্দে চারিদিকে সোরগোল আরম্ভ হইল। কয়েকজন পুলিস মেলায় পাহারায় ছিল। মহাবীরের নাম শুনিয়া তাহারা তাহার অনুসরণ করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর লছমন তাম্বুতে ফিরিয়া আসিল।

একখানি পত্র লিখিয়া এই সকল বিবরণ সহদেবের গোচর করিলাম। অবিলম্বে আমার সহিত যোগদানের জন্য পুনর্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

দুইদিন পরে সহদেব ৮০ জন সিপাহীসহ উপস্থিত হইলেন। সহদেব বলিলেন, মহাবীরের হাতে বিস্তর গুপ্তচর আছে, মহাবীর তাহাদের নিকট পুলিসের গতিবিধির সংবাদ জানিতে পারে। অতঃপর সহদেব কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন।

আমার সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া সহদেব কুড়ি মাইল দূরবর্তী কোন রেল-স্টেশন যাত্রা করিলেন। স্থির হইল, তিনি সংবাদ পাঠাইলে আমি সেইস্থানে তাঁহার সহিত যোগদান করিব।

পাঁচদিন পরে একজন দোকানদারের নিকট মহাবীরের আড্ডার সন্ধান পাইলাম। এই দোকানদার দস্যুগণকে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য

সরবরাহ করিয়াছিল। সে চৈত্রমাসের কথা, হোলির অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার আর দুইদিন মাত্র বাকি ছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশোয়ালীরা দলে দলে এক এক স্থানে সমবেত হইয়া পেট ভরিয়া মগুপান করে এবং দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে মাদল বাজাইয়া সমস্বরে গান করে।

আমি দোকানদার গণেশরামকে ডাকিয়া বলিলাম, 'হোলির সময় উহারা স্ফূর্তি করিয়া মদ গিলিবে। অত্যন্ত উগ্র মদ যত পার উহাদিগকে গছাইয়া দিবে।' সেইদিনই সহদেবকে এক পত্র লিখিয়া হোলির রাত্রে আমার তাম্বুতে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তাঁহাকে ইহাও জানাইলাম যে, হোলির রাত্রে মহাবীরের আড্ডার চারি মাইল দূরে আমার তাম্বু পড়িবে। সেই রাত্রে মহাবীর কোন্ স্থানে আড্ডা করিয়া হোলির আমোদে মত্ত হইবে, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। স্থির হইল, গণেশরাম সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় আমার তাম্বুতে আসিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া মহাবীরের আড্ডায় লইয়া যাইবে।

সেইদিন ৩০শে মার্চ, হোলির উৎসব। সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় গণেশরাম আমার তাম্বুতে আসিয়া আমাকে জানাইল, সে দুইদিন হইতে মহাবীরের দলকে প্রচুর উগ্র সরাপ যোগাইয়াছিল। সেই রাত্রিতে তাহাদের দলে পুরাদমে পানোৎসব চলিবে।

রাত্রি বারটা বাজিল, সহদেব অনুচরবর্গসহ আমার তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর আমরা দস্যুদলের আড্ডা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া দুর্গম পথ, রাত্রি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, দুইটি মাত্র বিজলি-বাতি আমাদের সম্বল। আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিলাম। গণেশরাম আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিবার জন্য আমাদের পুরোভাগে চলিল। আমাদিগকে অনেকগুলি শুষ্ক পয়োনালা পার হইয়া চলিতে হইল। যে বেতবনের ভিতর দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম, তাহা এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখাগুলি পথের উপর এভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল যে, আমাদের মস্তক জানু পর্যন্ত অবনত করিয়া অতি কষ্টে সেই পথে চলিতে হইল। ক্রমাগত দুই ঘণ্টা চলিয়া আমরা গলদ্‌ঘর্ম হইলাম। টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সেই দুর্গম অরণ্য শ্মশানভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ, কোনদিকে কোন আরণ্য জন্তুরও সাড়া-শব্দ পাইলাম না।

অবশেষে গণেশরাম হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া দূরে অঙ্গুলী নির্দেশ করিল, আমরা সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিরাশির ক্ষীণপ্রভা দেখিতে পাইলাম।

অতঃপর তাড়াতাড়ি সকল ব্যবস্থা শেষ করা হইল। আমাদের অনুচরবর্গকে চারিটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া খোদ কর্তা এক দলের ও আমি এক দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলাম। দুইজন দেশীয় জমাদারকে অন্য দুই দলের নেতৃত্ব ভার প্রদান করা হইল।

অতঃপর আদেশ প্রচার করা হইল—দস্যুদলের আড্ডার একশত গজ দূরে সকলেই থাকিবে, তাহার পর সহদেব দস্যুগণকে আক্রমণের আদেশমূলক হুইশ্লধ্বনি করিলে দস্যুদলের উপর গুলীবর্ষণ করিতে হইবে। হুইশ্লধ্বনির পূর্বে কেহ উহাদিগকে আক্রমণ করিবে না। আমরা সতর্কভাবে তিনশত গজ অতিক্রম করিলাম। একশত গজ দূরে থাকিয়া আমরা দস্যুদলকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। কয়েকজন দস্যু বিভিন্ন ঘাঁটিতে সান্ত্রীর কার্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা হাতের বন্দুক কোলে ফেলিয়া ঢুলিতেছিল, কেবল একজন লোককে একখানি কম্বলের উপর হাত পা ছড়াইয়া গড়াগড়ি দিতে দেখিলাম। সেই ব্যক্তিই যে দস্যুপতি মহাবীর চৌবে—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম।

অতঃপর আমি সদলে একটি বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দলপতি সহদেবের সাঙ্কেতিক হুইশ্লধ্বনির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে পাঁচ মিনিট অতীত হইল। সহসা একটি রাইফেল গর্জিয়া উঠিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। মুহূর্ত পরে দলপতির হুইশ্লধ্বনি শুনিয়া আমারা সকলেই দ্রুতবেগে সম্মুখে অগ্রসর হইলাম। সেই মুহূর্তে দস্যুরা উচ্চৈঃস্বরে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, "পালাও সকলে—শীঘ্র পালাও। পুলিস সর্দার সহদেব মিছির আমাদের ধরিতে আসিয়াছে।"

আমাদের রাইফেলের গুলীতে তাহাদের আহত বা নিহত হইবার আশঙ্কা থাকায় আমি আমার দলের লোকগুলিকে দস্যুদলের উপর গুলী বর্ষণের আদেশ দান করিতে পারিলাম না। আমরা দ্রুতবেগে দস্যু শিবিরে উপস্থিত হইলাম। অধিকাংশ দস্যু প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল পাঁচ-ছয়জন দস্যু আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া নেশায় চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায় আমাদের হাতে ধরা পড়িল। আমরা তাহাদিগকে বন্দী করিলাম। দস্যু সর্দার মহাবীর আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে পুলিসম্যান নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ঐভাবে গুলী বর্ষণ করিয়াছিল, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক কয়েকদিন মাত্র পূর্বে পুলিসের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, সে সহসা এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহার ধারণা হইয়াছিল, সে দলপতি 'মিছির সাহেবের' সাঙ্কেতিক হুইশ্লধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে এবং এইজন্য ঐভাবে গুলীবর্ষণ করিয়াছিল। সহদেব তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাময়িকভাবে পদচ্যুত করিয়া সদর থানায় ফেরত পাঠাইবার আদেশ দান করিলেন।

দস্যু শিবিরে চারিটি রাইফেল আমাদের হস্তগত হইল। আমরা তাহাদের শিবিরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দস্যুদের সকল দ্রব্যই পুড়াইয়া ফেলিলাম। যে কয়েকজন দস্যু ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক গোয়েন্দা গণেশরামকে দেখিতে না পাওয়ায় তাহার অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত হইল।

একশত গজ দূরে একটি তৃণক্ষেত্রে তাহাকে পাওয়া গেল। সে ঘাসের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। দেখা গেল, একটি রাইফেলের গুলী তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করায় সে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে। নির্বোধ পুলিস কন্‌স্টেবলটার রাইফেলের গুলী গণেশরামেরই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল। তাহার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া আমাদের আক্ষেপের সীমা রহিল না। তাহা দ্বারা আমরা উপকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু কে জানিত, আমাদেরই দলের নিক্ষিপ্ত রাইফেলের গুলীতে তাহাকে এইভাবে নিহত হইতে হইবে? যাহা হউক, আমরা একটি বাঁশের মাচা নির্মাণ করিয়া গণেশরামের মৃতদেহ আমাদের তাম্বুতে লইয়া চলিলাম।

কয়েক সপ্তাহ মহাবীর বা তাহার দলের কোন সংবাদ পাইলাম না।

একদিন ডেপুটি পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মিঃ মিশ্র একটা তদন্ত উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে যাইবার সময় আমার বাসায় উঠিলেন। দীর্ঘকাল পরে বন্ধু-সমাগমে অনেক কথারই আলোচনা চলিল। মিশ্র বলিলেন, "মহাবীর যেন পাঁকাল মাছ! অনায়াসে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করে। আমার গুপ্তচররা তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এই অঞ্চলে বাস করা বিপজ্জনক মনে করিয়া সে তিহরীর রাজার এলাকায় গিয়া আড্ডা লইয়াছে।"

সেই সময় একজন পুলিস কন্‌স্টেবলের আবির্ভাবে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়িল। সেই কন্‌স্টেবল 'পুলিস সাহেবকে' সসম্ভ্রম অভিবাদন করিয়া তাঁহার হাতে যে পত্রখানি প্রদান করিল, সেই পত্রখানির আগাগোড়া পাঠ করিয়া তিনি চঞ্চলস্বরে বলিলেন, "মহাবীর আবার বীরত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে! এই পত্রখানি দেখ!"

সেই পত্রখানি তাঁহার তাঁবেদার কোন পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের প্রেরিত রিপোর্ট। এই রিপোর্টে মহাবীরের অনুষ্ঠিত শেষ ডাকাতির বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছিল। যে কন্‌স্টেবল মারফৎ এই রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল, সেই কন্‌স্টেবল এই ডাকাতির আমূল বৃত্তান্ত অবগত ছিল—রিপোর্টে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকায় সহদেব কন্‌স্টেবলটিকে মহাবীরের ডাকাতির সকল বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিতে আদেশ করিলেন।

কন্‌স্টেবল তাঁহার আদেশ বলিতে আরম্ভ করিল,—

"মহাবীর সংবাদ পাইয়াছিল, একদল 'ঘামটাপ্পা' গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে তাহাদের পার্বত্য বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবে।

"এই ঘামটাপ্পারা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। তাহারা যেখানে বাস করে সেই স্থানের পার্বত্য জমিতে তাহারা কৃষিকর্ম করে। কিন্তু শীতকালের কয়েক মাস তাহারা চাষ-আবাদের কার্য বন্ধ রাখিয়া নামিয়া আসে। এই সময় সেই সমতল ক্ষেত্রে তাহারা কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনের চেষ্টায় সরকারের অধিকৃত বন মহলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বন মহলের শ্রমজীবির কার্যে নিযুক্ত হয়। ইহারা সস্ত্রীক সেখানে কয়েকমাস কঠোর পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জন করে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। বৈশাখ মাসের প্রথমেই তাহাদের উপার্জিত অর্থ-রাশি লইয়া সদলে তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যাগমন করিত।

এই সকল ঘামটাপ্পার সঙ্গে তিন চারিজন ধনাঢ্য বেণিয়া ছিল। তাহারা স্বদেশের পথে অগ্রসর হইয়া একদিন সায়ংকালে একস্থানে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য সেইস্থানে আড্ডা লইল। তাহারা সেইস্থানে তাম্বু খাটাইয়া রন্ধনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইল, সেই দলে যে সকল পুরুষ ছিল, তাহারা দস্যুর আক্রমণের আশঙ্কায় পালা করিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিল।

সন্ধ্যার পর একদল লোকের ভোজন শেষ হইলে অন্য দল যখন ভোজন করিতে বসিবে, সেই সময় তাহারা অদূরবর্তী বনপথে কতকগুলি লোকের

পদশব্দ শুনিয়া সভয়ে সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহারা সেই বনপথের বাঁকের মাথায় একদল লোক দেখিতে পাইল। তাহারা যখন নিকটে আসিল, তখন ঘামটাপ্পারা দেখিল, তাহারা খাকি পরিচ্ছদে সজ্জিত একদল পুলিস কন্‌স্টেবল এবং একজন জমাদার তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছিল।

তাহাদিগকে দেখিয়া ঘামটাপ্পা দলের একজন বণিক আশ্বস্তচিত্তে উৎসাহভরে বলিল, "বাহা রে বাহা! পুলিস আমাদের পাহারায় থাকিলে ডাকাতের দল এদিকে ঘেঁসিতে সাহস করিবে না।"

ঘামটাপ্পারা সাদরে তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। যে বেণিয়া তাহাদিগের দলপতি ছিল, সে পুলিসের জমাদারকে সবিনয়ে জানাইল—জমাদার সাহেব যদি মেহেরবাণী করিয়া সেই রাত্রিটুকু তাহাদের সঙ্গে বাস করেন, তাঁহা হইলে সে তাহাদের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সকলের শয়নের স্থানও জুটাইয়া দিবে।

জমাদার বলিল, সে সংবাদ পাইয়াছে—দুঃসাহসী দস্যু মহাবীর চৌবের দল নিকটেই আড্ডা করিয়াছে এবং গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটি 'সুপ্রাণডণ্ড' মিছির সাহেব বাহাদুর তাহাদের উপর এই হুকুম জারী করিয়াছেন যে, ঘামটাপ্পাদের বড় বড় দল যখন দুর্গম বনপথ দিয়া পাহাড়ের দিকে চলিতে থাকিবে, সেই সময় বনের এলাকা পার না হওয়া পর্যন্ত পুলিস তাহাদের পাহারায় থাকিবে।—এই জরুরী হুকুম তাহাদিগকে তামিল করিতে হইবে।

জমাদারের নিকট এই সুসংবাদ শুনিয়া দলের সকল লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

অতঃপর জমাদার তাহার তাঁবেদারগণকে কিছু দূরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং দুইজন ভুঁড়িদার বেণিয়ার গা-ঘেঁসিয়া বসিল। তাহার পর অন্তরঙ্গের ন্যায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

জমাদার তাহাদিগকে জানাইল, দলের যে সকল লোকের নিকট অধিক টাকা সঞ্চিত আছে, তাহারা সকলেই যদি কনস্টেবলগুলির গা-ঘেঁসিয়া শয়ন করে, তাহা হইলে তাহারা তোফা নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারিবে। তাহাদের দলের স্ত্রীলোকদের অঙ্গে যে সকল মূল্যবান অলঙ্কার আছে, সেগুলি খুলিয়া লইয়া পুরুষদের নিজের কাছে রাখা উচিত। এরূপ

করিলে—মহাবীরের দল যদি আসিয়াই পড়ে—তাহা হইলে স্ত্রীলোকগুলির বিপদের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

'বেণিয়া ভাই, জমাদারের সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশে এতই মুগ্ধ হইল যে, অবিলম্বে তাহা কার্যে পরিণত করিল।

নৈশ ভোজন শেষ হইলে ছয়জন পুলিশম্যান ধরাশয্যায় দেহ প্রসারিত করিল; তাহারা নিদ্রার আয়োজন করিলে, জমাদার অবশিষ্ট কন্‌স্টেবলগুলিকে সঙ্গে লইয়া তাম্বুর চারিদিকে পাহারা দিতে বসিল। একঘণ্টা পরে সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিছুকাল পরে চতুর্দিক নিস্তব্ধ হইলে জমাদারের ইঙ্গিতে তাহার অনুচরবর্গ নিঃশব্দে উঠিয়া বসিল এবং যাহারা টাকা ও অলঙ্কারগুলি নিজেদের কাছে রাখিয়াছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

তাহাদের প্রত্যেককে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া তুলিয়া, কন্‌স্টেবলের ছদ্মবেশধারী দস্যুরা তাহাদের নিকট যাহা কিছু ছিল সমস্তই বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিল এবং জানাইল এই আদেশ পালনে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইলে বন্দুকের গুলিতে তাহাদের মাথার খুলী গুঁড়া হইবে। টাকা-কড়ি গহনা-পত্র হাত-ছাড়া হইলে, পরে তাহা উপার্জন করা যাইতে পারে; কিন্তু মাথার খুলী ছাতু হইলে আর তাহা জোড়া লাগিবে না, মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার হইবে না।

একজন বেণিয়া স্খলিতস্বরে বলিল, "কিন্তু জমাদার সাহেব, তোমরা পুলিশের লোক, সুপ্রাউণ্ড সাহেব বাহাদুরের হুকুমে আমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ; কিন্তু যে কর্মটি করিতেছ তাহা রক্ষকের কর্ম, না ভক্ষকের কর্ম?"

জমাদার হাসিয়া বলিল, "ওরে নির্বোধ, আমার মতলব এখনও কি বুঝিতে পারিস্ নাই?—আমার হাত দেখিলে তাহা বুঝিতে এক লহমা বিলম্ব হইবে না। এই দেখ, আমি আঙ্গুল কাটা মহাবীর চৌবে। পুলিশ সাজিয়া কিছু উপার্জন করিতে আসিয়াছি।" সে তাহার দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে প্রসারিত করিল, দলের সকলে প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যাহার নিকট যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সমস্তই মহাবীরের হস্তে অর্পণ করিল। অতঃপর মহাবীর দ্রুতবেগে অদূরবর্তী অরণ্যে প্রবেশ করিল। পরদিন প্রভাতে দুইজন 'ঘামটাপ্পা' সেই এলাকার থানায় উপস্থিত হইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে সকল বিবরণ প্রকাশ করিল।

গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি সুপাউণ্ড সহদেব মিশ্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন।

অবিলম্বে তাঁহার তাঁবেদার দারোগাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দলের লোকগুলিকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। যে স্থান হইতে এই লুণ্ঠনের সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি সদলে সেই স্থানে যাত্রা করিলেন।

একপক্ষের মধ্যে আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। পক্ষান্তে একদিন প্রভাতে আমি একটি অরণ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেছিলাম সেই সময় একজন ডাক-রাণার একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম তিনি মহাবীরের গতিবিধির সন্ধান পাইয়াছেন।

সহদেব সেই রাত্রেই মহাবীরের দলকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি সেই ডাক-রাণারের সহিত তাঁহার তাম্বুতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাঁহার তাম্বুর দূরত্ব দশ মাইলের অধিক ছিল না।

আমি অশ্বারোহণে সেই ডাক-রাণারের অনুসরণ করিলাম।

সেইদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় আমি সহদেবের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম।

একটা কনস্টেবল ধূমবহুল অগ্নিতে জল গরম করিয়া এক এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিলে সেই বিস্বাদ চা গলাধঃকরণ করিয়া আমরা কাজের কথার আলোচনা করিলাম। সহদেবের নিকট জানিতে পারিলাম—মহাবীর সদলে সেই সময় অরণ্যের যে অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্থানটি গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সহদেবের সেই আড্ডা হইতে দস্যু-সর্দারের তাম্বুর দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। আমরা মধ্যরাত্রে নৌকাযোগে যাত্রা করিব।

কয়েকখানি অখাদ্য, পুরু চাপাটি চর্বণে ক্ষুধানল নির্বাপিত করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলাম। অরণ্যের ভিতর দিয়া দুর্গম পথে প্রায় এক ঘণ্টা চলিয়া নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। ছয়খানি ডিঙ্গী নৌকা সেইস্থানে আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। আমরা নদীর অনুকূল স্রোতে তরী ভাসাইলাম। নদীর খরস্রোতে ডিঙ্গীগুলি যেন উড়িয়া চলিল। অবশেষে মাঝি বলিল, আমাদের নৌ বিহার শেষ হইয়াছে, আমাদিগকে তীরে অবতরণ করিতে হইবে।

সিপাহীদিগকে সতর্ক করিয়া এবার স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করিলাম। আবার প্রায় আধ ঘণ্টা অরণ্য ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইলাম। দস্যু শিবিরের কিছু দূরে থাকিতেই আমাদিগকে থামিতে হইল। পুলিস সাহেবের আদেশ হইল—

তাঁহার হুইশ্লধ্বনি শুনিবার পূর্বে কেহই গুলীবর্ষণ করিবে না। তাঁহার আদেশে আমরা অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইলাম।

আমরা সেই বনভূমির দুইশত গজ অতিক্রম করিয়া দস্যুদলের এক জোড়া সান্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাহারা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহারা জাগিয়া চীৎকার করিবার পূর্বেই আমরা তাহাদের মুখ ও দুই হাত তাহাদেরই পাগড়ী দিয়া বাঁধিয়া, তাহাদের রাইফেল দুইটি হস্তগত করিলাম।

কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া আমরা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিতে পাইলাম। অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম—সর্বনাশ! প্রায় পঞ্চাশটা গাঢ় কৃষ্ণ মেঘবর্ণের মহিষ আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া, বক্র শৃঙ্গের সঙ্গীন উদ্যত করিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছে।

এই অর্ধশত মহিষ ভয় পাইয়া যদি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করে, তাহা হইলে মহাবীরকে সদলে গ্রেপ্তার করা এবারও অসম্ভব হইবে।

আমরা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিরূপে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই সময় গোপ জাতীয় কোন জমাদার আমাদিগকে আশ্বস্ত করিল। তাহার নিজের একপাল মহিষ ছিল। মহিষের পালকে কি কৌশলে ঠাণ্ডা করিতে হয়—তাহা সে জানিত। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোয়ালার ভাষায় মহিষগুলিকে 'হ্যাদে-তা' 'হ্যাদে-তা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ঠাণ্ডা করিল—তাহার সেই আদরের বুলি শুনিয়া, মহিষগুলা আর আমাদের প্রতি আক্রোশ না করিয়া দস্যুদের আড্ডার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সিপাহীরা মহিষগুলার দেহান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দস্যুদলের দিকে অগ্রসর হইল।

আমি সেনাপতি সহদেবের পার্শ্বেই ছিলাম। দস্যুদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমরা তাহাদিগকে ঘুমাইতে দেখিলাম। কতকগুলি দস্যু মাটিতে পড়িয়া গড়াইতেছিল; সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। কেবল একজন দস্যু একখানি চারপাইয়ের উপর শায়িত ছিল। তাহার হাতের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম—সে আঙ্গুলকাটা মহাবীর।

আমরা দস্যুদলের কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে থাকিতেই মহিষগুলা দস্যুদলের আড্ডার ক্ষীণ আলোকে অত্যন্ত ভীত হইল এবং চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

আর মুহূর্তকালও নষ্ট করা উচিত নহে বুঝিয়া আমাদের দলপতি দস্যুগণকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য সিপাহীগণকে আদেশ করিলেন। আমি দস্যু-সর্দারের চারপাই লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইলাম। আমাদের হাতে রিভলভার ছিল। একজন দস্যু জাগিয়া উঠিয়া হাঁকিল, "চৌবেজী, চৌবেজী—ভাগো!"

এই চীৎকার শুনিয়া মহাবীর চারপাই হইতে লাফাইয়া মাটিতে পড়িল। যে দস্যু তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল, সে সর্দারের শয্যার অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার হাতের রিভলভার তাহার নাকের ডগায় উদ্যত করিলাম।

সহদেব মহাবীরের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইবামাত্র দস্যুসর্দার কোমর হইতে তাহার রিভলভারটা টানিয়া লইয়া উর্ধ্বে তুলিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মরিতে আসিয়াছ, মিছির সাহেব, তবে মর।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের রিভলভার গর্জিয়া উঠিল।

মিছির সাহেব চক্ষুর নিমেষে এক পাশে কাত হইয়াছিলেন। রিভলভারের গুলী তাঁহার কাঁধের পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। তিনি মুহূর্তে মহাবীরের হাতের কব্জীতে প্রচণ্ড বেগে পিস্তলের কুঁদার আঘাত করিতেই তাহার হাতের পিস্তল খসিয়া পড়িল এবং তিনি বাঘের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। মহাবীর মাটিতে পড়িয়া তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার উভয় হস্ত শৃঙ্খলিত করিতে বিলম্ব হইল না। পার্শ্বস্থ জমাদার নির্বিঘ্নে এই কার্য শেষ করিল।

অতঃপর মহাবীরের দলের সকল দস্যুই সিপাহীদের হাতে ধরা পড়িল।

জিলার সদরে আনিয়া দস্যুদলকে হাজতে আবদ্ধ করা হইল। মহাবীরের অপরাধের বিচারের জন্য যে বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছিল—সেই আদালতের বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার অনুচরবর্গ দশ, বার বা চতুর্দশ বর্ষের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। মহাবীরের দল ধরা পড়ায় সেই অঞ্চলের দস্যুভয় নিবারিত হইল। সহদেব মিশ্র বহু পুরস্কার ও 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের পদে প্রমোশন পাইলেন। এই দস্যুদল দমনের জন্য সরকারের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।"



অনুরোধ

*

শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়

ভালবাসো নিজ দেশ
　　পরো নিজেদের বেশ
　　　　কথা কও নিজেদের ভাষাতে।
পায়জামা বুশ্‌সার্ট
　　হতে পারে ফিট্‌ফাট্‌
　　　　পরো না তা বিদেশীকে হাসাতে।
পোশাকে প্রথম হয়
　　সকলের পরিচয়—
　　　　কোন্‌ জাত্‌, কোন্‌ দেশে বাড়ী বা!
ইংরেজ, আফগান,
　　চীনে বাড়ী, না জাপান,
　　　　বাঙালী, বেহারী, মাড়োয়ারী বা।
তারপর পরিচয়
　　কি ভাষায় কথা কয়;
　　　　জাত চেনা যায় ভাষা শুনে তো!
তারপরে আচরণে
　　ছাপ রেখে যায় মনে
　　　　শেষ পরিচয় জ্ঞানে গুণে তো।
আমরা যে ভারতীয়
　　সেই পরিচয় দিও
　　　　মুখের কথায় আর সাজেও।
নকলে হয়ো না মাটি
　　সব দিকে হও খাঁটি
　　　　উৎসবে, আনন্দে, কাজেও।



লুপ্ মেল * সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শীতকাল। গভীর রাত্রি। বাহিরে দুর্যোগ। চলন্ত ট্রেণের কামরায় দুটি মাত্র সহযাত্রী। একজন খুনী; আর একজন···সদ্য যে খুন হয়েছে তার মৃতদেহ,···সেই কামরায় বসে আছি খুনীর সামনে—জীবনে এমন ঘটনা কল্পনা করতে পারো?

আজো সে কথা মনে জাগলে আতঙ্কে সারা গা কেঁপে ওঠে!

অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তখন লুপ্ লাইনে লুপ্ মেল চলতো।

ট্রেণের কামরায় অঘটন ঘটে চিরদিন, মানি। আজো কত ঘটছে, খবরের কাগজে পড়ি। সে-সব কাহিনী পড়ে শিউরে অনেকে বলেন,—বাপ রে! আমি কিন্তু চুপ করে থাকি! ভাবি, এ আবার ঘটনা না কি, হুঁ! আমার জীবনে যা ঘটেছিল···

খবরের কাগজে এ-কাহিনী ছাপা হয়নি। ছাপবার নয়!

আসছিলুম আমি পুর্ণিয়া থেকে। সেক্রিগালি ঘাটের ট্রেণ এসে সাহেবগঞ্জে দাঁড়ালো। তখন চড়্‌বড়্ করে বৃষ্টি পড়ছে। শীতের রাত। হাড়-ঝন্‌ঝনে হি-হি করা শীত! দেখি, লুপ্ মেল ছেড়ে যায়! তাড়াতাড়ি সামনে পেলুম ইণ্টারক্লাশ ইউরোপীয়ান্ কামরা। দরজা ঠেলে সেই কামরাতেই উঠে পড়লুম।

যাচ্ছিলুম ভাগলপুর। সেখানকার কলেজে তখন বি-এ পড়ি।

কামরায় বসে সাহেবী-পোষাক পরা দু'জন যাত্রী। একজন কোণে বসে আছে; তার মাথায় ক্যাপ্, মাথাটা ঝুলে পড়েছে! বুঝলুম, ঘুমে ঢুলছে! অপর ভদ্রলোকটি সজাগ বসে আছে।

আমাকে দেখে চমকে উঠলেন, বললেন,—এমন গোঁয়ার্তুমি করে? ছি! ফুটবোর্ড পিছল…চলন্ত ট্রেণ…পা যদি শ্লিপ্ করতো?

হেসে বললুম,—কেন পড়বো? স্পোর্টসে দখল আছে!

ভদ্রলোকটি বাঙালী। বললেন—ও!

ট্রেণ চলেছে। শার্সির কাচ দিয়ে ভদ্রলোক বাহিরের পানে চেয়ে আছেন—আকাশের গায়ে কে যেন কালো মেঘের তুলি বুলিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক্!

ভদ্রলোক বললেন—কোথায় যাওয়া হবে?

বললুম—ভাগলপুর।

ভদ্রলোক বললেন,—ও!

রাত প্রায় বারোটা। কটাই বা স্টেশন! এখনি নামতে হবে, কাজেই ঘুমোবার চেষ্টা করিনি। কাটিহার স্টেশনে একখানা ছ' পেনি দামের বিলাতী নভেল কিনেছিলুম,—খানিকটা পড়া হয়েছে,—সেখানা আবার খুলছি, ভদ্রলোক বললেন,—কি বিশ্রী দুর্যোগ!

বললুম,—হ্যাঁ।

নভেলের পঞ্চম পরিচ্ছেদ খুললুম। ভদ্রলোক বললেন,—ভাগলপুরেই থাকা হয় বুঝি?

বললুম,—হ্যাঁ। ওখানকার কলেজে পড়ি। থাকি কলেজের হোস্টেলে।

—ও!…নিবাস?

বললুম,—পূর্ণিয়ায়।

ভদ্রলোক আবার বললেন,—ও!

তারপর চুপচাপ। ঘুমন্ত সহযাত্রীটির পানে চাইলুম। নিদ্রায় নিথর। দেহখানা শুধু ট্রেণের ঝাঁকানিতে দুলছে। নভেলের পাতায় মনঃসংযোগ করলুম।

ভদ্রলোক বললেন,—এর পরে কোন্ স্টেশনে গাড়ী থামবে?

বললুম—কাহালগাঁ।

—তারপর ?

বললাম,—সাবুর। তারপরে ভাগলপুর।

ভদ্রলোক বললেন,—ও !…এখনো তা হলে দুটো স্টেশন মাঝে আছে !… আচ্ছা…তা দেখুন, আমি একটু বিপদে পড়েছি। মানে,…ভাবছিলুম, এমন কাকেও যদি পাই, বুঝে যিনি জবাব দিতে পারেন…বেশ চালাক-চতুর ভদ্রলোক—মানে, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাহলে তাঁর পরামর্শ নি ! এমন সময় আপনি এসে উঠলেন এই কামরাতেই ! Young college-gentleman —তা, হ্যাঁ, সিগারেট ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক সিগারেটের প্যাকেট ধরলেন আমার সামনে।

বললুম—আমি সিগারেট খাই না।

—খান না ?

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন ! তাঁর চোখ-দুটো বিস্ময়ে ঠেলে বেরুবার জো !

বললেন,—আশ্চর্য ! একালের ছেলে—বি-এ পড়েন, অথচ সিগারেট খান না ! একালে তো দেখি দুধের-বোতলের সঙ্গে বাঙালীর ছেলে সিগারেট টানতে সুরু করে ! ভালো, ভালো ! সিগারেট খান না শুনে খুশী হলাম। সিগারেট খবর্দার খাবেন না। ও বিষ ! স্রেফ্ বিষ ! না খেলেই মঙ্গল।

ভদ্রলোকের আবেগ উচ্ছ্বাস দেখে কৌতুক বোধ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে গর্ব। আমাকে দেখে ভদ্রলোক বলছেন, বুদ্ধিমান ! মনটা খুশী হলো। ভদ্রলোক তাহলে নেহাৎ সেকেলে নন্—মাথা আছে !

তিনি সিগারেট ধরালেন, ধরিয়ে দু' তিনটে টান দিয়ে বললেন,—তাহলে বলি আপনাকে। যেন নভেল ! অথচ সব সত্য !…আপনার বই পড়ার ব্যাঘাত হবে না তো ?

বই রেখে দিলুম। বললুম,—না, বই তো পালাবে না—পরে পড়বো।

ভদ্রলোক হাসলেন, হেসে বললেন,—বেশ বলেছেন ! বাঃ ! বই পালাবে না ! কিন্তু, আমি পালাবো। এখন না শুনলে গল্প আর আমার শোনা হবে না। বইয়ের গল্প যখন খুশী পড়বেন। বাঃ ! হাঃ হাঃ হাঃ !

ভদ্রলোকের সব-তাতেই বাড়াবাড়ি ! এ কথায় কেন যে এত হাসি…

সহসা তিনি গম্ভীর হলেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—দশ বছর আগেকার ঘটনা। তবু মনে হয়, যেন কালকের কথা !…দুই বন্ধু।

দু'জনেই বেকার—গলায় গলায় ভাব। নানা দিকে ঘোরাঘুরি করে শুধু নৈরাশ্য···শেষে যথাসর্বস্ব বেচে দু'জনে গেল আসাম। ঠিক করলে, সেখানে ব্যবসা করবে। কমলা-লেবু, কমলা-মধু, আসাম-সিল্ক! কাছেই মণিপুর··· মণিপুর চাদর, রকমারি পাথর, মৃগনাভি, সাপের চামড়া···নানা জিনিস আছে। তাই নিয়ে চালানী কারবার খুললে লাভের সীমা থাকবে না। বিশেষ, ওদিকটায় কারবারী লোকের ভিড় তখনো তেমন জমেনি!

দু'জনে সীলেটে গেল। সেখান থেকে কামরূপ-কামাখ্যা, গৌহাটী, চেরাপুঞ্জি···কোনো জায়গা আর বাকী রাখলে না। চেরাপুঞ্জিতে নিলে কমলালেবুর মস্ত ক্ষেত। দু'জনে মিলে ইজারা নিলে। তা ছাড়া সিল্ক অস্ত্রশস্ত্র, ···চাদর···দু'বছরে ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠলো।

যে দু'জন বন্ধুর কথা বললুম, ধরুন, তাদের মধ্যে একজনের নাম শশধর, আর একজনের নাম ভূষণ।

একদিন ভূষণকে ডেকে শশধর বললে,—দু'জনে এক জায়গায় বসে কি ফল? তার চেয়ে তুমি ছাখো এখানকার কারবার, আমি যাই মণিপুর। দেখে শুনে সেখান থেকে জিনিসপত্র চালান দিতে পারবো।

ভূষণ বললে,—খুব ভালো কথা।

কথা মতো শশধর গেল মণিপুর; ভূষণ রইলো সীলেটে চায়ের চার্জে।

সেখানে গিয়া শশধরের হলো অসুখ—কালা-জ্বর। যা-কিছু পুঁজি ছিল, সব ফুরিয়ে গেল। ভূষণকে বার-বার চিঠি লেখে, টাকা পাঠাও···টাকা! নাহলে মারা যাবো।

ভূষণ টাকা পাঠালে না। চিঠির জবাবও দিলে না। পরমায়ুর জোর ছিল, মরে-মরেও শশধর কোনো মতে বেঁচে উঠলো।

বাঁচলেও নড়বার সামর্থ্য নেই—তা' ছাড়া একা, নিঃসম্বল। কি করে সীলেটে ফিরবে? শরীর একটু সামর্থ্য পাবে ভেবে একটা আড়তে চাকরি নিলে এবং কোনো মতে কষ্টেসৃষ্টে ট্রেণের ভাড়া জম্‌লে প্রায় দু'বছর পরে শশধর সীলেটে ফিরলো।

ফিরে দেখে, ভূষণ নেই! কারবার বেচে মোটা টাকার বাণ্ডিল বেঁধে সীলেট ছেড়ে পালিয়েছে। শশধরের মণিপুরে যাবার ছ'মাস পরেই সে সীলেট ছাড়া।

রাগে শশধর জ্বলে উঠলো! বটে! বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! কিন্তু এ-ক্রোধ ভূষণকে স্পর্শ করলে না।

সীলেটে ছিল তার দু'চারজন আলাপী লোক। তাদের করুণায় বছরখানেক সীলেটে পড়ে রইলো; তারপর দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সীলেট ত্যাগ করলে।

প্রতিজ্ঞা, সেই বেইমান ভূষণকে খুঁজে বার করবে—পৃথিবীর বুক চিরে বার করে তার এ বেইমানীর সে চূড়ান্ত শোধ দেবে···

এখানে সেখানে নানা জায়গায় শশধর ভূষণের খোঁজ করলে! কোথাও সন্ধান মিললো না! শেষে নিরাশ হলো।

কিন্তু নিরাশ হলে চলবে কেন? প্রাণটাকে রক্ষা করা চাই।

ঘুরতে ঘুরতে গয়ার ওদিকে এক ভদ্রলোকের পাথরের কোয়ারিতে শশধরের একটা চাকরি জুটে গেল। কোয়ারির কাজে নানা দেশে তাকে ঘুরতে হতো। ভূষণের সন্ধান কিন্তু কোনো দিন ছাড়েনি!

বারো বছর কেটে গেল। এমনি ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একদিন দেখা হলো সেই বেইমান ভূষণের সঙ্গে। নির্জনে···গভীর রাত্রে! আশপাশে তখন কেউ নেই! শশধরের মন আক্রোশে অট্টহাস্য করে উঠলো।···

এ পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক চুপ করলেন। পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার পানে দু'চোখে চেয়ে রইলেন···অবিচল দৃষ্টি! আমি বিস্ময় বোধ করলুম।

ভদ্রলোক বললেন,—আচ্ছা ধরুন, আপনি যদি শশধর হতেন, আর আমি সেই ভূষণ হতুম? তাহলে আপনি আমায় হাতে পেয়ে ছেড়ে দিতে পারতেন? না, খুন করতেন···হ্যাঁ খুন! যে এত বড় বেইমান···বিশ্বাসঘাতক···

ভদ্রলোক বললেন,—আমার নাম শশধর। আর ঐ যে লোকটি কোণে বসে···ও হলো ভূষণ। কোয়ারির কাজে পাকুড় গিয়েছিলুম। এই ট্রেণেই ফিরছি···কামরায় আমি একা। গাড়ী তিনপাহাড় স্টেশন ছাড়বে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে আমার এই কামরায় এসে উঠলো ঐ ভূষণ! ঠিক আপনার মতো ধরণে!

তাকে দেখে আমি চমকে উঠলুম! তার আশা প্রায় যখন ত্যাগ করেছি, ···তখন? আশ্চর্য! প্রথমে মনে হলো, ভূষণ নয়, ভূষণের প্রেতাত্মা! কিন্তু নিমেষে বুঝলুম, তা নয়! জীবন্ত দেহে ভূষণই! আমাকে দেখে ভূষণ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। কম্পিত স্বরে বললে,—শশধর?

আমি বললুম—ভূষণ? বাঃ!

তখনি উঠে দাঁড়ালুম···হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে উঠলো! দাঁড়িয়ে এমনি করে ভূষণের গলাটা টিপে তাকে চেপে ধরলুম। ধরে···

কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, সবলে আমার গলা জোরে টিপে ধরলেন। আমার প্রাণ যায়!

ভদ্রলোক বললেন—একটি ধাক্কা! ব্যস্‌! সব শেষ!···বসে বসে তাই ভাবছি, ট্রেণে লাশ ফেলে নিঃশব্দে এই রাত্রে গা ঢেকে কেমন করে সরে পড়ি!···ভাবলুম, সাহেবগঞ্জে নেমে গা-ঢাকা দেবো! সুবিধা হলো না। প্লাটফর্মে ভিড়! ওকে বসিয়ে রেখেছি কায়দা করে···যেন ঘুমোচ্ছে! আপনি এসে এ কামরায় উঠলেন। ভাবচি, আপনার জিম্মায় রেখে এই কাহালগাঁ স্টেশনে নেমে পড়বো? তারপর গা ঢাকা?···এ্যালার্ম সিগনালের দিকে চাইছেন কি? খবর্দার! যে লোক সদ্য একটাকে খুন করেছে, তার পক্ষে আর একটা লোককে খুন···শক্ত নয়!···হাঃ হাঃ হাঃ!

ভয়ে আমি কাঠ! এমন খুনী···তার অসাধ্য কাজ নেই! মাথায় যখন খুন চেপেছে, তখন···

আড়ষ্ট-কাঠ হয়ে বসে রইলুম! বুকের মধ্যে স্পন্দন চলেছে। মনে হচ্ছিল, সে যেন কামান-দাগার শব্দ! ভদ্রলোক উঠে ভূষণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন···

আমি যেন অচেতন, নিস্পন্দ! মনে হলো, যেন ট্রেণ থেমেছে···পুলিশ কামরায় ঢুকেছে, লাশ দেখে আমাকে গ্রেফতার করেছে! আমার হাতে হাতকড়ি!

হঠাৎ বুঝলুম, ট্রেণের গতি মৃদুতর, ট্রেণ সিগনাল-পোস্ট পার হলো।··· একটা স্টেশন!···

কি স্বস্তি! আঃ!

ভদ্রলোকের পানে তাকালুম···তখনো তিনি তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন!

প্লাটফর্মের প্রান্ত যেমন চোখে পড়া, অমনি লগেজ-পত্র ফেলে ঠেলে দরজা খুলে চলন্ত ট্রেণ থেকে একেবারে প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়লুম।

ভাবলুম, এখনি রিপোর্ট করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবো! খুনে! শয়তান! আমি বুকিং-অফিসের কাছে আসতে আসতে ট্রেণ থামলো।

কামরার পানে চাইলুম।

যা দেখলুম, শিউরে উঠলাম! কামরার দ্বার খুলে শশধর আর তার সেই সঙ্গী ভূষণ···আমার লগেজগুলো প্লাটফর্মে ছুড়ে দিচ্ছে···

আমাকে দেখে দু'জনেই হাঃ হাঃ করে হাসলো। সে যেন বাজের হুঙ্কার! আমাকে ডেকে বললে,—বাবুসাব···ভয়ের চোটে লগেজ ফেলে দৌড়! চলন্ত ট্রেণ থেকে অমন করে নামে? যদি পড়ে যেতেন···

বিস্ময়ে আমি হতভম্ব! ট্রেণ দিলে ছেড়ে!

সে হাস্য-কৌতুকের অর্থ বুঝলুম সঙ্গে-সঙ্গে···অর্থাৎ আমার পকেট থেকে পার্সটি অন্তর্হিত···সেই সঙ্গে কোটে-আটকানো সোনার ঘড়ি চেন সাফ!

সেই যে খুনের কশরতি অভিনয়—সেই ফাঁকে সব সাফ করেছে! খাশা হাত বটে!

কি করে ভাগলপুরে পৌছুলুম? স্টেশনমাস্টারদের নিন্দা আর যিনি যতই করুন, আমি করবো না। অন্ততঃ কাহালগাঁর স্টেশন-মাস্টার-বাবুটি···চমৎকার ভদ্রলোক! তাঁর দয়াতেই সে যাত্রা ভাগলপুরে ফিরি।

মগধরাজ অজাতশত্রু যুদ্ধে দুটি নতুন অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন—মহাশিলাকণ্টক ও রথমুষল। মহাশিলাকণ্টক কামানের পূর্ব-কল্পনা এ থেকে বড় বড় পাথরকে ছোড়া যেতো গোলার মতো। রথমুষল এখনকার ট্যাঙ্কের পূর্ব-কল্পনা। রথ চলতো, সারথিকে দেখা যেতো না। রথের চারিপাশে থেকে লৌহ-শলাকা বেরিয়ে থাকতো, শত্রু সেনার মাঝে পড়ে সেই রথ মহাক্ষতি করতো।



সাঁওতালী নাচ * শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

নদীর ধারে বাস করেছে ঘর কত সাঁওতাল
স্ত্রী পুরুষে সমান খাটে নাই কোন জঞ্জাল।
কুকুর পোষে, বেজী পোষে, পোষে মুরগী হাঁস
ফোটে ছোট অঙ্গনেতে ফুল যে বার মাস।
খোঁপায় পরে' ফুল
মেয়েরা সব নৃত্য করে, আনন্দে আকুল।

পুরুষেরা সব মাদল বাজায়, বাঁশীতে সুর নানা,
উড়ে যেন ঢুম্‌কা আসে, সাঁওতাল পরগণা।
কোথা থেকে আসে, যেন মৌয়া ফুলের বাস
অসময়ে আসে মধুর বাসন্তী উচ্ছ্বাস।
বাঁশীর মোহন সুর
ডেকে ডেকে কাছে আনে কাঙ্ক্ষিত সুদূর।

টা-রা, রা-রা, টারা রারা, তুরু, রুরু, রু—
করে তাদের নৃত্য এবং গীতের যে সুরু।
সন্দেহ হয় ঘর ক'খানা উড়িয়ে কি আনা?
মন্ত্রে বুঝি নিয়ে এলো বাসন্তী বাজনা।
আমরাও দিই তাল—
আনন্দ যে বানিয়ে দিলে সবাইকে সাঁওতাল।



পিস্তল * শ্রী চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)

রায়বাড়ীর বৌ হয়ে আসবার পর মাসখানেকের মধ্যে এখানকার প্রায় সব কিছুই দেখে নিয়েছে শোভনা। শ্বাশুড়ীই দেখিয়েছেন ডেকে ডেকে। মস্ত বড় বাড়ী। সাতাশখানা ঘর। সব জিনিসপত্রে ঠাসা। কত দামী দামী আসবাব! বেশীর ভাগই সাহেবী দোকান থেকে কেনা। রায়গিন্নী বৌকে শুধু দেখান নি, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন ওদের রকমারি ইতিহাস। কোন্ রাজার দেওয়ান চমৎকার কাজ-করা কর্পূর কাঠের টীপয়ে চা খাইয়েছিল কর্তাকে। জাঁক দেখিয়ে বলেছিল, 'এর দাম কত জানেন, রায়বাহাদুর? এক হাজার টাকা।' ব্যস্, আর যায় কোথায়! সেইদিন থেকেই ক্ষেপে গেলেন—'ঐ রকম টীপয় চাই।' লোক চলে গেল মাইশোরে। ঠিক ঐ রকম কি আর পাওয়া যায়? জিনিস যদি বা পছন্দ হয়, দাম বলে কম। শেষকালে এক দালালের পাল্লায় পড়ে কিনলেন ঐটা। যখন আনা হল, ভুরভুর করছে কর্পূরের গন্ধ। ও হরি! তখন কি জানি বাজে কাঠের উপর কর্পূরের সেন্ট্ মাখিয়ে দিয়েছে? মাসখানেক যেতেই সব গন্ধ উবে গেল। তখন আর তাকে পাই কোথায়?—বলে হাসলেন রায়গিন্নী।

শোভনা বলল, কত দাম নিয়েছিল?

—দেড় হাজার।

—কী সর্বনাশ! ডাকাত নাকি লোকটা?—কপালে চোখ তুলল শোভনা।

—আর ঐ যে বুদ্ধমূর্তিখানা দেখছ, ওটা কিনেছিলেন এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। আমি গিয়েছিলাম কালীঘাট। বাড়ী ফিরতেই সিঁড়ির মুখ

থেকে ধরে নিয়ে এলেন এই ঘরে। 'ছাখ কী জিনিস একখানা! আসল শ্বেত পাথরের মূর্তি। দাম মোটে আড়াইশ।' চমকে উঠলাম, 'বল কি! ওটা যে পেটেণ্ট স্টোন্। সাড়ে তিন টাকায় বিক্রী হচ্ছে কালীঘাটের মোড়ে।' শুনেই ছুটলেন সে লোকের খোঁজে। সে কি আর তখন বসে আছে ওঁর জন্যে ?

একটা বড় ড্রেসিং টেবিল দেখিয়ে বললেন রায়গিন্নী,—এটা যে দিন কিনতে যাই, কি মজার কাণ্ড শোন। আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে গেলেন সেই সাহেব পাড়ায়। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। 'এস, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক', বলে ঢুকে পড়লেন এক রেস্তোরাঁয়। আমি তো ভয়ে মরি! চারদিকে খালি সাহেব মেম। একটা কোণ বেছে বসলাম আমরা। মাছ-মাংস চলবে না, খাবার কথা শুধু আইসক্রীম্। কী খেয়াল হল, বলে বসলেন, 'দাঁড়াও, নতুন ধরণের নিরিমিষ কিছু নেওয়া যাক্ ঐ সঙ্গে।' বয় মেনু নিয়ে এল। পেন্‌সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিলেন। খাবার যখন এল, উনি চান আমার দিকে, আমি চাই ওঁর দিকে। দু'ডিস জোড়া এই বড় বড় দুই ট্যাঁড়স!

—ট্যাঁড়স! হেসে গড়িয়ে গেল শোভনা।

—হ্যাঁ; গোটা ট্যাঁড়স সেদ্ধ, বেশ করে সাজিয়ে দিয়েছে ডিসের ওপর। বয় আসতেই রেগে উঠলেন, 'এটা কী এনেছ ?'

—'আজ্ঞে, লেডিস ফিঙ্গার। তাই তো অর্ডার ছিল আপনার', বলে দেখিয়ে দিল পেন্সিলের দাগ। চারদিক থেকে লোকগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তথ্‌খনি বিল চুকিয়ে মানে মানে সরে পড়লাম।

ফেরবার পথে বললেন গাড়ীতে বসে—'মনে করলাম, নামটা যেমন মিষ্টি, জিনিসটাও আ-মরি-গোছের হবে নিশ্চয়ই। লেডিস্ ফিঙ্গার মানে যে ট্যাঁড়স তা কেমন করে জানবো! যেমন বিটকেল জাত, তেমনি ব্যাটাদের ভাষা!'

ইংরেজী তো শেখেন নি, আর একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন রায়গিন্নী। প্রথম প্রথম নাম লিখতেও জানতেন না। এদিকে অত বড় রাজার ম্যানেজারি পেয়ে গেলেন। বড় টাইপ করা চিঠি সই করতে হবে। কী করেন ? ছেলেকে ডেকে বললেন, আমার নামটা লিখে দে তো একটা কাগজে। খোকা লিখল, এন্ এন্ রায়। তার ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যা হোক একটা দাঁড় করালেন। কাজ চলে গেল। সই তো অনেকেরই পড়া যায় না। তারপর ছেলের কাছেই শিখতে সুরু করলেন এ, বি, সি, ডি। বেশী দূর এগোতে পারেন নি। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে কথাবার্তা হিন্দীতেই চালাতেন। চিঠিপত্তর পড়ে

শোনানো আর উনি যেমন যেমন বলে দিতেন, সেইভাবে মুসাবিদা করে উত্তর লিখে টাইপ করতে পাঠানো—এ সব কাজের ভারও ছিল খোকার হাতে। এই জন্যেই ওকে চাকরি করতে দেন নি। ওকালতি পাস করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

এই সব কথা বলতে বলতে কোথায় যেন ডুবে যেতেন রায়গিন্নী। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন,—তবু একটা জীবনে কী না করে গেছেন। এই যা কিছু দেখছ, সব এক হাতের গড়া।

শোভনা গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনত। ভারী অদ্ভুত লাগত এই ভেবে, অত বড় শ্বশুর তার, তাঁর জীবনেও ছোট ছোট মজার কাহিনীর অন্ত নেই! সব বড় লোকের জীবনেই বোধ হয় এমন ধারা ঘটে, বাইরের লোক তার খবর রাখে না।

এমনি আস্তে আস্তে খানিকটা খানিকটা করে শ্বশুরের সব কথাই জানতে পারল শোভনা।

বরিশাল জেলার কোন এক গ্রামে গরীবের ঘরে নগেন রায়ের জন্ম। ছেলেবেলায় বাপ-মা দুই-ই মারা যান। কাকার সংসারে দিনগুলো সুখের ছিল না। গ্রামের পাঠশালায় দিন কয়েক বাংলা আর ধারাপাত পড়েছিল। ঐ পড়া পর্যন্তই। শেখাটা বেশী দূর এগোয় নি। তার চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিল মাছ ধরতে, খোল বাজাতে আর তাসের আড্ডায় তামাক টানতে। একদিন এই শেষের বিদ্যাটা কাকার চোখে পড়তেই নগদ পুরস্কার জুটল বেশ গোটা কয়েক খড়মের ঘা। পিঠের দাগ হয়তো একদিন মিলিয়ে যেত, কিন্তু মনে যে দাগ পড়ল তা সহজে মিলতে চাইল না। তার দুই দিন পরেই ভোর রাত্রে ঘর ছাড়ল নগেন রায়। কত আর বয়স তখন? চৌদ্দ-পনেরো হবে। স্টীমারের কেরাণীর সঙ্গে ভাব ছিল। খুলনা পর্যন্ত বিনা ভাড়াতেই যাওয়া গেল। তারপর রেল। তার আগে পেটে কিছু পড়া দরকার। এদিকে পকেট গড়ের মাঠ। অগত্যা সোজা শহরের দিকে হাঁটতে সুরু করল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারী। ডাক্তারবাবু বসে বসে চা খাচ্ছেন। নগেন রায় ঢুকে পড়ে চেয়ার টেনে বসল। গভীরভাবে বলল, 'আমার জন্যেও এক কাপ আনতে বলে দিন স্যর! তার সঙ্গে কিছু খাবার।' ডাক্তারের চোখ তো ছানাবড়া। বেশ কিছুক্ষণ লাগল সামলাতে। তারপর বললেন, 'তোমাকে তো চিনতে পারছি না?'

—চিনবেন কেমন করে? আমি তো এখানকার লোক নই!

ডাক্তার গলায় ঝুলানো রবারের নলটা হাতে তুলে নিলেন। বাগিয়ে ধরবার আগেই রাস্তায় নেমে পড়ল নগেন। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা।

স্টেশনে ফিরে দেখল মস্ত বড় এক বরযাত্রীর দল চলেছে কলকাতা। ভিড়ে পড়ল তাদের মধ্যে। হাঁক ডাক করে জিনিসপত্র ধরে নামাল কুলীর মাথা থেকে, গুছিয়ে সাজিয়ে রাখল যেখানে যেটা মানায়। খাটতে স্থরু করল বাবুদের ফাই-ফরমাস। তামাক সেজে হুঁকোটা ধরিয়ে দিল কর্তার হাতে। কোন এক বড় স্টেশনে আসতেই জল বদলাবার নাম করে নেমে গেল। আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দিয়ে নিল কয়েকটা লম্বা টান। বর বেচারা খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছিল। বিয়ের দিনে তো খাওয়া চলে না। হাতের ইশারায় নামিয়ে নিয়ে গেল নগেন। দোকানের পিছন দিকে বসে পেট ভরে খাইয়ে দিল সিঙ্গাড়া, সন্দেশ আর চা। সেই সঙ্গে নিজের ব্যবস্থা যা হল তার পরিমাণটা বেশ গুরুতর।

বিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে নগেন একাই এক শ'! রান্না থেকে ভাঁড়ার, বাসর থেকে বৈঠকখানা চলল তার ছুটোছুটি। বরপক্ষ মনে করল কনের পক্ষের ছেলে; আর কনেপক্ষ ভাবল বরপক্ষের কুটুম্ব। খাতির-যত্ন পাওয়া গেল তু' তরফেই। পরদিন সকালে যখন জানাজানি হল, তার আগেই উধাও হয়ে গেছে নগেন রায়। টাকাকড়ি, জিনিসপত্তর সব ঠিক আছে। পাওয়া গেল না খালি খান তুই শান্তিপুরী ধুতি, একটা সিল্কের জামা আর এক জোড়া নতুন জুতো।

তারপর কেমন করে, কাদের চোখে ধুলো দিয়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি চড়ে হঠাৎ একদিন দেওঘরে গিয়ে উদয় হল নগেন রায়, সেও এক মস্ত বড় কাহিনী। সে কথা আরেক দিন হবে। তার পরের টুকু আজ বলে রাখি।

ওখানে ছিলেন ওর এক মাসতুতো ভাই। এক টিকায়েৎ অর্থাৎ সাঁওতাল রাজার সদর কাছারির নকলনবিশ। তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠল নগেন। ক'দিন পরে তিনিই নায়েববাবুকে বলে-কয়ে ঢুকিয়ে দিলেন চাকরীতে। তহ্‌শিলদারের পেয়াদা। মাইনে পাঁচ টাকা; তার সঙ্গে খাওয়া পরা। কাজ হল সাঁওতালদের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা, মনিবের ফরমাস খাটা, রান্নাবান্না করা, আর দরকার মত মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে করে তার সঙ্গে খাজনা আদায় করে বেড়ানো। দেখতে দেখতে সাঁওতালী ভাষাটা বেশ রপ্ত হয়ে

গেল। শুধু ভাষা নয়, আপন জনের মত জানতে চাইল ওদের মনের খবর ; ওদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ।

আগের সব পেয়াদাদের বাইরে ভয় আর মনে মনে ঘৃণা করত সাঁওতালেরা। নগেন রায় পেল ওদের ভালবাসা আর বন্ধুত্ব। এতে করে লাভই হল রাজ সরকারের। অনেক বেয়াড়া প্রজা, যারা কোনদিন বাগ মানেনি, তারা রীতিমত খাজনা দিতে সুরু করল। আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক গুণ। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন টিকায়েতের ম্যানেজার। কয়েক মাস যেতেই পেয়াদা থেকে তহশিলদার হল নগেন রায়। তারপর ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে মুহুরি, নায়েব এবং সহকারী ম্যানেজার। শেষটায় একেবারে শেষ ধাপ ডিঙ্গিয়ে পুরোপুরি ম্যানেজার মিস্টার এন. এন. রায়। সাঁওতাল রাজা কিছু দেখেও না, বোঝেও না। ম্যানেজারই হল আসল রাজা।

—ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।—গর্বের সঙ্গে বললেন রায়গিন্নী, দশটা বছর ডাঁটের সঙ্গে রাজত্ব করে গেছেন। বাড়ী, গাড়ি, টাকাকড়ি, লোকজন, তার সঙ্গে 'রায় বাহাদুর' খেতাব। কোনদিকে কোন অভাব রেখে যাননি।

সবই দেখল শোভনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দিলেন শাশুড়ী। বাকী রইল শুধু একটা ঘর। তেতলায় ঠাকুর দালানের পাশে। কোনদিন নিয়ে যান নি বৌকে। সে তালাটাও কখনো খুলতে দেখেনি শোভনা। ওখানে কী আছে? জানতে তার ভারী কৌতুহল। কিন্তু নিজে থেকে যখন দেখালেন, না, বলতে কেমন বাধো-বাধো লাগে। গেল কয়েকদিন। শেষটায় আর থাকতে পারল না। হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো! ক'দিন আর চেপে রাখবে পেটের কথা? ঠাকুর দালানে বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞেস করে বসল,—ও ঘরটায় কী আছে, মা? রায়গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন,—আজ থাক্ মা, আরেক দিন দেখো। শুধু দেখালে তো বুঝবে না, বলতেও হবে অনেক কিছু।

তারপর একদিন নিজে থেকেই বললেন সব কথা।

—দেশ শুদ্ধ সাঁওতাল একবার ক্ষেপে গিয়েছিল জান তো? লোকে যাকে বলে সাঁওতাল বিদ্রোহ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ; বইতে পড়েছি।—মাথা নেড়ে বলল শোভনা।

—আর আমরা চোখে দেখেছি। বইতে আর কতটুকু লিখেছে? সে যে কী জিনিস, না দেখলে ধারণা করা যায় না। এমন শান্তশিষ্ট জাত, কাজে

গাধার মত খাটে ; ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে জানে না। কাজ যখন থাকে না, দল বেঁধে নাচে, গায়, বাঁশী বাজায় আর প্রাণ ভরে হাড়িয়া টেনে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। তারাই একদিন রুখে উঠল তীর, ধনুক আর বর্শা নিয়ে। যাকে দেখে তাকেই মারে, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। অথচ কী যে হয়েছে বেশীর ভাগ লোকই জানে না। সর্দার বলেছে, ব্যস্! সর্দারদেরও জানা নেই সব কথা।

একটুখানি থেমে, সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর উপর যেন একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন রায়গিন্নী,—যুদ্ধ লেগেছে পশ্চিমে। মোসানটেমিয়া না কী দেশ সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। নতুন রাস্তাঘাট তৈরী করতে সক্ষম হবে, পুল বানাতে হবে, হাজার হাজার কুলী চাই। সাঁওতালের মত কাজের লোক পাবে কোথায় ? তাই ইংরেজ সরকারের হুকুম এল আমাদের রাজার উপর—কুলী পাঠাও। তোমার শ্বশুরকে ডেকে পাঠালেন লাটসাহেব। চাপিয়ে দিলেন কুলী জোটাবার ভার আর তার সঙ্গে এক বোঝা আনকোরা নতুন নোট। বললেন, টাকার জন্যে ভাববেন না, দরকার হলে আরো দেবো। হুকুম মানতেই হবে। গ্রামে গ্রামে আড়কাঠি লেগে গেল। অনেকেই ভিড়ল চকচকে টাকার লোভে। কোথাও কোথাও বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। তখন চলল জোর-জুলুম। সেখান থেকেই সুরু হল গণ্ডগোল। তারপর, যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যেও একদল মেয়ে-পুরুষ কী সব হাঙ্গামা বাধিয়ে গুলি খেয়ে মরল। কতকগুলো পালিয়ে এসে রটিয়ে দিল, ওখানে অনেক কষ্ট—খাওয়া-পরার কষ্ট, থাকবার কষ্ট, মেয়েদের মান নেই। তা ছাড়া কথায় কথায় মারধোর, গুলিগালাজ। এই সব শুনে বেঁকে বসল সাঁওতালরা। কুলী আর পাওয়া যায় না। আড়কাঠিরা মার খেয়ে ফিরে এল। খুনও হয়ে গেল জনকয়েক। সরকারী লোকও মারা পড়ল কিছু। ধর-পাকড় সুরু হতেই গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। উনিও জড়িয়ে পড়লেন। এত যে ভালবাসত ওঁকে, সব কোথায় তলিয়ে গেল! গোপনে খবর এল—ফাঁক পেলে ওঁকেও তারা ছাড়বে না। কথাটা আমার কাছে চেপে গেলেন।

মাঝে মাঝে বড় বড় বস্তিতে সভা ডেকে উনি গিয়ে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন। এমনি এক সভায় যাচ্ছিলেন একদিন। শালবনের ভিতর দিয়ে পাল্‌কী চলেছে। আগে পিছে পাইক বরকন্দাজ। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল। পাল্‌কী থামিয়ে নেমে এসে দেখলেন, পিঠের মাঝখানে বিঁধে গেছে

সাঁওতালী তীর। মারাত্মক বিষ থাকে তার ফলায়। একবার বিঁধলে ধন্বন্তরী এসেও বাঁচাতে পারেন না। হঠাৎ সোরগোল কানে যেতেই দেখা গেল, শালবন ভেঙ্গে জোয়ারের মত ছুটে আসছে বিশাল দল। চোখের নিমেষে পাল্কী-বেয়ারা, পাইক বরকন্দাজ যারা ছিল, সব কোথায় মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন উনি একা। লোকগুলো খানিকটা কাছে আসতেই চেঁচিয়ে বললেন,—খবরদার! আর এক পা এগোলেই গুলি করবো।—বলে পকেটে হাত দিলেন। প্রথমটা ওরা একটু থমকে গেল। তারপরেই আবার হট্টগোল করে এগিয়ে আসতে লাগল। আর দেরী করা যায় না। পকেটে যে জিনিষটা ছিল উঁচিয়ে ধরে উনিও মরিয়া হয়ে ছুটলেন ওদের দিকে, চিৎকার করে বললেন,—এখনো বলছি, সরে যা; নইলে গুলি করবো। ঠিক সেই সময় সাঁ করে একটা তীর বেরিয়ে গেল ওঁর ঠিক কানের পাশ দিয়ে। তখনো উনি তেমনি হাত উঁচিয়ে সমানে এগিয়ে চলেছেন সেই মারমুখী লোকগুলোর দিকে।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল,—পিস্তল! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে সেই শ'পাঁচেক লোক একেবারে হাওয়া। দশ মাইল হেঁটে উনি বাড়ী ফিরে এলেন।

এতক্ষণে যেন নিঃশ্বাস পড়ল শোভনার। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শ্বাশুড়ী বললেন,—চল, ওপরে চল।

এতদিন যে তালা সে খুলতে দেখেনি, শ্বাশুড়ীর হাত থেকে চাবি ছিনে নিয়ে আজ নিজেই সেটা খুলে ফেলল। সামনেই বেদীর উপর একটা কাঠের বাক্স। রায়গিন্নী ডালাটা তুলে বললেন,—এইটাই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেদিন।

শোভনা ভিতরে একবার উঁকি মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—ও মা, এ যে একটা তামাকের পাইপ! কিন্তু কত বড়!

—হ্যাঁ, অনেকটা তামাক ধরবে বলে অর্ডার দিয়ে করানো। সেই ছেলেবেলার হুঁকোর নেশা তো!

ভীষণ হাসি পেল শোভনার। কিন্তু গলাটা চড়িয়েই হঠাৎ থেমে গেল শ্বাশুড়ীর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে।

রায় গিন্নী বললেন,—একে প্রণাম কর, বৌমা। বেথুন কলেজের বি, এ, পাস করা মেয়ে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল সেই পাইপটার সামনে।



লাইন দেওয়ার দেশে • শ্রী মনোজিৎ বসু

হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম লাইন দেওয়ার দেশে
সেই কথাটা ভেবে এখন, মরছি হেসে হেসে।

সবাই মিলে হাসেন সেথা লম্বা করে লাইন,
অমনি করেই হাসির রেওয়াজ, এই সেখানের আইন।

বৌ-ঝিরা সব ঝগড়া করে এমনি লাইন করে,
রাস্তা-ঘাটে চলছে এমন অষ্ট-প্রহর ধরে।

চুল কাটে সব লাইন দিয়ে, কামায় মুখের দাড়ি,
লাইন করে খোঁজেন সবাই কোথায় ভাড়া-বাড়ি।

দেখে এলাম বর-কনে সব করছে মজার বিয়ে,
লাইন ধরে ছাদ্‌নাতলায় টোপর মাথায় দিয়ে।

গদ্য করে পদ্য লেখেন লাইন দিয়ে কবি,
শিল্পীরা সব তেমনি করে আঁকেন ডিমের ছবি।

দেখে এলাম সেই দেশেতে সব কিছুতে লাইন,
আইন ভঙ্গ করলে নাকি আড়াই টাকা ফাইন।

নাচতে হলে লাইন লাগায় কিংবা পেলে হাঁচি,
লাইন সেথায় দিতেই হবে, নেহাৎ কেন' মাছ-ই।

পান সাজে সব লাইন দিয়ে, তেল মাখে সব টাকে,
গামছা পরে অমনি করে, ওষুধ লাগায় নাকে।

লাইন দিয়ে ওস্তাদেরা করেন কালোয়াতী,
রাত দুপুরে নস্যি নিয়ে মাথায় দিয়ে ছাতি।

কিন্তু এমন কাণ্ড কভু কেউ শুনেছ ভবে—
মোচার ঘণ্ট খেতে হলেও লাইন দিতে হবে।



রূপোর ডালে সোনার পাতা * শ্রী শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাপ মা তার নাম রেখেছিল টুনটুনি। মা তাকে আদর করে ডাকত খুদে টুনটুনি বলে।

খুদে টুনটুনি খুদেই আছে এখনও। কতই বা তার বয়স—নয় ডিঙিয়ে দশে পড়েছে বোধ হয়।

মার মিষ্টি মুখখানা তার এখনও একটু একটু মনে পড়ে যেন স্বপ্নের মত। বাবাকে কিন্তু তার মনেই পড়ে না।

কোন কুলে কেউ আর নাকি এখন নেই তার। এত বড় পৃথিবীতে খুদে টুনটুনি একবারেই একা।

কবে কেমন করে যে বেচারা তাঁতী আর তাঁতিনীর খপ্পরে পড়েছিল, তা সে জানে না। দয়া-মায়ার লেশও নেই তাদের মনে।

দু'বেলা দু'বাটি সাতবাসী পান্তা আর এক ছিটে নুন তাকে খেতে দেয় আর উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটায়।

চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, কাপড় ধোলাই করে বেলনে পরিপাটি করে গুটিয়ে রাখা, তারপর আবার হেঁসেল তোলা, বাসন মাজা, কাঠ কাটা, গোয়াল কাড়া—গেরস্থালীর সব কাজই সে করে মুখ বুজে। তবু একটা মিষ্টি কথা নেই তাদের মুখে।

পান থেকে চুন খসলেই দেখে কে তাদের তম্বি! তাঁতী চোখ লাল করে বলে,—মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয় অমন হাবাতে মেয়ের। তাঁতিনী ঝাঁটা হাতে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। মুখ ভেংচিয়ে বলে,—খেংরিয়ে ভেঙে দিতে হয় ও পোড়ার মুখ।

এইভাবে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দিন যায় বেচারা টুনটুনির।

তাঁতী আর তাঁতিনীর ছিল তিন মেয়ে। বড় মেয়ে এক-চোখো, মেজ মেয়ে দু-চোখো আর সবার ছোটটি তে-চোখো।

তিনটি মেয়ে তিন কুঁড়ের ধাড়ী। সংসারের কুটোটুকু ছিঁড়ে দু'খান করে না। কেবল বসে বসে খায় আর পায়ের ওপর পা দিয়ে রাজা উজীর মারে।

একদিন হয়েছে কি—তাঁতীর ধবলী গাইটাকে টুনটুনি রোজ যেমন নিয়ে যায়, সেদিনও তেমনি মাঠে নিয়ে গেছে চরাতে। গাইটাকে সে প্রাণ ঢেলে ভালবাসত আর গাইটাও যেন বুঝত তা। টুনটুনির যত কিছু দুঃখের কথা হত ধবলীর সঙ্গে।

সেদিন টুনটুনি ধবলীর গলা জড়িয়ে খুব আদর করে বললে,—ধবলী ভাই, আর যে পারি না নিত্যি ওদের জুলুম সহ্য করতে। হাড় কালি হয়ে গেল দিনভোর খেটে খেটে, তবু মন পাই না ওদের।...সারাদিন কেবল মুখঝামটানি আর বেদম মার। খিদে পেলে যদি কাঁদি, তাহলে আর রক্ষে নেই।... একরাশ তুলো দিয়েছে। কালকের মধ্যেই কাটনা কেটে, তাঁত বুনে, বোনা কাপড় ধোলাই করে বেলনে গুটিয়ে ফেলতে হবে।...কেমন করে করি বল তো ধবলী ভাই? বলতে বলতে ছলছল করে উঠল তার দুটি চোখ।

ধবলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—কিছু ভেবো না টুনটুনি ভাই।... তুমি একটা কাজ কর- আমার একটা কানের মধ্যে সুড়সুড় করে সেঁধিয়ে যাও আর বেরিয়ে পড় আর এক কান দিয়ে। ব্যস, তাহলেই তোমার সব কাজ ফতে। আর কিছুই করতে হবে না তোমাকে।

টুনটুনি তো শুনে অবাক। বললে,—সত্যি?

ধবলী বললে,—হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, যা বলছি তা করেই দেখ না একবার।

ধবলী যেমন যেমন বলেছিল, টুনটুনি তখন ঠিক তাই করলে। তার এক কানের মধ্যে ঢুকে পড়ল আর বেরিয়ে এল আর এক কান দিয়ে।

বেরিয়েই দেখে, তাই তো, সত্যিই তো; আগে যেখানটায় সে তুলো রেখে দিয়েছিল, সেখানে তুলোর বদলে রয়েছে তাঁতে বোনা একখানা চমৎকার ধোলাই-করা ধবধবে কাপড়, বেলনে দিব্যি করে জড়ান।

দেখেই তো সে আহ্লাদে আটখানা! খুশিতে নাচতে নাচতে সে বেলনে জড়ান কাপড় নিয়ে সটান তাঁতিনীর সামনে গিয়ে হাজির।

তাঁতিনীর হাড় তো জ্বলে গেল তাকে দেখে। সে আর কিছু না বলে, মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করে কাপডটা একটা পেঁটরার মধ্যে তুলে রাখলে আর টুনটুনিকে আরও বেশী তুলোর কাঁড়ি দিয়ে ধমক দিয়ে বললে,—যা, এগুলো নিয়ে যা।···আর একখানা বেশ মিহি কাপড় বুনে ফেলবি আরও তাড়াতাড়ি। দেরি হলে তোর হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করব, মনে থাকে যেন।

টুনটুনি সেই তুলোর কাঁড়ি নিয়ে ছুটল ধবলীর কাছে। ধবলীর কথামত সে আবার সেই আগের মত তার এক কান দিয়ে ঢুকল আর অন্য কান দিয়ে এলো বেরিয়ে। তারপর তুলোর বদলে বেলনে জড়ান ধবধবে তাঁতের কাপড় নিয়ে ফিরে এলো তাঁতিনীর কাছে।

তাঁতিনী মুখ হাঁড়ি করে কাপড়টা পেঁটরার মধ্যে তুলে রেখে আবার একগাদা তুলো নিয়ে টুনটুনিকে বললে,—বেশ ভাল একখানা কাপড় বুনবি এবার। দেরি করবি না কিংবা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কাজ খারাপও করবি না। কাপড় মনের মত না হলে, তোর একদিন কি আমারই একদিন।

টুনটুনি সেই তুলোর গাদা নিয়ে হাজির হল ধবলীর কাছে।

এইভাবে দিন যায়। তাঁতিনী টুনটুনিকে কাঁড়ি কাঁড়ি তুলো দিয়ে যত জব্দ করতে যায়, ততই জব্দ হয়ে যায় সে নিজে।

শেষে একদিন সে তার বড় মেয়ে এক-চোখোকে ডেকে বললে,—

কুঁড়ের ধাড়ী সে হাবাতে মেয়েটা কি যে করে মাঠে গিয়ে,
কাটনা কাটে কে, তাঁত কে চালায়, কাপড় কে ছায় গুটিয়ে,
এক-চোখো সোনা, দেখে আয় তো মা, তার সাথে সাথে গিয়ে।

মার কথা শুনে এক-চোখো টুনটুনির সাথে একদিন সকালে গেল মাঠে।

একেই তো সে ঘুম-কাতুরে, তার ওপর শীতের সকাল, উঠতেও হয়েছে ভোর-ভোর। তখনও ঘুম লেগে রয়েছে তার চোখে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর বসে বেশ আরাম করে রোদ পোয়াতে পোয়াতে তার ঢুলুনি এলো। সে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল।

তাই দেখে টুনটুনি তার চোখের ওপর হাত নেড়ে নেড়ে সুর করে বলল,—

এক-চোখো দিদিমণির এক চোখ ভরি
ঘুম দাও, ঘুম দাও, ওগো ঘুম-পরী।

যেমনি এই কথা বলা, অমনি রাজ্যির ঘুম নেমে এলো তার চোখে। সে চোখ বুঁজিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই ফাঁকে টুনটুনি রোজকার মত ধবলীর এক কানে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে এলো আর দেখলে তার তুলো থেকে তৈরী সুতোয় বোনা ধবধবে পরিষ্কার একখানা তাঁতের কাপড় পরিপাটি করে জড়ান রয়েছে বেলনে।

সে তখন সেই কাপড় এনে দিল তাঁতিনীর হাতে।

তাঁতিনী দেখলে তার বড় মেয়েকে দিয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হল না। তাই এবার সে মেজ মেয়ে দু-চোখোকে ডেকে চুপিচুপি বললে,—

কুঁড়ের ধাড়ী সে হাবাতে মেয়েটা কি যে করে মাঠে গিয়ে,
কাটনা কাটে কে, তাঁত কে চালায়, কাপড় কে ছায় গুটিয়ে,
দু-চোখো সোনা, দেখে আয় তো মা, তার সাথে সাথে গিয়ে।

এবার টুনটুনির সাথে মাঠে চলল দু-চোখো মেজ মেয়ে।

কিন্তু সেও ঘুম-কাতুরে কম না। এক-চোখো বড়দিদির মত সেও একটু পরে ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে শুয়ে পড়ল। তাই দেখে টুনটুনি তার চোখের ওপর হাত নেড়ে নেড়ে বললে,—

দুই-চোখো দিদিমণির দুটি চোখ ভরি
ঘুম দাও, ঘুম দাও, ওগো ঘুম-পরী।

তার মুখের কথা শেষ না হতেই দু-চোখোর চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল। দু'চোখ বুঁজে অঘোরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই সুযোগে টুনটুনি তার কাজ হাসিল করে নিলে; তারপর রোজকার মত বেলনে জড়ান ধোয়া ধবধবে তাঁতের কাপড় এনে দিলে তাঁতিনীকে।

মেজ মেয়েকে দিয়েও কোন কাজ হল না দেখে রাগে রি রি করতে করতে তাঁতিনী এবার পাহাড়প্রমাণ এক তুলোর বস্তা ধপাস্ করে চাপিয়ে দিলে বেচারা টুনটুনির মাথায়। দিয়ে বললে,—কাপড়ের বুনন যদি আরও মিহি আর ধোলাই যদি আরও ভাল না হয় তো তোর আদিখ্যেতা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব, এই বলে দিলাম।

তারপর সে তার ছোট মেয়ে তে-চোখোকে আড়ালে ডেকে বললে—

কুঁড়ের ধাড়ী ও হাবাতে মেয়েটা কি যে করে মাঠে গিয়ে,
কাটনা কাটে কে, তাঁত কে চালায়, কাপড় কে দ্যায় গুটিয়ে,
তিন-চোখো সোনা, দেখে আয় তো মা, তার সাথে সাথে গিয়ে।

এবার তে-চোখো চলল টুনটুনির সাথে।

মাঠে গিয়ে খানিকক্ষণ মনের আনন্দে সে রোদে খুব ছুটোছুটি লাফালাফি করল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলে ঘাসের ওপর।

টুনটুনির সেদিন কি জানি কি হল, তার চোখের ওপর হাত নাড়তে নাড়তে ভুল করে সে বললে,—

তিন-চোখো দিদিমণির দুই চোখ ভরি
ঘুম দাও, ঘুম দাও, ওগো ঘুম-পরী।

একথা যেমনি বলা অমনি তার দু'চোখ ঘুমে বুজে গেল বটে কিন্তু আর একটা চোখ দিয়ে পিটপিট করে দেখতে লাগল কেমন করে টুনটুনি ধবলীর এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে আসে, আর কেমন করে ভোজবাজির মত তুলোর বদলে বেলনে জড়ান তাঁতে বোনা কাচা ধবধবে কাপড় হাতে নিয়ে সে বাড়ি ফেরে।

তে-চোখোর মুখে সব কথা শুনে আর এতদিনে সব কথা জানতে পেরে তাঁতিনীর তো মহাফূর্তি!

সে তখনই তাঁতীকে বললে,—কালই নিকেশ কর বজ্জাতের ধাড়ী ওই গাইটাকে।

তাঁতী আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিল, তাঁতিনী ঝংকার দিয়ে উঠল,—না না, তুমি বাপু আর কাঁদুনি গাইতে এস না ওর

হয়ে। ...আর একদিনও দেরি না করে কালই খতম করে দাও ও পাপটাকে।

তাঁতী আর কি করে—মস্ত একটা ছোরা নিয়ে বসল সে শানাতে।

আড়াল থেকে তাই দেখে টুনটুনির চোখ তো চড়কগাছ। কাঁদকাঁদ হয়ে সে তক্ষুনি ছুটল মাঠে।

সেখানে গিয়ে ছলছল চোখে ধবলীর গলা জড়িয়ে ধরে সে বললে,—কি হবে ধবলী ভাই, তাঁতী যে কাল তোমাকে কেটে ফেলবে ঠিক করেছে। তাহলে কি হবে বল না। বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তাকে অমন করে কাঁদতে দেখে ধবলী বললে,—টুনটুনি ভাই, আমার জন্যে কেঁদ না।...যা বলি তাই শোন এখন। আমাকে যখন ওরা কেটে ফেলবে, তুমি তখন করবে কি—আমার হাড়গুলো সব একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে নিয়ে গিয়ে বাগানের এক কোণে পুঁতে দেবে। তারপর রোজ সেখানে জল দেবে তুমি !...কেমন—মনে থাকবে তো আমার কথা ?

সে কথার জবাব দিতে গিয়ে টুনটুনির গলা ভারী হয়ে এলো। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল সে।

তাঁতিনীর কথার নড়চড় হল না। তার কথা ঠেলতে না পেরে তাঁতী পরের দিন সকালেই কেটে ফেললো ধবলীকে।

টুনটুনি কাঁদতে কাঁদতে তার হাড়গুলোকে একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে বাগানে নিয়ে গিয়ে এক কোণে পুঁতে দিলে। আর রোজ সেখানটায় জল দিতে লাগল।

জল দিতে গিয়ে একদিন সে দেখল সেখানে একটা চারাগাছ হয়েছে। দিনে দিনে সেই গাছ যখন বড় হল, গাছ ছেয়ে গেল কনকচাঁপা ফুলে। টুনটুনি অবাক্ হয়ে দেখলে গাছের ডালগুলো সব রূপোর আর পাতাগুলো সব সোনার।

ঝিরঝিরে বাতাসে সেই ডালগুলো যখন দুলতে থাকে, রোদ্দুরে ঝকঝক করে সোনার পাতাগুলো, আর কনকচাঁপার গন্ধে ম-ম করে সারা বাগান, তখন সে কি শোভা ! বাগানের আশপাশ দিয়ে যে যায়, সে-ই থ হয়ে চেয়ে থাকে সেই গাছের দিকে।

একদিন কি হয়েছে—এক-চোখো, দু-চোখো আর তিন-চোখো তিন বোনে সেজেগুজে বেড়াচ্ছে সেই গাছতলায়। বাগানের ধার দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন এক পরমসুন্দর রাজপুত্র। তিন বোনকে সেখানে বেড়াতে দেখে রাজপুত্র খুনসুড়ি করে বললেন,—

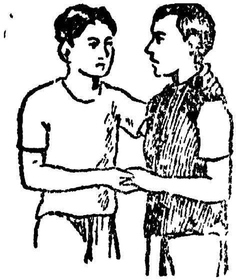
রূপোর ডালে সোনার পাতা, তিন কন্যা তার তলায়,
গাছের ফুল যে আনবে পেড়ে, মালা দেব তার গলায়।
ভিন রাজ্যের রাজার ছেলে, সূর্যসাক্ষী করছি পণ,
রাজার ঘরে রানীর আদর পাবে কন্যা আমরণ।

যে আগে ফুল তুলে আনতে পারবে সেই হবে রাজপুত্রের ঘরণী, রাজপুত্রের মুখে যেমনি এই কথা শোনা অমনি তিন বোনে ভোঁ দৌড়।

গাছের নীচের দিকের ডালে যে ফুলগুলো ফুটেছিল, মরি-বাঁচি করে ছুটে গেল তারা সেইগুলো তুলতে। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! যেই তারা হাত বাড়িয়েছে ফুল তুলতে অমনি সরসর করে ফুলভরতি ডালগুলো উঠে গেল তাদের নাগালের বাহিরে। ডালপালা ধরে তারা যত টানাটানি করে, ডালগুলো ততই কখনও যায় তাদের খোঁপায় আটকে, কখনও বা জামায়। দেখতে দেখতে জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, খোঁপা লণ্ডভণ্ড, হাত কেটে ছিঁড়ে রক্তে লালে লাল।

নাজেহালের একশেষ হয়েছে যখন তারা, তখন সেখানে এলো টুনটুনি। সে ধবলীকে মনে মনে একবার স্মরণ করে গাছের কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই সরসর করে নেমে এলো ফুলন্ত ডালগুলো। সে অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে রাজপুত্রকে দিলে।

তারপর একদিন খুব ধুমধাম করে টুনটুনির বিয়ে হয়ে গেল সেই রাজপুত্রের সঙ্গে। আজন্ম দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর এতদিনে সে রাজপুত্রের ঘরণী হয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।



দুঃখ শুধু এই

শ্রী প্রভাকর মাঝি

বলতে পারো আজ থেকে ঠিক।
হাজার বছর পরে,
কি হবে এই পৃথিবীতে।
কিংবা গ্রহান্তরে ?

পরীক্ষাতে ছেলেরা কি
ছুঁড়বে এটম্ বোম্
আমের গাছে উচ্ছে হবে
পটল গাছে গম ?

দেওঘরে নয় চাঁদের দেশে
চেঞ্জে যেতে যেতে
এক পয়সার টিকিটে লোক
চড়বে রকেটেতে ?

অয় অজগর সাপটা দেখে
দেড়-বছরের খোকা
আজের মতো আঁৎকে উঠে
বলবে কি আর বোকা ?

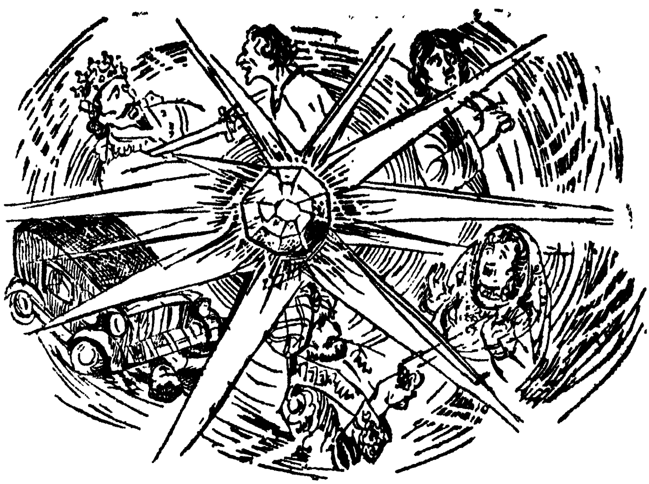




সোঁদরবনের বাঘ সিংহী
হিংসা ভুলে যাবে ?
ধ্যুত্তেরি ছাই, ম্যাপে সেদিন
সোঁদর বন কি পাবে ?

মাথার পরে জাগবে রবি।
থাকবে নীলাকাশ ?
করবে সাড়া মনকে, বিভেদ
আজের মতো ত্রাস ?

কি যে হবে, কল্পনাতে
পাচ্ছি না তার থেই :
দেখতে সেদিন থাকবো না কেউ
—দুঃখ শুধু এই।



এক যে আছে হীরে * শ্রী অমরনাথ রায়

এক যে আছে হীরে।

ভারী অপয়া হীরে।

যার কাছে সে যায়, তার দুঃখ আর দুর্ভোগের সীমা থাকে না। অনেক অনেকদিন আগে আমাদের দেশের মাটিতেই ঐ অপয়া হীরেটি জন্মেছিল। তখন কি আর লোকে জানতো যে হীরেটা ভারী অপয়া। জানলে ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে টাভার্নিয়ে সাহেব ওটাকে কিনে দেশে নিয়ে যাবেন কেন।

কিছুদিন পরেই টাভার্নিয়ে সাহেব ঐ হীরে কেনার ফল হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। তাঁর সংসারে সুখ বলে আর কিছু রইলো না। অসুখ-বিসুখে তাঁর অশান্তি দিন দিন বেড়েই চললো।

মস্ত বড় হীরে। আর দ্যুতিও তার তেমনি। দেখলে চোখ যায় জুড়িয়ে। অমন হীরে তো যে সে লোকে কিনতে পারে না। তাই টাভার্নিয়ে সাহেব যখন হীরেটিকে বেচতে গেলেন তখন এগিয়ে এলেন ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই।

সম্রাট লুই হীরেটা কিনলেন। অমনি তাঁর দেশে বিপ্লব আরম্ভ হলো। সম্রাট শান্তি তো পেলেনই না, উপরন্তু বিপ্লবীদের হাতে প্রাণটা হারালেন।

চোর-ডাকাতের উৎপাত সব দেশে সব কালেই ছিল। ফরাসী দেশেও ছিল। ফরাসী বিপ্লব চলা কালে সম্রাট লুইয়ের রাজকোষ হতে হীরেটি চুরি যায়। তারপর হাত বদল হয়ে সেটি আসে আমস্টারডামের এক বিখ্যাত মণিকারের হাতে। হীরের সঙ্গে দুর্ভাগ্যও নেমে আসে মণিকারের ঘরে।

অতো বড়ো আর অত সুন্দর হীরে দেখে মণিকারের ছেলে লোভ সামলাতে পারে না। বাপের লোহার সিন্দুক থেকে হীরেটি চুরি করে সে বেচে দেয় এক ফরাসী ভদ্রলোককে। ফরাসী ভদ্রলোকের নাম বোলিউ। বোলিউ যেদিন হীরেটি কিনলেন সেইদিনই মারা গেলেন। আর তার কিছুদিন বাদেই মণিকারের পুত্র আত্মহত্যা করলো।

বেচারি বোলিউ, বেচারি মণিকারের পুত্র! ভাবছ, এ সব বুঝি বানিয়ে বলছি। মোটেই তা নয়। সব সত্যি।

হাত বদল হয়ে হীরেটা এবারে এলো টমাস হোপ সাহেবের কাছে। হোপ সাহেবের কোন উন্নতি তো হলোই না বরং তাঁর অবস্থা দিন দিন Hopeless হতে লাগলো। শীঘ্রই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। আর তাঁর বংশধরেরাও হীরেটাকে বিদায় দিলেন।

এবারে বেশ কয়েক হাত ঘুরে ঐ অপয়া হীরেটি এলো এক রাজপুত্রের হাতে। রাজপুত্র ওটি কিনলেন এক মহিলাকে উপহার দেবার জন্যে। উপহার দিলেনও। কিন্তু তারপর কি হলো জান? রাজপুত্র কোন এক কারণে খুন ক'রে বসলেন ঐ মহিলাটিকে। কিন্তু নিজেও নিস্তার পেলেন না, ক্রুদ্ধ জনতার হাতে পড়ে প্রাণ হারালেন রাজপুত্র।

এবারে হীরে এলো এক গ্রীক বণিকের ঘরে। মন্থারাইডস নামে ঐ গ্রীক বণিক সেটিকে বিক্রী করলেন তুরস্কের সুলতানের কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই এক দুর্ঘটনা ঘটলো। মন্থারাইডস উঁচু জায়গা থেকে পড়ে মারা গেলেন।

এদিকে তুরস্কের সুলতান সাধের হীরেটি উপহার দিলেন তাঁর বেগমকে। বেগম তো বেজায় খুশি। কিন্তু হঠাৎ কি হলো কে জানে, বেগমকে গুলী করে মারলেন সুলতান নিজেই।

এমনিভাবে অনেক হাত ঘোরার পর অপয়া হীরেটি কিনলেন ম্যাকলিন নামে এক আমেরিকান ব্যবসায়ী। হীরে কেনার কয়েকদিন পরেই ম্যাকলিন সাহেবের ছোট ছেলেটি মারা গেল মোটর দুর্ঘটনায়। শোকটা একটু সামলে নিয়ে ম্যাকলিন সাহেবের স্ত্রী হীরেটা বেচবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু কে নেবে? ইতিমধ্যে সব জায়গায় রটে গেছে যে হীরেটা ভারী অপয়া। কেউ আর কিনতে সাহস করে না। না জানি কি দুর্ভোগ ঘটে ওটি কিনলে।

এমনিভাবে কতো লোকের যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছে ওই হীরেটি— তার ঠিক নেই। এই অপয়া হীরেটির নাম কি জান? নাম হচ্ছে 'হোপ'। টাস হোপ—যাঁর কথা একটু আগেই বলেছি—তাঁর নাম অনুসারেই হীরেটির নাম রাখা হয় 'হোপ'। এই অপয়া হীরেটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নীল আভাযুক্ত হীরে। ওজন ৪৪'৫ ক্যারাট।

অপয়া হীরে হোপ এখন পৃথিবীর কোন দেশে আছে, কার ক্যছে আছে তা জানি না। তোমরা একটু খুঁজে দেখ। যদি ওর সন্ধান পাও তো আমাকে জানতে ভুলো না যেন।

বুদ্ধের সমকালে জীবক ছিলেন অদ্বিতীয় চিকিৎসক। মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অভয় তাঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন জঞ্জালের গদায়। পরে জীবক চিকিৎসা-বিদ্যা শেখেন তক্ষশিলায়। অসাধারণ ছিল তাঁর বিদ্যা।

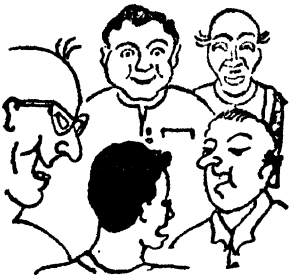
ভগবান বুদ্ধ একবার কৌষ্ঠবদ্ধতা রোগে আক্রান্ত হন। জীবক তাঁকে পদ্মফুল শুঁকিয়ে নিরাময় করেন।

সম্রাট বিম্বিসারের অর্শরোগ জীবক নিরাময় করেন।

উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতের ন্যাবা-রোগ জীবক আরাম করেন।

কাশ্মীরের এক বণিক পুত্রের অন্ত্র জড়িয়ে যায়, জীবক তার উদরে অস্ত্রোপচার করে তাকে আরাম করেন, সেজন্য বণিক তাঁকে ১৬০০ কহাপন প্রণামী দেয়।

সকেতে (শিয়ালকোট) এক শ্রেষ্ঠীর পত্নী পাগল হয়ে যায়। এক ঘৃতের নাসা দিয়ে জীবক তাকে সুস্থ করেন। শ্রেষ্ঠী জীবককে প্রণামী দেয় ১৬০০ কহাপন, গাড়ী ঘোড়া ও দুটি ভৃত্য।



হর হর বোম্ বোম্

*

শ্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বলল এসে এ জীবনে কয়ার কী বল আছে,
দীক্ষা নিয়ে হরকালী বোম্ বাবাজীর কাছে।
নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে চিলের ঘরে বসে
ধ্যানে বসে কল্‌কে নিয়ে টান দেন ভাই কসে।
বোম্ বাবাজী পরম্ সাধু, মস্ত বড় গুনী
থাকেন বসে কাঁটার পরে, সামনে জ্বেলে ধুনি।
জটায় ভরা মাথায়রে তার মস্ত সে কারখানা
পয়সা নিয়ে করেন টাকা, বানান টাকায় আনা।
আম গাছেতে জাম ফলান, জাম্ গাছেতে আতা,
কলা গাছে মন্ত্রগুণে, ফলান গোলাপ পাতা।
ভাবলে দেখে হরকালী, মন্ত্র ব্যাপার নয়
যা আছে মোর গুরুর কৃপায় দ্বিগুণ যদি হয়।
বললে—"গুরু, যা আছে মোর সকল কিছু নাও
দয়া করে মন্ত্রগুণে দ্বিগুণ করে দাও।"
টাকা কড়ি গয়না গাটি যা কিছু তার ছিল,
উজাড় করে গুরুর পায়ে সকল এনে দিল।
চক্ষু খুলে বোম্ বাবাজী একটুখানি হেসে,
কলকে নিয়ে হরদাদায় প্রসাদ দিলেন শেষে।
কলকে নিয়ে হরদাদা নিরালা কোন খুঁজে
টানতে থাকেন, কখন যে তাঁর চক্ষু এল বুজে।
দিনের শেষে আকাশ'পরে আঁধার এলো নেমে
চক্ষু খুলে হরকালীর কপাল উঠে ঘেমে
কোথায় বা তার বোম্ বাবাজী, গয়না গাটি টাকা
গাছের তলায় নেইকো রে কেউ সকল কিছুই ফাঁকা



অরণ্যের অধিপতি * শ্রী রাধারাণী দেবী

গভীর অরণ্য। অরণ্যের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে হাজার হাজার বছরের পুরোণো বিরাট বটবৃক্ষ—লক্ষঝুরি। একা লক্ষঝুরিই একটা অরণ্য যেন! তার ডালে ডালে—শাখায়-শাখায় হাজার-হাজার পাখ্-পাখালির বাসা—কোটি-কোটি কীট-পতঙ্গের গর্ত। তা' ছাড়া তার মোটা-মোটা ঝুরির ঘন অরণ্যে ঝুপ্সি আঁধারে বাস করে ক—ত জন্তু-জানোয়ার! বাঘ—ভাল্লুক—নেকড়ে—বরা থেকে—খরগোস্ বেঁজী বনবিড়াল পর্যন্ত।

লক্ষঝুরিকে মেনে চলে সারা অরণ্য! সমস্ত বৃক্ষ তরুলতা গুল্ম জীব-জন্তু পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ—সকলেই। লক্ষঝুরি ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষে নেই! একবার রেগে মাথা ঝাঁকুনি দিলে সারা অরণ্যে প্রলয় উপস্থিত হয়ে যায়।

লক্ষঝুরির মাথা থেকে নেমে আসা ঝুরিগুলিই এখন এক-একটা বিপুল বনস্পতির মত। তাদেরও কোটরে-কোটরে অজগর সর্প—কালফণী—পাতায়-পাতায় নানা পক্ষী—অঙ্গে-অঙ্গে শত-শত কাঠবিড়ালীর ওঠা-নামা ছুটোছুটির বিরাম নেই সমস্ত দিন।

এ—ই লক্ষঝুরির সবার চেয়ে—উঁচু শীর্ষে শিখরে—আগডালের মগ আগায়—সোনালী খড়ে রূপোলী ঘাসে সুন্দর বিনুনী করা বাসা বেঁধে বাস করতো এক—ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী।

ঘন অন্ধকারের কালো চাদর মুড়ি দেওয়া এক—গভীর নিশুতি রাত্রি।

চারিদিক স্তব্ধতার ভারী পাথর চাপা পড়ে নিথর—নিস্পন্দ। চাঁদহীন শোকাচ্ছন্ন আকাশে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্র শুধু ঝিম্-ঝিম্ করছে। জ্যোৎস্নাহারা গভীর অরণ্যে রাশি-রাশি অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে জমেছে। লক্ষঝুরির বিরাট প্রাসাদের মহলে-মহলে—একতলায় দোতলায় তেতলায় চারতলায়—কেবলি ফিস্-ফিস্ শব্দে বাতাসের চুপি চুপি মন্ত্রণা পরামর্শ চলেছে সারা রাত ভরে।

ব্যাঙ্গমা বলে—ব্যাঙ্গমী! জেগে না ঘুমিয়ে?

ব্যাঙ্গমী জবাব দেয়—আধ-ঘুমে আধ-জাগায়।—তুমি?

ব্যাঙ্গমা বলে—আমিও তাই। তার চেয়ে আয় গল্প করি।

ব্যাঙ্গমী বলে—বেশ তো।

ব্যাঙ্গমা বলে—ব্যাঙ্গমী! সে—ই যে বিজন দেশের রাজপুত্তুর ডান-হাতে সোনার তরোয়াল, বাম-হাতে হীরেমুখী বর্শা—নীল-রংয়ের পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে—তার হারানো ছোটবোনটিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল—মনে আছে তোর?

ব্যাঙ্গমী বলে—মনে আবার নেই? এমনি আজকের মতনই এক নিবিড় অমাবস্যার নিঝ্‌ঝুম্ রাতে রাজপুত্তুর এসে নীল ঘোড়া বেঁধেছিলেন না আমাদেরই এই লক্ষঝুরি মহাবটের প্রাসাদ-তলায়? সেই রাত্রে রাজপুত্তুর আমাদেরই এই বৃক্ষ-প্রসাদের দোতলার মহলে শুয়ে রাত কাটিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাঙ্গমী বলে—ঠিক। কিন্তু জানিস্ কি সে-বেচারা আজও দেশ-দেশান্তরে অরণ্যে-প্রান্তরে সাগরে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে হারানো বোনের খোঁজে?

ব্যাঙ্গমী গম্ভীর স্বরে বলে—জানি।

ব্যাঙ্গমা বলে—আরও কিছু জানিস্ কি?

ব্যাঙ্গমী জবাব দেয়—জানি বৈকি!

ব্যাঙ্গমা রাগ করে বলে—জানিস্ তো বল্ দিকি!

ব্যাঙ্গমী বলে—জানি তার সে হারানো ছোটবোন কোথায় আছে।

ব্যাঙ্গমা বলে—আমি তোর চেয়ে বেশি জানি।

ব্যাঙ্গমী বলে—শুনি।

ব্যাঙ্গমা চুপি-চুপি বলে—আমি জানি কোন্ উপায়ে রাজপুত্তুর হারানো রাজকন্যাকে খুঁজে পেতে পারেন।

ব্যাঙ্গমী বলে—বলো না—শুনব।

ব্যাঙ্গমা বলে—দেশ-দেশান্তর, সহর-গ্রাম, বন-মরুভূমি, সমুদ্র-পর্বত ছুটে-ছুটে কিছুই হবে না। এই মহা-অরণ্যের অধিপতি আমাদের লক্ষঝুরির তলায় তিনদিন তিনরাত্রি খাড়া দাঁড়িয়ে উর্ধ্ব-আকাশে চক্ষু মেলে তপস্যা করে লক্ষঝুরিকে প্রসন্ন করতে পারলে, লক্ষঝুরি তাঁর বিরাট কোটরের অধিবাসী সাতশো বছরের কালনাগকে হুকুম দেবেন তার মাথার মণি মাটিতে ফেলতে। সেই মণি নিয়ে যাত্রা করলে তবে হারানো রাজকন্যাকে খুঁজে পাবে।

ব্যাঙ্গমী আস্তে-আস্তে স্বর নীচু করে বলে—তা তো বটেই। রাজকন্যাকে তো জল-দৈত্য চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে এই মহা-অরণ্যেরই সাতরঙা হ্রদের জলের তলায়। সে হ্রদের জল সকালবেলায় থাকে নীল সোনালী রং, দুপুর-বেলায় হয় রূপোর রং আর ইস্পাতের রং, বিকেলবেলায় ময়ূরকণ্ঠি, আর সন্ধ্যাবেলায় হয় আবীর-কুকুম গোলা। রাত্রির আঁধারে কিন্তু সেই জলই হয়ে ওঠে কালির মতন কালো, নিকষ-নিতল!

রাজকন্যা অরণ্যে এসেছিলেন বসন্তের ফুল তুলতে সখীদের সঙ্গে। সাতরঙা হ্রদের জলে নেমে হাত বাড়িয়ে যেই লাল পদ্মফুল তুলতে গেছেন,—জলদৈত্য এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল জলের তলায় পাতালপুরীতে।

ব্যাঙ্গমা ফিস্-ফিস্ করে বলে—হ্যাঁ। ঐ হ্রদের জলের তলায় পাতালপুরীতে যাওয়া যেতে পারে একমাত্র ফণীর মণির আশ্চর্য আলোয়। লক্ষঝুরি যদি তপস্যায় তুষ্ট হয়ে কালনাগকে তার মাথার মণি মাটিতে ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন—তা' হলে রাজপুত্তুর হারানো ছোটবোন পেলেও পেতে পারেন।

আকাশ সাদা হয়ে ভোর হয়ে এলো। বাসা ছেড়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী উড়ে চললো উত্তর সাগরের মুখে।

লক্ষঝুরির সাতশো মহল প্রাসাদের এক কোণে বাস করতো হুগ্‌গো টুন্‌টুনি পাখী। এর কথা ওর কাছে, ওর বার্তা তার কাছে টুন্-টুন্ করে লাগানোই ছিল তার একমাত্র কাজ আর আনন্দ। সে রাত্রিবেলায় সন্তর্পণে কান পেতে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সমস্ত কথা শুনে নিয়েছিল। ভোর হতে না হতে হুগ্‌গো টুন্‌টুনি উড়ে চললো কুটো ঠোঁটে ধরে—সেই ধবল পাহাড়ের দিকে, যেখানে বিজন দেশের রাজপুত্তুর বামহাতে হীরামুখী বর্শা আর ডান-হাতে সোনার তরোয়াল নিয়ে খুঁজে ফিরছেন হারানো রাজকন্যাকে।

উড়ে—উড়ে—উড়ে—উড়ে—কত মাঠ—কত নদী পার হয়ে হুগ্‌গো টুন্‌টুনি এসে পৌছলো ধবল পাহাড়ের শিখরে।

ধবল পাহাড়—ধবল পাহাড় শুধু তুষারের রাশি—বরফের স্তূপ। সবুজের লেশ নেই—রঙের রেশ নেই। ঝরণাগুলি ঝরছে গলানো তুষার ধারায়—ঠিক যেন হিমেল দুধের ধারা। রাজপুত্তুর তখন শিখর পার হয়ে নেমে চলেছেন অন্য রাজ্যে—আরেক রাজার দেশে। নীল ঘোড়ার ক্ষুরে—সোনার নালে—তুষারের রাশি খোলায় খৈ-ভাজার মতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে উঠছে।

দুগ্‌গো টুনটুনি উড়ে এসে বসলো রাজপুত্তুরের কাঁধে। রাজপুত্তুর চমকে তরবারি খুললেন।

দুগ্‌গো-টুনটুনি রাজপুত্তুরের কানের মধ্যে মুখ দিয়ে বলে উঠলো…ভয় পেয়ো না। আমার নাম দুর্গা। একের খবর অন্যের কাছে পৌছে দিই বলে সবাই নাম দিয়েছে টুনটুনি। সকলেই আমাকে ডাকে দুর্গা-টুনটুনি—রাগ হলে লোকে গাল দেয় দুর্ঘটন-টুনি।

রাজপুত্তুর রাগ করে বললেন—তা' এখানে আমার কাঁধে চড়ে বসেছে কোন্ দুর্ঘটন ঘটাতে শুনি?

টুনি বললে—আমার নাম তুমি যদি শুভ-টুনটুনি করে দাও, তা' হলে তোমার হারানো বোনকে পাইয়ে দিতে পারি।

রাজকুমার ব্যগ্র হয়ে বললেন—এমন সুঘটন যদি ঘটাতে পারো, তোমার নাম দেবো আমি—সোনার টুনটুনি।

টুনি হেসে তখন টুন্-টুন্ টুন্-টুন্ করে রাজপুত্তুরের কানে-কানে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সমস্ত গল্পটি বললে।

রাজপুত্তুর বললেন—এখুনি যাবো আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের অরণ্যের অধিপতিকে তপস্যায় তুষ্ট করতে। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

টুনটুনি রাজপুত্তুরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এল নিজেদের অরণ্যে। রাজপুত্তুর লক্ষঝুরির তলায় দাঁড়িয়ে নিজের চারিধারে অগ্নিকুণ্ড জেলে উর্ধ্ব-আকাশে তাকিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। আহার নেই, শয়ন নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনদিন তিনরাত্রির স্থলে ছয়দিন ছয়রাত্রি কেটে গেল। সাতদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষঝুরি মহাবট সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আশ্রিত প্রজা কালফণীকে আদেশ দিলেন, তাঁর মাথার মানিক মাটিতে ফেলে দিতে। কালফণী মাটিতে মানিক ফেলতেই রাজপুত্তুরের চারিপাশের জলন্ত অগ্নি নিবে গিয়ে তার বদলে রাশি-রাশি সুরভি ফুল ফুটে

উঠলো। সারা অরণ্য জ্যোৎস্নার চেয়েও শীতল স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল এক আশ্চর্য আলোয় হেসে উঠলো।

ফণীর মণি কুড়িয়ে নিয়ে রাজপুত্র ছুটে চললেন সাতরঙা হ্রদের পানে।

মাণিকের আলোয় অরণ্যের কাঁটাবন ঘনবন ফাঁক হয়ে গিয়ে সুন্দর পরিষ্কার পথ আপনা-আপনি জেগে উঠতে লাগলো।

হ্রদের ধারে পৌঁছে রাজপুত্র দেখতে পেলেন, জলের মাঝে শত-শত পদ্মফুল ফুটে আছে। মানিকের আলোয় সেই পদ্মফুলগুলিকে অনেকগুণ বেশি প্রকাণ্ড দেখাতে লাগলো। রাজপুত্র অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, সেই সব পদ্মের বুকের ভিতর দিয়ে থরে-থরে সরু সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে—ধাপের পর ধাপে।

রাজপুত্র হাতের মুঠোয় মণি চেপে ধরে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলেন। সাঁতার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড পদ্মফুলের উপরে উঠে দেখলেন, মৃণালের মধ্য দিয়ে পাতালপুরীর তলায় দিব্য সরু সিঁড়ি। মণি হাতে রাজপুত্র সেই সিঁড়ি বেয়ে তর্‌তর্ করে নেমে চলে গেলেন পাতালপুরীর মধ্যে।

সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, স্ফটিকেরই ঘরে—স্ফটিকের খাটে—স্ফটিকের বালিশ মাথায় দিয়ে—তাঁর হারানো ছোটবোনটি গালে হাত রেখে শুয়ে-শুয়ে কাঁদছে! তার চোখের অশ্রু বিন্দুগুলি স্ফটিকেরই মালার মতন দেখাচ্ছে।

জল-দৈত্যকে হীরামুখী বর্শায় বিঁধে বধ করে—রাজকুমারীকে উদ্ধার করে বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজপুত্রের যে বেশি সময় লাগেনি, তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে পারবে। তাই এইখানেই আমার কথাটি ফুরোলো।

দিল্লীর মেহেরৌলি অঞ্চলে একটি লৌহস্তম্ভ আছে। সেটি ২৩ ফুট উঁচু, ব্যাস সওয়া ১৬ ফুট। স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। অনেক শতাব্দীর অনেক জলঝড় তার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আজ অবধি লোহার গায়ে মরিচা ধরেনি। ধাতুবিদ্যায় এ এক মহাবিস্ময়।



অবাক

*

শ্রী নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার।

আগুন! আগুন!—চেঁচায় দীনু ফিরতি পথে বাজার করে
শুনেই রামু ছুটল ভীষণ শুধায়—আগুন কোথায় ওরে?
বললে দীনু—আগুন! আগুন! জ্বলছে কোথায় শুনবি তা কী?
দেখ না গিয়ে বাজার ঘুরে প্রমাণ পাবি সত্যি না কী!
আগুন লাগে কাপড় জামায় দর শুনলে চমক লাগে!
শাক-সব্জি তাতেও আগুন—বলেই মধু সটান ভাগে!
আগুন লাগে ভেটকি, ইলিশ, হাঁসের ডিমে, চিংড়ি মাছে,
জানায় শশী—শুনলে সে দর চক্ষু উঠে চড়ক গাছে!
আগুন জ্বলে সর্ষে তেলে, ঘি আর মাখন, চিনি, চালে!
বললে বিধু দুঃখে বড় হাতটি তাহার দিয়ে গালে।
সবাই বলে—আগুন! আগুন! আগুন তখন সত্যি ওরে!
ফায়ার ব্রিগেড দিইনা ডেকে! —বলেই রামু ছুটল জোরে।
সঙ্কেতটা দিতেই সেথা ফায়ার ব্রিগেড পড়ল এসে।
খুঁজতে থাকে কোথায় আগুন জ্বলছে এমন সর্বনেশে!
'ফায়ার ব্রিগেড'—হাসল রামু, বলল—কোনও পাওনি খবর?
আগুন জ্বলে সব বাজারে দেখছো না কী তাহার বহর?
নিভিয়ে দিতে পারবে নাকী পাইপ দিয়ে ঠাণ্ডা জলে?
অবাক! তারা প্রশ্ন শুনে ভাবল খানিক কৌতুহলে!



পুষ্পকরথে পিসিমা * শ্রী শামুক

নেহেরু পুলের ওপর টংগা দুলে দুলে উঠতেই পিসিমা দু'হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে,—আহা, এই বুঝি তোদের সবরমতী? কি ছিরি করে রেখেছিস্ রে? গঙ্গার দেশের মানুষ কিনা, নদীতে পুরো জল না দেখলে মন খারাপ লাগে।

—এ দেশের মত বৃষ্টি হলে তোমার গঙ্গা নদীও হামাগুড়ি দিয়ে পার হওয়া যেত।

—ও কথা বলিস্ নে বাপু, মার মাহাত্ম্যই আলাদা।

আবার যোড় হাত কপালে ওঠে। এবারে অবশ্য মা-গঙ্গার উদ্দেশ্যে।

দ্বারকার তীর্থ সেরে ফেরার পথে আমেদাবাদে আমার কাছে নেমেছে। দলের কয়েকজন সোজা বোম্বাই গেল আত্মীয়দের বাড়ি। ঠিক হল দিন পনেরো পরে আমিও পিসিমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শহর দেখিয়ে দলে ভিড়িয়ে তুলে দেব গাড়িতে।

তোদের পোড়া দেশ 'এটা পাওয়া যায়', 'ওটা মেলে কি'—করে অল্প সময়েই রান্নাঘরটি নানা সরঞ্জামে ভরে গেল। আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চব্য—চোষ্য—লেহ্য—পেয়-র চলল মিছিল। আর আমার জিভটি জলের

মাছের মত সারাক্ষণই মুখের ভেতর পরমানন্দে ওল্‌টায় পাল্‌টায়। আশ্চর্য, এতোটুকুও বিরাম চাইল না। বহুদিনের অভ্যাস নেই তো—তবুও!

সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। অদৃষ্ট মন্দ না হলে এমন হয় কি? সকালে খবরের কাগজ পড়ছি আর গন্ধ শুঁকছি। চা খাবার সময় রান্নাঘরে উঁকি মেরে আয়োজনের আন্দাজ নিয়ে এসেছি কিনা। মূলোর শুক্‌তোর গন্ধ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করা থেকেই প্রাণ আইঢাই করছে—আহা, কখন হবে সময়। এবারে নারকেল-কুমড়ির ছ্যাঁৎ—সাঁতলানোর আওয়াজ শুনে আর মুখের জল সাম্‌লানো যায় না, গরম মশলার গন্ধ মাথা গরম করে দেয়।

কাগজে মন বসে না। কংগোর একঘেয়ে খবরে কোন রঙ্গ খুঁজে পাই নে। আহা, লুমুম্বা ও কাসাভুবুর যদি স্বয়ং বিভুর কৃপায় পিসিমা থাকতো তো এই দাঁতকপাটি লাগানো রাজনীতিক কবাডি খেলা ছেড়েছুড়ে রসের মাঝ দরিয়ায় এতক্ষণে আমারই মত হাবুডুবু খেত।

—তার বাবুজী!

তার পড়ে মেজাজ বিলকুল বেতার হয়ে গেল। আগেই বলেছি, কপাল মন্দ ছাড়া আর কি। কলকাতা থেকে হুকুমনামা। পিসিমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উড়ে চলে এস, রাণুর বিয়ে। জামাইকে বিয়ে করেই বিলেত যেতে হবে, তাই হঠাৎ সমস্ত ঠিক।

রাগে, দুঃখে বেড়ালের মত খানিকটা গর্ গর্ করি। বিয়ে করেই জাহান্নামে যাক না, কে বারণ করছে? অবশ্য জাহান্নামের মানে করলাম যে এই পৃথিবীতে খুব জঘন্য কোন জায়গা, যেখানে বর্তমানের পুরো শরীর নিয়েই যাওয়া যাবে।

পরে মনকে সান্ত্বনা দি, পিসিমা বুড়ো বাতিকওয়ালা বিধবা মানুষ, নিশ্চয় উড়োজাহাজে যেতে রাজী হবে না। আর রেলগাড়ীতে পৌছানো যাবে না বিয়ের দিন। সুতরাং—

কিন্তু পিসিমা শুনে গদগদ হয়ে বলে, দেখ, তোকে সব কথাই খুলে বলি। তোদের পুষ্পকরথে চড়বার ইচ্ছে অনেক দিনই হয়েছে।

জামা পরে তখুনি টিকিটের জন্যে বেরুবার পথে কপি-কড়াইশুঁটি-বড়ি প্রভৃতি দেওয়া ঝালের ঝোলের গন্ধ! চোখে জল এসে গেল।

সন্ধ্যের একটু আগে সিঁড়ি দিয়ে গট্ গট্ করে বিমানের খোলে ঢুকলাম।

—এ পুষ্পকরথের নাম কি রে ?

—'ডাকোটা'।

—'ডানাকাটা'? ঐ যে জলজ্যান্ত দুটো ডানা দুপাশে। ভু-ভারতে আর নাম খুঁজে পেল না বুঝি? তা বাপু বসে আরাম আছে। সব ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। তবু গঙ্গাজলের শিশি বার করে আমার হাতে দে। দেখ দেখ, এর ভেতরেও মেয়েটা চকলেট বিক্রী করতে এসেছে—এ যেন নেড়া-নেড়ীর মেলা! অমনি দিচ্ছে? না না, তবু খবরদার খাস নে। হয়তো ঘুমের ওযুধ মেশানো আছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে ভালমন্দ কিছু হলে বুঝতেও পারা যাবে না। হাসালি তুই। আমার কি ভীমরতি ধরেছে যে ওরা তুলো দিচ্ছে বলে কানে তুলো গুঁজে বসে থাকতে হবে? তাহলে একটা বড় কুলোও নিয়ে আয়, পিঠে বাঁধি। মরতে হয় মরবো, কালা বোবা হয়ে অঙ্গহানি নিয়ে মরতে যাব কোন দুঃখে?

এয়ার হোস্টেস্—মানে সহজ কথায় সহকারিণী বলাই ভাল, পণ্ডিতি পরিভাষায় বায়ু-সেবিকা বললে গোলমাল বেড়ে যাবে,—পিসিমার মজা দেখে মিটি মিটি হাসে।

—মেয়েটি বড় সুন্দরী রে! বড় মিষ্টি হাসি! আহা, যদি তোর—

—ঐ দেখ পিসিমা, আলোর লেখা জ্বলে উঠল; বেল্ট পরিয়ে দি; এবারে উড়বে।

হাউমাউ করে পিসিমাকে বাকি কথাগুলো বলতে দিলাম না। জানি তো, যখন আমার ওপর স্নেহ প্রবল হয় তখন কাণ্ডজ্ঞান বজায় থাকে না। মেয়েটি যদি বুঝতে পারে? দেশের বর্তমান ভাষার ঘোড়দৌড়ের পাল্লায় যে দু'চার কথা বাংলাও শিখে ফেলে নি তারই বা প্রমাণ কোথায়?

যখন প্লেন গড়াতে সুরু করল বেশ হাসিমুখে বসেছিল। তারপর দাঁড়িয়ে খানিকটা ঘড় ঘড় ও ফটাস্ আওয়াজ করে যেই দুলুনি দিয়ে নাক বাড়িয়ে বাড়িয়ে আকাশে উঠতে থাকে পিসিমা একেবারে শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে হঠাৎ অবুঝ হয়ে গেল। ওরে থামতে বল্, একটু থামতে বল বাবা! আমরা আগে নেবে যাই। পেটের ভেতর কি রকম করছে যে। হে মধুসূদন! কেন, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে দুঃসাহস হল? হে বিপদভঞ্জন হরি!

চারিদিকে যোড়া যোড়া চোখ দেখে নির্লজ্জের মত। আমার অবস্থা কাহিল। বেল্ট বাঁধা না থাকলে হয়তো উঠে লাফালাফি সুরু করে দিত। মরিয়া হয়ে হাত থেকে শিশিটা ছিনিয়ে নিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দি মাথায় শরীরে। ততক্ষণে ঢুলুনি থেমেছে। বেল্ট খোলার হুকুমও মিলল।

ওপাশে লম্বা-কোট ও কপালে হলদে-টিপ-পরা এক পেট-মোটা শেঠ বসেছিল। বেল্ট খুলেই তড়াক্ করে আমাদের কাছে হাত পেতে ঝুঁকে দাঁড়ায়। তারপর একটা আঙুল পেটের দিকে নিশানা করে বন বন ঘুরিয়ে দেখায়। ভাগ্যিস্ হাঁ করে কথা বলবার চেষ্টা করে নি। মুখ থেকে কিছু বেরিয়ে এলে মাত্র ঐ এক শিশিতে পিসিমার আগাগোড়া শুদ্ধির ব্যবস্থা করা যেত না।

'সর্বভয়হরি' এক গণ্ডুষে সড়াৎ করে টেনে, হাত পেটে ও মাথায় বুলিয়ে, শেঠ বসে চোখ বোজাল। আমিও চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে প্রার্থনা জানাই—হে মা গঙ্গে, মধুসূদন দাদার সেই দই-এর ভাঁড়ের মত শিশিতে পরিপূর্ণ থেকো মা, খালি হয়ে যেও না কিছুতেই—এখনও অনেকখানি পথ বাকি আছে।

বোম্বাই-এ বিমান বদলে অন্যটায় উঠছি, বললে,—এটার নাম কি রে?

—'ভাইকাউন্ট'।

—'ভাই কানু'? তা বেশ বেশ। ঐ পাশেরটি বুঝি 'বলরাম'?

—পাশের বিরাটকায় 'জেটের' দিকে চেয়ে হাসি চাপলাম; হলধরের হালটির মতই দেখতে বটে। পিসিমা শক্ত মানুষ বলতে হয়। এবারে উড়তে কোন হাঙ্গামা করল না। এমন খুশিভাবে বসে রইল যেন পাল্কী চড়ে সই-এর বৌ-এর বাপের বাড়ি বেড়াতে চলেছে।

রাত দেড়টায় নাগপুরে নামিয়ে দিল। এর পরে শেষ গাড়ি। সকলে খুব তাড়াতাড়ি খাবার ঘরের দিকে ছুটল।

—ওরা ব্যস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে কেন?

—খেতে যাচ্ছে। কোম্পানী খাওয়াবে, আলাদা পয়সা দিতে হবে না।

—হায় পোড়া কপাল! দুপুর রাতে মোষকেও ঠেলে তুললে খেতে চায় না!—তোদের সব ব্যাপারখানা কি রে?

বসে ঝিমুচ্ছি আর ঘড়ি দেখছি যে দেরি হচ্ছে। দিল্লীর উড়ল, মাদ্রাজের উড়ল, বোম্বাই-এর ফিরতি পথে উড়ল, কিন্তু কলকাতার নাম নেই। শেষে

মাইকে ঘোষণা হল,—'ভাইকাউন্টের' কল বিকল হয়েছে, তাই একটি 'স্কাইমাস্টার' দেওয়া হচ্ছে—দশ হাজার ফিট ওপরে তিনশো মাইল বেগে যাবে, সুতরাং সময়ের গোলমাল হবে না।

ভয়ে ভয়ে তাকাই। বুঝতে পারলে না তো—ঘোষণার সব কথাগুলিই মারাত্মক!

—কি বললে রে?

—এবারে একটা নতুন ভাল পুষ্পকরথ দিচ্ছে। নামটিও জুৎসই—আকাশের প্রভু। তার মানে মেঘনাদ বল বা ইন্দ্রজিৎ ও বলতে পারো।

আওয়াজ কম, কাঁপুনি কম, আকাশে যকের মত স্বচ্ছন্দে উড়ে চলে। আলো নিভে গেল। কম্বল পায়ের ওপর মেলে বসে বসে ভূতের মতন ঘুমিয়ে পড়ি।

শরীরের অস্বস্তিতে স্প্রীং-এর মত চোখ খুলে যায়। দাউ দাউ আলো চারিদিকে। আলোর লেখা তাড়াতাড়ি নিভছে, হুকুম করছে—বেল্‌ট পর চট্‌পট্। পিসিমার মুখ বিবর্ণ, আওয়াজ করে নিঃশ্বাস পড়ছে। অন্যদের, দেখি, ভয়ে মুখগুলো টেনে লম্বা হয়ে গেছে। হাঁ খোলা—স্রেফ চোখ দুটো বন্ধ হয়ে জিভটা বেরিয়ে আসতে যা দেরি। আমার পেটের ভেতর একটা ছোট্ট এরোপ্লেন ঘুরে ঘুরে গোঁৎ খেতে লাগলো।

আর 'আকাশের প্রভুর' প্রভুত্বের চিহ্ন মাত্র নেই। যেন মার কোলের বাচ্ছা খোকাকে শূন্যে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। টাল খাচ্ছে, ভূমিকম্পে কাঁপছে যেন খড়ের কুটো ধরে অসহায়ের মত ভাসছে। যে কোন নিমেষে বন্ধ খাঁচা-ভরা মানুষ নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে, রাবণের চিতা জ্বলে উঠবে—তখন হা রাম বলার সময়টুকু মিলবে কি?

ক্রমশঃ অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। কেউ গোঙায়, কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদে, কেউ গলা চিরে বমি করে। সহকারিণী নিজেকে সামলায় ও প্রাণপণে অন্যদেরও সাহায্য করে। এ ওর পেশা বটে, আবার দারুণ কর্তব্যও।

—চামড়ার দড়িটা খুলে দে, এক ফোঁটা মেয়েটা একলা খুন হয়ে যাবে কি?

পিসিমার মুখ চোখের চেহারা বদলে গেছে। সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম সুর করে বলতে বলতে টলতে টলতে এগিয়ে যায় নির্ভয়ে। এর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, ওর মুখ দেয় মুছিয়ে, কারুর বুকে

হাত চেপে শুইয়ে দিল। সহকারিণীকে জোর করে বসিয়ে দিল একটু জিরোবার জন্যে। আর নাম-গানের সুর যেন আচ্ছন্ন করে অভিভূত করে। কি যেন পেয়ে সকলের অস্থিরতা কমে যায়। এ সময়ে বিমান নীচে নামছে তর তর করে।

মাটিতে ল্যাজ ঠুকে যন্ত্র-দানবের কাঁপুনি থামল। বিষম ধাক্কা খেলাম, কিন্তু আশ্চর্য, আর কিছু অনিষ্ট হল না। ঘাম মুছতে মুছতে পাইলট দরজা খুলে ভেতরে এল। বললে—অদ্ভুত রক্ষা পাওয়া গেছে। বাংলার সীমানার মধ্যেই নেমেছি। খবর পৌঁছে গেছে দমদমে।

পিসিমার পায়ের ধুলো নিতেই মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল। মুখ ফিরিয়ে দেখতে দিল না। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল কালো আকাশে রাশি রাশি তারার ফুল—পৃথিবীর যেখানে যত স্নেহ ফুটে উঠেছে একসঙ্গে।

প্রাচীন যুগে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল আশ্রম। দুটি বড় আশ্রমের কথা জানা যায়: নৈমিষারণ্যে কুলপতি সৌনিকের আশ্রম, সেখানে শিষ্য ছিল দশ হাজার। আর প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম, সেখানে বাসগৃহ, অতিথিশালা, অশ্বশালা, হস্তীশালা—সব ছিল। রাজা ভরত সসৈন্যে সেখানে থাকবার স্থান পেয়েছিলেন।

এই সব আশ্রমে বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট ছিল: হোমের জন্য অগ্নিস্থান, বেদ পাঠের জন্য ব্রহ্মস্থান, রাজনীতি ও অর্থনীতি শেখার জন্য বিষ্ণুস্থান। সমরনীতি শিক্ষার জন্য মহেন্দ্রস্থান, যুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যূহরচনা শিক্ষার জন্য কার্তিকেয়স্থান, জ্যোতির্বিদ্যা শেখার জন্য বিবস্বতস্থান, উদ্ভিদবিদ্যা শেখার জন্য সোমস্থান, চলাচল নীতি শিক্ষার জন্য গরুড়স্থান ইত্যাদি।



হিজিবিজির হদ্দহদিস

*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

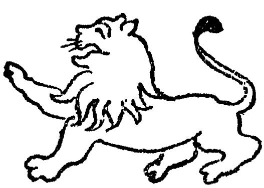
ভূমিকা :

হঠাৎ ঝড়ে ছট্‌কে এল মাসিক-পত্রের একটা পাতা।
তাইতে ছিল একটি ছবি, এঁকেছে কে ঘামিয়ে মাথা।
তুমুল তর্ক বেধে গেল পশুসভায় গহন বনে—
ছবিখানার অর্থ নিয়ে বচন ঝাড়ে জনে জনে।
রিপোর্টাররা খবর পেয়ে দৌড়ে এল দ্রুতগতি,
লম্বকর্ণ গর্দভরাজ আজ এখানে সভাপতি।

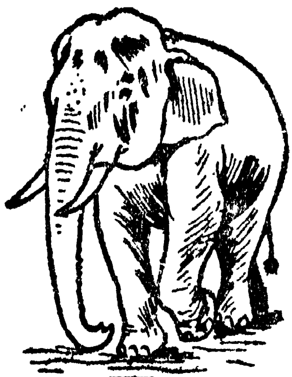
সভার রিপোর্ট :



হিজি-বিজি বকের ছানা ?
কাক বলে—"এ আমার ছানা।"
ছানা বলে "তানা নানা !
আমি যে কার যায় না জানা।"
বাপ দিয়েছে যে দেয়ালটা তাইতে চড়ে বসলে শেয়াল—
"আমার ছানার নকল করে এ কোন হতভাগার খেয়াল !"



সিংহ এসে ফুলিয়ে কেশর
বললে চটে—"কি আহাম্মক !
কোন পটুয়া এমন করে
দেখাতে চায় সিংহশাবক ?"



বংশ বনের বস্তি থেকে
হস্তী বলে ব্যস্তভাবে—
"আমার বাচ্চা গুলিয়ে দিলে
শুঁড়ের বাড়ি এক ঘা খাবে।"

মাৎলা দিঘির কাৎলা বুড়ো
ঝাঁপাই জুড়ে বললে হেঁকে—
"ডিম ফোটা মোর বাছনিকে
দেখিয়েছে কেউ ছবি এঁকে।"

এসা গেছো টিকটিকিটা বললে তখন "ঠিক ঠিক ঠিক!
নক্সাতে মোর বাচ্চা দেখ, হাসছে কেমন ফিক ফিক ফিক!"
"হাসছে কি রে? কাঁদছে যে রে, কেঁদেই ব্যাকুল আমার খোকা?"
গর্ত থেকে কাঁপিয়ে শুঁয়া বললে ভীতু তেলাপোকা!
"আরে, এটা বেড়ালছানা! বসে আছে গোঁফ ফুলিয়ে!"
বাঘের মাসী বললে হেসে থাবা তুলে লেজ দুলিয়ে।
কাঁকড়া ক্ষেপে ঝগড়া করে বললে ঝোপের মাকড়সাকে—
"নিজের বলে চাস চালাতে আমার ছানার ছবিটাকে?"
হ্রেষা রবে অশ্ব কহে "একে চেনা খুবই easy,
বাচ্চা-টাচ্চা নয়কো কিছু—এটা কেবল হিজি-বিজি!"

সভাপতির ভাষণ:

গাধা তখন দেয় ফতোয়া, লাগিয়ে চোখে চশমাখানা,
—"মিথ্যে কেন সভায় তোরা করিস এত টানবাহানা?
যে কলা ঐ গাছে ফলে তা নয়। এ যে ললিতকলা,
ইংরাজীতে যার নাম আর্ট, বেচে না যা ফেরিঅলা।
নতুন চোখে শিবকে দেখে শিল্পী যখন গড়ে বাঁদর।
পণ্ডিতরা তার মহিমা গায়, রত্ন বলে করে আদর।"



অদ্ভুত প্রতিশোধ * শ্রী মনোরম গুহ ঠাকুরতা

অনেক অনেকদিন আগের কথা।

তখন জাপানে একটি ছোট রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের নাম হচ্ছে নিপ্পন।

যে সময়ের কথা বলছি তখন এই রাজ্যের যিনি রাজা ছিলেন তাঁর নাম ছিলো মাসামুনে। অতটুকু ছোট রাজ্যের রাজা হলে কি হয়, মাসামুনের প্রতাপ কিন্তু কম ছিল না। আর ভারী দেমাকী ছিলেন এই ক্ষুদে রাজ্যের রাজাটি। শুধু তাই নয়, জাপানের যিনি সম্রাট অর্থাৎ মিকাডো—তাঁর ওপরেও মাসামুনের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এজন্য দেশের সবাই এই ক্ষুদে রাজ্যের রাজাটিকে খুবই মেনে চলতো।

মাসামুনে তাঁর প্রজাদের উৎপীড়নও করতেন নানাভাবে। তা ছাড়া আবার তাঁর নানা রকম খেয়ালও ছিল। এজন্য সবাই সব সময় তাঁর ভয়ে অস্থির থাকতো।

নিপ্পন রাজ্যে শীতের সময়ে ভারী শীত পড়ে। জল জমে সব বরফ হয়ে যায় আর সব সময় আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পেঁজা তুলোর মত সব তুষারকণা।

একদিন শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠে মাসামুনে তাঁর ঘরের খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সারাটা দুনিয়া যেন এক নতুন রূপ নিয়ে

তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি দেখতে পেলেন সারাটা দুনিয় বরফে ঢেকে একদম সাদা হয়ে গিয়েছে, আর পেঁজা তুলোর মত বরফ উড়ে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মাসামুনে দুনিয়ার এই রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী হলেও মাসামুনে বেশ ভাবপ্রবণ ছিলেন। তিনি ভাবলেন, প্রকৃতির এই নতুন রূপটি ভালো করে উপভোগ করবার জন্য শহর থেকে দূরে, নির্জনে এক পাহাড়ের ওপরে যেখানে রয়েছে তাঁর একখানা বাগানবাড়ী সেখানে যাবেন।

যেই ভাবা সেই কাজ। মাসামুনে সদলবলে রওনা হয়ে গেলেন সেই বাগানবাড়ীর উদ্দেশ্যে।

তখন জাপানে কেউ চামড়ার জুতো পরতো না, পরতো গেটা। গেটা কাঠ দিয়ে তৈরী হতো, অনেকটা আমাদের দেশের খড়মের মত।

গেটা পায়ে তখন কেউ ঘরে ঢুকতো না। ঘরে ঢুকতে হলে গেটা বাইরে রেখে যেতে হতো। মাসামুনে ও তাঁর সঙ্গীরা গেটা বাইরে রেখে বাগানবাড়ীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। চাকর-বাকরেরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো, আর শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। যে চাকরটির ওপরে গেটা তদারক করবার ভার পড়লো তার নাম হেইশিরো।

হেইশিরো ভাবলো মাসামুনে বাইরে এসে ভেজা গেটা পায় পরতে খুবই অসুবিধা বোধ করবেন, তাই সে করলে কি, মাসামুনের গেটা জোড়া তুলে নিয়ে তার জামার কাপড়ে মুছে শুকনো করে, তার কাপড়-জামা দিয়ে গেটা-জোড়াকে এমনভাবে ঢেকে রাখলে যেন আর না ভিজতে পারে।

মাসামুনে বহুক্ষণ ধরে ঘরের ভেতর থেকে প্রকৃতির এই নতুন রূপ উপভোগ করলেন।

মাসামুনে বাইরে আসবার আগেই হেইশিরো গেটা জোড়া তার কাপড়ের ভেতর থেকে বার করে দরজার সামনে রেখে দিলে।

গেটা পায়ে দিয়ে মাসামুনে একটু অবাক হলেন। সারা দুনিয়া বরফে ভিজে গেছে, অথচ তাঁর গেটার ওপরে কোথাও জলের চিহ্ন ত নেই-ই, বরং বেশ গরমই মনে হচ্ছে।

মাসামুনে ভাবলেন নিশ্চয়ই ঐ ব্যাটা হেইশিরো গেটার ওপরে আরাম করে বসেছিল। এত বড় সাহস ওর! আমার গেটার ওপরে বসা!

দেখাচ্ছি মজা! এই না বলেই গেটা জোড়া তুলে নিয়ে দমাদ্দম ওর মাথার ওপরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। ওর মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগলো। সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

যে গেটার ওপরে তার একটা নফর বসেছিল সে গেটা ত আর মাসামুনে পায়ে দিতে পারেন না, তাই খালি পায়েই হন্‌হন্‌ করে বাগানবাড়ী থেকে বেরিয়ে দলবল নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

হেইশিরো অজ্ঞান হয়ে সেখানেই বরফের ওপরে পড়ে রইল। পরদিন ভোরে যখন হেইশিরোর জ্ঞান ফিরে এলো, তখনও তার সারা শরীরটা যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছিল। সে ভাবলে মানুষকে যারা এমন ঘৃণা করে তাদের কোন রকম সংস্পর্শে সে আর আসবে না। তাই সে এর একটা প্রতিশোধ নিতে হবে ভেবে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো।

প্রতিশোধ নেবার অনেক রকম উপায়ই তার মাথায় এলো, কিন্তু কোনটাই তেমন কাজে আসবে না বলে তার মনে হল।

একবার ভাবলো চুপি চুপি সে রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজা যখন ঘুমিয়ে থাকেন তখন রাজার বুকে ছুরি বসিয়ে রাজাকে খুন করবে। কিন্তু তাই বা সম্ভব হবে কি করে, সব সময়েই ত সঙ্গীন উঁচিয়ে কড়া সব পাহারাওয়ালা রাজপ্রাসাদের চারদিক পাহারা দিচ্ছে।

তবে? তবে আর একটা কাজ করা যায়। গরীব-দুঃখী থেকে সুরু করে রাজা-মহারাজা পর্যন্ত সবাই ত সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্মান করে। যদি সে কোনদিন একজন ভালো সাধু হতে পারে তবে হয়ত সে জাপানের সম্রাট মিকাডোরও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে পারে। তখন হয়ত মিকাডোকে মাসামুনের হৃদয়হীনতার কথা বলে তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

এই না মনে মনে ভেবে সে ঠিক করলো যে সে সাধুই হবে।

সে একটি বৌদ্ধমঠে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করলো।

এরপর সে একাগ্রচিত্তে ভগবানের সাধনা সুরু করে দিলে। এ মঠ থেকে সে মঠে—এইভাবে নানা মঠে ঘুরে ঘুরে, বহু সাধুর সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো।

জাপানে তখন যেসব নামকরা বৌদ্ধ ধর্মমন্দির ছিল তার প্রায় সবগুলোতেই সে গেল। সাধু হিসেবে দেশে তার বেশ নামও হলো।

কিন্তু তখনও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে ঘর থেকে সন্ন্যাসী হয়ে বার হয়েছিল, অর্থাৎ জাপানের সম্রাট মিকাডোর সাথে পরিচিত হওয়া—তা তার হলো না।

তখন চীনদেশে অনেক বিখ্যাত প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির ছিল। হেইশিরো ভাবলো সে চীনদেশে গিয়ে ঐ সব মন্দিরে ভগবানের আরাধনা করবে। এই ভেবে সে চীনদেশে চলে গেল।

চীনদেশের বহু বিখ্যাত মন্দিরে গিয়ে সে ভগবানের আরাধনায় সময় কাটাতে লাগলো। সেখানকার জ্ঞানী সাধুদের সাথে মেলামেশা করবার ফলে তার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানও বাড়তে লাগলো। ক্রমে চীনদেশে জ্ঞানী সাধু হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়লো।

এভাবে বহুদিন চীনদেশে কাটিয়ে হেইশিরো দেশে ফিরে এলো। তারপর দেশের একটি মঠেই সে স্থায়ীভাবে থাকতে লাগলো।

তখনও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না ভেবে সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। দেশে ফিরেই মাসামুনের সম্পর্কে সে খোঁজ নিয়েছিল। সে শুনেছিল যে মাসামুনে তখন একটি বড় রাজ্যের রাজা। সে আশা ছাড়লো না। ভাবলো, যে করেই হোক, মাসামুনে তাকে যে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ সে নেবেই।

অল্পদিন পরেই সুযোগ মিলে গেল। দেশের সম্রাট মিকাডো খুব কঠিন অসুখে পড়লেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হলো না। কিন্তু কোন চিকিৎসায়ই রোগ সারলো না। সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে সম্রাটের ওপরে ভুতপ্রেতের দৃষ্টি পড়েছে, ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য নয় যে এ রোগ সারায়, দরকার সাধু-সন্ন্যাসী বা রোজা-ফকিরের।

বহু সাধু-সন্ন্যাসী রোজা-ফকির এলো, কারো মন্ত্রতন্ত্রেই কিছু হলো না। রাজপ্রাসাদের লোকেরা খবর পেলো যে চীনদেশ থেকে এক সাধু এসেছেন—ভারী গুণী।

রাজপ্রাসাদ থেকে লোক এলো হেইশিরোর কাছে। এবার আর হেইশিরোর আনন্দ দেখে কে? এবার হয়ত তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

রাজপ্রাসাদে এসে হেইশিরো ভগবানের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা জানালো, তিনি যেন তার মুখ রক্ষা করেন। হেইশিরো সম্রাটকে ভালো করে

পরীক্ষা করে দেখলো। এ রোগের কোন ওষুধ তার জানা ছিল না। তাই সে একান্তমনে ভগবান তথাগতের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে লাগলো, তিনি যেন সম্রাটকে আরোগ্য করেন, তাকে তার উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করেন। তথাগত ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

সম্রাট ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। চারদিকে হেইশিরোর জয়জয়কার পড়ে গেল। দেশের চারদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়লো। সবাই বলতে স্বরু করলো—ইনি একজন সত্যিকার উঁচুদরের সাধক। দেশের সবাই তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে স্বরু করলো।

হেইশিরো এখন ভাবতে স্বরু করলো যে এবারে তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। একদিন রাত্রিবেলা ঘুমোবার আগে বিছানায় বসে বসে এইসব কথা ভাবছে, এমনি সময় হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেলো। সমস্ত ঘরটা এক অপূর্ব রহস্যময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হেইশিরো দেখতে পেলে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। মৃদু হাসির রেখায় তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জল হয়ে উঠেছে।

এঁকে চিনতে হেইশিরোর দেরী হলো না। এঁরই আরাধনায় সারা জীবন হেইশিরো কাটিয়েছে। ইনিই ভগবান তথাগত। ধীরে ধীরে হেইশিরোর দিকে এগিয়ে এসে তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর যেমন নিঃশব্দে তিনি ঢুকেছিলেন তেমনি নিঃশব্দে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। আবার ঘর অন্ধকার হয়ে গেলো।

হেইশিরো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। তার মনে হলো সারা দুনিয়ায় আজ যেন আলোর বান ডেকেছে। সারাটা দুনিয়া যেন কেমন অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেছে। কোথাও কোনো হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, নেই মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি! সারাটা দুনিয়ায় যেন নেমে এসেছে শান্তি, আনন্দ। পৃথিবীর এই নতুন রূপ তাকে অবাক করে দিলে।

যে উদ্দেশ্যে সে সাধু হয়েছিল, যে প্রতিহিংসার আগুন তার বুকে দাউ দাউ করে এতদিন পর্যন্ত জ্বলছিল হঠাৎ যেন তা নিভে গেল, তার মন শান্ত হয়ে গেল। তার হৃদয়ের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের জন্য সে ভগবান তথাগতের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম জানাতে লাগলো।

পরদিন ভোরবেলাই হেইশিরো তার একজন ভক্তকে পাঠিয়ে দিল মাসামুনের কাছে, তাকে মঠে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে। সম্রাটকে

আরোগ্য করবার পর থেকে মাসামুনের ইচ্ছা হচ্ছিল এই সাধুটির সাথে পরিচিত হবার। এবার আপনা থেকে সেই সুযোগ আসতেই মাসামুনে দ্বিধা না করে মঠে চলে এলেন।

মঠে এসে ঘুরে ঘুরে মাসামুনে সব কিছুই দেখলেন। মাসামুনে হেইশিরোকে চিনতে পারেন নি। যে ঘরে হেইশিরো থাকতো, সে ঘরে একটা বেদীর ওপরে একটি সিংহাসনে ছিল এক জোড়া গেটা—ফুল দিয়ে ঢাকা। চারদিকে ধুপ আর বাতি জ্বলছে। এ ব্যাপার দেখে মাসামুনের ভারী কৌতূহল হলো। তিনি হেইশিরোকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন —কার পাদুকার এখানে পূজা হয়?

হেইশিরো বললে যে—এই পাদুকাই আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। হেইশিরো ধীরে ধীরে তখন তার জীবনের কাহিনী বলে যেতে লাগলো। কাহিনীটি শেষ করে হেইশিরো বললে—"আমিই আপনার সেই ভৃত্য।"

হেইশিরোর কাহিনী শুনতে শুনতে মাসামুনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মাসামুনে হাত জোড় করে হেইশিরোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—"আমায় আপনি ক্ষমা করুন।"

হেইশিরো বললে—"ক্ষমা করবার কোন অধিকার ত আমার নেই। ক্ষমা করতে পারেন একমাত্র ভগবান তথাগত। তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছেন। সুতরাং আপনার ভাববার কিছু নেই।"

এই বলে এগিয়ে এসে মাসামুনেকে হেইশিরো নিজ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলো।

একটি জাপানী প্রাচীন কাহিনী।

আড়াই হাজার বছর আগেও এদেশে নগর বসানো হতো পরিকল্পনা করে। মহারাজ বিম্বিসার গিরিব্রজ পুরকে নতুন করে গড়ে তোলেন—রাজগৃহ। এই রাজগৃহ নগর ও রাজপ্রাসাদের নক্সা তৈরী করে দিয়েছিলেন স্থপতি মহাগোবিন্দ।



এক চাষী বুড়োর কাহিনী * শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

এক চাষী বুড়োর কাহিনী। কিন্তু সরল চাষী সে মোটেই নয়—বরং যাকে বলা চলে বেশ ফিঁচলে।

বুড়ো সে হয়েছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে দিন দিন। যেদিন যমরাজার দূতটি দ্বারে এসে হাজির হবে সেদিন বিলম্ব না করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সরে পড়তে হবে। এখন শুধু সেইদিনটির জন্যই অপেক্ষা করে থাকা। কিন্তু বুড়ো অত সহজ পাত্তর নয়। তার মনের ধারণাটা অন্যরকম—তোমার আমার মত নয়।

একদিন সাঁঝের বেলা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বাড়ীর দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে ঝিমুচ্ছিল সে। হঠাৎ চটক ভাঙ্গতেই দেখল—কে একজন লোক রাস্তা থেকে হন্ হন্ করে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটি কাছে আসতেই বুড়ো হতচকিত হয়ে বললে—'কে হে বাপু তুমি? এ গাঁয়ে তোমায় ত কোনদিন দেখিনি। একেবারে অচেনা মুখ।'

—'ঠিক চেনা না হলেও একেবারে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে কাজে-কর্মে এদিকেও আমার আসা-যাওয়া আছে বই কি। আমি যমরাজার দূত।'

এ কথা শোনা মাত্র বুড়োর ঘোর মুহূর্তে কেটে গেল। ঝিমুনিও। বললে—'তা বেশ, বেশ। কিন্তু এখানে কি মনে করে? কোন দরকার-টরকার আছে নাকি?'

—'দরকার না থাকলে আমরা কি আর কারুর কাছে আসি। দরকারটা তোমার কাছেই। এবার যে তোমার যাওয়ার পালা। তল্পিতল্পা গুটিয়ে নাও হে। জলদি—'

বুড়ো কিন্তু এখন যেতে নারাজ। চট করে মনে মনে কি একটা মতলব ঠিক করে বললে—'দেখ বাপু, একটা কথা বলতে চাই তোমায়। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছ। এই দাওয়ায় একটু বস—বিশ্রাম নাও। পান তামাক খাও—'

বুড়ো একটা পিঁড়ে এগিয়ে দিল লোকটির দিকে।

—'অনেক কষ্ট করে এসেছ। কিন্তু ভাই আর একটু যে সময় চাই। সবে মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হয়েছে। এখনও বীজ বোনা হয়নি। আর দু'চার সপ্তাহ সময় পেলে বীজ রোয়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তুমি অন্যত্র কাজ-কর্ম সেরে ফেরার পথে বরং এখান হয়ে যেও। তখন যেতে আর কোন অসুবিধা হবে না।'

যমদূত এক মুহূর্ত কী ভেবে বললে—'বেশ তাই হবে। এই শনিবারের পরের শনিবার আবার আসব। তখন কিন্তু আর না করো না।'

সত্যিই চলে গেল যমদূত। আরো অনেকের কাছে তাগিদায় যেতে হবে তাকে।

যমদূত চলে গেল, বুড়ো আবার বসে বসে ঝিমুতে লাগল। দেখতে দেখতে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর আরো কয়েকটা দিন। পরের শনিবার ভোর হতেই বুড়ো ক্ষেত নিড়োতে মাঠে গেল। যে সব আগাছা গজিয়েছে তাদের একটি একটি করে খুঁটে তুলে ফেলতে লাগল।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। একটু ঠাণ্ডার ঝাপটা। চাষী পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল—যমদূত হাজির।

চোখা-চোখি হতেই যমদূত বললে—'চল হে, আর দেরী নেই, আমার এখনো অনেক কাজ বাকী।'

—'ক্ষেত নিড়ানোর পক্ষে চমৎকার দিনটি'—নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে চাষী—'শিশিরে মাঠ ভিজে আছে। তুমিও আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাবে ভাই?'

লোকটার ফিঁচলেমি-পনা দেখে যমদূতের মাথায় যেন আগুন দপ করে জ্বলে উঠল। তবুও মনের ভাব গোপন করে সহজ সুরে বললে—'দেখ বাপু, এখন রসিকতা করার সময় নয়। আমার কাজ একেবারে ছকে বাঁধা।

তোমার এখানে আমি রোজ রোজ ধর্ণা দিতে আসতে পারব না। অত ফুরসুৎ আমার নেই।'

—'যমদূতমশাই আমাকে তাহলে আরো একটু সময় দিতে হবে যে। এ গাঁয়ে ধান চালের বড্ড অভাব। আমার এ ক্ষেতের ফসল না হলে গাঁয়ের লোকেরা উপোস করে মরবে। এখনও ক্ষেতের অনেক কাজ বাকী। অথচ এই অসময়ে আমি যদি চলে যাই ধানগাছের কচি কচি চারাগুলো মাঠেই মারা পড়বে যে।'

যমদূত একটু কি ভাবলে—তারপর বললে—'বেশ তোমার কথাই রইল ক্ষেত নিড়োও এখন। এরপর যখন আসব আর কোন ওজর-আপত্তি শুনব না কিন্তু।'

—'না না—তা কি হয়? এরপর এ গাঁয়ে যখন আসবে আর তোমাকে খালি হাতে একা ফিরে যেতে হবে না।'

যমদূত চলে যেতে চাষী আবার ক্ষেত নিড়োতে লাগল। যমদূত যে বার-বার আসছে আর ফিরে-ফিরে যাচ্ছে তা নিয়ে একটুও মাথা ব্যথা নেই চাষীর। এসব ব্যাপার যেন ওর মনে কোন দাগই কাটে না। যথাপূর্বং দিন গুজরান করতে লাগল সে। কিন্তু যমদূতকে ফিরিয়ে দিলেও শরীর ত অটুট থাকবে না। শরীরটা দিন দিন কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। হাতে পায়ে বাত ধরল। চোখের জ্যোতিও যেন ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল দিন দিন। কানেও যেন কম শুনছে আজকাল।

দেখতে দেখতে শীত শেষে বসন্ত এল। একদিন যমদূতও এসে হাজির। —'চল হে, এবার আর কোন ওজর শুনছি না।'

—'এই যে এস ভাই, বস'—, বুড়ো তাকে একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিল। 'একটু তামাক চলবে নাকি।'

'—'দেখ বুড়ো, তুমি বড্ড ফিঁচলে। নাও উঠে পড় চটপট।'

বুড়ো এখনও যেতে নারাজ। এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া কি অত সহজে কাটান যায়।

—'তোমায় বার বার শুধু শুধু আসা-যাওয়া করতে হচ্চে। সত্যিই বড্ড হাঙ্গামার ব্যাপার সন্দেহ নেই, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? এরপর তোমাকে আর এ্যাদ্দূর কষ্ট করে আসতে হবে না। সময় হলে, কোন একটা নিশানা পাঠালেই আমি ঠিক একাই চলে যাব।'

—'কি রকম নিশানা শুনি ?'

—'এমন একটা কিছু যা আমি দেখলেই বা শুনলেই বুঝতে পারব।'

—'সত্যি বলছ ত ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিন সত্যি বলছি। এবার আর না করব না।'

—'বেশ নিশানা পাঠানো মাত্রই যখন যে অবস্থায় থাকবে চলে আসবে। এবার আর কোন বায়না শুনব না বলে রাখছি।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! বার বার কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়? আমারও ত একটা লজ্জা-শরম বোধ আছে।'

ইতিমধ্যে চাষীর দেহ আরো ভেঙ্গে পড়ল। চোখের জ্যোতি কমতে কমতে একেবারে অন্ধ। আর কানের শক্তিও হ্রাস পেতে পেতে বধির হয়ে গেল। এখন আর সে কিছুই দেখতে পায় না, শুনতেও পায় না।

একদিন একখানা চিঠি এল। যমদূতের কাছ থেকেই এসেছে চিঠিখানা। কিন্তু বুড়ো পড়তে জানে না। তাছাড়া অন্ধ বলে কিছু বুঝতেও পারলে না। চারপাঁচ দিন পরে যমদূতের কাছ থেকে বিশেষ বার্তা নিয়ে একটি লোকও এল তার পূর্বের শপথ স্মরণ করিয়ে দিতে। কিন্তু কালা বলে তার একটি কথাও কানে ঢুকল না।

শেষ পর্যন্ত যমদূত নিজেই এসে উপস্থিত। এসে দেখল লোকটা না পারে দেখতে—না পায় শুনতে। রাগে যেন ক্ষেপে গেল সে।

—'পাজী হতভাগা কোথাকার। বার বার আমাকে বোকা বানিয়েছ। আর আমি আসব না।'

চটে-মটে চলে গেল যমদূত।

এদিকে চাষী বুড়ো হতে হতে একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়ল। নিবান্ধব অবস্থায় সে পড়ে থাকে বিছানায়। কেউ দেখবার নেই। মাথার চুল, মুখের দাড়ি বাড়তে বাড়তে জট পাকিয়ে গেল। সে এক অতি অসহনীয় করুণ অবস্থা। এখন সে যমদূতকে কত ডাকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সব কাকুতি মিনতি বৃথা। যমদূত আর আসে না। এদিকে গায়ের মাংস পচে খসে পড়তে লাগল। পোকা থক থক করতে লাগল সারা গায়ে। হাড়ে ধরল ঘুণ। এইভাবে একদিন সে মিলিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। স্বাভাবিক মৃত্যু হল না তার। পঞ্চভূতে তৈরী দেহ ক্ষয় পেতে পেতে পঞ্চভূতেই মিশে গেল।



কঙ্কালের ক্ষুধা * শ্রী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

জহর চিরদিনই খুব সকালে ঘুম হইতে উঠে।

সেদিন অতি ভোরে ঘর হইতে বাহিরে পা বাড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিল, ভীত কম্পিত স্বরে ডাকিল—'মা—মা, শিগ্‌গীর এসো—'

মা তখন বিছানা হইতে উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম ও কতকগুলি স্তোত্র আওড়াইয়া বিছানা হইতে মাথা তুলিতেছিলেন, হঠাৎ জহরের স্বর তাঁহার কানে প্রবেশ করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি রে জহর?'

তিনি বাহিরে আসিলেন।

জহর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এগুলো কি মা?'

একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া মা তাহা লক্ষ্য করিলেন। 'তাই তো এ কি? কী এ?'

জহর কহিল, 'পায়ের ছাপ? কোনো জন্তু জানোয়ারের পায়ের দাগ এ রকম হতে পারে না। এ কোনো মানুষের পায়ের ছাপ নয়। কোনো কঙ্কালের পায়ের ছাপ। কিন্তু—ছাপটা এতো লাল কেন মা? এ কি আল্‌তা, না রক্ত? পায়ের ছাপ রক্তমাখা কেমন করে হবে?'

মায়ের মুখে কোনো কথা নাই।

জহর হঠাৎ তাহার মায়ের পিছনে, তাঁহারই প্রায় মাথার উপরে, ঘরের দরজার উপর দিকে আঙুল দিয়া কি দেখাইল। মা তৎক্ষণাৎ সেদিকে ফিরিলেন, দেখিলেন দরজার উপরে দুই পাশে দুইটি রক্তমাখা হাতের ছাপ। কঙ্কালের হাতের ছাপ। ছাপ দুইটির মাঝখানে একখানি কাগজ—তাহাতে বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা—

ক্ষুধা! বড় ক্ষুধা!
প্রথম বলি···বাবু
দ্বিতীয় বলি জহর
—কঙ্কাল

ভীত হইয়া মা কহিলেন, 'এ কি কোনো ভূত না প্রেত? প্রথম বলিটি কে? বাবুর নামটি লেখা নেই—তবে কি ওটা আমাদের কর্তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে? আজ সাতদিন যাবৎ তাঁরও যে কোনো খোঁজ-খবর নেই রে জহর?'

আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আজ সাতদিন যাবৎ বিশ্বনাথবাবু হঠাৎ নিখোঁজ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে নিঃসম্বল অসহায় ফেলিয়া এভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার মত লোক তিনি নহেন। কাজেই তিনি নিখোঁজ হওয়ায় খুবই একটা উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল।

জহর তাঁহার দূর সম্পর্কের ভাইপো। হঠাৎ পিতৃহীন হওয়ায় আজ বৎসরকাল যাবৎ সে বিশ্বনাথবাবুকে আশ্রয় করিয়াছে। বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী সম্পর্কে জহরের কাকীমা হইলেও জহর তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত।

মাকে কতকটা আশ্বাস দিবার জন্যই সে বলিল, 'তুমি বৃথা আশঙ্কা করছ মা। কাকাবাবু কাজে-কর্মে কোথাও আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন—শিগ্‌গীরই ফিরে আসবেন। কাকাবাবু যেখানেই থাকুন, বেশ সুস্থ শরীরেই আছেন—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি ভাবছি এই কঙ্কালের কথা।'

হঠাৎ বাহিরের ফটকে কে করাঘাত করিল। 'একখানা চিঠি আছে, বাবু!'

ডাক পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল। নীল খামে মোড়া চিঠিখানা। ভিতরে লাল রঙের একখানি কাগজ, অতি সংক্ষিপ্ত একখানা চিঠি। কিন্তু

চিঠির উপরের অংশ দেখিয়াই জহর আর স্থির থাকিতে পারিল না—তাহার হাত কাঁপিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। চিঠিখানা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

॥ দুই ॥

টিফিনের ঘণ্টা বাজিতেই ক্লাসের সমস্ত ছাত্র বাহির হইয়া গেল—জহরও বাহির হইতেছিল হঠাৎ অতুল ডাকিল—'জহর!'

জহর ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'তোমায় আজ এমন দেখাচ্ছে কেন জহর? কিসের জন্য তোমায় আজ এমন আনমনা ও বিষণ্ণ দেখছি।'

এক গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জহর তাহার বুকপকেট হইতে দুইখানি চিঠি বাহির করিল এবং সেগুলি অতুলের হাতে দিয়া কহিল, 'আগে এইখানি পড়।'

দু'খানি চিঠিই নীল খামে মোড়া এবং দু'খানি চিঠিই জহরের নামে লেখা।

অতুল প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। চিঠির উপরে প্রথমে একটি কঙ্কালের ছবি। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রেতপুরী

জহর,

তোমাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তুমি আজও আমাদের আদেশ পালন কর নাই। যা হোক এই চিঠি পাইবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একখণ্ড কাগজে লিখিবে: "আমি আমার দাবীর টাকা সম্পূর্ণ বুঝিয়া পাইয়া এই রসিদ লিখিয়া দিলাম।" তাহার পর রসিদখানি গালামোহর করা একখানি খামে পুরিয়া সুলতান দীঘির পূর্বপাড়ে বটগাছের নীচে রাখিয়া দিবে। তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি—পুলিশ বা অন্য কাহাকেও কোন খবর দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পাইবার আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। তুমি মুহূর্তের জন্যও তেমন চেষ্টা করিলে তোমার নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিবে মাত্র।

—কঙ্কাল

পুঃ—মনে রাখিও এই আমাদের চতুর্থ চিঠি। ইহাতেও যদি তুমি আমাদের আদেশ পালন না কর তাহা হইলে প্রেতপুরীর সমস্ত কঙ্কাল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে স্থির জানিও।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে অতুলের সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিল।

জহর কহিল, 'অতুল। একখানি চিঠি পড়লে তো? এখন ঐ চিঠিখানিও পড়ে ফেল।'

অতুল অপর চিঠিখানি পড়িতে লাগিল—

প্রেতপুরী

জহর,

এই আমাদের শেষ চিঠি। তোমার জীবন-মরণ এখন তোমার উপর নির্ভর করছে। যদি আমাদের আদেশ পালন কর, তবে তুমি নিরাপদ। আর যদি না কর, তবে তোমার মৃত্যু—পৃথিবীর কোন শক্তি নেই, যে তোমাকে রক্ষা করে। জহর! আমি আজ ক্ষুধার্ত। আজই সকালে জানতে পেরেছ আমার প্রথম বলি···বাবু, আর দ্বিতীয় বলি তুমি নিজে। সাবধান!

—কঙ্কাল

এই চিঠিরও উপরেই একটা কঙ্কালের ছবি।

'এই চিঠিখানি আজ পেয়েছি। কেবল তাই নয়, সকালবেলা ঘুম হতে বেরুতেই আরো কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।' এই বলিয়া জহর সেইদিন ভোর বেলা যাহা কিছু দেখিয়াছিল অতুলকে বলিল।

অতুল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। তারপর কহিল 'আচ্ছা, এর মানে কি জহর? আমি যে এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। ওরা কিসের রসিদ চায়? কার কাছে তোমার টাকা পাওনা?'

জহর উত্তর করিল, 'না অতুল, সারা পৃথিবীর কাছেই আমার ধার, আমার আবার পাওনা থাকবে কার কাছে ভাই? কাজেই, টাকা পেয়েছি বলে আমার রসিদ নিয়ে পৃথিবীতে কার কোন উপকার হবে, সেকথা আমি ধারণাই করতে পারি না।'

অঙ্কের শিক্ষক হরেনবাবু ক্লাশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে এক পাল ছাত্রও ক্লাশে ঢুকিল। টিফিনের ঘণ্টা কখন যে শেষ হইয়া গিয়াছে,

অতুল বা জহর তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহাদের চমক ভাঙিল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছাত্রেরা নিজ নিজ স্থানে বসিয়া পড়িল। হরেনবাবু আদেশ করিলেন 'নিয়ে এস তোমাদের অঙ্কের খাতা।'

সকলে একে একে অঙ্কের খাতা দেখাইতে আরম্ভ করিল।

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ক'টা কষেছ?'

বিনীতভাবে জহর কহিল, 'সাতটা কষেছি।'

'বাকি তিনটা?'

অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া জহর কহিল, 'আজ সারা সকালটা একটুও সময় পাইনি স্যার। কালকের জন্য আমাদের যে ক'টা অঙ্ক কষতে দেবেন, আমি তার সঙ্গে এই তিনটা অঙ্কও বেশি এনে দেখাবো।"

'সময় পাওনি। তোমায় পাটিগণিত কিনতে বলেছিলুম, কিনেছো সেই বই?'

'না স্যার, কিনতে পারিনি।'

'কিনতে পারিনি? বই কেনার শক্তি না থাকে তো ইস্কুলে ভর্তি হওয়া কেন? না—আমি এসব বরদাস্ত করবো না। যাও, ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাও—'

জহর কি একটু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মাস্টারমহাশয় তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—'বেরিয়ে যাও! আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনে—যাও!'

জহর ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতুল বসিয়া রহিল, যতক্ষণ দেখা গেল সে একদৃষ্টিতে জহরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

॥ তিন ॥

বিস্তৃত খেলার মাঠে তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে। চারিদিকে ধূসর অন্ধকার। ছেলের দল খেলা শেষ করিয়া কখন যে চলিয়া গিয়াছিল বিনয় বা অতুল কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। অদূরে পাকা রাস্তায় একটা গ্যাসের আলো কে জ্বালিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো আসিয়া বিনয় ও অতুলের সারা মুখ রাঙাইয়া দিল।

বিনয় কহিল, 'আর ভেবে কি হবে অতুল? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর তার প্রতিকার কেমন করে হবে? কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় অতুল, তুমি আজ পর্যন্তও তার কোনো খোঁজ-খবর রাখনি।'

অপরাধীর মত অতুল কহিল, 'আমি রোজই ভাবছিলুম সে হয়তো আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এখন দেখছি সে আশা বৃথা।'

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। অতুলও তাহার সঙ্গে গাত্রোত্থান করিল। তাহাদের পদশব্দে চকিত হইয়া কয়েকটি শৃগাল দূরে সরিয়া গেল।

॥ চার ॥

জহরের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে অতুলের কষ্ট হইল।

সে যখন জহরের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে জানিতে পারিল যে জহর আজ কয়েকদিন যাবৎ নিখোঁজ। বাড়ীর কর্তা বিশ্বনাথবাবুও পূর্বেই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সংসার অচল।

কথাবার্তায় অতুল বুঝিল জহর তাহার স্কুলের ব্যাপারটা চাপিয়া গিয়াছে। শিক্ষক যে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে জহর মায়ের কাছে সেকথা বলে নাই।

কথায় কথায় রাত হইল, অতুল ও বিনয় ঠিক করিল, জহরের বাড়ীতেই রাত কাটাইবে।

* * * *

হঠাৎ কার উচ্চ শব্দে অতুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এক রাশি সূর্যের আলো তাহার বিছানায় তখন লুটোপুটি খাইতেছে। ভোরের শীতল হাওয়া মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ছুঁইয়া যাইতেছে।

'যান বেরিয়ে যান'—উচ্চকণ্ঠের এই আদেশ অতুলের কানে পৌছাইতেই অতুল চমকিত হইল।

'এখনো বুঝে বলুন—বেশ ভেবে বলুন। আপনি দেবেন কি না জহরের বাক্স? এই তার চিঠি। সে চাইছে তার জিনিস। আর আপনি তাকে তার জিনিস ফিরিয়ে দেবেন না?'

'না, দেবো না', তীব্রকণ্ঠে মা গর্জন করিয়া কহিলেন, 'মিথ্যাবাদী কোথাকার। এই কি জহরের লেখা? আমি কি তার লেখা কখনো দেখিনি?'

একটু নরম হইয়া লোকটি কহিল, 'আপনি চটছেন কেন? জহর অসুস্থ, তার শক্তি নেই যে নিজের হাতে চিঠি লিখবে। তাই অন্য লোক দিয়ে লিখিয়ে আমার মারফৎ এই চিঠিখানি পাঠিয়েছে।'

'চিঠিখানি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে কখনো এমন কথা লিখতে পারে? জোচ্চুরি করবার জায়গা পেলে না আর! যাও—যাও আমার বাড়ী থেকে!'

অতুল ঘর হইতে বাহির হইল।

লোকটি গর্জন করিয়া কহিল, 'সাবধান, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না—জোর করে নিয়ে যাব জহরের জিনিস-পত্তর সব।'

'বটে রে বেয়াদব!' সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড লাথি তাহার কোমরে পড়িয়া তাহাকে ভূপতিত করিল।

লোকটি পড়িয়া গেলেও অতুল ক্রমাগত তাহাকে লাথি মারিতে লাগিল।

তারপর কোনরূপে সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার দেহের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু অতুলের হাতে একখানি লম্বা কাটারী দেখিয়াই তাহার সমস্ত সাহস যেন কর্পূরের মত উপিয়া গেল। নিঃশব্দে সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মহিলার দিকে তাকাইয়া কহিল—'আচ্ছা পরে দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে। কি দেখবি রে?' বলিয়াই অতুল তাহার কাটারী তুলিয়া এক লম্ফে বাহিরে যাইয়া পড়িল।

লোকটি আর মুহূর্ত অপেক্ষা করিল না। সে তৎক্ষণাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

অতুল ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল 'মা, ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

মা কহিলেন, 'লোকটা বাড়ী এসেই কড়া নাড়তে থাকে। আমি বেরুতেই সে আমার হাতে একখানি চিঠি দেয়—এই সেই চিঠি। চিঠিখানা জহরের লেখা নয়।'

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ একটা ধপাস্ করিয়া পতনের শব্দ হইল ও কে কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল 'বাবা রে—'

বিনয় বাহির হইয়া বলিল—'আলো চাই, অতুল!'

ঠিক দরজার গোড়াতেই যে একটা লোক অমনভাবে পড়িয়াছিল, বিনয় তাহা কেমন করিয়া জানিবে? ঘরের বাহির হইতেই বিনয় হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সর্বাঙ্গে কাদামাখা একটা লোক ঠিক চৌকাঠের উপর পড়িয়া ভয়ানক হাঁপাইতেছিল। লোকটার গায়ে জামার চিহ্নমাত্র নাই। পরণে অতি ময়লা ও জীর্ণ একখানি ধুতি। তাহার মাথায় কোন এক ক্ষতস্থান হইতে তখনও রক্তধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।



বিনয় কহিল 'কে তুমি, এখানে কেমন করে এলে?'

সে কথা কহিল না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইল।

'কথা বলছ না কেন? কে তুমি? এখানে কি করে এলে?'

লোকটি এবার কহিল, 'আমি জাতিতে কাপালিক। একটা লোকের সঙ্গে আমার বড্ড শত্রুতা ছিল। সে লোকটা খুনে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে ছুটে এদিক দিয়ে বাড়ী যাচ্ছি, লোকটা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে একটা কাটারী হাতে আমায় আক্রমণ করলে। তারপর আমার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিলে।

ভাগ্যিস্, আমি অন্ধকারে ছুটে পালিয়েছিলুম, তা নইলে আজ আমায় খুন করেই ফেলত!'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নামটা তো বল্লে না হে? জাতিতে কাপালিক, কিন্তু বাড়ী কোথায়? এখান দিয়ে কোথা যাচ্ছিলে?'

লোকটা কহিল, 'আজ্ঞে, বাড়ী আমার অনেক দূরে—তেলীপাড়া গ্রামে। আমার নাম মধু কাপালিক।'

'বটে? তা তেলীপাড়ায় তোমার বাড়ী। কিন্তু এখান দিয়ে যাচ্ছিলে কোথা? এই কি তেলীপাড়া যাবার রাস্তা?'

বিনয়ের প্রশ্নে মধু কাপালিক কিছু সোজা হইয়া বসিল। কহিল—'আজ্ঞে না, আমি বাড়ীই যাচ্ছিলুম, কিন্তু একটু ঘুরপথে যাচ্ছিলুম, এদিকে একটু কাজ ছিল। হঠাৎ সেই লোকটা একটা ভয়ানক জোয়ান—এই ষণ্ডামার্কণ্ড সেই লোকটা হৈ হৈ করতে করতে আমার পিছনে ছুটে এলো। হঠাৎ প্রকাণ্ড একখানা কাটারী দিয়ে আমার মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলে। আমি কোপ খেয়েও ছুটতে লাগলুম, উঃ!'

মধু কাপালিক বক্তৃতা বাড়িয়া যাইতেছিল। বিনয় তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল। 'চুপ কর। দেখি তোমার মাথাটা, কোথায় কেটেছে?'

বিনয় তাহার মাথা দেখিতে গেল। কিন্তু মধু কাপালিক তখনই আবার কাতর চীৎকার করিয়া উঠিল—'না না, ছোঁবেন না। উঃ।'

বিনয় চমকিত হইল। সে আর অগ্রসর হইল না।

হঠাৎ ঘরের পিছনে ক্ষীণ আর্তনাদ শুনা গেল—'মা!'

'কে রে?' মহিলা চীৎকার করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন 'ময়না! ময়না!'

অতুল ও বিনয় ছুটিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল ঘরের এক পাশের বেড়া কে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে। আর ময়না তাহার বিছানায় নাই। বিছানা শূন্য।

বিনয় তৎক্ষণাৎ লণ্ঠন হাতে আবার বারান্দায় ছুটিয়া আসিল। কিন্তু মধু কাপালিকের তখন আর চিহ্নমাত্র ছিল না। লোকটা যেন যাদুমন্ত্রে পলাইয়াছে।

সেই সময় ছোট্ট কি একটা জিনিস দূর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল। বিনয় তখনই তাহা আলোর কাছে লইয়া গেল। দেখিল মাটির ঢেলায় জড়ানো একখণ্ড পরিষ্কার কাগজ, তাহাতে লেখা রয়েছে :

'ক্ষুধা—কঙ্কালের ক্ষুধা।'

॥ ছয় ॥

'অদ্ভুত! অদ্ভুত এদের সাহস অতুল, আর অদ্ভুত আমাদের আহাম্মুকি!' দুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে বিনয়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। 'এই মধু কাপালিক এসে উপস্থিত হলো। বাড়ী তার তেলীপাড়া গাঁয়ে। মরতে এলো আমাদের এই বাড়ীর পাশে। বল্লে, কোন একটা খুনে লোক তাকে খুন করতে এসেছিল। খুনে লোকটা তার মাথায় বেশ এক ঘা কোপ বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অতুল, যেই তুমি তার ক্ষত জায়গাটা দেখতে গেলে, অমনি সে মরা-কান্না কেঁদে উঠলো। ক্ষত জায়গাটা আর পরীক্ষা করা হলো না। আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল যে লোকটার সব কথা মিথ্যা। আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আগাগোড়া সমস্তই জহরের শত্রুদের কারসাজি।'

অতুল জিজ্ঞাসা করিল—'ময়নাকে তারা নিলে কেন?'

বিনয় কহিল, 'তা ঠিক বলা কঠিন।'

হঠাৎ ডাক-পিওন একখানি চিঠি ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। অতুল কুড়াইয়া লইল। হাতের লেখা দেখিয়াই কহিল, 'এ যে জহরের চিঠি।'

মা তখনই চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন—

মা, চিঠিখানি লুকিয়ে লিখছি—ধরা পড়লে প্রাণের ভয় যথেষ্ট। কাজেই বেশী লিখতে পারব না। আমি কোথায় আছি জানি না। আমার বাক্সে বাবার লেখা বা বাবার নামে যা কিছু কাগজপত্র আছে সব সরিয়ে ফেলবে। কি আছে জানি না, কিন্তু আমি তাতেই মরতে বসেছি। সেগুলি পেলেও এরা আমায় মেরে ফেলবে—কাজেই সেগুলি কিছুতেই দেবে না। আমায় জব্দ করবার জন্য ময়নাকে এরা চায়। তাকে খুব সাবধানে রেখো। চিঠি পাবে কি না জানি না। যদি পাও খুব সাবধান। আমার ফিরে যাওয়া বা

আমাকে উদ্ধার করা মানুষের অসাধ্য। কাজেই চেষ্টা করো না। দুঃখ করো না। ইতি—জহর

চিঠি পড়িয়াই মহিলা কাঁদিয়া উঠিলেন—'জহর! বাবা জহর!'

বিনয় এনভেলাপখানি ভালরূপে ক্ষ্য করিতে লাগিল। চিঠিখানিতে ডাকঘরের প্রায় দশ-পনেরোটি চিহ্ন। কোনটি বুঝিতে পারা যায়, কোনটি বুঝিতে পারা যায় না।

শিরোনামার উপরে বাঁ দিকে একপাশে জহরের হাতে লেখা ছিল, 'চিঠিখানা যার হাতে পড়বে দয়া করে তিনি যদি তা ডাক-বাক্সে ফেলে দেন, তবে বড়ই উপকৃত হব। ইতি—জনৈক বিপন্ন ব্যক্তি।'

বিনয় বুঝিতে পারিল যে চিঠিখানি লিখিয়া জহর কোন ডাক-বাক্সে দিতে পারে নাই—সে হয়ত পথে-ঘাটে যে কোন জায়গায় তাহা ফেলিয়া গয়াছে। তারপর কোন সদাশয় ব্যক্তি তাহা ডাকে দিয়াছিলেন।

॥ সাত ॥

সেদিন বিনয়ের আর অবসর ছিল না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। মহিলা একটি বাতি জ্বালিয়া রাখিয়া গেলেন। বিনয় কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিল। অতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু বুঝতে পাচ্ছ, বিনয়?'

বিনয় কহিল, 'হাঁ, কিছু বুঝতে পাচ্ছি বই কি। কিন্তু সবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। জহরের বাবা কি এত ঋণ করে গেছেন? সারা দুনিয়ায় তাঁর ঋণ। কাবুলীওয়ালা, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী সকলেই জহরকে শাসিয়ে চিঠি লিখেছে,—টাকা দাও, তোমার বাবার ঋণ, তা শোধ করবে না? কিন্তু কঙ্কালের চিঠিগুলো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। কঙ্কাল তো টাকা চাইছে না, সে চাইছে একটা রসিদ। তাতে লিখে দিতে হবে, 'আমি আমার দাবীর টাকা সব বুঝে পেয়েছি।' সবগুলিতেই একটা করে কঙ্কালের ছবি, আর প্রত্যেকটিতে প্রায় একই ভাষা—'একটা রসিদ লিখে দাও, আর রসিদ রেখে আসবে সুলতান দীঘির পূর্ব-পাড়ে বটগাছের নিচে।'

অতুল কহিল, 'তাহলে মনে হচ্ছে সুলতান দীঘির পূর্ব-পাড়ের বটগাছটাই হচ্ছে সেই কঙ্কালের আড্ডা।'

বিনয় কহিল, 'ভাব দেখি সেই মধু কাপালিকের কথা! সে লোকটা এখানে কিছুক্ষণ বেশ থিয়েটার করে গেল। তারপর পাওয়া গেল একখানা কাগজ, তাতে লেখা 'কঙ্কালের ক্ষুধা'। তাহলে প্রেতপুরীর কঙ্কাল আর তেলীপাড়ার মধু কাপালিক কি এক সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছিল? এই তো খানিক আগে আমরা দু'জন সে জায়গাটা দেখে এলুম। কি দেখলুম সেখানে? একটা কঙ্কালের পায়ের দাগ আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে আছে আরও তিন জোড়া পায়ের দাগ। তাদের দু'জনার পায়ে জুতো—একজনার পায়ে রবারের জুতো আরেক জনার পায়ে চামড়ার।'

অতুল কহিল, 'আচ্ছা, জহরের বাবার লেখা কোন কাগজপত্র পেলে?'

'তাঁর নামে লেখা কয়েকখানি চিঠি দেখতে পাচ্ছি, তার দু-একখানা চিঠি বোধ হয় কখনও খোলাই হয় নি।'

'খোলা হয়নি?'

'না'—বলিয়া বিনয় তখনই একখানি রেজিষ্ট্রি করা লম্বা এন্‌ভেলাপ খুলিয়া কহিল, 'এই দেখ একখানি চিঠি, শিলমোহর করা চিঠি, কিন্তু খোলাই হয়নি। ও কি?' বিনয় হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল।

'আগুন! আগুন! আগুন—'

মহিলা পাশের ঘরে শুইয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ বিনয়ের চীৎকারে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল—'আগুন, আগুন' শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল।

চেনা-অচেনা অনেকগুলি লোক প্রায় এক সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বার করতে হবে আপনাদের?'

বিনয় তাহাদের কাহাকেও চেনে না।

মহিলা কহিলেন, 'আমায় কি জিজ্ঞেস করছ? তিন তিনটে লোক আমার চলে গেছে, আমি জিনিস নিয়ে কি করবো বাবা? সব যেতে দাও, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক।'

বিনয় প্রথমে কতকগুলি বিছানা-পত্তর দেখাইয়া দিল, সাহায্যকারী লোকেরা সেগুলি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনয় অতুলকে কহিল, 'অতুল, এখন হচ্ছে জিনিস-পত্তর চুরি করবার সুযোগ। জহরের বাক্স যাতে চুরি না যায় সেজন্য খুব সাবধান হবে। নাও, এই বাক্সটা নাও,' বিনয় খুব ক্ষিপ্রহস্তে জহরের বাক্সের বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রগুলি আবার সেই বাক্স মধ্যে পুরিয়া তালাচাবি বন্ধ করিল, তারপর অতুলের হাতে তাহা দিয়া কহিল, 'খুব সাবধান, এটা জহরের বাক্স! তুমি বেরিয়ে যাও, এই বাক্স নিয়ে। মা, আপনিও সাথে যান, আমি সব জিনিস-পত্র বার করে দিচ্ছি।'

বিনয় আগন্তুক লোকগুলিকে কহিল, 'নিয়ে যাও, তোমারা এই থালাবাসন আর ঐ ট্রাঙ্কগুলি,—যা যা পার বাঁচাও।'

একজন কহিল, 'ট্রাঙ্ক? কার ট্রাঙ্ক এগুলি? ছোট বাক্স পেঁটরা নেই কিছু?'

ঠিক সেই মুহূর্তে অতুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিনয় কহিল, 'তুমি এলে কেন? সেই বাক্স কোথায়?'

'বাক্স মার কাছে রেখে এসেছি, কিছু ভয় নেই।'



'মূর্খ হতভাগা!' কহিয়াই বিনয় তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঠেলিয়া বাহির হইল সেই অপরিচিত সাহায্যকারীর দল। তাহারা বিনয়কে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর মুহূর্ত মধ্যে মহিলার নিকট উপস্থিত হইয়াই ঝাঁ করিয়া তাঁহার হাত হইতে বাক্সটি কাড়িয়া লইল এবং চক্ষুর পলকে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিনয় ধূলা ঝাড়িয়া উঠিতে উঠিতে জ্বলন্ত আগুনের আলোকে তাহা দেখিল। সে একখণ্ড বাঁশ লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং কিছুদূর যাইয়াই সে তীব্রবেগে বাঁশটি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, বংশখণ্ড ঘুরপাক খাইতে খাইতে তাহাদের একজনের মাথায় যাইয়া আঘাত করিল। একটা কাতর আর্তনাদ করিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সঙ্গী তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল, তারপর বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অতুল জিজ্ঞসা করিল, 'ব্যাপার কি বিনয় ?'

বিনয় কহিল, 'মূর্খ কোথাকার! পঞ্চাশবার তোমায় বলে দিয়েছি, জহরের বাক্স-পেঁটরা সব সাবধানে রাখবে। আর তুমি তা রেখে এলে একটা বুড়ো স্ত্রীলোকের কাছে!'

অতুল নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

॥ আট ॥

পাড়া-প্রতিবেশী লোকজন আসিয়া যখন আগুন নিভাইল, তখন বাড়ীর অনেক জিনিসই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ছোটখাট বিছানাপত্র, একখানা চেয়ার ও পুস্তক বোঝাই একটি ট্রাঙ্ক, সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়া গেল। মহিলা কহিলেন, 'আমার তাতে কোন দুঃখ নেই রে, জিনিস নিয়ে আমি কি করব ?'

বিনয় কহিল, 'কিন্তু জহরের কাগজ-পত্তরগুলি অমনভাবে হাত ছাড়া হওয়া একেবারেই ভাল হয়নি। ঐ আগুন লাগবার ব্যাপারেও শত্রুদের কোন হাত আছে। তারা স্থির করেছিল যে, একটা হৈচৈ আরম্ভ হলেই তারা জহরের বাক্স নিয়ে সরে পড়বে। 'যাক—যা অনিষ্ট হবার হয়ে গেছে। এখন আর যা কিছু পড়ে আছে,তাই কুড়িয়ে ঠিক করে রাখছি—এই যে সেই রেজিষ্ট্রী চিঠিখানিও রয়েছে দেখছি।' বলিয়া বিনয় তাহার ঠিকানাটি পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

'জে, স্মিথ, এটর্ণী, মাদ্রাজ? চিঠিখানা খুলে পড়তে হবে, আচ্ছা, যাক এখন আমার কাছেই।' বিনয় সেই চিঠিখানিও ভাঁজ করিয়া তাহার পকেটে পুরিল। তারপর অতুলের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'চল, একবার ঘরটার চারদিক দেখে আসি।'

বিনয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, অতুলও তাহার সঙ্গে চলিল।

ঘরের পিছনে দেখা গেল—কতকগুলি লোকের পায়ের ছাপ, একটি পেট্রলের টিন ও লাল কাঁচের একটি লণ্ঠন পাওয়া গেল।

বাগানের পথে তখনও সেই বাঁশের খণ্ডটি পড়িয়াছিল। বিনয় তাহা দেখিয়া কহিল, 'আমার সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে এই একটা সান্ত্বনা অতুল, এই বাঁশের টুকরোটি দিয়ে ওদের একটার মাথা ভেঙে দিয়েছি।' বিনয় বাঁশটি তুলিয়া লইল। কহিল, 'দেখছ অতুল, এতে এখনো রক্ত লেগে রয়েছে কত এই যে দেখ, এতে কত বড় একটা চুল। এত বড় চুল? এ যে মেয়ে-মানুষের চুলের মত।'

ঘরে আসিতেই মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন সন্ধান পেলে?'

বিনয় কহিল, 'ঘরের পিছনে অনেকগুলো লোকের পায়ের দাগ। তাছাড়া সেখানে এই পেট্রোলের টিন ও লাল বাতিটি পড়েছিল। আমার বিশ্বাস আমাদের শত্রু ফটোগ্রাফার বা সেই জাতীয় কেউ। এমন ধরনের লালবাতি কেবল ফটোগ্রাফারের কাজেই দরকার হয়। আর একটা প্রমাণ জহরের চিঠি। সে যাতে চিঠি লিখেছে, সেই কাগজখানা সাধারণ কাগজ নয়, সেটি ব্রোমাইড কাগজ। যা দিয়ে লিখেছে তা সাধারণ পেনসিল নয়, তার চেয়ে অনেক কালো পেনসিল। ফটো তুলে নিয়ে যারা তা রিটাচ্ করেন কেবল তারাই এই সকল পেন্‌সিল ব্যবহার করেন। কাজেই আমাদের শত্রু ফটোগ্রাফার। শত্রুদের একজনের মাথায় আছে লম্বা চুল। লম্বা টিকি। লম্বা টিকি থাকে কাদের মাথায়, চীনাদের মাথায়। কাজেই আমার অনুমান আমাদের শত্রুর দলে অন্তত একজন চীনে আছে।'

'হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি ঘরের বাহিরে উঠিল আবার তখনই নীরব হইয়া গেল।

বিনয় চক্ষুর নিমেষে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। অতুলও তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল। বিনয় ধমক দিয়া কহিল, 'খবর্দার! আসবিনে সাথে—বাড়ী পাহারা দে—সাবধান!'

॥ নয় ॥

বিনয় ছুটিল অনেকক্ষণ, কিন্তু সে ধরি-ধরি করিয়াও লোকটাকে ধরিতে পারিল না।

লোকটি সম্ভবতঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সে আর ছুটিতে পারে না—বিনয় তাহার কাছে আসিয়া পড়িল। লোকটি তখন পশ্চিম দিয়ে খোলা মাঠের মধ্যে নামিল।

প্রকাণ্ড মাঠ—কোথাও ধানগাছ, কোথাও তিলগাছ। বিনয় সেই লোকটার পিছনে তাহাদের মধ্য দিয়া ছুটিতে ছুটিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ সম্মুখের তিলগাছগুলি একবার একটু নড়িয়া উঠিল। তারপর গাছগুলি ফাঁক হইয়া গেল—ভিতর হইতে দুইটি জোয়ান লোক হঠাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিনয়ের দিকে ছুটিয়া আসিল। ফাঁকা মাঠ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার সুমুখে পড়িল প্রকাণ্ড এক দীঘি। দীঘির তীরে বিশাল এক বটগাছ। বিনয় ভাবিল, 'কি এ! একি সুলতান দীঘি?'

ভূত-প্রেতের লীলা খেলা ও অমানুষিক কত কাণ্ডের জন্য সুলতান দীঘির নাম দীর্ঘকাল হইতে বিখ্যাত।

হঠাৎ সর সর করিয়া বটগাছ হইতে দুইটি লোক নামিয়া আসিয়া বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল—তাহার পিছনের লোক দুটিও আসিল। সম্মুখের প্রকাণ্ড একটা জোয়ান তাহার মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

বিনয় বাধা দিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পাইল না। তাহার অচৈতন্য নিস্পন্দ দেহ লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

'বল—এখনও বল।'

'আমি জানি না'—বিনয় সংক্ষেপে উত্তর করিল। তাকাইয়া দেখিল, এ সেই মধু কাপালিক!

'আর দেরী করছিস্ কেন রে পোঁটা? লোকটাকে ধরে চ্যাংদোলা করে দীঘির জলে ছুঁড়ে ফেলে দে।'

'এখনও বল—জহরের বাক্সের বাকি কাগজ-পত্তর সব কোথায়? একটা মিথ্যা ভুয়ো বাক্স দিয়ে আমাদের ভুলিয়েছিস্। বাকি কাগজ সব কোথায় রেখেছিস্?'

'আমি কোথাও রাখিনি।'

'ও এমনি সহজভাবে কিছু বলবে না রাওজি, ওর ঠ্যাং তুটো ধরে তু-দশবার ওকে জলে চুবিয়ে ধরুন, তাহলেই সব বেরুবে।'

বিনয় দেখিল, এই বুদ্ধিদাতা রোগা লোকটাই তাহাকে এতদূর লইয়া আসিয়াছে। তাহারই অনুসরণে সে আজ সুলতান দীঘির ধারে উপস্থিত হইয়াছে।

রাওজি তাহার কথার অনুমোদন করিয়া কহিল, 'হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছিস্? তুলে নে ছোঁড়াটাকে।'

বিনয় এতক্ষণে সব ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। জহরের ছোট বাক্সটা তাহারা অনেক আশা করিয়া ছিনাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু দরকারী কাগজ তাহাতে ছিল না। বাকি কাগজ পাইবার আশায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগুন নিভিয়া যাইবার পরে ঘরে আসিয়া সে যে কয়েকখানি কাগজ কুড়াইয়া পাইয়াছে সেগুলি তখনও তাহার পকেটেই আছে। জহরের বাবার নামে রেজেষ্ট্রি করা চিঠিখানিও সেই সঙ্গে আছে।

একটা ক্ষুদ্র সঙ্কেতে তুটি ষণ্ডা লোক খপ করিয়া তাহার বদ্ধ পা তুটি ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইল, তারপর মুহূর্ত মধ্যে তাহার বুক পর্যন্ত সেই দীঘির কালো জলে ডুবাইয়া ধরিল।

বিনয়ের মাথা তখন নীচু দিকে। বুক পর্যন্ত জলের তলায়। একটা জমাট অন্ধকার প্রাচীর বিনয়ের মাথায় বিরাট গুরুভার দৈত্যের মত চাপিয়া বসিল, চারিদিকে শুধু কালো—কেবল কালো অন্ধকার।

কে তাহাকে আবার ধীরে ধীরে উর্ধ্বে টানিয়া তুলিল। ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার মুখে চোখে নিঃশ্বাস ফেলিয়া গেল। বিনয় একটু সতেজ অনুভব করিল, একবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাওজি কহিল, 'কি রে ছোকরা, এখন বলবি? জহরের বাকি কাগজ কোথায়? না, আবার তোকে জলে চুবিয়ে ধরব?'

বিনয় তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। সে কোন উত্তর করিতে পারিল না।

রাওজি একটু নীরব থাকিয়া আবার কহিল, 'কি রে ছোঁড়া, দিবি তুই কাগজ-পত্তর ?'

বিনয় কতকটা সুস্থ হইয়া আসিতেছিল। সে ভাবিল কাগজ সঙ্গে আছে জানতে পারলে তো কাড়িয়াই লইবে, মারিয়াও ফেলিবে। কহিল, 'তোমরা কোন্ কাগজ খুঁজছ। জহরের বাক্সটা তোমরা কেড়ে নিয়েছ। আর সামান্য দু' চারখানা কাগজ ঘরের মধ্যে পড়েছিল।'

'কোথায় সেই কাগজ ?'

'আমি সব বলে দিচ্ছি, কিন্তু আমার উপর অত্যাচার করবে না বল ?'

'কাগজ যদি আমাদের দাও, তাহলে তুমি ছাড়া পাবে।'

'বেশ, তবে দেখ এগুলি তোমাদের দরকারী কাগজ কিনা', বলিয়া বিনয় তাহার কাপড়ের নীচে আঁটা হাফশার্টের পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিল।

রাওজি কাগজগুলি লুফিয়া লইল। রেজেষ্ট্রী চিঠিখানি ভালরূপে দু'দিক উল্টাইয়া কি লক্ষ্য করিল, তারপর তাহা খুলিয়া এক নিমেষে চিঠিখানির উপরে তাহার সতর্কদৃষ্টি বুলাইয়া হাসিমুখে কহিল 'বেশ বেশ, মুক্ত তুমি! একে ছেড়ে দাও।'

রাওজি সঙ্কেত করিল। বিনয়ের হাত পা খুলিয়া দেওয়া হইল। সে অতি অসমর্থের মত অতি দুর্বলের মত অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিনয় পথ ছাড়িয়া ক্ষেতের মাঝে আসিয়া পড়িল এবং যথাসাধ্য নীচু হইয়া চলিতে লাগিল। সহজে কেহ তাহাকে দেখিতে না পায় ইহাই হইল তাহার উদ্দেশ্য।

ক্ষেতের মাঝে এক জায়গায় একটা গহ্বর, সম্ভবতঃ কেহ সেখান হইতে কতকগুলি মাটি কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল।

স্থানটি লুকাইয়া থাকিবার উপযুক্ত। বিনয় অতি নিঃশব্দে সেইখানে মরার মত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

আধ ঘণ্টাও গেল না। একদল লোকের পায়ের শব্দ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের কথাবার্তার শব্দও সে শুনিতে পাইল। কথাগুলি অস্পষ্ট হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। বিনয় তাহাদের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনিতে পাইল।

পায়ের শব্দ ও কথায় শব্দ ক্রমশঃ দূরে ভাসিয়া গেল, অবশেষে আর তাহা

শুনিতে পাওয়া গেল না। পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল, লোকজন তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে জহরের বাড়ীর দিকেই চলিয়া গেল।

অবশেষে বহুক্ষণ পরে বিনয় ধুলা ঝাড়িয়া উঠিল।

সারাদিনের উদ্বেগ ও অনাহারে বিনয় মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তবু সে তাড়াতাড়ি জহরের বাড়ী চলিতে লাগিল।

॥ দশ ॥

বিনয় সবই শুনিল, মহিলা তাহাকে সবই বলিলেন। কেমন করিয়া একজন লোক আসিয়া বলিল যে বিনয় তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে, তারপর কেমন করিয়া তিন চারিটি লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া তাহাকে লইয়া যায়। মহিলা কহিলেন, 'বাবা বিনয়! আমি চেঁচাতে যাচ্ছিলুম কিন্তু খুব জোয়ান একটা লোক প্রকাণ্ড একখানি দা নিয়ে আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আর আমায় শাসিয়ে বললে, 'একটু টুঁ শব্দ করবি তো টুকরো করে ফেলব।' তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলুম, একটা শব্দ করতে পারিনি।'

বিনয় তাঁহাকে কহিল, 'মা, কালই থানায় একটা এজাহার দিন। আমি লিখে যাচ্ছি থানার দারোগাবাবুর নামে। কাল থেকেই তিনি যেন আপনার রক্ষার ভার গ্রহণ করেন, আর কয়েকটি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে। তার খরচস্বরূপ এই দশ টাকার নোটখানা দারোগাবাবুর হাতে দেবেন।'

বিনয় চিঠি লিখিতে বসিল।

চিঠি লিখিতে তাহার প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। একখানি কাগজে লিখিল, এজাহার কি রকম হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে উপদেশ। আর একখানি কাগজে লিখিল দারোগাবাবুর নামে একখানি চিঠি। চিঠিতে একখানি কাগজে একটা বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করিয়া রাখিল।

লেখা শেষ হইলে বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল 'মা, আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসি। আমি অতুল জহর প্রভৃতি সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব—ঈশ্বর আমায় সাহায্য করুন।'

দুয়ারের কাছে একটি লোহার শিক পড়িয়াছিল বিনয় তাহা কাজে

লাগিতে পারে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ কুড়াইয়া লইল এবং অন্ধকার নিশীথে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহিলা বিস্মিতভাবে বিনয়ের পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

*   *   *   *

বিনয় যখন পৌছিল, সুলতান দীঘির কালো জলে তখন লহর খেলিয়া যাইতেছে। দীঘির ধারে বটগাছের তলায় ছোট্ট একটি লাল বাতি—তাহার লাল আলোতে দীঘির কালো জলও রঙিন হইয়া উঠিয়াছে।

বিনয় একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিল, গাছের তলায় প্রকাণ্ড একটা জটলা। একদল লোক সেখানে জড় হইয়া কি একটা কাজে ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একদল গর্জন করিয়া উঠিল 'সেদিন যে বড় লাথি মেরেছিলি ছোঁড়া? মনে আছে সেদিনের কথা?' আজ তার প্রতিশোধ। মরবার আগে জেনে যা, রাওজির প্রতিহিংসা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। আজ আর ক্ষমা নেই। তোকে মরতে হবে, ভীষণভাবে মরতে হবে। লম্বোদর, বাঁধো, পাথর বাঁধো।'

বিনয় শুনিল। সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিল অতুল এখানেই আছে এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই রাওজি কথাগুলি বলিল। কিন্তু অতুল তো একটা কথাও বলিল না!

গাছের তলায় একটা চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইল। আলোটা একবার এদিকে আর একবার ওদিকে এইভাবে কেবল নাড়াচাড়া করা হইতেছিল।

বোধহয় কাজ শেষ হইল, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাওজি কহিল, 'লম্বোদর! যে দলিলের জন্য আমরা এত পরিশ্রম কচ্ছিলাম সে দলিল আমাদের হাতে এসেছে। এদিকে কাজের মধ্যে বাকি শুধু এই ছোঁড়া। আর বিনয় ছোঁড়া। এর তো আজকেই দফা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিনয়কেও যেমন করে হোক্ কালই শেষ করা চাই। কালকের ভেতর ঐ কাজটাও শেষ করে তোমরা কালই আমাদের পেছনে রওনা হবে। আমরা আজই রওনা হচ্ছি। আমাদের এখনই ছুটতে হবে। তা নইলে স্টেশনে যেয়ে গাড়ী পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা এখানে থাকতে আমারই সুমুখে ওকে বিসর্জন দিতে হবে। নিয়ে এসো, সুলতান দীঘির জলে ওকে শুইয়ে দাও।'

লম্বোদর একটা বোঝা কাঁধে তুলিয়া লইল। বোঝাটি অতুলের দেহভার।

লম্বোদর দীঘির এক উচ্চ পাড়ে যাইয়া বোঝাটি লইয়া দাঁড়াইল, তারপর আদেশের প্রতীক্ষায় রাওজির দিকে তাকাইল। রাওজি সংক্ষেপে একটা শব্দ করিল—'হুঁ্যা।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে বোঝাটি দীঘির জলে নিক্ষিপ্ত হইল—ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল মাত্র।

রাওজি কহিল, 'লম্বোদর, তবে এখন থাকো তুমি। আমরা চলে যাচ্ছি, তোমরাও কালই রওনা হতে চেষ্টা করবে।'



রাওজি তাহার দলবল লইয়া তৎক্ষণাৎ গভীর অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেবল লম্বোদর তখনও সেই বাতির সম্মুখে দীঘির কালো জল পাহারা দিতে লাগিল।

বিনয়ের মাথায় কে যেন আগুন ঢালিয়া দিল। একটা লোহার শিক তখনো তাহার হাতে। নিঃশব্দে অতি দ্রুত সে লম্বোদরের পেছনে যাইয়া দাঁড়াইল। তারপর প্রচণ্ড বেগে সেই লোহার শিক দিয়া লম্বোদরের মাথায় আঘাত করিল। একটা আঘাতের শব্দ হইল মাত্র, লম্বোদর কিছুমাত্র শব্দ করিতে পারিল না। তাহার অসাড় নিস্পন্দ দেহ তৎক্ষণাৎ গড়াইয়া দীঘির কালো জলে তলাইয়া গেল।

বিনয় চক্ষুর নিমেষে দীঘির কালো জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

॥ এগারো ॥

কয়েকদিন পরে—

মাদ্রাজের সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একখানি বাড়ী। বিনয় তার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। দরোয়ান কার্ড চাহিল, বিনয় নিজের নাম লিখিয়া এটর্ণী মিঃ স্মিথের সহিত দেখা করিতে চাহিল। দরোয়ান কার্ড লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, পাশের ঘরে চেয়ার দেখাইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিল।

সাহেব আসিলেন। ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি খবর মিস্টার সেন ?'

বিনয় বলিল, 'স্যার অনেকদিন আগে এক বছরেরও বেশী হবে—আপনি বাংলাদেশে সোনারপুরে প্রসাদ বসু নামে এক ভদ্রলোকের কাছে একখানি রেজেষ্ট্রী চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠি পৌছবার সময় প্রসাদবাবু জীবিত ছিলেন না, চিঠিখানি রেখেছিলেন তাঁর ছেলে জহরলাল বসু। আপনার চিঠিতে কি আছে সে তা কোনদিন খুলেই দেখল না। কিন্তু সম্প্রতি আমরা বুঝতে পেরেছি যে একদল শত্রু সেই চিঠিখানার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চিঠিখানা হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি এমন লেখা ছিল যা তাঁর শত্রুদের কাছে অত লোভনীয়। তাই আপনার কাছে এসেছি সেই চিঠি সম্পর্কে সব জানবার জন্য।'

মিঃ স্মিথ কিছুক্ষণ কি একটু ভাবিলেন। ঝঞ্ঝাট এড়াইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন 'দেখুন অতদিনের চিঠি, তার নকল পাওয়া—সে তো দুঃসাধ্য। আমি বড়ই দুঃখিত যে আপনাকে আমি কোন সাহায্যই করতে পারি না।'

'আমি অনেক কষ্টে অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনার জবাবের উপর অনেকগুলি লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

'জীবন-মরণ নির্ভর করছে ?'

'হ্যাঁ সাহেব। যদি অনুমতি করেন তবে সমস্ত ব্যাপার আপনাকে খুলে বলতে পারি।'

সাহেব অনুমতি দিলেন। বিনয় তাঁহাকে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারই কহিল। স্মিথ সাহেব তন্ময় হইয়া তাহা শুনিলেন। কহিলেন, 'বিনয়বাবু, আপনাকে আমি সব রকমেই সাহায্য করব। কিন্তু সেই অতুলকে উদ্ধার করে আপনি কোথায় তাকে রেখে এলেন ?'

'একটা হাসপাতালে রেখে এসেছি।'

'আপনি আমার খবর পেলেন কি করে?'

চিঠির উপরে আপনার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। মনে ছিল, মাদ্রাজ এবং একজন সাহেব এটর্ণী। আমি আজ তিনদিন এখানে এসেছি। এখানে এসে হাইকোর্টে খোঁজ করে, আপনারা যতজন সাহেব এটর্ণী আছেন, তাঁদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। সেগুলি পড়তে পড়তে আপনার নামটা পড়েই আমার মনে হল আপনিই সেই লোক। কাজেই আপনার কাছে এসেছি।'

সাহেব কহিলেন, 'আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। কিন্তু কাগজপত্তর খুঁজে সেই পুরানো চিঠির নকল বার করতে কিছু সময় দরকার। দেখব আপনাকে আরও কোন সাহায্য করতে পারি কিনা। শত্রু কে, কি তাদের স্বার্থ সে বিষয়ে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'শত্রুর দলে কোন ফটোগ্রাফার আছে। ফটোগ্রাফীর কাগজে জহরের চিঠি বা যেখানে-সেখানে ফটোগ্রাফীর লালবাতি দেখে-শুনে আমার সেই ধারণা হয়েছে। আমি সব খবর নিশ্চিতভাবে আজকের মধ্যে জানতে পারব। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার কালে সেখানকার দারোগাবাবুকে একটা অনুরোধ-চিঠি দিয়ে এসেছি। সেই সঙ্গে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য একটা মুসাবিদা ও দশটা টাকা রেখে এসেছি। দারোগাবাবু যদি কোন বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, তবে হয়তো আমরা সঠিক কোন আড্ডা জানতে পারব।'

'বিজ্ঞাপনে কি লেখা ছিল?'

'বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কোন ফটোগ্রাফী কোম্পানীকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার আবশ্যক। কিন্তু চিত্র-বিদ্যায় বিশেষতঃ সস্‌পেইন্টিং সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা চাই। চীনেম্যানের আবেদন সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হবে। এই সাহায্যের জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ তিনি কোম্পানীর লাভের অর্ধাংশ পাবেন—সম্ভবতঃ তা বছরে বিশ হাজারের কম হবে না। বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানা গোপন রেখে কেবল বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা। আমার বিশ্বাস দারোগাবাবু যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন তবে হয়তো দু' একটা তেমন লোকের ঠিকানা আমরা জানতে পারব। আমি দারোগাবাবুকে টেলিগ্রাম করেছি।'

সাহেব কহিলেন, 'আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।'

॥ বারো ॥

বিকালবেলা বিনয় সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। হাসিয়া সাহেব কহিলেন বিনয়বাবু 'সবকিছু ঠিক করে রেখেছি। এ ব্যাপারে কার স্বার্থ তা অনেকটা বুঝতে পেরেছি।'

বিনয় কহিল 'আমিও আজ একটা রেজিষ্ট্রী চিঠি পেয়েছি। এতে আমার বিজ্ঞাপন ও তার জবাব রয়েছে। এই দেখুন—'বলিয়া বিনয় পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া সাহেবের সম্মুখে রাখিল।

সাহেব সেগুলি পড়িলেন। কহিলেন 'হ্যাঁ, ঠিক লোকই দরখাস্ত করেছে। কানপুরের ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানীর অংশীদার চীয়াংলু। এই লোককেই আমি খুঁজছিলুম।'

'আপনিও খুঁজছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমিও খুঁজছিলুম। কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে আমি সেই চিঠিখানার নকল পেয়েছি। চিঠিখানা আমি লিখেছিলুম এক ই, জি মারিসন সাহেবের অনুরোধে। মারিসন সাহেব ঐ ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানীর একজন অংশীদার ছিলেন। ঐ কোম্পানীর দু'জন মাত্র অংশীদার—একজন এই মারিসন সাহেব আর একজন ঐ চীনে সাহেব চীয়াংলু। মারিসন সাহেবের সঙ্গে চুক্তি ছিল যে তিনি যতদিন কাজ করবেন ততদিন তিনি হাজার টাকা করে মাইনে আর লাভের অর্ধাংশ বখরা পাবেন। মারিসন সাহেব একবার ছোটনাগপুরের বন-জঙ্গলে কি একটা কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে হঠাৎ একটা বাঘ তাঁকে আক্রমণ করে। ঠিক সেই সময় প্রসাদ বসু নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁকে রক্ষা করেন। মারিসন সাহেব তা ভুলতে পারেননি। মৃত্যুকালে তিনি ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানীর কাছে তাঁর যা কিছু প্রাপ্য টাকা আছে সে সমস্তই সেই প্রসাদ বসুকে দান করে গেছেন। কিন্তু দলিল রেজিষ্ট্রী হয়নি। দানপত্র লেখা হল তাঁর মৃত্যুশয্যায়। সেই দানপত্র সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে আমারই একখানা চিঠি ঐ রেজেষ্ট্রী করা খামের ভিতর ছিল। সেই চিঠিই আপনারা পড়বার সময় পেলেন না, আর সেই চিঠিই আপনাদের খোয়া গেল।'

'সেই দানের পরিমাণ কত টাকা?'

'সেই টাকার পরিমাণ বিরাশি হাজার তিনশত টাকা।'

'এত টাকার মালিক যে জহর সে তার দৈন্যবশতঃ একখানা বই কিনতে পারেনি, আর তাই বলে সেই থেকে তার পড়া বন্ধ।' কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া বিনয় কহিল, 'সে দানপত্র কেমন করে উদ্ধার হতে পারে?'

সাহেব একটু ভাবিয়া কহিলেন, 'দলিলের সাক্ষী আমরা কয়েকজন— একজন আমি নিজে, একজন হচ্ছেন এক পাঞ্জাবী ইঞ্জিনীয়ার বলবন্ত সিং, আর একজন কানপুরের এক ব্যবসায়ী সাহেব মিস্টার রস। দলিলে লেখা রয়েছে প্রসাদবাবু বা তার ছেলে উপযুক্ত চিহ্ন বা পরিচয়পত্র সহ উপস্থিত হয়ে ঐ টাকার দাবী পেশ করলে ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানী তাকে টাকা দিতে বাধ্য। দানপত্র স্বাক্ষর হবার পূর্ণ ১৮ মাস মধ্যে ঐ দাবী পেশ না করলে দানপত্র বাতিল হয়ে যাবে এবং সমস্ত টাকা ঐ ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানীর দাতব্য তহবিলে জমা থাকবে।'

বিনয় কহিল, 'দানপত্রখানি কয়েকদিন চেপে রাখতে পারলেই সমস্ত টাকা ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানীর হয়ে যায়।'

'টাকাটা কোম্পানীতে জমা হলে কে তাতে লাভবান হবে? দু'জন মালিকের একজন যদি না থাকেন তাহলে বাকী থাকবে শুধু অপর ব্যক্তি —চীয়াংলু।'

'যিনি আমার বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছেন সেই চীয়াংলু, কানপুরের ফটোগ্রাফার?'

'সুতরাং, এই ব্যাপারে চীয়াংলু জড়িত আছে। তবে আর একটা চুক্তিও এই দলিলের ভিতর রয়েছে। আঠারো মাসের মধ্যে কোন দাবীদার উপস্থিত না হলে টাকাটা সবই ইয়াঙ্কি ডসন কোম্পানীর দাতব্য ভাণ্ডারে জমা হবে এবং তার প্রথম দান পাবে এই দলিলেরই তিনজন সাক্ষী একজন আমি— এই স্মিথ সাহেব, অপরজন রস সাহেব আর তৃতীয় ব্যক্তি সেই ইঞ্জিনীয়ার বলবন্ত সিং। আমরা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা করে পাব। আমাদের তিনজনের পনেরো হাজার টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকার মালিক হবে চীয়াংলু।'

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। অবশেষে সাহেব কহিলেন, 'আমি স্থির করেছি, আমি আজই কানপুর যাব এবং আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন। সেখানে যেয়ে সেই রস সাহেব ও বলবন্ত সিংকে খুঁজে বার করতে

হবে, তারপর তাঁদের সাহায্যে পুলিশকে হাত করে আমাদের ঐ কোম্পানীতে হানা দিতে হবে। আপনি যাবেন আমার সাথে।'

'হাঁ, নিশ্চয় যাব।'

'রাত্তির আটটায় আমাদের গাড়ী, আজই যেতে হবে।'

॥ তেরো ॥

মাটির তলায় বদ্ধ ঘরে জহরের যন্ত্রণার অবধি ছিল না। প্রত্যহ নির্যাতন, প্রত্যহ অত্যাচার। ঘরের এক কোণে একটি বাতি। তাহার মৃদু আলোতে ঘরখানি ঈষৎ আলোকিত। জহর একখানি কম্বলে মাথা রাখিয়া কত কি ভাবিতেছিল।

হঠাৎ ক্রিং করিয়া একটা শব্দ হইল, জহর মাথা তুলিয়া দেখিল ঘরের দরজাটি খুলিয়া একটা সুদীর্ঘ কঙ্কাল মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে।

মূর্তি ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিল তারপর একটি কাগজ ও ফাউন্টেনপেন সম্মুখে রাখিয়া কহিল, 'কি রে দিবি তুই লিখে? এই নে কাগজ কলম, লিখে দে, 'আমি আমার প্রাপ্য সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া এই রসিদ লিখিয়া দিতেছি।' লিখে দে শীগ্‌গির।'

জহর কহিল, 'না, সে আমি দেব না। কিসের বাবদ প্রাপ্য, কত টাকা কিছুই জানি না।'

কঙ্কাল কহিল, 'বটে!'

'যারা আমার কাকাকে আটকে রেখেছে, যারা ময়নার মত কচি মেয়েকেও চুরি করে নিয়ে এসেছে, তাদের হুকুমে আমি বিন্দুমাত্র লিখতেও নারাজ।'

'বটে! তবে জেনে রাখ শুধু ময়নাকে নিয়ে এসেই আমাদের কাজ শেষ হয়নি। এই আমারই ইঙ্গিতে, তোর ঘর-দোর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চালাকি করতে এসেছিল দুটো ছোঁড়া বিনয় আর অতুল। বিনয়ের মুণ্ডু বোধহয় এতদিনে তার কাঁধের উপর থেকে খসে গেছে। আর অতুল? সে এখন নিশ্চিন্তে সুলতান দীঘির অতল তলে শেষ বিছানা বিছিয়ে শুয়ে আছে।'

'বিনয় আর অতুল বেঁচে নেই?' জহরের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।'

'না, তারা বেঁচে নেই। বেঁচে আছিস্ কেবল তোরা ক'টা লোক। তোর জবাবের উপর তাদেরও বাঁচা মরা নির্ভর করছে।'

'যারা এতবড় বদমায়েস্, এত বড় খুনে—জহর তাদের দেবে না—কিছুই দেবে না।'

'বটে!' কঙ্কাল তখনই একটা বাঁশীতে আওয়াজ করিল। তৎক্ষণাৎ দুইটি বিকটকায় মানুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

'নিয়ে এসো বন্দী,' কঙ্কাল আদেশ করিল।

মুহূর্ত পরেই দুইটি বন্দীকে সেখানে উপস্থিত করা হইল—একটি বিশ্বনাথবাবু, অপরটি ময়না।

ঘরের এক কোণ হইতে কঙ্কাল একটি চামড়ার চাবুক তুলিয়া লইল, তারপর চাবুকখানি জহরের কপালের সম্মুখে কয়েকবার নাচাইয়া কহিল, 'বেশ করে নিজে এটা দেখে নে—'

কঙ্কালের চাবুক সপাং সপাং করিয়া জহরের পিঠে পড়িতে লাগিল। জহর প্রথমে দু' এক ঘা চাবুক খাইয়া কাঁপিয়া উঠিল তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল 'ওরে বাবা রে, মেরে ফেল্লেরে!'

কঙ্কালের চাবুক সপাং সপাং করিয়া তাহার পিঠে পড়িতে লাগিল। চাবুকের প্রত্যেকটি আঘাত জহরের চামড়া ও মাংস ভেদ করিতেছে। রক্ত-ধারায় তাহার সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেল, সে আর সহ্য করিতে পারিল না—সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

কঙ্কাল কহিল, 'মাত্রা কিছু বেশী হয়ে গেল! তা যাক ক্ষতি নেই—কাল রাত্তিরে আবার ব্যবস্থা করা যাবে। কালই আমার শেষদিন, কাল আমি রসিদ আদায় করবই করব।'

কঙ্কাল একবার বিশ্বনাথবাবুর দিকে তাকাইয়া কহিল, 'কেমন বুড়ো, এই চাবুকের ক'ঘা তুই সহ্য করতে পারবি? আর ক'ঘা সহ্য করতে পারবে এই কচি মেয়েটা?'

বিশ্বনাথ কিছুই কহিলেন না। ময়না কঙ্কালের মূর্তি দেখিয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বিশ্বনাথবাবু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন।

কঙ্কাল তাহার অনুচরদিগকে বলিল, 'যাও, নিয়ে যাও এদের, আর এটাকে বন্ধ রাখো বেশ কড়া পাহারায়।' সে জহরকে দেখাইয়া দিল।

ঘরের পিছনে অতি নোংরা একটা জায়গায় লুকাইয়া থাকিয়া বিনয় সমস্তই বুঝিতে পারিল। চোখে দেখিতে না পাইলেও তাহার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। ইঞ্জিনীয়ার বলবন্ত সিংও সকলই বুঝিলেন। বলবন্ত সিং

কহিলেন, 'বিনয়বাবু! এখন চলুন, বেরিয়ে যাই। আজ আর আমাদের কিছু করবার নেই, বরং ধরা পড়লে ভয়ঙ্কর বিপদ। চলুন, বেরিয়ে যাই।'

গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে তাহারা বাহির হইয়া গেলেন। সর্দার বলবন্ত সিং আগে আগে যাইতেছিলেন। তিনি কহিলেন, 'এই সুড়ঙ্গপথ আমারই নক্সা অনুযায়ী তৈরী হচ্ছিল। চীয়াংলু আমায় বলেছিল যে, যদি কখনও কোন চোর-ডাকাতের আক্রমণ হয় তাহলে সে যাতে চুপি চুপি তার ধনদৌলত নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সে রকম একটা রাস্তা করতে হবে। সুড়ঙ্গপথ কাটতে কাটতে কি ভেবে জানি না চীয়াংলু আর আমাকে দিয়ে কাজটা শেষ করালো না। কাজেই সুড়ঙ্গপথের মুখটা পেট্রোল দোকানের বরাবর নীচ পর্যন্ত এল, আর বাড়ানো হয়নি। আমি উপর থেকে একটা রাস্তা কেটে সুড়ঙ্গপথের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। আজই প্রথম তার সদ্ব্যবহার করলুম বিনয়বাবু।'

উভয়ে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন। কিন্তু জহরের কাতর আর্তনাদ তখনও যেন তাঁহাদের কানে আসিয়া পৌঁছাইতেছিল।

॥ চৌদ্দ ॥

পাতালপুরীর বৈঠকে আজ নরক গুলজার।

চীয়াংলু কহিলেন, 'রাওজি কি হয়েছে সব খুলে বল।'

রাওজি কহিল, 'বিনয় ছোঁড়াটাকে ধরবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সে নিখোঁজ। পোঁটা ও পিন্টু বিনয়কে খুঁজতে গিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা তারা যখন সুলতান দীঘির ধারে ফিরে এলো তখন লম্বোদরের মৃতদেহ দীঘির জলে ভেসে উঠেছে, তার মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা আঘাত। তারা লম্বোদরকে ঘিরে বসে জটলা করছিল এমন সময় হঠাৎ একদল পুলিস তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তারা সবাই বন্দী হল।'

'আমাদের সাত-সাতটি লোক পুলিসের হাতে বন্দী হল। তারপর?'

'ঐ বিনয় ছোঁড়াটাই পুলিসকে সব খবর দেয় এবং তারই অনুরোধে পুলিস অমন হঠাৎ সুলতান দীঘিতে এসে হানা দিয়েছিল। পুলিস পাহারায় আমাদের লোকজন যখন থানার দিকে এগুতে থাকে, সেই সময় সুযোগ

পেয়ে আমাদের একজন লোক পালিয়ে এসেছে, তারই কাছে এই দুঃসংবাদ জানতে পারলুম। আমাদের এই লোকটা নরোত্তমপুর গ্রামের মাঝ দিয়ে আসবার বেলা আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে এসেছে। সে বল্লে, দলে দলে লোক নাকি সেখানে হাসপাতালে যাচ্ছিল। কতকগুলি ডাকাত নাকি একটা লোককে জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই জলে ডোবা ছেলেটা কেমন করে যেন রক্ষা পেয়েছে—সে তখন হাসপাতালে। আমাদের লোকটাও দেখে এসেছে সেই ছোঁড়াটা অতুল—যাকে আমার সমুখে সুলতান দীঘির জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুঝতে পাচ্ছি না জলে ডোবা মরা ছেলে আবার কেমন করে বেঁচে উঠলো?'

চীয়াংলু কহিল, 'সেও বিনয়েরই কাজ। সে পুলিসকে লেলিয়ে দিয়েছে।'

'হতে পারে।'

'তাহলে সংক্ষেপে আমি এই বুঝতে পাচ্ছি রাওজি, যে বিনয় ছাড়া পেয়েছে, অতুল বেঁচে উঠেছে, লম্বোদর খুন হয়েছে। আর পুলিস আমার সেখানকার দলবল সব ধরে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে খবর বার করে পুলিস এইখানে—এই কানপুর পর্যন্ত আসতে পারে—আমার কারখানা পর্যন্ত হানা দিতে পারে।'

'অসম্ভব নয়।'

চীয়াংলু একটু সোজা হইয়া বসিল। কহিল, 'তাহলে রাওজি আজই আমি সমস্ত শেষ করব। জহরের কাছ থেকে আজই আমি রসিদ আদায় করব। সবক'টা বন্দীকে এখানে নিয়ে এসো। আগে মেয়েটাকে জ্যান্ত রেখে তার পিঠের চামড়া তুলে নাও। তারপর বুড়োটাকে শিকে ফুঁড়ে শিক-কাবাব তৈরী কর। সকলের শেষে ঐ জহর ছোঁড়াকে আগুনে ঝল্‌সে ভাজা তৈরী কর। কিন্তু তার আগে আমায় কঙ্কাল সাজিয়ে দাও।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ঘরের চারিদিকে কেবল কতকগুলি কঙ্কাল মূর্তি—তাহাদের কতকগুলি জ্যান্ত কঙ্কাল আর কতকগুলি প্রাণহীন নরকঙ্কাল। তাহাদের মাঝখানে বসিল চীয়াংলু স্বয়ং, তাহার হাতের কাছে একটি শাণিত তরবারি আর একখানি চাবুক।

মিটমিটে আলোয় ঘরের ভীষণতা আরও শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

বন্দীদের আনা হইল। ঘরের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ময়না তো ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চীয়াংলু কহিল, 'আমি তোদেরই জন্য অপেক্ষা করছি। শোন জহর, আজ আমি রসিদ আদায় করবই করব। যদি রাজী হোস ভাল— তা নইলে আজই তোর শেষ দিন। আজ নরক গুলজার হয়ে উঠবে। যদি মঙ্গল চাস—তবে এখনো বিবেচনা কর। রসিদ আজ আমি চাইই।'

সরু তলোয়ারখানি কঙ্কাল হাতে তুলিয়া লইল তারপর কহিতে লাগিল, 'রাওজি, তুমি যা বুদ্ধির দৌড় দেখিয়েছ তা অসাধারণ। বিনয়কে হাতে পেয়েছিলে কিন্তু দলিলটি আদায় করেই তুমি তাকে ছেড়ে দিলে।'

কঙ্কাল রাওজির পাশে যাইয়া কহিল, 'রাওজি! আমার অনেকদিনের বন্ধু তুমি! কিন্তু তোমার একটা মারাত্মক ভুলে আজ আমার সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। তুমি নিজে বুঝতে পাচ্ছ কে এর জন্যে দায়ী?'

রাওজি ভয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

'তবে এই তোমার পুরস্কার!' সেই তরবারি প্রায় আমূল রাওজির বক্ষে চড় চড় করিয়া বিঁধিয়া গেল। সে চিৎ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

তরবারিখানি রাওজির বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিতে করিতে জহরের দিকে ফিরিয়া কঙ্কাল কহিল, 'এই তো মাত্র সুরু। তোদের দফা এখনো বাকি! রসিদের জন্য অনেক খোসামুদি করেছিলুম, তা দিস্‌নি। আর চাইনে রসিদ, তোর রসিদ ছাড়াও আমার কাজ আমি গুছিয়ে নিতে পারব। সঙ্কটা—সঙ্কটা—'

ভীষণ জোয়ান একটা লোক ঘরের মধ্যে আসিয়া কহিল, 'হুজুর।'

কঙ্কাল তাহার হাতে তরবারিখানি দিয়া কহিল, 'এই নে অস্ত্র। ঐ মেয়েটার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নে!'

সঙ্কটা অগ্রসর হইয়া ময়নার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং তরবারি দিয়া তাহার চামড়া ছাড়াইতে উদ্যত হইল। ময়না ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। জহর ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সঙ্কটাকে এক লাথি মারিল।

কঙ্কাল চীৎকার করিয়া কহিল, 'সঙ্কটা, জহরই আমার প্রথম বলি, ওরই গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নে। তোর বিনয়কে ডাক, সে এসে আজ তোদের রক্ষা করুক।'

'এসেছি, আমি এসেছি!' এক বলিষ্ঠ যুবক বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

'কে? কে তুই?' কঙ্কাল জিজ্ঞাসা করিল।

'কে আমি ? চিনতে পাচ্ছ না কঙ্কাল ? আমি বিনয়।'

কঙ্কাল চমকিত হইল। পর মুহূর্তেই বিনয় তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিল, কহিল, 'খবর্দার ! এক পা কেউ নড়েছ কি অমনি গুলী করব।'

দরজা ঠেলিয়া আরও একদল লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করিয়া পিস্তল। এটর্ণী মিঃ স্মিথ, ব্যবসায়ী মিঃ রস, ইঞ্জিনীয়ার বলবন্ত সিং ও পুলিসের লোক,—ইন্‌স্পেক্টর হাবিলদার, জমাদার, কনস্টেবল ইত্যাদি সবশুদ্ধ প্রায় পঁচিশজন লোক, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নির্বিচারে প্রত্যেকের হাতে হাতকড়ি পরাইতে লাগিল।

উপসংহার

চীনে চীয়াংলু-এর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গীরাও কেহ জেলখানায়, কেহ বা দ্বীপান্তরে।

জহর এখন আর সেই নিরন্ন নিঃস্ব জহর নাই, সে একজন ধনী ব্যবসায়ী। অতুল ও বিনয় এখন জহরলালের সহকর্মী, একই কারবারের অংশীদার।

মিঃ স্মিথ, মিঃ রস ও বলবন্ত সিং এখন জহরলালের সমগ্র পরিবারের বিশেষ বন্ধু।

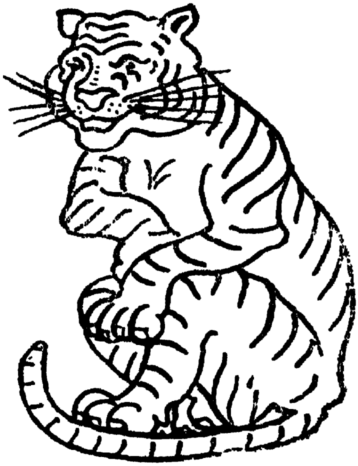
জহর তাহার স্কুলের নিকটে গরীব ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপন করিয়াছে এবং সদাশয় দাতা মিঃ মারিসনের নাম অনুসারে তাহার নাম দিয়াছে 'মারিসন হোস্টেল।'

সুরাষ্ট্রের জয়সেন ছিলেন মস্ত পণ্ডিত। সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁকে বললেন—আমি আপনাকে কিছু প্রণামী দিতে চাই।

—কি প্রণামী ? জয়সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

—উৎকলের আশিটি নগর আপনাকে দোব।

—প্রয়োজন নেই। জমিদারী দেখতে হলে আমার ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রচর্চায় ক্ষতি হবে। আমি যেমন আছি সেই ভালো। আমায় ক্ষমা করুন, মহারাজ!



যা ইচ্ছে তাই * ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগ করে বাঘ বলে—আমি হলাম কেন বন্য।
বাঘ না হয়ে হতে পারতাম যা হক কিছু অন্য।
হতে পারতাম গর্দভ কি হতে পারতাম শিয়াল,
হতে পারতাম ইউকেলিপটাস, হতে পারতাম দিয়াল।
হতে পারতাম হেডমাস্টার মান্য এবং গণ্য।
না হয় কিছু নাই বা হলাম—হতাম শুধু লক্ষী
ভুলে যেতাম গাঁ গাঁ করা এবং ধরা পক্ষী।
ভুলতে পারতাম হিংসা আদি—হয়ে ওঠার জন্য—
সুঁদর বনের ব্যাঘ্র ছাড়া—যা হক কিছু অন্য।



ঘাসীরাম লোটাওয়ালা * শ্রী সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

চারিদিকে দেওয়াল। ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে একটা বাগান। সেই বাগানের পেছনে বাড়ী। বাগানে ঘাসের ওপর মনের সুখে দু' পা ছড়িয়ে বসে গল্পের বই পড়ছিল ভুলু। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন খাওয়া, ঘুম, খেলা আর গল্পের বই পড়া। একটু দূরে ছোট ভাই দিলু। মুখে তার হাসি নেই। বারে বারে চোখের কোণ দিয়ে দাদাকে দেখছে। তার দুঃখের কারণ হ'ল এই, যে, দাদা তো স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাকে থাকতে হবে এখনও কয়েক বছর। কবে যে দাদার মত বড় হয়ে স্কুল ছাড়বে কে জানে?

"আরে, ভুবনদা' যে! এস এস। তার পর কি মনে করে?" স্কুলের হেড-পিওন ভুবনেশ্বরকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে ভুলু অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রশ্ন করল। ভুবনের বয়স আশী। তবু সোজা হয়ে চলে। কালো পায়জামা, কালো বুকবন্ধ লম্বা কোট। কোমরে স্কুলের নামে ব্রোঞ্জের প্লেট-বসানো চামড়ার বেল্ট। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ী। কপালে চন্দন আর সিঁদুরের তিলক। কলকাতার একশ' বছরের পুরোনো স্কুলটির আশী বছরের হেড-পিওন ভুবনকে এই সাজপোষাকে দেখে আসছে হাজার হাজার ছেলে বছরের পর বছর। পেনসন সে চায় না। আজ ষাট বছর কাজ করে চলেছে নিখুঁত ভাবে। তাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ কিছু বলেন না।

"বাবুর কাছে এসেছি। বখ্‌শিস চাই।" ঘাসের ওপরে বসে উত্তর দিল ভুবন।

ভুলু হাসে, "পরীক্ষার ফলটা বের হোক আগে।"

ভুবনও হাসে, "জগড়নাথোর কৃপায় তোমাকে আটকাবে কে?"

ভুবনের দেশ উড়িষ্যার কটক জিলায়। কিন্তু বাংলা বলে বাঙালীর মতই। তবে জগন্নাথকে এখনও বলে জগড়নাথো।

তার পর কথা উঠল বড় হয়ে কে কি হবে। ভুলু জানালো সে ব্যবসা করবে। কারণ বাণিজ্যেই লক্ষ্মীলাভ হয়। তবে ছোটখাট ব্যবসায় সে নামবে না। ভুলুদের বাড়ীর দু'শো গজ পশ্চিমে এক বিরাট কাঠের গোলা আর কারখানা। রাত্রিদিন কলের করাতে চিঁ-চিঁ শব্দ আর ছুতোরের খট্ খটা খট্। তিন শ' লোক কাজ করছে চব্বিশ ঘণ্টা। ভুলু পশ্চিম দিক্ দেখিয়ে বলে, "ব্যবসা যদি করতে হয়, তবে কাঠের ব্যবসা। ইয়া লম্বা লম্বা আকাশ-ছোঁয়া গাছ নিয়ে আসব আসাম, বর্মা আর আন্দামান থেকে। বড় গোলা করব, কারখানা বানাবো।"

ভুবনের দৃষ্টি পড়ল দিলুর ওপর। তার দিকে চেয়ে বলে, "আর তুমি কি হবে দিলু বাবু?" দিলুর মেজাজটা ভাল ছিল না। ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে জবাব দিল, "এখনও স্কুলে পচতে হবে কয়েক বছর। যখন বড় হব, তখন ভেবে দেখব কি হব।" তার পর থেমে কি যেন ভেবে হঠাৎ বলে ওঠে, "আমার দ্বারা কিছু হবে না। ঘোড়ার ঘাস কাটব আমি।"

ভুবন হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। "ঠিক বলেছ দিলু বাবু! ঘাসই হচ্ছে আসল চীজ্। কাঠ আবার একটা জিনিস? আরে ছো ছো! তার আবার ব্যবসা! কত বড় টিম্বার মার্চেন্ট লছমন তেওয়ারী! বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, কলিকাতা আর গৌহাটিতে তার অফিস। সেই টিম্বার মার্চেন্ট লছমন তেওয়ারীকে হাত জোড় করে ঘাসীরাম লোটাওয়ালার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল।"

"ঘাসীরাম! সে আবার কে?"

ভুবন হাসিমুখে বলে, তোমাদের বাঙলা দেশে একটি চলতি কথা আছে, কি করছ, কি করবে? উত্তর হ'ল ঘোড়ার ঘাস কাটছি, ঘোড়ার ঘাস কাটব। এই কথা কেন হ'ল? আমার মনে হয় ঘাসীরাম লোটাওয়ালা

এই কথার জন্য দায়ী। কারণ, ঘাসীরাম ঘোড়ার ঘাস কেটে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ঘাস কেটেও লক্ষীলাভ করা যায়।"

"বিশ্বাস করি না।" চেঁচিয়ে ভুলু বলে।

ভুবনও বলে, "চল আমার সঙ্গে তোমরা দু'ভাই। আগে ঘাসীরামের বাড়ী-ঘর দেখাব, তার পর তার গল্প শোনাব।"

বাড়ীর গাড়ী চেপে ভুলুরা তিনজন কলকাতার সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। সামনে পাঁচতলা এক বাড়ী, লম্বায় প্রায় রাইটার্স-বিল্ডিং-এর মত। বাড়ীর মধ্যে সাড়ে তিন ঘরের শ' খানেক ফ্ল্যাট। ভুলু আর দিলুকে নিয়ে ভুবন ভেতরে ঢুকল। ভেতরে একতালায় অনেকটা ফাঁকা জায়গা, বড় বড় ঘাসে ভর্তি। তার মধ্যে সাদা পাথরের বুক পর্যন্ত এক মানুষের মূর্তি। মূর্তির নীচে লেখা—বাঙলা হিন্দী আর ইংরেজীতে—'ঘাসীরাম লোটাওয়ালা, জন্ম ১৮৩৫ সাল, মৃত্যু ১৮৯৬ সাল।' ভুবন জানাল এ রকম পাঁচটা বাড়ীর মালিক ছিল এই ঘাসীরাম। এ ছাড়া ছোটখাট বাড়ী যে তার কত ছিল তার ঠিক নেই।

গাড়ী ছুটে চলেছে বাড়ীর দিকে। ভুলু একেবারে চুপ। ভুবনেশ্বর বলে চলেছে: "১৮৮৪ সালে কটকে আমার জন্ম। উনিশ বছর বয়সে ১৮৯৩ সালে কলকাতায় আসি। আমার দেশের একজন লোক গঙ্গার ঘাটে যাত্রীদের তেল মাখাতো আর গা-হাত-পা টিপত। আমিও সেই ব্যবসা ধরলাম। একদিন তেল মাখাতে আর গা টেপাতে এল একটি লোক। যেমনি মোটা তেমনি লম্বা। ঢাকাই জালার মত তার ইয়া বড় ভুঁড়ি। এই লোকেরই নাম ঘাসীরাম লোটাওয়ালা। আমার সেবায় খুসী হয়ে বাঁধা মাইনে দিয়ে নিয়ে এল তার বাড়ীতে। এক বছর চাকরী করি। বেশ আরামে ছিলাম। কিন্তু একদিন ঝগড়া হ'ল। ও বলেছিল, হনুমানজি বড়। আমি বলেছিলাম, জগড়নাথো। একশো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় করে দিল আমাকে। তার দু' সাল পরেই ১৮৯৬ সালে ঘাসীরাম পটল তুললো।"

একটা পান মুখে ফেলে ভুবন বলে, "আমার মতই কলকাতার টানে কলকাতায় এল এক বিহারী, নাম রামসিং। ট্রেন থেকে হাওড়া স্টেশনে নামলো ডান-হাতে লোটা আর বাঁ-হাতে কম্বল নিয়ে। কাপড় বলতে এক গামছা, সেটাই পরেছে। কোথায় যাবে ঠিক নেই, তাই প্লাটফরমেই থেকে গেল মাস কয়েক। মোট পেলে বইত। কিন্তু বেশী দিন থাকতে পারল না।

যাত্রীদের বাক্স-প্যাঁটরা চুরি হ'ল কয়েকবার। পুলিশের ধমক খেয়ে পথে এসে দাঁড়াল রামসিং। তারপর থেকে সে ঝাঁকামুটে। আড্ডা ছিল থিয়েটার রোডের কাছে গড়ের মাঠে এক গাছতলায়। এখানে ছাতু বিক্রী করত এক হিন্দুস্থানী সেই গাছের নীচে বসে। অনেক হিন্দুস্থানী এখানে এসে বসত, ছাতু খেত, গল্প করত। ভগলুও আসত। সে ঘাস কেটে সেই ঘাস বিক্রী করত। ভগলুর অনেক বয়স। রামসিংকে পেয়ে আধাআধি বখরায় ঘাসকাটার কাজে লাগিয়ে দিল তাকে।

"সেদিন ছিল এক রবিবার। খুব সকালে রামসিং গড়ের মাঠে ঘাস কাটছিল। পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এক সাহেব যাচ্ছিলেন। একটু এগিয়েই ঘোড়াটা শুয়ে পড়ল মাটিতে। সাহেব তো ভ্যাবাচাকা। দৌড়ে এল রামসিং। লম্বা এক সেলাম ঠুকে বলল, ঘোড়াটার নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া হয়েছে। (কথাটা সে নতুন শিখেছিল) আর হবেই না কেন? ঘোড়াকে যে ঘাস দেওয়া হয় তার মধ্যে মশার ডিম থাকে। খুব ভাল করে দেখে তবেই ঘাস কিনতে হয়। "তুমি জানলে কি করে?"—সাহেব প্রশ্ন করলেন। "হুজুর, আমি যে ঘাস বিক্রী করি। আমার ঘাস দেখুন। একটা মশার ডিম খুঁজে বার করুন তো?" সাহেব অত শত জানতেন না। রামসিং-এর কথা শুনে তার ওপর ভারী শ্রদ্ধা হ'ল তাঁর। ম্যালেরিয়াকে তিনি যমের মত ভয় করতেন।

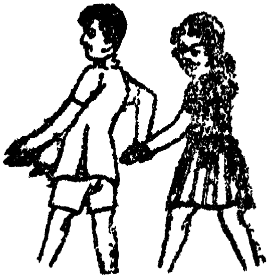
"এখন ঐ সাহেব ছিলেন সৈন্য বিভাগের সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের খোদ কর্তা। নাম মেজর জেনারেল স্মিথ। তিনি ভাবলেন যে সিপাহী-বিদ্রোহের মত যদি আরও একটি বিদ্রোহ হয় এবং সেই বিদ্রোহ দমন করবার সময় যদি সরকারের অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া ম্যালেরিয়ায় অক্রান্ত হয়ে পড়ে যায়, তবে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শেষদিন এসে যাবে। সেইজন্য এর পর থেকে রামসিংএর কাছ থেকেই তিনি ঘাস নিতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে, সাহেবের আস্থা কুড়িয়ে, রামসিং গোটা সৈন্য বিভাগে ঘাস সরবরাহ করবার মোটা কন্‌ট্রাক্ট পেয়ে গেল। এই সাহেবই রামসিং-এর নাম দিলেন ঘাসীরাম লোটাওয়ালা। ঘাসের কণ্ট্রাক্টর রাম, তাই ঘাসীরাম। আর তার সম্বল বলতে ছিল একটা লোটা, সাহেব সেটাও দেখেছিলেন। তাই তার উপাধি হ'ল লোটাওয়ালা। সে যুগে মোটর গাড়ী চালু হয়নি, সৈন্য বিভাগে মাল টানার জন্য আর অশ্বারোহীর জন্য ঘোড়া, গাধা আর খচ্চর ব্যবহার

করা হ'ত। এই সব জানোয়ারের প্রধান খাদ্য ছিল ঘাস। লাখ লাখ জানোয়ার—তাদের ঘাসের কণ্ট্রাক্ট পেলে একা ঘাসীরাম লোটাওয়ালা। দেখতে দেখতে তার ব্যবসা ফেঁপে উঠল। শেষে দেখা গেল প্রায় দশ হাজার লোক তার ঘাস কাটছে সারা হিন্দুস্থানে। জাহাজ আর রেল বোঝাই হয়ে সেই ঘাস চালান যাচ্ছে নানা ক্যান্টনমেণ্টে আর ফোর্টে!"

আর একটা পান মুখে দিয়ে ভুবন বলে, "সেবার ব্রহ্মপুত্র নদী বেয়ে আসাম থেকে ঘাস বোঝাই ষ্টিমার আসছিল কলকাতা। ঐ সঙ্গে জলে ভাসতে ভাসতে আসছিল টিম্বার মার্চেণ্ট লছমন তেওয়ারীর বড় বড় কাঠের তক্তা। সেই ভেসে-আসা কাঠের ধাক্কা লেগে ষ্টিমার জখম হ'ল। সেজন্য দেরী হ'ল কলকাতা আসতে। এই ব্যাপার নিয়ে দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি সুরু হ'ল। তেওয়ারী বলেছিল, ঘাস আবার একটা জিনিষ, তার আবার মার্চেণ্ট! ছোঃ ছোঃ।'

"ঘাসীরামের কানে এল কথাটা। কিন্তু সে কিছুটি বলল না। উপরন্তু, করল কি, পাটনায় তেওয়ারীর নিজের যে ব্যাঙ্ক ছিল সেইখানে কুড়ি লাখ টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলল। তার পর হঠাৎ একদিন সব টাকা একসঙ্গে উঠিয়ে নিতে এল। এখন, ব্যাঙ্কের টাকা তো ব্যাঙ্কে পড়ে থাকে না,—ব্যবসায় খাটে। কাজেই এত টাকা ব্যাঙ্ক চট্ করে দিতে পারে না। ঘাসীরাম সারা পাটনায় লোক লাগিয়ে কথাটা রটিয়ে দিল—তেওয়ারীর ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারছে না। আর যাবে কোথায়? ব্যাঙ্ক তাহ'লে ফেল পড়ছে? দলে দলে লোক ব্যাঙ্কে একসঙ্গে ছুটে এল টাকা তুলবার জন্য। তেওয়ারী খবর পেল এর মূলে কে? দৌড়ে এল খালি পায়ে, হাত জোড় করে দাঁড়াল ঘাসীরাম লোটাওয়ালার সামনে। কাঁপতে কাঁপতে বললে, সে সারা জীবনের জমানো টাকা দিয়ে এই ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছে। এ ব্যাঙ্ক ফেল পড়লে তাকে পথে বসতে হবে। তা ঘাসীরাম লোটাওয়ালা হনুমানজীর চেলা, ভক্তের কথায় গলতে সময় লাগল না তার। সে তেওয়ারীকে ক্ষমা করল। তবে সবাই বুঝে গেল ঘাসের ব্যবসা কাঠের চেয়েও অনেক বড়।"

ভুবনের গল্প শেষ হলে ভুলু আর দিলু দু'জনেই অবাক্। তাহ'লে পৃথিবীতে কিছুই তুচ্ছ নয়! এমন কি ঘাসও!

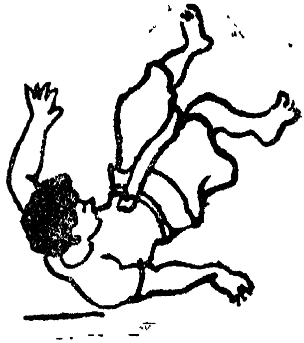


ভাই বোন

*

শ্রী পলাশ মিত্র

তারা পাঁচ ভাই-বোন
সে কথাই বলি শোন্
ছেলে মেয়ে তারা খুব ঠাণ্ডা



ছেলেটা বেড়াল ধরে
উল্‌টে পিছনে পড়ে
হাতে তার ইয়া মোটা ডাণ্ডা।
ছেলেটার নাম চাঁদু,
এক বোন বুলু,
অন্যেরা শোভারাণী,
ঝাঁপি আর টুলু :



কেউ নাচে,
কেউ গায়,
কেউ ডিগবাজি খায়,
দুধের গেলাসটায়
কেউ ঢালে জল,
চুনের বাটিটা নিয়ে
মেশায় তেল আর ঘিয়ে,
মা বলেন,—পারিনেকো,
কোথা যাই বল?



চীনে পট্‌কা আর ছিনে জোঁক * শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত

আসলে ওরা তু'জনে মাসতুতো ভাই, কিন্তু কেউ কারুকে চেনে না।

রোগা লিক্‌লিকে আর টিংটিঙে শরীরটার ওপর পাঁচ নম্বরের ফুটবলের মতো হেঁড়ে মাথা নিয়ে, চিন্‌সুরা বা চুঁচড়োয় জন্মেছিল বলে, দাতু ওর নাম রেখেছিলেন চীনু।

আর, পেটমোটা বেঁটেখাটো ছেলেটা ছাতিমতলায় জন্মেছিল, তাই ছেলেবেলা থেকেই দাতু তাকে ছানু বলেই ডাকতেন।

চীনু আর ছানু, তু'জনেই প্রায় সমবয়সী।

কিন্তু চুঁচড়ো আর ছাতিমতলা, বাংলাদেশের মধ্যে হলেও, তু'টো নেহাৎ কাছে নয়।

ছেলেবেলায় মায়ের কোলে চড়ে তু'জনেই দাতুর কাছে বার কয়েক এসেছিল। বুড়ো দাতু তাদের দেখে খুশী হয়েছিলেন আর আদর করে তাদের নামও রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের জন্মের কিছুদিন পরেই দাতু মারা গেলেন। তাদের মা আর মাসী ছাড়া দাতুর আর কোন ছেলেপুলে, মানে তাদের মামাটামা, কেউ ছিল না। দাতুর আগেই দিদিমা সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে, স্বর্গে গিয়ে দাতুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাই তারা কেউ আর মামার বাড়ীতে আসবার সুযোগ পায় নি।

বনগাঁয়ের বনের শেষ দিক্‌টায় দাতুর বনেদী বাড়ী। বিষয় সম্পত্তিও প্রচুর। ব্যাঙ্কেও অনেক টাকা। দাতুর উচিত ছিল, তাঁর জমি-জমা সব

তাদের দু'জনের নামেই সমান বখরা করে দিয়ে যাওয়া। তা নয়, দাদু কিনা একটা উইল করে গেছেন—'সাবালক হয়ে চীনু আর ছানু দু'জনের মধ্যে যে চালাকি বুদ্ধিতে রোজগার করে আগে দশ হাজার টাকা জমাতে পারবে সে-ই তাঁর টাকাকড়ি আর বিষয়-সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক হবে।' সে উইলখানা রাখা আছে কলকাতার এক বুড়ো উকিলের কাছে।

দাদুর উইলের খবরটা তাদের মা-বাবা জান্‌তে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অনেক পরে। ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেইজন্যে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

চুঁচড়োর চৌধুরী অ্যাকাডেমীতে চীনু ভর্তি হয়েছিল ঠিক সময়েই। টিংটিঙে শরীরে তার হেঁড়ে মাথাটা ছেলেবেলা থেকেই খুব পরিষ্কার ছিল। কাজেই ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী, গণিত আর বাংলা সব সাবজেক্টগুলোই ছিল তার নখদর্পণে। তবু পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নপত্রের যে সব উত্তর সে লিখে আসতো, তাতে মাস্টারমশাইরা তাকে বাগবাজার-মার্কা যে নম্বর দিতেন, তাতে বাইশ বছরেও সে ক্লাস এইট ছাড়িয়ে নাইনে উঠতে পারলো না কিছুতেই।

দাদুর সম্পূর্ণ বিষয় সম্পত্তি তো তার কপালেই লেখা আছে, তাই, ধুত্তোর বলে, চীনু ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে পাড়ায় মাতব্বরী করে বেড়াতে থাকে।

বাড়ীতে চারবেলা চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খায়দায়, আর পাড়া-বেপাড়ায় সে এখন আজগুবি খবর পরিবেশন করে।

টিংটিঙে শরীরে হেঁড়ে মাথা আর হেঁড়ে গলায় তার 'বক্তিমের' ধরন আর কথাবার্তার রকম-সকম দেখে, চীনু নামটা ভুলে গিয়ে, সবাই তার নাম দিয়েছে 'চীনে পট্‌কা'।

* * * * *

ছাতিমতলার ছানু ছেলেবেলা থেকেই পেটরোগা। যা খায় তা বেশীক্ষণ পেটে রাখতে পারে না। ক্ষিদে পায় তার অনবরত। খাবার জন্যে সে ঘ্যান ঘ্যান করে, মায়ের আঁচল ধরে তাঁর পেছু পেছু ঘুরে ঘুরে তাঁকে জ্বালাতন করে সারাক্ষণ। একটু কিছু খাবার জিনিস না পাওয়া পর্যন্ত তার খুঁৎখুঁতুনির বিরাম নেই। বিস্কুট, লজেন্স, টফি, চকোলেট, নিদেনপক্ষে একটু গুড় কি চিনি তার চাই-ই চাই। যতক্ষণ সে হাতে কিছু না পাচ্ছে ততক্ষণ মায়ের আঁচল সে কিছুতেই ছাড়ে না।

বিরক্ত হয়ে তার হাতে একটু কিছু গুঁজে দিয়ে মা বলেন,—"ছানু নয় তো, যেন ছিনে জোঁক।"

মায়ের কাছ থেকেই আদায় করে সে তুষ্ট হয় না। ফাঁক পেলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে।

ঢাউসপানা পেটটা নিয়ে সে জুল্‌জুল্ করে সবার খাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ হাতে কিছু না পায় ততক্ষণ সেখান থেকে নড়ে না।

তাই, তার মায়ের দেওয়া 'ছিনে জোঁক' নামটাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ছিনে জোঁক বড় হলো। বয়স বাড়লো কিন্তু তার হাতে-খড়ি হলো না। মা তার ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হন। লেখাপড়া শিখে ছেলেটা যদি একটু চালাক চটপটেও হতে পারতো, তাহলে তার দাদুর সম্পূর্ণ সম্পত্তিটার মালিক হতে পারলে আর ভাবনা কি? লোকমুখে, চিনসুরার চীনে পট্‌কার কত কথাই ছানুর মায়ের কানে আসে, আর নিজের ছেলের হ্যাংলাপানা ক্যাংলা মুখখানির দিকে চেয়ে কপাল চাপড়ে ভাবেন—খেতে যখন এতই ভালোবাসিস্, তখন কত খাবি খা না! সারা জীবন খেয়েও দাদুর সম্পত্তি শেষ করতে পারবি না।

ছানু এখন সাবালক হয়েছে।

দাদুর উইলের কথাটা ছানুর মা একদিন ছেলের কাছে প্রকাশ করে ফেলেন।

শুনে, চোখ বড় বড় করে ছানু বলে,—"ও মা, তাই নাকি!"

উকিলবাবুর ঠিকানাটা জেনে নিয়ে সেইদিন থেকে ছানু মনে মনে ভাবতে থাকে, কলকাতায় গিয়ে উকিলবাবুকে তার চালাকি-বুদ্ধি দেখিয়ে আর দশ হাজার টাকা জমিয়ে সে দাদুর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে, আর দেখিয়ে দেবে যে ফোঁপরদালাল চীনে পট্‌কার চেয়ে ছিনে জোঁক কিছু কম যায় না।

মনে মনে ঠিক করে, কারুকে কিছু না বলে, একদিন রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি বাড়ী ছেড়ে সে কলকাতার পথে পাড়ি জমায়।

উকিলবাবু ক্রমশঃ আরো বুড়ো হয়ে পড়েছেন।

বনগাঁয়ের দাদুর উইল নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় আছেন। এমন সময় একদিন সকালে টিংটিঙে চীনু এসে তার পরিচয় দিয়ে বলে,—"আমি চিনসুরার চীনু।

আমায় দেখেই আপনি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন, আমি কি করম চট্‌পটে। দাদুর উইলের কথা জানতে পেরেই, আপনার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে কলকাতায় এসে আপনার বাড়ীটা খুঁজে বার করতে আমার একটুও কষ্ট করতে হয় নি। সেই জন্যেই তো চুঁচড়োর সবাই আমাকে চীনে পট্‌কা খেতাব দিয়েছে।"

উকিলবাবু বলেন,—"বেশ। এখন, তোমার দাদুর উইল মতো, দশ হাজার টাকা রোজগার করে যেদিন আমাকে দেখাতে পারবে, সেইদিনই আমি তোমাকে তোমার দাদুর বিষয়-সম্পত্তি আর নগদ টাকাকড়ি সব পাইয়ে দেবো।"

চীনু বলে,—"বেশ কথা। কিছুদিন আমাকে সময় দিন। দশ হাজার কেন, তার চেয়েও ঢের বেশী উপায় করে আমি আপনার কাছে শীগ্‌গিরই আসব।"

উকিলবাবু তাকে মনে করিয়ে দেন,—"কিন্তু তোমার সেই মাসতুতো ভাই, কি যেন তার নাম, ছানু না ছিনে জোঁক,—তার আগেই কিন্তু তৈরী হয়ে আসা চাই। সে কথা যেন ভুলে যেও না।"

চীনু তার লিক্‌লিকে হাত-পা নেড়ে, মুখে একটা ফুৎকার দিয়ে বলে,—"ফুঃ! মার কাছে শুনেছি, সেটা একটা পেটরোগা হ্যাংলা। গাড়ু হাতে কোন্‌দিন সে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে। তার জন্যে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। দাদুর সম্পত্তিটা আমার নামে লিখে রাখবেন।"

বলেই টিং টিং সিং চীনে পট্‌কা ট্রামে চড়ে টালার দিকে চলে যায়।

কিছু পরেই ছানু এসে উকিলবাবুকে তার পরিচয় দেয়।

তার সব কথা শুনে উকিলবাবু তাকেও ঠিক সেই কথাই বলেন।

ছানু সেখানে আর তিলার্ধ সময় দাঁড়ায় না। সেও ট্রামে চড়ে টালিগঞ্জের দিকে রওনা হয়।

* * * *

দুই মাসতুতো ভাই।

চীনু আর ছানু।

একজন টালায় আর একজন টালিগঞ্জে।

কেউ কারুকে চেনে না আর জানেও না।

কিন্তু দেখাশুনো তাদের ঠিকই হলো। আর দু'জনের মধ্যে বুদ্ধির খেলাও শুরু হয়ে গেল। এইবার সেই কথাই বলি :

টালায় এসে জলকলের এককোণে, ভাঙ্গা একটা পুরোণো বাড়ীতে চীনু তার আস্তানা গেড়ে বসলো। খুঁজে খুঁজে সব রক্‌বাজ ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, গল্পগুজবে মোহিত করে তাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করতে করতে, হাতসাফাইয়ের ব্যবসা করে বিনা মূলধনে সে কিছুদিনের মধ্যেই উপার্জনের বেশ একটা ফন্দি বার করে নেয়।

হাতে তার কিছু টাকা জমতেই নানা রকম পোযাক-পরিচ্ছদে সে দিনের মধ্যে বিশবার ভোল বদলে নানা পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়।

দশ হাজার টাকা জমতে তার আর বেশী দেরী নেই। শীগ্‌গিরেই সে দাদুর সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হতে চলেছে। এখন তার স্টাইল বদলানো উচিত বৈকি! ভাঙ্গা বাড়ীটাকে অন্ততঃ চুণকাম করানো দরকার।

চুণের গুদামে গিয়ে সে তিন থলে চুণের অর্ডার দিয়ে এসেছে।

এদিকে, টালিগঞ্জে এসে ছানু এক বড়লোকের বাড়ী ঢুকে পড়েই, থেলো হুঁকো হাতে, কর্তা-ব্যক্তির মতো একজন লোককে দেখে বলে,—"বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে!"

থেলো হুঁকো হাতে ভদ্রলোকটি খিঁচিয়ে উঠে বলেন,—"তোমার ক্ষিদে পেয়েছে তো আমি কি করবো?"

ছানু সেইখানে ধপ্‌ করে বসে পড়ে বলে,—"আজ্ঞে, পেট ভরে চাট্টি খেতে দেবেন। তা ছাড়া আপনি আর কি করতে পারেন বলুন?"

হুঁকোটা দালানের কোণে ঠেকিয়ে রেখে ভদ্রলোক আরো খিঁচিয়ে বলেন,—"তোমাকে চাট্টিখানি দিয়ে পেট ভরে খাওয়াতে যাবো কেন হে?"

নির্বিকারচিত্তে নিজের ঢাউসপানা পেটটায় হাত বুলিয়ে ছানু বলে,—"আপনি ছাড়া আর কে খেতে দেবে বলুন? এখানে কি আর আমার মা আছেন যে—"

ছানুর ছল্‌ছলে চোখ আর কান্না-চাপা ধরা গলার আওয়াজে, তার শুক্‌নো মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকটির মনে দয়া হয়। তিনি তার সেদিনের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

এই রকম করে রোজই এ-বাড়ী, ও-বাড়ী, সে-বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ছানু তার খাওয়াটা জুটিয়ে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু রোজগারেরও চেষ্টা করে।

কোন্ বাড়ীতে বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের খোঁজ রাখতে রাখতে ছান্নু টালিগঞ্জ থেকে চৌরঙ্গী, এসপ্লানেড, বৌবাজার, বাগবাজার, শ্যামবাজার পেরিয়ে, নাড়ীর টানে কবে যে টালায় এসে পৌঁছেছে, তা সে নিজেও জানতে পারে নি।

সেদিন সকালে মুটের মাথায় তিন বস্তা চূণ দেখে, সেগুলোকে ময়দার বস্তা মনে করে ছান্নুর মনে আনন্দ আর ধরে না। নিশ্চয় কারো বাড়ী বিয়ে কিংবা শ্রাদ্ধের ভুরিভোজের আয়োজন হচ্ছে। নইলে, একসঙ্গে তিন মণ ময়দা, এই সাত সকালে যায় কোথায় ?

ছান্নু মুটেদের অনুসরণ করে তাদের পেছু পেছু চলতে থাকে।

মুটেগুলো একটা ভাঙ্গা বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়।

ছান্নু সেই বাড়ীর দোর গোড়াতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে।

খানিক পরেই, ডোরাকাটা পাজামা আর চীনে-কোট পরে, বাড়ীর কর্তা বেরিয়ে এসে, দোর-গোড়াতেই ছান্নুকে দেখে জিজ্ঞেস করে,—“কে হে বাপু তুমি ? কি দরকার তোমার এখানে ?”

বিনয়ের অবতারের মতন হাত কচলাতে কচলাতে ছান্নু বলে,—“আজ্ঞে, তা একটু দরকার আছে বৈকি! মানে, এই জানতে চাইছিলুম—বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ কিংবা হয়তো খোকার অন্নপ্রাশন।”

বাড়ীর মালিক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—“হেঁয়ালী রেখে সোজা কথা কও তো বাপু!”

বাবু হয়ে বসে হাঁটু নাচাতে নাচাতে, ফিকে হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে ছান্নু বলে,—“আজ্ঞে, তা একটা কিছু নিশ্চয় আছে বৈকি। নইলে তিন মণ ময়দা—”

তার মুখের কথা শেষ হতে পায় না। বাড়ীর মালিক তাকে আচ্ছা বোকা ঠাউরে হো হো করে অট্টহেসে বলে,—“আরে, মুটের মাথায় যা এলো তা ময়দা হতে যাবে কেন ? চূণ হে বাপু, চূণ। তুমি বুঝি ওগুলোকে ময়দা-ভরা বস্তা মনে করে, এটাকে একটা যজ্ঞি-বাড়ী ভেবে, আসনপিঁড়ি হয়ে আড্ডা গেড়ে বসেছ ? যাও যাও, সরে পড়ো।”

বিনীত হাসিতে মুখখানাকে উজ্জ্বল করে ছান্নু ন্যাকা-ন্যাকা সুরে বলে—“আজ্ঞে, এই অবেলায় সরে আর পড়বো কোথায় ? বাড়ীতে চূণ যখন এসেছে তখন চূণকামের পরেই যজ্ঞি একটা নিশ্চয়ই হবে। তবে একপাত না খেয়ে সরে পড়ি কি করে বলুন ?”

রেগে উঠে বিরক্ত হয়ে বাড়ীর মালিক বলে,—"আচ্ছা এক ছিনে-জোঁকের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি!"

—"তা, যা বলেছেন সত্যি! খুবই সত্যি কথা। কিন্তু, যজ্ঞি-বাড়ী পাত না পেড়ে আমি তো কিছুতেই নড়তে পারি না বাবু।" বলে ছানু ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লোকটাকে খুব বোকা ঠাউরে, বাড়ীর মালিক একটু সুখ-সুবিধে পাবার আশায় তাকে জিজ্ঞেস করে,—"যজ্ঞি না খেয়ে তুই নড়বি নে তা তো বেশ বুঝতে পাচ্ছি। দাদুর সম্পত্তিটা পেলে, খুব বড় রকম যজ্ঞি অবশ্যই একটা হবে। তার আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু খেটে খাবার মুরোদও যে তোর আছে তা তো দেখে মনে হয় না! বলি, কাজকর্ম কিছু করতে পারিস?"

এতক্ষণে ছানুর কাছে ব্যাপারটা যেন কেমন খোলসা হয়ে আসে। তাই, মুখখানা আরো ন্যাকা-ন্যাকা করে, বোকার মতো স্বরে বলে,—"আজ্ঞে, কি যে বলেন বাবু! কাজকর্ম আমি সবই করতে পারি। দিয়েই দেখুন না।"

চুণকাম করাবার মিস্ত্রীর মজুরীটা বাঁচাবার তালে বাড়ীর মালিক বলে,—"আমার এই ঘরটাকে বেশ করে চুণকাম করে দিতে পারবি?"

ঘাড় কাৎ করে ছানু বলে,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখবেন। আপনার তিন বস্তার তিন মণ তো লাগবেই না, এক মণের এক থলেতেই সব সাফ্‌সুৎরো করে চুণকাম করে দেবো। দু' বস্তা চুণ আপনার বাঁচিয়ে দিলে এক বস্তা কিন্তু আমার চাই।"

চুণের মালিক খুশী হয়ে বলে,—"বেশ, তা না হয় নিস্‌। ঘরটা চুণকাম করার পর সারাদিন আমার ঘরদোর সব আগ্‌লাবি। আর ঐ কোণের দিকে আমার রান্নাঘর। রান্না-বান্নার সব জিনিস ওখানেই পাবি। আজকে রান্না করে খাওয়া দিকি! তোর কাজকর্ম দেখে, পরে তোর মাইনে ঠিক করে দেবো।"

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। ছানু তাকে আগেই চিন্‌তে পেরেছিল, আর বুঝতেও পেরেছিল যে চিন্‌সুরা থেকে চীনে-পট্‌কাও ঠিক একই মতলবে কলকাতায় এসে টাকা যোগাড় করছে। তাই, চীনুর কথায় যেন পরম কৃতার্থ হয়েছে এমনি ধারা মুখখানা করে, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে হেসে ছানু চুণকাম করার কাজে লেগে যায়।

তারপর রান্নাবান্না, চীনুর স্নান করবার জল তোলা, তাকে ডলাই-মলাই করে তেল মাখানো, কাপড়চোপড় কাচা, বাসন মাজা, মায় তার জুতো পালিশ করা—সব কাজ শেষ করে সন্ধ্যেবেলা খেয়েদেয়ে ছানু দাঁত বার করে হাসিমুখে চীনুকে জিজ্ঞেস করে,—"আপনি আমার কাজে খুব খুশী হয়েছেন তো বাবু! তবে এইবার আমার মাইনেটা ঠিক করে ফেলুন।"

চীনু তার কাজে সত্যিই খুব খুশী হয়েছিল। তবু, তাকে বোকা ঠাউরে, দাঁও মারবার আশায় বলে,—"রোজ সন্ধ্যেবেলা পেট ভরে খেতে পাবি। আর, আমি সারাদিন যখন বাড়ী থাকবো না তখন তুই-ই তো এ বাড়ীর মালিক হয়ে থাকবি। তা ছাড়া এক বস্তা চূণ তো আগেই তোঁকে দিয়ে রেখেছি। মাস কাবারে না হয় আরো একটা নগদ টাকা দেবো। কি বলিস, রাজী তো?"

ওপর-নীচে, আশেপাশে নিজের মুণ্ডুটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ছানু মিটিমিটি হাসতে থাকে। তার খুশী-খুশী মুখখানা দেখেই বোঝা যায় সে চীনুর কথায় খুব রাজী আছে।

সেইদিন থেকে ছানু ঘরের সব কাজকর্ম করে। আর চীনু সকাল থেকে রকবাজীর দাঁও মারতে বেরিয়ে যায়।

চীনুর ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা চোরকুঠুরী। তার এককোণে দেয়াল ঠেসিয়ে রাখা ছোট্ট একটা কাঠের সিন্দুক। তাতে ইয়া বড় একটা তালা ঝোলে।

রোজ রাতে এসে চীনু সেই চোরকুঠুরীতে ঢুকে একবার করে সিন্দুকটা খোলে, আর পুঁটুলী বেঁধে কি যেন রেখে আবার তালা বন্ধ করে দেয়। চাবিটা সে তার নিজের কাছেই রাখে।

বাইরের এক চিলতে দালানে বসে বসে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে ছানু তা লক্ষ্য করে। মনে মনেই ব্যাপারটা সব সে আন্দাজ করে নেয়। চীনু কিন্তু এ ব্যাপারটা মোটেই টের পায় না।

ছানু সেই আগের মতই বোকা সেজে থাকে। চীনু যে তাকে চিনতে পেরেছে তা মনে হয় না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা চীনু যখন রকবাজীতে বেরিয়েছি, ছানু তখন তার চোরকুঠুরীতে ঢুকে, কাঠের সিন্দুকের পেছনের কব্জা খুলে দেখে, তাতে দশটা থলি। আর প্রত্যেক থলিতে একটি হাজার করে টাকা। কেবল একটা থলিতে একটি টাকা কম। সব শুদ্ধ ন'হাজার নশো নিরানব্বুই।

ছানুর মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়।

ভেতর দিকের উঠোনে রাখা দু'বস্তা চুণের একটা বস্তার মুখ খুলে, ড্রেনের জলে অর্ধেকটা চুণ ঢেলে ফেলে দিয়ে, থলেটার খালি জায়গায় সব টাকাগুলো ভরে, চীনুর টাকার থলিগুলোতে ঢিল, কাঁকর ভর্তি করে সিন্দুকটার কব্‌জা লাগিয়ে, আবার আগের মতো দেয়াল ঘেঁসে বসিয়ে রেখে, বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে সে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

খানিক পরেই চীনু এসে ছানুকে কাঁদতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করে।

ছানু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে,—"মায়ের আমার বড্ড অসুখ গো বাবু! দেশ থেকে একটা লোক এসে খবর দিয়ে গেল। মাসকাবার তো হয়ে গেছে অনেকদিন। এইবার আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, আমি আজই দেশে চলে চাই।"

চীনু সেদিন অনেক টাকার দাঁও মেরে এসেছে। এক কম দশ হাজার ছিল বলে এর আগে সে উকিল বাড়ী যেতে পারে নি। সকাল হলেই দশ হাজার টাকা নিয়ে সে হাসিমুখে উকিল বাড়ী গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে। তারপর দাদুর সম্পত্তির মালিক হতে আর কতক্ষণ? তাই মনটা তার খুশীতে ভরা ছিল। এমন ধারা বোকা চাকরে তার আর দরকার কি? তাই ঝনাৎ করে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে ঠং করে ছানুর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে সে তার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখের জল মুছে ছানু উঠোনে এসে চুণের বস্তাটা পিঠে তুলে চীনুকে নমস্কার করে বলে,—"এটা তো আপনি আমাকেই দিয়েছিলেন বাবু, আমি নিয়ে চললুম।"

ভোর না হতেই চীনু দাদুর সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছে, কি হবে আর ঐ চুণের বস্তা নিয়ে? তা ছাড়া ওটা তো আগে থেকেই ওকে দেওয়া আছে।

তাই চীনু সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপও করে না।

এক প্রহর রাত হবার আগেই চুণের বস্তা পিঠে নিয়ে ছানু উকিলবাবুর বাড়ী এসে, নিজের মাইনের টাকাটা মিলিয়ে, গুণে গুণে দশটি হাজার টাকা তাঁর সামনে রেখে, কি রকম চালাকি করে সে টাকা রোজগার করেছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটা তাঁকে খুলে বলে।

শুনে উকিলবাবু তার তারিফ করেন।

সকাল হতেই তিনি তার দাতুর সমস্ত সম্পত্তি ছানুর নামে রেজিস্ট্রী করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

খানিক পরেই চীনু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে, মুখ তার বিজয়ের হাসি। কিন্তু উকিলবাবুর সামনে টাকা গুণতে গিয়ে থলের ভেতর থেকে একরাশ ঢিল-পাটকেল বেরুতে দেখে মুখ চুণ করে সেইখানেই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে যায় সে।

তার জরদ্গবের মতো অবস্থা দেখে উকিলবাবু মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন।

আর, পেছন থেকেও তেমনি মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে ছানু বলে,—"তুমি আমায় মোটেই চিনতে পারো নি। কিন্তু আমি যে তোমার মাস্‌তুতো ভাই! তুমি জানতে আর লোকেও বলে, আমি নাকি ভারী বোকা! কিন্তু মা আমাকে ঠিকই বলতেন—ছিনে জোঁক। তাই, চোরের ওপর বাটপাড়ি করে, আমি জোঁকের মতো তোমার রক্ত চুষেছি। এবার তোমার ল্যাজের পলতেয় আগুন লেগেছে, তুমি এখন সত্যিকার চীনেদের মতো তিড়িং মিড়িং করে লাফাতে থাকো। তা হলেই তোমার 'চীনে পট্‌কা' নাম সার্থক হবে।"

কাশ্মীররাজ চন্দ্রপীড় মন্দির তৈরী করাবেন। যেখানে মন্দির হবে সেখানে এক মুচির বাড়ী। পাইক-পিয়াদা গিয়ে বললো—এ বাড়ী-ঘর তোমায় ছাড়তে হবে।

মুচি বললো—তোমাদের কথায় আমি সাত পুরুষের ভিটে ছাড়বো কেন?

—মন্দির হবে।

—বেশ, সেজন্য তোমরা কেন? যিনি মন্দির বানাবেন, তিনি নিজে এসে এই জমিটুকু ভিক্ষা চাইবেন, দিয়ে দোব।

খবর পেয়ে রাজা চন্দ্রপীড় তখনই এলেন মুচির দরজায়। বললেন—জমিটুকু ভিক্ষা চাইছি!

মুচি জমি দিল। মন্দিরও সেখানে তৈরী হল।



কানুর বাঁশী * শ্রী মন্মথ রায়

প্রথম দৃশ্য

[গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী]

মোড়ল। হায়-হায়-হায়, এ কি হল দায়। এত বড় একটা গাঁয়ের মোড়ল আমি, শেষে কিনা ইঁদুরের কাছে আমাকে হার মানতে হচ্ছে! রাজ্যের ইঁদুর এসে যেন জড়ো হয়েছে আমার ঘরে। এদ্দিন হিসেবের খাতাপত্র, দলিল-দস্তাবেজ কেটে টুকরো টুকরো করছিল, সিন্দুকে পুরে রাখতে তা' যদি বা রক্ষা পাচ্ছে, এখন ধান-চালের গোলায় দিয়েছে হানা, গ্রাহ্য করে না লাঠির মানা। ভাতে মারবে এবার আমায়। হায়-হায়-হায়।

[মোড়ল গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী। ওগো, বসে বসে কি ভাবছো? ইঁদুরের জ্বালায় গেল যে সব, তা কি কিছু দেখেছো? গাঁয়ের মোড়ল বলে কত না তোমার দেমাক। আমি দেখছি সে শুধু মিথ্যে জাঁক। ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছ কত লোক। সেই পাপে ঘরে ঢুকেছে আমার ইঁদুর। খাতাপত্র খাচ্ছিল, থাক। এবার হানা দিয়েছে ধানের গোলায়, ভাঁড়ারে আর রান্না ঘরে। বল দেখি মোড়লমশাই, বাঁচি কি করে!

মোড়ল। কেন, ইঁদুর মারা কল, সহর থেকে আনলাম কিনে তাও কি হলো বিফল?

গিন্নী। কলে না হয় মরছে দু'-দশটা। একটা ধেড়ে, একটা নেংটি, আর কিছু তার কাচ্চা-বাচ্চা। কিন্তু এ যে দেখছি রাবণের বংশ, কে করবে তা নির্বংশ।

মোড়ল। কল যদি হয় বিফল, নাই কি ঘরে লাঠি ?

গিন্নী। আছে বটে লাঠি। শুধু কি লাঠি। কুড়ুল আছে, কোদাল আছে, মাছ কোটার বঁটি আছে। সব মেনেছে হার, কি বলবো আর ?

[মোড়লের দুই ছেলে। ব্যাং ও চ্যাং। দুটি বড় লাঠি হাতে তারা ছুটে এলো।]

ব্যাং। চুপ, চুপ, চুপ।

চ্যাং। মস্ত একটা ধেড়ে ইঁদুর।

ব্যাং। মনে হচ্ছে পালের গোদা।

চ্যাং। আমাদের তাড়া খেয়ে হয়েছে এবার হাঁদা।

ব্যাং। পালিয়ে এসেছে হেথা, চুপ। বলো না কেউ কথা।

[সকলে চুপ করল। ইঁদুরটি বের হলেই মারবে বলে ব্যাং এবং চ্যাং লাঠি বাগিয়ে ধরে ওৎ পেতে হাঁটু গেড়ে বসে রইল। একটি ধেড়ে ইঁদুর (ইঁদুরের মুখোস পরা একটি ছোট ছেলে) ব্যাং-এর পেছন দিক থেকে যেই ছুটে এসেছে অমনি ব্যাং এবং চ্যাং লাঠি মারলো। কিন্তু ইঁদুরের গায়ে সে লাঠি না পড়ে পড়লো পরস্পরের মাথায়। ব্যাং, চ্যাং, মোড়ল এবং মোড়ল-গিন্নী আর্তনাদ করে উঠলো।]

ব্যাং। গেলাম, গেলাম, গেলাম !

চ্যাং। মালাম, মালাম, মালাম !

মোড়ল। বাপরে বাপ, বাপের বাপ !

গিন্নী। হায় হায়, এ কি পাপ !

[ধেড়ে ইঁদুরটি এদের চারদিকে নাচ্ছিলো]

ধেড়ে ইঁদুর। হাঃ হাঃ হাঃ !
হোঃ হোঃ হোঃ !
হিঃ হিঃ হিঃ !
কুটুস্ কুটুস্ কুটুস্ !

[নাচতে নাচতে পালিয়ে গেল]

গিন্নী। ওরে বাবা ব্যাং, ওরে বাবা চ্যাং, চল্ বাবারা চ মাথায় দিবি জল।

ব্যাং। মাথাটা কি আর আছে?

চ্যাং। মান ইজ্জত গেছে। কি হবে আর বেঁচে।

গিন্নী। (মোড়লকে) হাঁ করে কি দেখছো? ধনে-প্রাণে যে গেল এবার ইঁদুরকে করে সেলাম, ভিটে-মাটি, সব ছাড়ো, যত শিগ্‌গির পারো। আয় মাথায় দিবি জল।

মোড়ল। হ্যাঁ, ঢালো। ওদের মাথায় জল আর আমার মাথায় ঘোল।

[ব্যাং ও চ্যাংকে নিয়ে গিন্নীর প্রস্থান অন্যদিক দিয়ে মোড়লের গোমস্তার প্রবেশ।]

গোমস্তা। মোড়লমশাই মোড়লমশাই, আছেন দেখছি বাড়ি কিন্তু মুখখানা কেন এমন হাঁড়ি?

মোড়ল। এই যে ভাই গোমস্তা। জানো না তো আমার অবস্থা। সেই যে বলেছিলাম ইঁদুর কিছুতেই ধরতে পারছিনে, বাড়াবাড়ি তাদের এত বেড়েছে, এখন ধনে-প্রাণে মারছে। দেখি গোমস্তা, কি আছে রাস্তা।

গোমস্তা। আমারো তো ঐ একই অবস্থা। আমার গিন্নী বলে দিল—মুখের ওপর বলে দিল: তাড়াতে না পারো যদি ইঁদুর, আমরাই হচ্ছি দূর। হয় যাচ্ছি বাপের বাড়ী, নইলে দিচ্ছি গলায় দড়ি।

মোড়ল। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, এখন বল দেখি এসব নিয়ে কোথায় সরি।

গোমস্তা। ইঁদুরের তাড়ায় ভিটে-মাটি ছাড়লে লোকই বা কি বলবে?

মোড়ল। মান ইজ্জত যায়, হায় হায় হায়!

[গ্রাম্য চৌকিদার কালু ও তার কিশোর পুত্র কানুর প্রবেশ। কানুর হাতে একটি বাঁশের বাঁশী।]

চৌকিদার। মোড়লমশাই, গোমস্তামশাই, দণ্ডবৎ হই। সেই সঙ্গে গাঁয়ের লোকের দুঃখের কথাও কই। লোকের ঘরে ধান-চাল যা ছিল, ইঁদুরে সব খেলো। মানুষের রাজত্ব গেল, ইঁদুরের রাজত্ব এলো।

গোমস্তা। (চৌকিদারকে) থাম্ বেটা থাম, এখন কর দেখি একটা কাম। সাপুড়িয়াদের সব ডাক, ঘরে ঘরে ছেড়ে দিক সব সাপ।

চৌকিদার। সাপ! বাপরে বাপ!!

মোড়ল। যে ঘরে করবো বাস, সেই ঘরে সাপ! সে হবে এক রঙ্গ, কিনা, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ! এ সব বুদ্ধি ছাড়ো—অন্য পথ ধরো। শোন্ চৌকিদার শোন্, মন দিয়ে শোন। ঢ্যাঁটরা দিয়ে বল, কারুর যদি জানা থাকে এমন কোন কল, যাতে ইঁদুর হবে নাশ, দূর হবে ত্রাস, তাকে দেব হাজার টাকা বকশিশ, সেই সঙ্গে প্রাণ ভরা আশিস।

চৌকিদার। এটা দেখছি জবর এক ঘোষণা! এখান থেকেই সুরু হোক তবে রটনা। মোড়লমশাইয়ের পণ, কে কোথায় আছিস বাপু শোন্। কারুর যদি জানা থাকে এমন কোনো কল, এক্ষুনি এসে বল—যাতে ইঁদুর হবে নাশ, দূর হবে ত্রাস। মোড়ল দেবেন তাকে হাজার টাকা বকশিশ, আর মিলবে গাঁয়ের লোকের আশিস।

কানু। সত্যি বাবা, সত্যি?

চৌকিদার। মোড়লমশাই, সত্যি?

মোড়ল। সত্যি বাবা সত্যি। করছি আমি তিন সত্যি।

কানু। মনে হচ্ছে কাজটা আমি পারবো। পারি আর না পারি গুরুর কৃপায় পরখ করে দেখবো!

গোমস্তা। হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!

মোড়ল। কে এই ছোকরাটা। দেখ দেখি স্পর্ধাটা!

চৌকিদার। এটা আমার পুত, আস্ত একটা ভূত। নাম রেখেছি কানু, চরায় আমার ধেনু। বাজায় শুধু বাঁশী, ঢাক, ঢোল আর কাঁশি। কি করে তুই মারবি ইঁদুর।

গোমস্তা। দূর, দূর, দূর।

মোড়ল। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

কানু। কিন্তু আছে আমার বাঁশী। এই বাঁশীর সুরে ইঁদুরকে দেব ফাঁসি।

মোড়ল। কোথাকার এক পুঁচকে ছোঁড়া, স্পর্ধা দেখছি আকাশ জোড়া।

কানু। গুরুর নাম দিয়ে জয়, ধরছি বাঁশী, দেখ না কি হয়। আয় ইঁদুর আয়, হেসে হেসে আয়, নেচে নেচে আয়। ধেড়ে, বুড়ো, নেংটি ইঁদুর, যে যেখানে আছিস আয়, আমার কাছে আয়। কাছে আছে গঙ্গা নদী, নাইতে তোরা যাবি যদি, আয় তোরা আয়। আমার বাঁশীর সুরে আয় নেচে নেচে আয়। হেসে হেসে আয়, সময় বয়ে যায়।

[কানু বাঁশী বাজাতে লাগলো। অপূর্ব এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। ধেড়ে, বুড়ো, নেংটি ইঁদুর যে যেখানে ছিল, একে একে নাচতে নাচতে আসতে লাগলো। কানু বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলে গেল, ইঁদুরেরাও তার পিছু পিছু লাইন ধরে চলতে লাগলো। (ছেলেরা ইঁদুরের মুখোস পরে আসবে। তাদের লেজও থাকবে। চার-পাঁচটি ছেলেই ইঁদুর সেজে নাচতে নাচতে চলে যাবে এবং সিনের পশ্চাদ্দেশ ঘুরে পুনরায় আসবে এবং যাবে। এইভাবে চার-পাঁচটি ছেলেই অজস্র ইঁদুরের সমাবেশ দেখাতে পারবে। বলা বাহুল্য, বাঁশীর সুরটি নেপথ্যে বেশ জোরালো থাকবে এবং অবশেষে দূরতর হতে থাকবে)।

মোড়ল। অবাক কাণ্ড।

গোমস্তা। তাতে নেই কোনো স'ন্দ।

মোড়ল। চল, চল দেখি।

[ছুটে চলে গেল

গোমস্তা। ইঁদুরগুলো গঙ্গার জলে ডুবে মরবে নাকি।

[ছুটে চলে গেল

চৌকিদার। জয় গুরু! জয় গুরু! বুকটা আমার করছে দুরু দুরু। ইঁদুরগুলো যদি জলে ডুবে মরে, আমার কানু ব্যাটা হাজার টাকার বক্‌শিসটা তবে মারে।

[ছুটে চলে গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মোড়লের বাড়ী। মোড়ল, গোমস্তা, চৌকিদার এবং কানু।]

কানু। ইঁদুরের বংশ হয়ে গেছে নির্বংশ। গঙ্গাজলে গেছে মারা, স্বর্গে এখন গেছে তারা।

মোড়ল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—স্বর্গে ঢুকেছে ইঁদুর, দেবতাদের বুক দুরু-দুরু। বেঁচে গেলাম আমরা, যার যার ঘরে যাও তোমরা।

কানু। আমার হাজার টাকা বকশিস ?

মোড়ল। এটা তুই কি বলছিস ? ওরে ছোঁড়া, এটা তুই কি বলছিস ?

গোমস্তা। ইঁদুর মেরে বক্‌শিস ! তুই কি ছোঁড়া স্বপ্ন দেখছিস ?

চৌকিদার। তিন সত্যি করেছিলেন, বেমালুম ভুলে গেলেন? এরই নাম ঘোর কলি। আয় কানু, বাড়ী চলি।

কানু। হাজার টাকা নেব, তবে বাড়ী যাবো।

মোড়ল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাজার টাকা! তোর চৌদ্দ পুরুষে দেখেছে কেউ! টাকার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, হাজার পয়সা—তাই কি দেখেছিস বাপ-বেটা তোরা কেউ?

গোমস্তা। ছোট মুখে বড় কথা। এসব তোরা শিখলি কোথা?

চৌকিদার। ঘোর কলি, ঘোর কলি, তাই কানু, তোকে বলি, ছেড়ে দে টাকার আশা, শেষ হোক এই তামাশা।

কানু। তামাশা, তামাশাই বটে। কিন্তু অনেক তামাশা এখনো আছে আমার ঘটে।

মোড়ল। বটে!

কানু। বটে! কলিকালের খেলা, দেখাবো এই বেলা। আমার বাঁশীতে আছেন কল্কি, দেখুন এবার ভেল্কি! বাজরে বাঁশী বাজরে, খোকা-খুকুরা আয় রে, গান গেয়ে আয় রে। চল্‌রে—চল্‌রে—গঙ্গা নাইতে চল্‌রে—

[বাঁশী বাজানো স্থুরু করলো]

মোড়ল! খোকা-খুকুদের ডাকছে। তারাও যেন ইঁদুর, বোকাটা এই কথাটাই ভাবছে।

গোমস্তা। কিন্তু কারা যেন আসছে, কলরব শুনছি।

চৌকিদার। বাঁশীর সুরে যাদু আছে, খোকা-খুকুরা আসছে কাছে। ভয় জাগছে প্রাণে, যদি মা-গঙ্গা টানে।

মোড়ল। ছোঃ! ছোঃ! আমাদের খোকাবাবু, নয়কো তারা ইঁদুর।

গোমস্তা। (চৌকিদারকে) তোমার ছেলেটি আস্ত একটি বাঁদর। ইচ্ছে হয় মারি এক থাপ্পড়।

[বাঁশীতে আকৃষ্ট হয়ে ইঁদুরের মতই এক দল খোকা-খুকু নাচতে নাচতে এলো। বাঁশী বাজাতে বাজাতে কানু গঙ্গার দিকে চললো, খোকা-খুকুরাও কানুর পিছু নিলো।]

মোড়ল। একি! একি! একি! বাচ্চারা যে সব চললো! বাঁশীর যাদুতে ধরলো! খবর্দার কেউ যাবিনে, বাঁশীর ডাক শুনবিনে। ফিরে আয় ঘরে, নইলে মরবি বেঘোরে।

গোমস্তা। কে কার কথা শুনছে? বাচ্চারা সব গেল। মা-গঙ্গা ওদের টানছে। বংশটা মোদের গেল।

[ছুটিয়া মোড়ল-গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী। হায় হায় হায়! ছেলে-মেয়ে যে সব যায়! (মোড়লের প্রতি) ওগো তুমি দেখছো কি? কানুকে আর দিও না ফাঁকি। বোঝ মোদের ব্যথা, রাখো তোমার কথা। হাজার টাকা ফেল, নইলে যে সব গেলো!

মোড়ল। (চৌকিদারকে) ওরে ভাই চৌকিদার, খুব শিক্ষা হলো আমার। কানুকে গিয়ে থামা, দিচ্ছি টাকা এক ধামা।

চৌকিদার। যাচ্ছি আমি যাচ্ছি, ফিরে ওদের আনছি। জোগাড় রেখ হাজার টাকা, নইলে ওকে যাবে না রোখা।

[চৌকিদার ছুটে চলে গেল]

মোড়ল। হাজার টাকা! হাজার টাকা! একি চারটিখানি কথা?

গোমস্তা। একশ' টাকা দাও গোলমালটা থামাও।

গিন্নী। সেই সঙ্গে কানমলাও খাও।

[বাঁশী বাজাতে বাজাতে কানুর প্রবেশ। পশ্চাতে চৌকিদার]

কানু। মোড়লমশাই, মোড়লমশাই, কি বলবে বলো। বাজে কথা না বলে হাজার টাকা ফেল।

মোড়ল। বাচ্চাদের ফেলে, একলা কেন এলে?

গিন্নী। আমাদের বুকের ধন রইলো কোথায়? তুমি কেন বাবা একা হেথায়?

কানু। নাচছে তারা সব গঙ্গাতীরে, যদি পাই টাকা, তবে সব আসবে ফিরে।

মোড়ল। একশ' টাকা দিচ্ছি, কানমলা খাচ্ছি। ঘরের ছেলে সব ঘরে ফিরুক, আমার ওপর আর হয়ো না বিরূপ।

কানু। তিন সত্যি করেছিলে হাজার টাকা দেবে, কথা দিয়ে রাখছো না কথা, সেটা দেখ ভেবে। তোমরাও তবে চলো, নেচে নেচেই চলো, গঙ্গাতীরে চলো, ছেলে বুড়ো এক সাথেই সব বলো হরি বলো।

[কানু বাঁশী বাজাতে লাগলো। এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। মোড়ল-গিন্নী, গোমস্তা এবং চৌকিদার নাচতে সুরু করে দিল। একে একে গ্রামের আরো লোকজন নাচতে নাচতে এসে এখানে জমলো। বাঁশীর উদ্দাম সুরে ওদের নাচও ক্রমশঃ উদ্দাম হয়ে উঠলো। সকলে শেষ হাঁপাতে লাগলো।]

মোড়ল। গেলাম, গেলাম, গেলাম!

গিন্নী। মলাম, বাবা মলাম!

গোমস্তা। থামাও, বাঁশী থামাও!

মোড়ল। প্রাণটা মোদের বাঁচাও!

চৌকিদার। ওরে কানু থাম্! সারা গায়ে ঝরছে ঘাম।

মোড়ল। হায়, হায়, হায়! বেঘোরে প্রাণটা যায়।

গিন্নী। যেমন কর্ম তেমনি ফল, নড়েছে আজ ধর্মের কল। হাজার টাকা আমিই দিচ্ছি, মোড়লের কথা আমি রাখছি।

[মোড়ল-গিন্নী নাচতে নাচতে গা থেকে সব গয়নাগুলো খুলে একে একে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। এর ফলে বাঁশীর উদ্দাম সুরসৃষ্টিও ক্রমশঃ শান্ত হতে লাগলো। যখন শেষ গয়নাটি মাটিতে পড়লো, তখন বাঁশীও থেমে গেল। নাচ থেমে গিয়ে সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাটিতে বসে পড়ে সবাই হাঁপাতে লাগলো। কানু গয়নাগুলি জড়ো করে মোড়ল-গিন্নীর সামনে এসে নতজানু হয়ে বসলো।]

কানু। গিন্নী-মায়ের জয়। আর নেইকো ভয়। রক্ষা হলো ধর্ম, ফুরালো আমায় কর্ম। নাও ফিরে মা গয়না, এ ছেলের এই বায়না।

[কানু গয়নাগুলো মোড়ল-গিন্নীর হাতে ফিরিয়ে দিল।]

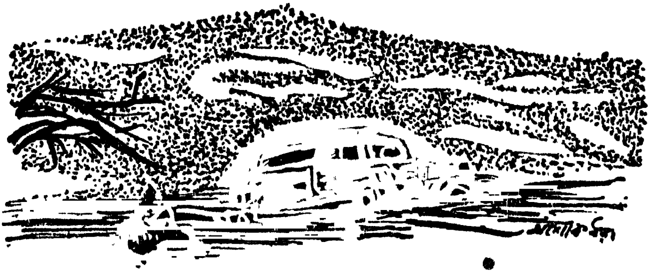
কানু। ওরে আমার সব ভাইবোন, আয়রে তোরা সব ফিরে। নাচতে নাচতে ফিরে আয়, চলে যা যে যার ঘরে।

মোড়ল। ওরে বাবা কানু, শোনো বাবা শোনো, আমাদের আর নাচতে না হয় যেন।

কানু। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে, এবার বাচ্চাদের নাচই আপনারা দেখুন সবে। আমার কাজটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

[কানু বাঁশী বাজাতে লাগলো। পূর্বোক্ত ছেলে-মেয়ের দল পূর্বোক্ত নির্দেশমত নাচতে নাচতে এলো, গেল, আবার এলো আবার গেল। এমনি করে, যেন বহু ছেলে-মেয়ে নাচছে, এমনি পরিবেশ সৃষ্টি হলো। দর্শকরা মহা আনন্দিত হয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো।]

যবনিকা



য়্যাকসিডেণ্ট * শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সতীনাথবাবু বললেন, 'যেতে পারি কিন্তু তিন সর্তে। প্রথম সর্ত রাত আটটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন—'

'আটার মধ্যে!' সভার উদ্যোক্তারা যেন কিছু বিমর্ষ হল।

'উপায় নেই। ঐ দিনই রাত ন'টা বারো মিনিটে গৌতমের ট্রেন। ও স-আটটা নাগাদ বেরুবে বাড়ি থেকে।'

'গৌতম—গৌতম মানে—'

'গৌতম মানে আমার ছেলে। ও একটা চাকরিতে ইণ্টারভিয়ু পেয়েছে, ঐদিন ওর না বেরুলেই নয়।' সতীনাথ একটু হাসলেন: 'ওর বেরুবার আগে আমার পৌছুনো দরকার। একটু আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ করে দিতে হবে তো।'

'বেশ তো তাই হবে।' উদ্যোক্তার দল সোৎসাহে রাজি হয়ে গেল। 'বেশ তো, আপনি প্রধান অতিথি বা সভাপতি না হয়ে একেবারে উদ্বোধক হয়ে বসবেন। ওপ্‌নিং সং-এর পরেই আপনার বক্তৃতা।'

'আর বক্তৃতান্তেই প্রত্যাবর্তন। বসা, বলা আর উঠে পড়া।'

'শুধু উঠে পড়া নয়, সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া।' উদ্যোক্তারা দল আশ্বস্ত করল: 'তাই হবে। ছটায় মিটিং, মোটরে একঘণ্টার পথ, আমরা এখান থেকে পাঁচটায় বেরুব। ওপনিং সং আর কতক্ষণ, আপনি সাতটায় ভাষণ শেষ করেই স্টার্ট করবেন। গাড়ি মজুত থাকবে।'

'আর শুনুন, দ্বিতীয় সর্ত, আপনাদের কারুর প্রাইভেট গাড়িতে যাব না, ট্যাক্‌সিতে যাব।'

উদ্যোক্তার দল অবাক মানল। সে কী! প্রাইভেট গাড়িই তো ভালো।

'হোক ভালো, তবু ওতে যাব না।' সতীনাথের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল: 'শেষে বক্তৃতার পরে দেখব, ড্রাইভার নেই, কাউকে পৌঁছে দিতে গিয়েছে। কিংবা খেতে বসেছে, কিংবা—পরের গাড়ির ড্রাইভার নিয়ে হাজার গণ্ডা ঝামেলা। সে তো আর আমার কন্‌ট্রোলের লোক নয়, দেরি করে দিলে আমি করি কী। তার চেয়ে ট্যাকসি অনেক নিরাপদ; সে নিজের স্বার্থেই তাড়াতাড়ি করবে। ফুরণ করে নেবেন, কিছুটা আগাম বাকিটা বাড়িতে ফিরে এলে। তা হলেই সে আমার কন্‌ট্রোলে থাকবে। সেও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত—'

'তাই হবে।' অপর পক্ষও মরীয়া। 'আর তৃতীয় সর্ত?'

'সে কিছু নয়।' সতীনাথ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'আপনাদের ওদিকে ভালো ছানার জিলিপি পাওয়া যায়, তাই পাঁচ সের—'

'সে আবার বলতে!' হাসতে হাসতে সভাসদরা বিদায় নিল।

নির্দিষ্ট দিনে-ক্ষণে ট্যাকসি এসে হাজির হলো। সতীনাথ যাচাই করে নিলেন। হ্যাঁ, ড্রাইভার প্রচণ্ড আশ্বাস দিল, ঠিক আটটার মধ্যে পৌঁছে দেবে। আর ভাড়া? মোট পঁচিশ টাকা। আগাম দশ আর ফেরত এসে বাকিটা।

যাক্, শেষ পর্যন্ত সতীনাথের কন্‌ট্রোলেই থাকবে। নিশ্চিন্ত হয়ে ট্যাক্‌সিতে উঠে বসল সতীনাথ। ছাড়বার আগে দুর্গা দুর্গা বললে।

কিছুটা এগিয়ে এসে রাস্তার পাশে গাছের নীচে মন্দির মত ছোট একটা ঘরের কাছে এসে ট্যাক্‌সিটা স্লো হল। ড্রাইভার একটা সিকি না আধুলি ছুঁড়ে মারল মন্দিরের দিকে। পুজুরী ঠিক কুড়িয়ে নিলে।

'ও আবার কী ঠাকুর?' জিগ্‌গেস করলেন সতীনাথ।

'য়্যাক্‌সিডেণ্ট ঠাকুর।' ড্রাইভার গম্ভীরমুখে বললে, 'ভীষণ জাগ্রত। এ পথে গাড়ি নিয়ে এলেই কিছু দিতে হয়। না দিলেই সর্বনাশ। বিপত্তারণ মধুসূদন।' পলকের জন্যে হুইলের থেকে হাত তুলে কপালে ঠেকাল।

শুভে লাভে ভাষণ শেষ হল। বাইরে ট্যাক্‌সি প্রস্তুত, ট্যাক্‌সির মধ্যে জুতো নিখুঁত, এত আরামে আর কোনদিন নিঃশ্বাস ফেলেননি সতীনাথ।

এবার ফিরে চলো।

মিষ্টির দোকানই দেরি করিয়ে দিল। আগের থেকে অর্ডার দিয়ে রাখেনি কর্তারা, এখন এক দোকানে সবটা পাওয়া যাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে তাই দিন, তাতেই হবে। সতীনাথ তাড়া দিতে লাগলেন। তা কি হয়? এ-দোকান ও-দোকান, আরো কত দোকান আছে। সব মিলিয়ে হাঁড়ি বেঁধে দিচ্ছি দেখুন না। দরকার নেই। ড্রাইভার পর্যন্ত হর্ণ বাজাতে লাগল। কিন্তু কে কার কথা শোনে। হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। পরে, এইবার নিন্ ভাড়ার বাকি টাকাটা। আপনার কাছে রাখুন।

টাকাটা পকেটে গুঁজে সতীনাথ প্রশান্ত মুখে বললেন—'চলুন।'

'দেরি হয়ে গেল।' ড্রাইভার আপশোষ করার মত করে বললে।

সতীনাথ ঘড়িতে দেখেন, সাতটা বেজে কুড়ি। বললেন, 'একটু স্পিড দিয়ে চলুন, যাতে ছেলের বেরুবার আগে ঠিকঠাক গিয়ে পৌঁছুতে পারি।'

তারপর ড্রাইভার ট্যাক্সি ছোটাল। যেন কালবোশেখির খ্যাপা ঝড়, সঙ্গে সঘন গর্জন হর্ণের আওয়াজ। পঞ্চাশে যাচ্ছে না ষাটে যাচ্ছে তা কে বলবে। না তারও চেয়ে বেশি।

ড্রাইভারের পাশে তার মেট, আর পিছনের সিটে সতীনাথ একা। কাজ ফুরিয়েছে, ভাড়াও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন আর লোকের কী দরকার।

তবু সতীনাথের মনে হল পাশে একটা লোক থাকলে বুঝি সাহস হত!

খানিকটা শহর-বাজার, আলোকিত কোলাহল আসে, ট্যাক্সিটা একটু সংযত হয়, আবার পেরিয়ে এসে ফাঁকায়, অন্ধকারে, হেডলাইট ফেলে উদ্দাম মূর্তি ধরে।

'আরেকটু আস্তে গেলে হয় না?' ত্বরান্বিত সতীনাথ চাইলেন মন্থর হতে।

ড্রাইভার গ্রাহ্যও করল না।

আবার মিনতি করলেন সতীনাথ, 'এত জোরে যাবার কী দরকার!'

'আপনার দরকার না থাকতে পারে, আমার দরকার।' ড্রাইভার ধমকে উঠল: 'ঐ একটা ফুরণ খাটলেই আমার পুষিয়ে যাবে? আমাদের সময়ের দাম নেই?'

নিশ্চয় আছে, সতীনাথেরও আছে—সতীনাথ চোখ বুজলেন। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আরও তাঁর ভয় করতে লাগল।

খুললেন চোখ, আর তক্ষুনি কী দেখলেন।

লোকটা রাস্তার বাঁ-পাশে দিব্বি চুপচাপ ছিল, গাড়ি দেখে হতচকিতের মত ছুটল ওপাশে, আর অমনি পড়ল গাড়ির সামনে। আর ঐ গাড়ির সামনে পড়ার মানে মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া।

ট্যাক্সিটা দাঁড়ালো না। পিছনের লাইট নিবিয়ে দিয়ে ছুটল নক্ষত্র বেগে।

জায়গাটা শহর-বাজার থেকে দূরে, ফাঁকার মধ্যে। তাই পিছনে তেমন একটা জোর চীৎকার উঠল না। ধর ধর গেল গেল—ঐ পর্যন্তই। কেউ ট্যাক্সির পিছু নিল না। দিব্বি বেরিয়ে আসতে পারল।

'কী করলেন বলুন তো?' সতীনাথ ধিক্কার স্বরে বললেন।

'আমি কী করলাম।' ড্রাইভার বললে নির্লিপ্তের মত: 'যা করবার ওর নিয়তি করল। ওই বা ঐ সময় ওখানে থাকে কেন, আর কেনই বা ও রাস্তাটা তখন ক্রস করে?'

কিন্তু এখনো হয়তো ওর প্রাণ আছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো এখনো বেঁচে যায়—কার না জানি ছেলে, কার না জানি স্বামী—সতীনাথ মিনতি করতে লাগলেন: 'চলুন, ফিরে চলুন, ওটা তো আমাদের কর্তব্য—ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসি—'

ড্রাইভার পাগলের মত হেসে উঠল। তার মেট বললে, 'ওখানে এখন গাড়ি নিয়ে গেলে গাড়ি তো পুড়িয়ে দেবেই, আমাদেরকেও লাশ করে ছাড়বে, আপনাকেও রেহাই দেবে না।'

কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু কী জানি সতীনাথ যদি বুঝিয়ে বলেন, জনতা মারমুখো নাও হতে পারে। বিশেষত যখন দেখবে সেই অপরাধী ট্যাক্সিই দয়াপরবশ হয়ে ফিরে এসেছে আহতকে সাহায্য করতে।

'যদি মরে গিয়ে থাকে?' মুখ খিঁচিয়ে উঠল ড্রাইভার: 'তখন তো আমরা সকলে পুলিশের হাতে। তাই চান?'

একবার বেরিয়ে আসার পর ফের ফেরা যায় না। মেট ঝাঁজিয়ে উঠল: 'গোড়ায় পালিয়ে গিয়েছিলাম কেন তারই জন্যে আরেক প্রস্থ মার চলবে।'

কী হবে ধরা পড়লে? ড্রাইভার বললে, 'জেল নয় জরিমানা হবে। লাইসেন্স যাবে। কিন্তু মার তো খেতে হবে না। গাড়িটাও তো আস্ত থাকবে।'

কী করে ধরবে? মেট সতীনাথের দিকে তাকাল রুষ্ট চোখে: 'কে খবর দিতে যাবে? কেউ দেখেনি, কেউ নম্বর নিতে পারেনি। প্রমাণ কি যে আমাদের ট্যাক্সি মেরেছে।'

'না, না, সে কথা হচ্ছে না।' সতীনাথ কণ্ঠস্বর মোলায়েম করলেন: 'আমি বলছিলাম একটা নিরীহ বিপন্ন লোকের সাহায্যের কথা—'

যান, আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে যান।' ড্রাইভার গাড়ি থামাতে চাইল: 'সাহায্য করুন গে।'

সতীনাথ চোখে অন্ধকার দেখলেন। এই বেঘোরে নামিয়ে দিলে যাবেন কোথায়?

সতীনাথকে নীরব নিশ্চল দেখে ড্রাইভার গাড়ি ছোটাল। বলল, 'আমার সাহায্যের কোনো দরকার নেই। কিন্তু র‍্যাশ ড্রাইভিং কার জন্যে? এই য়্যাকসিডেন্টের মূল তো আপনি। আপনাকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছে দেবার জন্যেই এই দুর্দশা। আপনি এখন ভালো মানুষ সেজে সাহায্য করতে চলেছেন।'

সতীনাথ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সন্দেহ কী, তিনিই তো প্ররোচনা দাতা, আসল অপরাধী। তার যে শাস্তি আছে তা হোক, কিন্তু অকারণে মার খেয়ে তাঁর চোখের সামনে একটা নির্দোষ লোক পড়ে থাকবে, তিনি তার কোনো উপশমে লাগবে না, এ যন্ত্রণাও দুর্বিসহ।

বাড়িতে পৌছে দিল ট্যাক্সি। কিন্তু পৌছে দেখেন, হুলুস্থুল কাণ্ড। সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু গৌতম এখনো বেরোতে পারেনি। আধঘণ্টার উপর একটা ট্যাক্সি যোগাড় হচ্ছে না। বাড়ির চাকর ঠাকুর দু'জন দু'দিকে বেরিয়েছে, ট্যাক্সি নেই।

বাবার ট্যাক্সিটা দেখে গৌতম একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ড্রাইভারকে বললে, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে দিতে হবে হাওড়া স্টেশন।'

ড্রাইভার দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললে, 'কুড়ি মিনিট।'

ছেলেকে সতীনাথ আশীর্বাদ করে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দু'হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল এই হাওড়া যাবার পথেই আরেকটা

য়্যাকসিডেণ্ট ঘটবে। চরম য়্যাকসিডেণ্ট। কে জানে নিয়তি হয়তো অমনি করেই ছকে ঘুঁটি সাজাচ্ছে।

আকুল স্বরে ছেলেকে বললেন, 'স্টেশনে পৌছেই যদি সময় পাস্ একটা টেলিফোন করে দিস যে ঠিকমত পৌছেচিস্।'

ড্রাইভার ভাড়ার জন্যে হাত বাড়াল। হ্যাঁ, ফুরণের প্রাপ্য বাকিটা দিয়ে দিতে হবে বৈকি। রোগীকে মেরে ফেললেও ডাক্তারকে তার ফি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কিছু বলবার দরকার নেই। ড্রাইভারের প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দিলেন সতীনাথ। শুধু আরেকবার ট্যাক্সির নম্বরটা দেখে রাখলেন।

এবার গৌতমই প্ররোচনা যোগাল: 'শিগ্‌গির চলুন, খুব তাড়াতাড়ি কুড়ি মিনিট, যদি পারেন তো আরও দু'চার মিনিট কম।'

তীরবেগে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

বাড়ির ভিতরেই পা দিতেই সতীনাথের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল: 'ছানার জিলিপি!'

এই যা। এ আরেক য়্যাকসিডেণ্ট। ট্যাক্সির মধ্যে রয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে নামানো হয়নি। ড্রাইভার আর তার মেট বসে বসে খাবে মনের সুখে। খুন করল মিষ্টিও খেল।

থাক গে জিলিপি। ছেলেটা ওই ড্রাইভারের হাত থেকে রক্ষা পায় তা হলেই হল। দুর্গা-দুর্গা। অনেক দেরিতে হলেও আরেকবার বললেন সতীনাথ। ছেলেটা কোন দোষ করেনি।

ওই উদ্‌ভ্রান্ত পথচারীটাই বা কী দোষ করেছিল?

না, গৌতম খুব ভালো ছেলে। সে জানে তার বাবা কেমন উদ্বেগী। স্টেশন থেকে ঠিক টেলিফোন করেছে। 'বাবা, ঠিকমত পৌচেছি স্টেশনে। ট্রেন এখনো ইন হয়নি। কিছু ভেব না। ঠিকঠাক ঘুমিয়ো রাত্তিরে।'

কিন্তু এ কী, কতক্ষণ পরে সেই ট্যাক্সি এসে হাজির। আপনার মিষ্টির হাঁড়িটা দিয়ে যেতে এসেছি, ভুলে তখন নামানো হয়নি। এক মুখ হাসল ড্রাইভার। পরে বাঁকা হেসে বললে, 'গাড়ির নম্বরটা আশা করি ভুলে যাবেন। য়্যাকসিডেণ্টের ঠাকুরকে তো আর মিছিমিছি পয়সা দিইনি।'

য়্যাকসিডেণ্ট ঠাকুর? সে কী? সতীনাথ জ্বলে উঠলেন: 'সে তো য়্যাকসিডেণ্ট করিয়ে ছাড়ল।'

'তা করাক। আমাকে তো বাঁচিয়ে দিলে। ভক্তকে বাঁচানো নিয়ে হচ্ছে কথা।' ট্যাক্‌সি নিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার।

সতীনাথ তাকালেন নম্বরের দিকে। কে জানে নম্বর প্লেটটা ইতিমধ্যে বদলে ফেলেছে কিনা।

শরীর খারাপের অজুহাতে সতীনাথ মিষ্টি স্পর্শও করলেন না, ছেলের অনুরোধ সত্ত্বেও ঘুমুতে পারলেন না এক ফোঁটা। তাঁরই জন্যে একটা লোক আহত হল অথচ তার জন্যে কিছুই করতে পারলেন না এ দুঃখে তিনি পুড়ে যেতে লাগলেন।

পরদিন খবরের কাগজ দেখে সতীনাথের চক্ষুস্থির। কাল যখন ও যেখানে তাঁদের ট্যাক্‌সিটা য়্যাকসিডেণ্ট করেছে তারই বিস্তৃত খবর বেরিয়েছে।

'একটা প্রাইভেট গাড়ি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটি লোককে চাপা দিয়েছে। সেই গাড়িতে করে লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা সঙ্গীন। পুলিশ গাড়ির মালিক-চালককে গ্রেপ্তার করেছে। আহত লোকটিকে এখানে সনাক্ত করা যায়নি। যতদূর মনে হয় লোকটি বাঙালী।'

কী ব্যাপার, অনেক খুঁজে-পেতে দিন কয়েক পরে সতীনাথ সেই প্রাইভেট গাড়ির মালিক-চালককে বার করল। কী হয়েছিল বলুন তো ?

'আরে মশাই, পরোপকার করতে গিয়ে এই বিপদ।' ভদ্রলোক বললেন, 'রাস্তায় দেখলাম চাপা-পড়া একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বাঁচানো যায় কিনা তাই ভেবে লোকজনকে ডেকে ধরাধরি করে আমার গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। পুলিশ এমন চতুর, যেহেতু আমার গাড়িতে হাসপাতালে বয়ে নিয়ে এসেছি, আমিই চাপা দিয়েছি। আসল লোকের খোঁজ নেই, আমাকেই য়্যারেস্ট করলে। স্থানীয় লোকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমি ঘটনার পরে এসেছি, তা পুলিশ শুনতে চায় না।'

'আহত লোকটি কী হল ?'

'হাসপাতালে ভর্তি হবার চারদিন পর মারা গেছে।'

'আর আপনার কী হল ?'

'পুলিশের হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছি বটে কিন্তু হাসপাতালের হাত থেকে রেহাই নেই।'

'কেন, সেখানে কী ?'

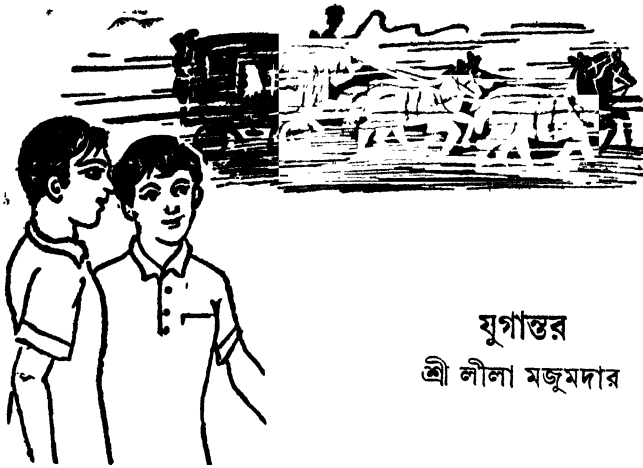
'দেখুন না, হাসপাতাল আমার নামে এই পঁয়তাল্লিশ টাকার বিল পাঠিয়েছে।' ভদ্রলোক বিল দেখালেন। বিরক্তমুখে বললেন, 'যেহেতু আমি ঐ আহত লোকটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি, হাসপাতাল আমার নাম ঠিকানা রেখেছে ও চারদিন চিকিৎসা করতে যা খরচ হয়েছে তারই লম্বা বিল পাঠিয়েছে আমাকে।'

'ও, হ্যাঁ, আপনাকে আমি সেই টাকাটা দিতে এসেছি।' সতীনাথ মনিব্যাগ খুলে টাকাটা বের করলেন। রাখলেন টেবিলের উপর।

'সে কী, ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন : 'ওই লোকটি আপনার কেউ হয় নাকি ?'

সতীনাথের দু'চোখ ছল ছল্ করে উঠল, বললেন 'হ্যাঁ, ও আমার আত্মীয়। আমার ভাই।'

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যই প্রথম তামার মুদ্রা চালান। তার আগে সোনা রূপার মুদ্রাই চলতো। বিক্রমাদিত্যের আমলের নয় রকম তাম্রমুদ্রা আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে।



যুগান্তর

শ্রী লীলা মজুমদার

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফ ইয়ার্লির ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে দু' তিনদিন ধরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এতো পড়লাম অথচ ফল বেরুলে দেখলাম ইংরেজিতে ২২, বাংলায় ২৯ আর অঙ্কের কথা নাই বললাম। তাই দেখে শুধু বাড়ীর লোকদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধ চক্ষুস্থির। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে এক রকম টেকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপীরও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আরেক কাঠি বাড়া। ক্লাবের নাম কাটিয়ে-টাটিয়ে, মাউথ আর্গ্যান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন। সন্ধ্যেবেলা গুপী এসে বলল, "জানিস, মানোয়ারি জেটি থেকে একটা মাল বোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!" আমার হাত থেকে পেন্‌সিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধ্বক করে জ্বলে উঠল। বললাম, "কে বলেছে?" গুপী বলল, "আমাদের আপিস থেকে মাল বোঝাই-এর পারমিট করিয়েছে। আজ রাত দুটোয় জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে পড়বে।"

বললাম, "ডায়মণ্ড হারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আরেকটু এগুলে না জানি কেমন।" গুপী বলল, "যাবি? না কি বাকি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কষে কাটাবি?" পেন্‌সিলটা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, "পয়সা-কড়ি নেই, তারা নেবে কেন?" গুপী বলল, "পয়সা কেন দেব? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময় চড়ে বসে থাকব, মেলা জেলে-ডিঙি রয়েছে, তার কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর লাইফবোটের ক্যাম্বিশের ঢাকনির তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়। তারপর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়লেই হল, ওরও ফেরবার নিয়ম নেই। আমাদেরো

নামাবার উপায় থাকবে না। যাবি তো বল। আজ রাত বারোটায় এসপ্ল্যানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।"

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি উড়ে যাচ্ছে। আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কালো হাতী বিরাট বিরাট সুন্দরী গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বললাম, "বেশ তাই হবে।"

তারপর যে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপীর সঙ্গে জুটলাম সে আর কি বলব। সঙ্গে একটা সার্ট প্যান্ট তোয়ালে আর টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময় ঐ পুরানো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনদিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাট সাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমরা তো অবাক। জন্মে কখনো চার ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি। কলকাতা সহরে আর চার ঘোড়ার গাড়ি যে আছে তাই জানতাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারটে কালো কুচকুচে দৈত্যের মত বিরাট ঘোড়া। তাদের সাজগুলো তারার আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ঘাড়গুলো ধনুকের মত বাঁকা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, নাক দিয়ে ফড়র-ফড়র আওয়াজ করছে, ঝন্‌ঝন্ করে চেন বকলস্ বেজে উঠছে। অত দূর থেকেও সে শব্দ আমাদের কানে আসছে। ষোলটা ক্ষুর থেকে মাঝে মাঝে স্পার্ক দিচ্ছে। সে না দেখলে ভাবা যায় না।

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতে ঘুরে এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে। ঐখানে সারাদিন মিস্ত্রীরা কাজ করছে পথে দু' একটা ইটপাটকেল পড়ে থাকবে হয়তো। তাতেই হোঁচট খেয়ে সামনে দিককার একটা ঘোড়ার পা থেকে নালটা খুলে গিয়ে শাঁই শাঁই করে অন্ধকারের মধ্যে একটা ভাঙা চক্র এঁকে কতকগুলি ঝোপঝাপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষুরের খটাখট চেনের ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে, আরো হাত বারো গড়িয়ে এসে বিশাল গাড়িটা থেমে গেল।

ততক্ষণে আমরা দু'জনে একেবারে কাছের গোড়ায় এসে পড়েছি। দেখি গাড়ির পিছন থেকে চারজন সবুজ পোষাক পরা কোমরে সোনালী বেল্ট আঁটা সইস্ নেমে পড়ে, ছুটে গিয়ে চারটে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে ধরেছে। সামনে দিকের ডান হাতের ঘোড়াটার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে একবার ভীষণ জোরে চিঁহিহিহি করে ডেকে উঠল। সেই শব্দ চারদিকে গমগম করতে লাগল।

বোধ হয় ওরা কোনো থিয়েটার পার্টির লোক, কোনো বিদেশী জাহাজে অভিনয় করে ফিরছিল। কারণ লোকটার দেখলাম রাজার মত পোষাক পরা, কিংখাবের জোব্বা পাজামা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে হীরে। আর সে কি ফর্সা সুন্দর দেখতে। মাথায় মনে হল সাত ফুট লম্বা। রাজা সাজবারই মত চেহারা বটে! ততক্ষণে সবাই মিলে অন্ধকারের মধ্যেই নালটাকে খুঁজছে। আমাদের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। আমি টপ করে থলি থেকে টর্চটা বের করে টিপতেই দেখি ঐ তো ঝোপের গোড়ায় নালটা পড়ে আছে। রূপোর মত ঝকঝক করছে। গুপী ছুটে গিয়ে সেটি হাতে করে তুলে নিল, তখনো একেবারে গরম হয়ে আছে।

নীল হাতে ওদের কাছে গেলাম। এতক্ষণে আমাদের দিকে ওদের চোখ পড়ল। "কোথায় পেলি বাপ?" "ঐখানে ঝোপের গোড়ায়", গুপী ঝোপটা দেখিয়ে দিল। "বাঃ বেড়ে আলোখানি তো বাপ। ওরাই দিয়েছে বোধ হয়। তাহলে আরেকটু দয়া করে, এদিকে কোথায় কামারের দোকান আছে বলে দে দিকিনি। ওটি না লাগালে তো আর যাওয়া যাবে না।"

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গুপীর দিকে তাকালাম। কামার আবার কোথায় পাব? গুপী বললে, "চলুন, আগে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান আছে, তাদের আমি চিনি, তারা করে দিতে পারবে মনে হচ্ছে।"

"তাহলে ওঠ বাপ ওঠ। আর সময় নেই।"

দু'জনে গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকের পাশে উঠে বসলাম। মখমলের সব গদী। থিয়েটারের লোকরা আছে বেশ। আর ভুর ভুর করছে আতরের তামাকের গন্ধ। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলা দলিলপত্রও রয়েছে দেখলাম।

গুপী বাৎলিয়ে দিল বাঁয়ে ঘুরে ড্যালহৌসি স্কোয়ারের দিকে পথ, আস্তে আস্তে চললাম। ঘোড়ার পায়ে ব্যথা লাগে। ছোট গলির মধ্যে দোকান। অত বড় চার ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে ঢুকবে না।

ঢুকলেও আর ঘুরবার উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক কেবলই তাড়া দিতে লাগলেন, দেরী করলে নাকি একটা মানুষের প্রাণ যাবে? তখন গুপী নাল হাতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বলল "এইখানে দাঁড়ান, আমি গিয়ে যন্ত্রপাতি সুদ্ধ শম্ভুকে ডেকে আনি। তুই আয় আমার সঙ্গে।" অগত্যা দু'জনেই নামলাম। শম্ভুকে ঠেঙিয়ে তুলতে একটু দেরী হল। তারপর প্রথমটা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। চার ঘোড়ার গাড়ি আবার কি? এ তল্লাটে কোথাও চার ঘোড়ার গাড়ি হয় না। একটা চার ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়াই দেখতে পাওয়া যায় না। তা আবার চারটে ঘোড়া এক গাড়িতে। শেষটা ঘোড়ার নালটা দেখে একেবারে থ। "এই এত বড় নাল হয় কখনো ঘোড়ার? হাতী নয় তো? হাতীর পায়ে আমি নাল লাগাতে পারব না গুপী দাদা, এই বলে দিলাম।"

আমরা বুঝিয়ে বললাম "চল না, গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে। এত প্রকাণ্ড ঘোড়াই দেখলে কোথায়, যে এত বড় নাল দেখবে? চল তোমার লোহাটোয়া নিয়ে চল ওদের খুব তাড়াতাড়ি আছে। দেরী করলে কার যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মেলা কাগজপত্র নিয়ে চলেছেন। চল। নাও, ধর, নালটাও তোমার যন্ত্রের বাক্সে রাখ! ভারী আছে।"

শম্ভু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। "বড় ঘোড়া যে হয় না তা বলছি না। ফতেপুর শিক্রি গিয়ে আকবরের ঘোড়ার যে বিরাট নাল দেখে এসেছি, তারপর আর কি বলি।"

কথা বলতে বলতে গলির মুখে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথায় চার ঘোড়ার গাড়ি? চারদিক চুপচাপ থমথম করছে, পথে ভালো আলো নেই, একটা মানুষ নেই, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, কিছু নেই। ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে কি মনে করে, শম্ভু যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে নালটা বের করতে গিয়ে দেখে বাক্সের মধ্যে নালও নেই। তখন শম্ভু ফ্যাকাশে মুখে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, "ও গাড়ি আরো অনেকে দেখেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না।" বলে আমাদের এরকম টানতে টানতে ওর বাড়ী নিয়ে গেল। পরদিন সকালে যে যার বাড়ী ফিরে গেলাম। গুপী আর জাহাজের কথা তুলল না।



ডিমাগিরীর বাংলোয় এক রাত্রি * শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আচম্‌কা বদলীর পরোয়ানা পেয়ে চাটগাঁ থেকে লুংলে যাবার পথে মিলিটারীর চাকরী জীবনে একরাত্রির জন্য ডিমাগিরীর ডাকবাংলোতে রাত কাটাতে হয়েছিল।

আসামের পার্বত্য-সঙ্কুল জায়গা। অনেকটা খাড়াই উঠে পাহাড়ের উপরে অস্থায়ী একটি টিনের চালা তুলে বাংলো তৈরী করা হয়েছে মিলিটারী অফিসারদের সুবিধার জন্য।

চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ধূসর রহস্য ঘেরা প্রাচীর। বহু নিম্ন দিয়ে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণফুলীর মূল অগভীর ধারাটি। বর্ষায় স্ফীতা হয়ে উঠে কিন্তু শীতে শীর্ণা হয়ে পড়ে। পাহাড়ী উঁচু-নীচু দীর্ঘ এগার মাইল পথ পায়ে হেঁটে, ক্লান্ত হয়ে শীতের এক সন্ধ্যায় আমি, মেজর ক্রিশ্চান ও অর্ডারলী রামসিং এসে বাংলোয় আশ্রয় নিলাম।

নীচে শীতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও পাহাড়ের উপরে তখনও একটা আবছা আলোছায়া মায়াজালের মত চারিদিকে থির থির করে কাঁপছে। দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে তোড়ে নদীর উৎস নেমে আসছে, তারই গুম্‌ গুম্‌ শব্দ কানে এসে বাজছে দূরাগত ঢাকের বাদ্যির মত দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌।

বাংলোয় পাশাপাশি মাত্র দুটি ঘর। ঘরের চারিদিকে কাঁচা বাঁশের চাঁচড়ীর বেড়া।

হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘনায়মান শীত রাত্রির।

বাংলো-কীপার একজন লুসাই। নাম বাউঙ্গা, বয়স চল্লিশের বেশী নয়। আমাদের সাড়া পেয়ে সেলাম দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মলিন রুক্ষ চুল।

পরিধানে বট্‌লগ্রীন মলিন একটা বড় সাইজের মিলিটারী ঝলঝলে প্যাণ্ট। গায়ে অনুরূপ একটি জ্যাকেট ঢল ঢল করছে।

'কেয়া খানা হোগা সাব!—'

'ভাত আর মাংস।'—সঙ্গে আমাদের একটা চিকেন ছিল, রাম সিংকে বললাম সেটা নিয়ে গিয়ে রান্না করবার জন্য।

লোকটা চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললাম, 'থোড়া গরম পানি গোসলকে লিয়ে মিলেগা রে!'

'মিলেগা সাব!—'

আহারাদির পর রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ বাংলোর দুটো ঘরে আমি ও মেজর ক্রিশ্চান দু'জনে আশ্রয় নিলাম।

নিদারুণ পথশ্রমের ক্লান্তিতে গায়ে কম্বল চাপিয়ে শয্যায় শুতে না শুতেই চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘরটা অন্ধকার!

আলোটা জ্বেলে দরজাটা বন্ধ করে শুয়েছিলাম, চেয়ে দেখি হা হা করছে ঘরের দরজাটা খোলা এবং সেই খোলা দরজা পথে হু হু করে শীত রাত্রির পাহাড়ী ঠাণ্ডা হাওয়া বেপরোয়া ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করছে। আলোটা বোধহয় সেই হাওয়াতেই এক সময় কখন নিভে গিয়েছে।

কম্বলের তলায়ও যেন ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম থাক অমনি, কিন্তু সাধ্য কি দরজাটা খুলে শুয়ে থাকি! কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডারে বাবা! হাড় শুদ্ধ জমে গেল বুঝি!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালাম।

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের দিকে তাকাতেই সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখ দুটি আমার যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল।

নিজের অজ্ঞাতেই পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বাইরের খোলা অপ্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

মধ্যরাত্রি।

মেটে মেটে চাঁদের আলো শীত রাত্রির অস্বচ্ছ কুয়াশার সঙ্গে জড়িয়ে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে।

দূরে অস্পষ্ট পাহাড় ও জঙ্গলের ধূসর ইঙ্গীত চারদিকে মধ্য শীত রাত্রির অদ্ভুত এক নীরবতা। সহসা সেই নীরবতা ছিন্ন হয়ে গেল দীর্ঘায়ত কার করুণ কণ্ঠের ডাকে: লা-তি-য়া! লাতিয়া!

নিঝুম নিঃশব্দ রাত্রি যেন কাকে ডেকে ডেকে খুঁজছে।

লাতিয়া! লাতিয়া!……

এমন করুণ কান্নার মত ডাক জীবনে আর কখনো শুনিনি।

লাতিয়া! লাতিয়া!

কোথা থেকে কে কাকে ডাকছে এমন করে করুণ কণ্ঠে এই মধ্য রাত্রে।

এগিয়ে গেলাম বারান্দার শেষ প্রান্তে কিসের কৌতুহলে কে জানে!

অস্পষ্ট আলোছায়ায় তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকালাম।

ডাকটা তখনও শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে: লাতিয়া! লাতিয়া! পুরুষ কণ্ঠের ডাক।

সহসা যেন বহুদুর হতে নারীকণ্ঠের ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা প্রত্যুত্তর এলো ভেসে: বাউঙ্গা!

বাউঙ্গা! চমকে উঠলাম! এই বাংলোরই সেই লুসাই কীপারটার নামই তো বাউঙ্গা!

পাহাড়ের গা বয়ে বয়ে আঁকা-বাঁকা এবড়ো-থেবড়ো পায়ে চলা পথে বাংলো থেকে নীচের দিকে একেবারে নদীর পাড় পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

নদীর একেবারে জলের কোলঘেঁষে একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল যেন অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি হাতে একটা লণ্ঠন মাথার উপরে দোলাতে দোলাতে ডাকছে: লাতিয়া! লাতিয়া!

চিরদিনের আলাপপ্রিয় আমি, পথে-ঘাটে কাউকে দেখলেই মিলিটারীর ঘরছাড়া জীবনে কাউকে দু'দণ্ড পেলেই আলাপ না করে পারতাম না।

আজ রাত্রে খাবার সময়ই দু'চারটে কথায় বাউঙ্গার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম: লোকটি বছর দেড়েক হলো এখানে আছে একাই। নিঃসঙ্গ একক জীবন। বাংলোর অল্প দূরে ছোট একটা চালা ঘরে লোকটা থাকে।

তবে শীতের এই মধ্য রাত্রে আলো জ্বালিয়ে, দুলিয়ে কাকে অমন চীৎকার করে ডাকছে বাউঙ্গা।

আশেপাশে কাউকে হয়ত ডাকছে। বার্কিং ডিয়ারের কয়েকটা ডাক শোনা গেল। আশেপাশে কোথাও পাহাড়ী বার্কিং ডিয়ার ফসল ক্ষেতে বা নদীর জলে তৃষ্ণা মেটাতে বেরিয়েছে হয়ত। হঠাৎ আবার বাউঙ্গার গলা শোনা গেল: লাতিয়া! লাতিয়া!......

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতই যেন নারীকণ্ঠে জবাব এলো: বাউঙ্গা! বাউঙ্গা!

মনে হলো যেন খুব কাছ থেকেই জবাবটা এলো এবার। তারপরই দুড়দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা লক্ষ্য করে চেয়ে দেখি একটা ছায়ামূর্তি প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই পাহাড়ে উঠবার পরে চলা পথটা ধরে নীচের দিকে নামছে।

দাঁড়িয়ে রইলাম নীচের দিকে সেই দ্রুত চলমান ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে।

ছায়ামূর্তিটা নামতে নামতে হঠাৎ সুমিষ্ট মেয়েলীকণ্ঠে খিল খিল করে যেন হেসে উঠলো। হাসি ত নয় যেন কলোচ্ছ্বসা একটা ঝর্ণাধারা উচ্ছ্বলিত আনন্দে পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

নামছে ঝর্ণাধারাটা কলকল ছল ছল আনন্দে। হঠাৎ স্তব্ধ নিশুতি রাতকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে একটা রাইফেলের ক্রুদ্ধ গর্জন চারিদিকে ছড়িয়ে গেল: দুড়ুম।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকি। একটা দীর্ণ আর্ত নারীকণ্ঠের চীৎকার। তারপরই দেখলাম সেই চলমান নারীমূর্তিটা গড়াতে গড়াতে নীচে পড়তে লাগল পাহাড়ী ঢালু পথ বেয়ে এবং সর্বশেষে কোন ভারী বস্তু কিছু-একটা জলে গিয়ে পড়বার মত ঝুপ করে একটা শব্দ হলো।

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরই সব ভুলে এক লাফে বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে সেই ঢালু পথ ধরে নদীর দিকে নীচে নামতে লাগলাম এক প্রকার ছুটতে ছুটতেই।

সেই পাথরটার কাছে পৌঁছে দেখি সত্যি সত্যিই বাউঙ্গা হাতে একটা জ্বলন্ত হারিকেন হাতে স্থাণুর মত পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কেউ নেই!

চীৎকার করে বললাম—'কে যেন কাকে গুলি করল বাউঙ্গা!'

'হামার লাতিয়াকে সাব!'—বলে লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

'লাতিয়া! লাতিয়া কোথায়?—'

'ওই জলের মধ্যে পড়ে গেছে। মরে গেছে সাহেব সে। আর তাকে পাওয়া যাবে না—'

ঝোঁকের মাথায় জলের মধ্যে নেমে মৃতদেহটা বোধ হয় তুলতে যাচ্ছিলাম, বাউঙ্গা বাধা দিয়ে বলল: 'জলের মধ্যে তো লাতিয়া নেই সাহেব।'

'তবে?'

'ও তার প্রেতাত্মা রোজ মাঝরাতে এমনি করে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এসে জলের মধ্যে গুলি খেয়ে পড়ে যায়। ও লাতিয়া নয়। তার প্রেতাত্মা!—'

'প্রেতাত্মা!—'

'হ্যাঁ!'—

ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী আর লুসাই ভাষায় মিশিয়ে বাউঙ্গা রাতে যা বলেছিল সবটা তার বুঝতে না পারলেও যেটুকু বুঝেছিলাম: গত বৎসর আমাদেরই মত এক মিলিটারী সাহেব এসে ঐ বাংলোয় রাত্রি কাটাবার জন্য ওঠে। সাহেবের ছিল শিকারের খুব ঝোঁক! রাত্রে নদীতে বার্কিং ডিয়ার জল খেতে আসে শুনে সাহেবের সাধ জাগে রাত্রে হরিণ শিকার করার। সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বাউঙ্গা নদীর পাড়ে জঙ্গলে ওৎ পেতে বসেছিল, আর লাতিয়া ছিল উপরে জঙ্গলের ধারে। হরিণ এলে সে তাড়া দিয়ে নীচের দিকে পাঠাবে। ঐ ভাবে একটা হরিণ শিকার করার পর দু'জনে উপরে উঠে এসে লাতিয়াকে না দেখতে পেয়ে বাউঙ্গা চিন্তিত হয়ে ওঠে। চারিদিক খুঁজেও তাকে না পেয়ে আলো জ্বেলে আবার নীচে নদী কিনারে গিয়ে ডাকতে থাকে লাতিয়া লাতিয়া বলে। কৌতুকপ্রিয় লাতিয়া লুকিয়ে স্বামীর সঙ্গে কৌতুক করছিল। এমন কৌতুক স্বামীর সঙ্গে সে প্রায়ই নাকি করত। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ডাকে বনের আড়াল থেকে বের হয়ে স্বামীর কাছে বোধহয় ছুটে যাচ্ছিল এমন সময় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। লাতিয়ার পদশব্দে হরিণ ভেবে বাউঙ্গা বাধা দেবার আগেই সাহেবের হাতের রাইফেল দ্বিতীয়বার গর্জে উঠলো। এবারে লক্ষ্যও ব্যর্থ হলো না।

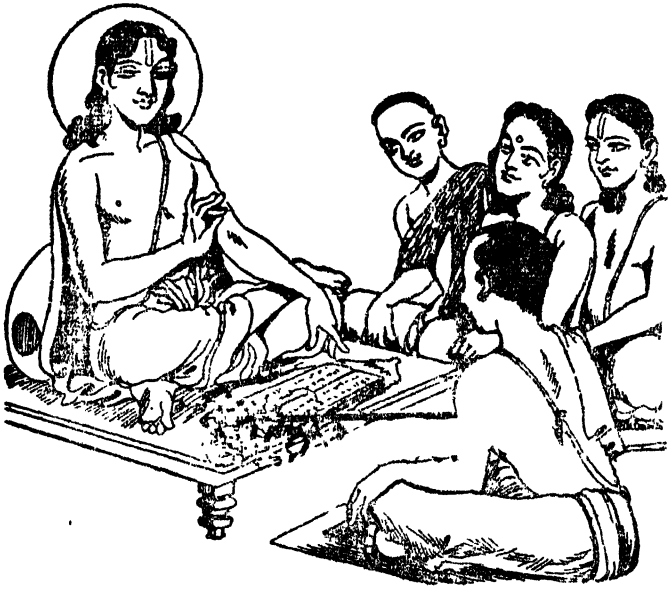
গুলিবিদ্ধ লাতিয়া একটা আর্ত কাতর শব্দ করে গড়াতে গড়াতে একেবারে ঝপ করে নদীর জলের মধ্যে এসে পড়লো।

তারপর হতে এমনি করেই প্রতি রাত্রির মধ্যখানে কে যেন আলো হাতে বাউঙ্গাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, ঘরের দরজা খুলিয়ে নীচে ওই নদীর কিনারে। তার হারিয়ে যাওয়া লাতিয়ার খোঁজে।

গলা ছেড়ে ও আজও প্রতি রাত্রে ডাকে লাতিয়া, লাতিয়া। যেমন করে সে রাত্রেও ডেকেছিল পাথটার উপর আলো হাতে দাঁড়িয়ে। কৌতুকপ্রিয়া লাতিয়া আজও সাড়া দেয়; বাউঙ্গা!····· তারপর গুলিবিদ্ধা হয়ে গড়িয়ে জলে গিয়ে পড়ে।

কাহিনী যখন শেষ হলো দেখি বাউঙ্গার শীর্ণ গালের দু'দিক দিয়ে নেমেছে চকচকে ক্ষীণ জলের ধারা। ভোরের আলোয় পূবের আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে এবং কখন না জানি ইতিমধ্যে এক সময় মেজর ক্রিশ্চানও ঘুম ভেঙ্গে পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শুনছে বাউঙ্গার কাহিনী। ডিমাগিরীর বাংলোয় এক রাত্রি শেষ হলো।

পঞ্চম শতকে হূণেরা পঞ্চনদে এসে পড়ে। মগধরাজ স্কন্দগুপ্ত দু'লাখ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান। যুদ্ধে তিনজন হূণ রাজা তাঁর বন্দী হয়। তাদের মৃত্যু বিধান করে স্কন্দগুপ্ত এদেশ থেকে হূণ অনাচার দূর করেন।



লোকশিক্ষা * শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকে খুব ভালমানুষ আর দয়ার সাগর বলে জানে। কিন্তু তিনি দরকার মতো পাথর বা লোহার চেয়েও কঠিন হতে পারতেন। অবশ্য এরকম কঠিন হতেন বেশির ভাগ তাঁর ভক্ত বা অনুরাগীদের শিক্ষা দেবার জন্যই। তিনি সত্যি-সত্যিই দয়ালু ছিলেন। মানুষদের ভালবাসতেন খুব বেশী, কাজেই এই রকম ক্ষেত্রে যাদের প্রতি কঠিন হতেন। তাদের চেয়ে তাঁর বুকেই সে আচরণ বেশি বাজত। কষ্ট তিনিও কম পেতেন না—তবু একটুও নরম হননি কখনও। ছোট হরিদাস বলে তাঁর একটি ভক্তের কী একটা অশোভন আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা বা তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। সেজন্য বেচারী হরিদাসের দুঃখের অবধি ছিল না। তার কষ্ট দেখে বহুলোক এসে চৈতন্যদেবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে—কিন্তু তিনি অটল ছিলেন। শেষে অবধি হরিদাস আত্মহত্যা করে, তাতে চৈতন্যদেব কম দুঃখ পাননি, বিস্তর শোক প্রকাশ করেছেন তবু বেঁচে থাকতে ক্ষমা করেন নি।

এমনি আর একটি ঘটনার কথাও ওঁর জীবনী থেকে জানা যায়।

চৈতন্যদেব তখন পুরীতে, সেখানকার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ওঁর বড় ভক্ত, দেবতার মতো জ্ঞান করেন। তেমনি রাজার এক কর্মচারী রায়

রামানন্দ খুব বড় ভক্ত এবং পণ্ডিত চৈতন্যদেব তাঁকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করেন, তার উপদেশ শুনতে বা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলে চৈতন্যদেবের আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকে না। রায় রামানন্দের বাবা ও ভাইয়েরা সকলেই রাজ সরকারে বড় বড় কাজ করেন, রাজারও যেমন প্রিয় এঁরা চৈতন্যদেবেরও তেমনি।

এই রামান্দেরই এক ভাই গোপীনাথ পট্টনায়েক উড়িষ্যা রাজ্যেরই মানজাঠ্যা দণ্ডপাঠ বলে একটি জেলার শাসক ছিলেন। তিনিই ওখানের কর আদায় করতেন ও রাজকোষে জমা দিতেন। (এখানকার ডিষ্ট্রীকট ম্যাজিস্ট্রেট আর কলেক্‌টার বলতে যা বোঝায় কতকটা তাই ছিলেন আর কি।) তখনকার দিনের প্রায় সব রাজপুরুষই রাজকর আদায় করে জমা দেবার আগে নিজের কারবারে খানিকটা খাটিয়ে নিতেন। গোপীনাথও সে নিয়মের বাইরে ছিলেন না। এই করে একবার তাঁর রাজ সরকারে প্রায় দু' লক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। রাজা যখন খুব চাপ দিলেন, তখন গোপীনাথ এসে জানালেন যে, আমি তো এখনই সবটা দিতে পাচ্ছি না, একটু সময় দিন—ক্রমে ক্রমে সবটাই শোধ করে দেব। আপাততঃ আমার কাছে খুব ভালো আরবী ঘোড়া আছে বারোটা। যদি আপনারা কিনে নেন তো ঐ দামটা দেনায় ওয়াশীল হতে পারে, আমি খানিকটা রেহাই পাই।

রাজা তাতে রাজী হলেন। রাজার বড় ছেলে 'বড়জানা' সাধারণতঃ এইসব কেনাকাটা করতেন। রাজা তাঁর কাছে গোপীনাথকে পাঠালেন ঘোড়াগুলোর দাম ঠিক করতে। রাজাই হোক আর রাজপুত্রই হোক—দরদস্তর করার লোভ সামলাতে পারে কে? ঘোড়াগুলোর যা ন্যায্য দাম হয়, বড়জানা তার চেয়ে অনেক কম দাম বললেন। এমনিই কম বললেন যে গোপীনাথের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। গোপীনাথ একে বড় রাজকর্মচারী, তায় ভবানন্দ রায়ের ছেলে রামানন্দের ভাই—ওদের সমস্ত পরিবারই রাজার বিশেষ প্রিয় কাজেই তিনিও বেশ একটু উদ্ধত ছিলেন। তিনিও এক মর্মান্তিক কথা বলে বসলেন। এই রাজপুত্রের স্বভাব ছিল কথা বলার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে উপর দিকে মুখ করে কথা বলতেন। গোপীনাথ ফস করে বলে ফেললেন, আমার ঘোড়া না হয় ঘাড় বাঁকায় না, উটমুখ করে কথা বলে না, তাই বলে এত অপদার্থও নয় যে এই দামে বেচব?

মানুষের শারীরিক কোন বিকৃতি নিয়ে ঠাট্টা করলে তার সবচেয়ে রাগ

হয়। রাজপুত্রও চটে আগুন হয়ে উঠলেন, তিনি রাজার কাছে গিয়ে একটা কথা সাতখানা করে লাগিয়ে বললেন, 'সহজে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় হবে না, টাকাটা দেবার ইচ্ছেই নেই আদৌ, যদি বলেন তো একটু ভয় দেখিয়ে টাকাটা আদায় করার চেষ্টা করি।'

রাজা অতশত জানেন না, বললেন, 'যা ভাল বোঝ তা কর।'

বড়জানা তখন হুকুম করলেন গোপীনাথকে হাত পা বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে, সেখানে একটা উঁচু মাচার উপর চড়িয়ে তার নীচে কয়েকখানা খোলা তলোয়ার পুঁতে দিলেন শূলের মতো, বললেন, 'টাকা যদি না দাও উপর থেকে ঐ তলোয়ারের উপর ফেলে দেওয়া হবে।'

এই যখন ব্যাপার—তখন কেউ কেউ এসে চৈতন্যদেবকে ধরলেন, 'ওরা আপনার সেবক, আপনার ভক্ত—এই বিপদে যদি আপনি না বাঁচান তো কে বাঁচাবে?' চৈতন্যদেব সব শুনে বললেন, 'তা আমি কি করব বলো, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, ভিক্ষা করে খাই—দু' লাখ টাকা শোধ করব কি করে?' তারা বলল, 'না, রাজা আপনার যেরকম অনুগত আপনি একটু বললেই তিনি ছেড়ে দেবেন।'

চৈতন্যদেব ভীষণ বিরক্ত হলেন এই কথায়, বললেন, 'রাজার প্রাপ্য রাজকোষে জমা না দিয়ে নিজে খরচ করে, আবার বাবুয়ানায় দিন কাটায়, তার হয়ে আমি রাজাকে বলতে পারব না। রাজার দোষ কি, তাঁর প্রাপ্য তিনি চেয়েছেন বই তো নয়। যে অপরের প্রাপ্য আদায় করে খরচ করে—সে তো চোর। আমি তার হয়ে বলতে পারব না।'

একটু পরে আর একজন লোক এসে খবর দিল, 'গোপীনাথের ভাই বাণীনাথকেও রাজার লোক বেঁধে এনেছে—একসঙ্গে শূলে দেবে।

সবাই জানত এদের মধ্যে বাণীনাথই আবার চৈতন্যদেবের বিশেষ প্রিয়, কারণ তিনি খুব বড় ভক্তও। কিন্তু তবু চৈতন্যদেব রাজাকে ওদের মুক্তির সুপারিশ করতে রাজী হলেন না। বললেন, 'রাজার প্রাপ্য রাজা আদায় করবেন বৈকি! তাছাড়া আমি বৈরাগী, আমাকে একথা শোনাতে এসেছ কেন?' একটু পরে আর একজন খবর দিল, ওদের বাড়ির সকলকে বেঁধে নিয়ে গেছে, সকলকেই বধ করা হবে! চৈতন্যদেব বিশেষ উত্তেজিত ও দুঃখিত হয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল—কিন্তু তবু তিনি একটি কথাও ওদের হয়ে বলতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি

মহাপ্রভুর প্রধান ভক্ত ও শিষ্যরা এসে ওঁর পায়ে আছড়ে পড়লেন। 'আপনি রক্ষা করুন, আপনি ওদের বাঁচান।'

চৈতন্যদেব বিষম রেগে উঠলেন এবার, 'তোমরা কি চাও আমি রাজার কাছে গিয়ে আঁচল পেতে ভিক্ষে করি? আর আমি ভিখিরী মানুষ, আমাকে তিনি দু' লাখ টাকা দেবেনই বা কেন?'

এই সময় একজন বললেন, 'গোপীনাথকে আর একদণ্ড মাত্র সময় দেওয়া হয়েছে, তারপরই শূলে ফেলা হবে!'

আবারও সকলে মহাপ্রভুর পায়ে পড়লেন, 'আপনি একটু বলুন, আপনার মুখের কথায় অত বড় বংশটা রক্ষা পায়!' চৈতন্যদেব মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমার দ্বারা হবে না কিছু, জগন্নাথকে জানাও তোমরা? রক্ষা করতে হয় তিনিই করবেন।'

মুখে বললেন বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগলেন, একটুও স্বস্তি রইল না। শেষে আর থাকতে না পেরে কাশী মিত্রকে ডেকে বললেন, 'আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারছি না। তুমি ব্যবস্থা করে দাও আমি এখনই আলালনাথে চলে যাব।' আলালনাথ পুরী থেকে ১৬।১৭ মাইল দূরে। এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। যে চোর, যে পাপী সে শাস্তি ভোগ করবে—মাঝখান থেকে তার দুঃখের কথা শুনিয়ে আমাকে এমন করে লোকে দগ্ধায় কেন তা বুঝি না।'

কাশী মিত্র বড় পুরোহিত। তার বাড়িতেই চৈতন্যদেব থাকতেন। তিনি ওর মনের কথা বুঝলেন। তখনকার মতো শান্ত করে কেউ যাতে আর না এসে ওকে বিরক্ত করে সেই ব্যবস্থা করে, নিজেই রাজার খোঁজে গেলেন। রাজা অবশ্য তার আগেই আর একজনের মুখে গোপীনাথের খবর পেয়ে তাঁকে বধ্যভূমি থেকে ফেরত আনিয়ে ঘোড়ার ন্যায্য মূল্য ঠিক করে বাকি টাকার জন্য খত লিখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন মহাপ্রভুর এই কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আমি এখনই ওর দু' লাখ টাকা মকুব করে দিচ্ছি। কী আশ্চর্য, এই সামান্য ব্যাপারে মহাপ্রভু দেশান্তরী হবেন?'

কাশী মিত্র বললেন, 'না টাকাটা আপনি লোকসান দেন তাও উনি চান না। আবার ওর কষ্টও সহ্য করতে পারছেন না, সেইজন্যেই উনি চলে যেতে চাইছেন। উনি বার বারই বলছেন, যে রাজার রাজস্ব আদায় করে জমা না দেয় সে চোর, সে মহাপাপী, তার চরম শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু এধারে

ওরা সকলেই ওঁর ভক্ত প্রিয়পাত্র—ওদের কষ্ট ওঁর সহ্য হচ্ছে না। প্রভু ওই দোটানাতেই বেশী কষ্ট পাচ্ছেন।'

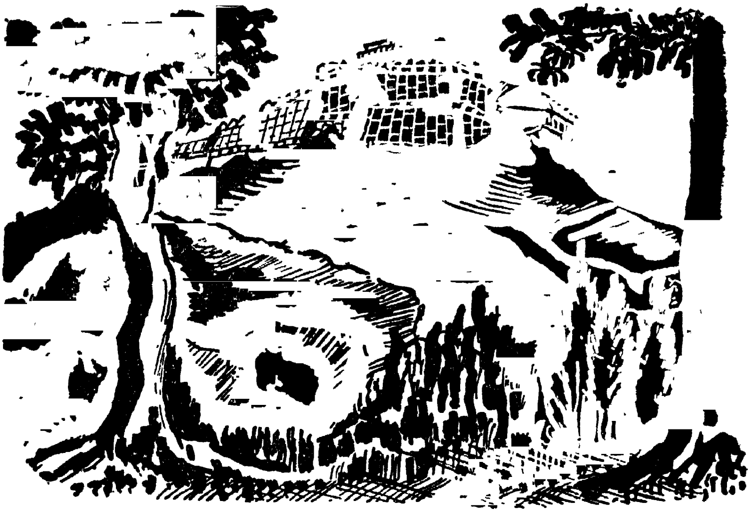
প্রতাপ রুদ্র তখন হাতজোড় করে বললেন, 'আপনি দয়া করে ওঁকে বুঝিয়ে বলুন যে ওদের পরিবারের সকলেই আমারও প্রিয়পাত্র, সেইজন্যই ও টাকাটা আমি মাপ করলুম, উনি যেন অন্য কিছু না ভাবেন। তাছাড়া গোপীনাথকে বধ করার ইচ্ছা কারুরই ছিল না। বড়জানারও না, শুধু ওকে ভয় দেখানোর জন্যেই ধরে এনেছিল। তাতেও যে মহাপ্রভু ব্যথা পেয়েছেন একথা শুনে আমার লজ্জার অবধি নেই। আমি এখনই এর ব্যবস্থা করছি।'

রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তখনই ফিরে গিয়ে গোপীনাথকে ডাকিয়ে ওর টাকার খতটা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর ওকে বললেন, 'ভয় নেই—তুমি যেমন মালজাঠ্যা শাসন করছিলে তেমনি করো গে, তোমার মাইনেও আমি দ্বিগুণ করে দিলুম আজ থেকে—তবে দেখো আর যেন কোনদিন অমনভাবে রাজস্ব খরচ করে ফেলো না।'

শুধু তাই নয়—বহুমূল্য শিরোপা প্রভৃতি উপহার দিয়ে রাজা সসম্মানে গোপীনাথকে দণ্ডপাঠে পাঠিয়ে দিলেন।

এসবই কিন্তু চৈতন্যদেবকে খুশি করার জন্যে, তাঁর ইচ্ছা জানা মাত্রই রাজা এতটা করলেন—আর রাজা যে তাঁকে এতটা খাতির করেন তাও চৈতন্যদেব জানতেন, তবু রাজাকে অন্যায় অনুরোধ করতে রাজী হননি তিনি কোন মতেই।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য খনির কথা লিখে গেছেন—সীসা, ত্রপু (টিন) ও অয়স (লোহা)। পাহাড় থেকে শিলাজতু, আর সমুদ্র থেকে মুক্তা, প্রবাল, শুক্তি ও শঙ্খ। তখনকার দিনে এসব জিনিষের কথা ইউরোপের সাহেবরা ভালমত জানতো না।



বীরাঙ্গনা * শ্রী মায়া বসু

মোগল বাহিনী ফিরে গেল যবে যশোহর পরিহরি
নয়া রাজধানী ধুমঘাট গড়ে নতুন দুর্গ গড়ি,
রণতরী আর সৈন্য কামানে সাজায়ে আপন হাতে
বাংলার বীর প্রতাপাদিত্য মহা উৎসবে মাতে।

যুদ্ধ বিরতি। প্রমোদে মত্ত যতেক সেনানীগণ
তরোবারে আর শাণিত কৃপাণে বাজে না ঝন্‌ন ঝন্‌।
নিষ্প্রভ যত অস্ত্রশস্ত্র নিষ্প্রাণ হাতিয়ার
স্বেচ্ছাচারে ও বিলাসে মত্ত ভুঁইয়ার দরবার।

গড় মুকুন্দপুর ঘিরে রয় যমুনা ও ইছামতী
বিশাল বাহিনী, অতি খরস্রোতা, উদ্দাম বেগবতী।
সুগভীর দহ কামারখালির পরিখার জলধারা
ধুমঘাট গড় ঘুরে ঘুরে এসে, এখানেই হল হারা।

এ হেন সময়ে দুর্গ দুয়ারে বাজিল কাড়া-নাকাড়া
'আল্লাহ আকবর' হাঁক ছাড়ি মোগলেরা দিল সাড়া।
নির্মেঘ নীল আকাশে সহসা ওঠে বৈশাখী ঝড়
শত্রু দুয়ারে সমাগত ফের! কেঁপে ওঠে ধুমগড়।

যুদ্ধ করিয়া এনায়েত খাঁর বিরাট বাহিনী সহ
হীনবল রাজা বরিয়া লইল পরাজয় দুর্বহ।
রাজার আদেশে অস্ত্র ত্যজিল যতেক সেনানীগণ।
অবনত শিরে করিল প্রতাপ আত্মসমর্পণ।

পরমা রূপসী শরত কুমারী মহারাণী আর যত
নারী ছিল গড়ে, জ্বলে ওঠে সবে অগ্নিশিখার মত।
"মোগলের হাতে ধরা দিতে হবে? এত বড় অপমান?
সহিব না কভু হেন লাঞ্ছনা, তার চেয়ে দিব প্রাণ।



বীরের ধর্ম রাজা ছাড়ে যদি, মোরা অসি লয়ে হাতে
রমণী হয়েও রণ দিব আজি এনায়েত খাঁর সাথে।
যুদ্ধ বিমুখ নিজে মহারাজ। হায় এ কী মহাপাপ
বুকের রক্তে মুছে নেব সবে এ কলঙ্কেরই ছাপ।"

অস্ত্রে বর্মে তুণীর কৃপাণে সাজে যত পুরনারী
খবর পেয়েই মোগলের দূত ছুটে আসে তাড়াতাড়ি।
করজোড়ে কয়, "শুন মহারাণী, ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ,
এই লও লিপি, নিজ হাতে লিখে পাঠালেন মহারাজ।

স্বেচ্ছায় তিনি করেছেন সব অস্ত্র সমর্পণ
মোগল অধীন ধুমঘাট গড়ে আর হবে নাকো রণ।
স্বামীর আজ্ঞা শরতকুমারী মানিবেন তাঁর কথা
সন্ধি সর্ত কোন মতে যেন হয় নাকো অন্যথা।

আজ রাত শেষে কালি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সাথে
ধুমঘাট গড় ছেড়ে দিতে হবে এনায়েত খাঁর হাতে।"
পাঠ করি সেই অদৃষ্ট লিপি কপালে কাঁকন হানি
বজ্রগর্ভ মেঘের মতন, নিশ্চল মহারাণী।

বেলা যায় যায়, ঘন হয়ে আসে সুনিবিড় আঁধিয়ার
শ্মশানের বুকে চিতার শান্তি ঘিরে রয় চারিধার।
পরিখার পারে সতর্ক চোখে মোগল সেনানী যত
পাহারায় রহে, শাণিত অস্ত্র ঝলসায় উদ্ধত।
কাল প্রত্যুষে ধুমঘাট গড় অধিকার করি তারা
রূপসী রমণী রত্ন লভিবে। উল্লাসে মাতোয়ারা।

গভীর রাত্রি! কখন সূর্য ডুবে গেছে বহুদূরে
একটি প্রদীপও জ্বলেনিকো আজ গড় মুকুন্দপুরে।
স্থির বিদ্যুৎ প্রতিমার মত ছিল যত সতী নারী
রাতের আঁধারে মুখ ঢাকি তারা, আসিল প্রাসাদ ছাড়ি
ময়ূরপঙ্খী বজরা ভাসায়ে কামারখালির জলে,
শরতকুমারী আর যত নারী ওঠে সবে দলে দলে।



প্রণাম করিয়া দেবী যশোরেশ্বরী :
নিজ হাতে রাণী পাটাতনখানি দিলেন ছিদ্র করি।
ধীরে ডোবে নাও, ঝলকে ঝলকে ওঠে বজরায় জল ;
বীরাঙ্গনারা হাসি মুখে রয়, নির্বাক! নিশ্চল!

মোগল সৈন্য ঢুকিল প্রাসাদে, সূর্য উঠিল দূরে।
একটি নারীও জাগিল না আর, রাজ অন্তঃপুরে!



উল্টো বিচার * শ্রী স্মথনাথ ঘোষ

এ রাজ্যের সবই উল্টো।

যেমন ভণ্ড রাজা, তেমনি শঠ ও প্রতারক তার মন্ত্রী ও পারিষদবৃন্দ। প্রজা পালনের নামে রাজা করেন প্রজা শোষণ। ধর্মদণ্ড হাতে থাকলেও অধর্মের সাহায্যে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। তাই যারা অন্যায় করে তারা এখানে শাস্তি পায় না, যারা ন্যায়ের পথে চলে তারাই দণ্ড ভোগ করে।

ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক প্রজারা সব সময় আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকে। কি জানি কার ওপর কখন রাজ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। রাজার চেয়ে ভয় করে সবাই বেশী তাঁর অনুচরবর্গকে! তারা সব সময় পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়। কার ক্ষেতে ধান জন্মেছে বেশী, কার পুকুরে মাছ হয়েছে অঢেল, কার ব্যবসায়ের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে গোপনে তার তথ্য করে সংগ্রহ। তারপর চুরি, জোচ্চুরি, বাটপাড়ী যে যেদিক দিয়ে পারে তা থেকে আত্মসাৎ করে। আর নিরাপরাধ প্রজাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের চালান দেয় রাজার কাছে বিচারের জন্যে।

যেমন রাজা, তাঁর শাসন করার পদ্ধতিটাও তেমনি চমৎকার। যে অপরাধী তাকে একটা কাঠের বাক্সের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলা হয়। সেই বাক্সের উপরে যে গর্ত তার মধ্যে থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো টেনে বার করতে। সেই কাগজে যে লেখা উঠবে তাই হবে রাজার বিচার। 'বাঁচা' আর 'মরা' এই দু'রকমের কথা দু' টুকরো কাগজে লেখা থাকে, যার

ভাগ্যে যা উঠবে, তাকে মেনে নিতে হবে তাই। এর ওপর আর কোন আপীল নেই।

বিচারের নাম শুনলে তাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে সকলে।

একদিন এক ধনী বস্ত্র-ব্যবসায়ীকে রাজার সামনে এনে হাজির করেন মন্ত্রী। বললে, হুজুর, এর অপরাধ সাংঘাতিক। এ রাজশুল্ক ফাঁকী দিয়েছে, যতটা দেবার কথা তার অনেক কম দিয়েছে।

এ গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই। রাজা তাই সঙ্গে সঙ্গে তার বিচারের দিন ধার্য করে আসামীকে হাজতখানায় বন্দী করে রাখতে হুকুম দিলেন।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যত বিচারের দিন ঘনিয়ে আসে, তত মন্ত্রীর বুকের ভিতরটা দুর দুর করে। কি জানি যদি তার ভাগ্যে ওঠে 'বাঁচা'। তাহলেই ত আসামী রাজার কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবে! মন্ত্রী যে তার কন্যার বিবাহের সময় অনেক টাকার বস্ত্র এই মহাজনের কাছ থেকে ধারে কিনেছিল এবং ছ' মাস এক বছর করতে করতে প্রায় আড়াই বছর কেটে গেলেও সে দেনা শোধ করেনি—উপরন্তু সেই টাকার জন্যে তাগাদা করাতে মন্ত্রী ওর ঘাড়ে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাকে এইভাবে ফাঁসীতে লটকাবার মতলব করেছে, রাজা সে কথা জানতে পেরে যাবেন। তাই এই আপদ একেবারে নিষ্কণ্টক করার জন্যে মন্ত্রী গোপনে সেই বাক্সরক্ষককে ঘুষ খাওয়ালে। বললে, ওর ভিতরের দুটো কাগজেই 'মরা' এই কথাটা লিখে দিতে হবে, তাহলে যে কাগজই সে তুলুক মৃত্যু একেবারে সুনিশ্চিত। মন্ত্রীর ইচ্ছামত কাজ বাক্সরক্ষক করলে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা মতলবও তার মাথায় গেল।

ঘুষখোরের কি লোভের সীমা আছে! তাই তখনি কারাধ্যক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে বন্দীর সঙ্গে গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলে এবং তার হাতের বহুমুল্য হীরার আংটিটার বিনিময়ে তাকে মন্ত্রীর সেই কৌশলের কথাটা ফাঁস করে দিয়ে এলো।

বিচারের দিন সকালে বন্দীকে এনে দাঁড় করিয়ে তার সামনে সেই বাক্সটা রাখা হলো। রাজার হুকুমে ঘাতক আগে থেকেই এসে তার পাশেই হাজির ছিল। মন্ত্রীর বুকের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠতে লাগল।

বন্দী প্রথমে ভগবান ও তারপর রাজা ও উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রণাম

করে একখানি কাগজ টেনে নিলে বাক্সটা থেকে। কিন্তু মরা এই কথাটাকে দেখেই যে তৎক্ষণাৎ কাগজটা মুখের মধ্যে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে রাজার দুই চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠলো এবং জনতাও হৈ-হৈ করে উঠলো।

তখন হাত জোড় করে বন্দী রাজাকে বললে, হুজুর, ভয়ে আমি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে এই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি, এর জন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আর একটি কাগজ ত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে—সেটা তুলতেই ত আগেরটাতে কি লেখা উঠেছিল বুঝতে পারা যাবে।

সবাই সায় দিয়ে উঠলো, বললে, এ সাধু প্রস্তাব। শুধু মন্ত্রীর মুখ ভয়ে পাংশু বর্ণ ধারণ করে।

বন্দী এবার সেই কাগজখানি বাক্স থেকে বার করে সকলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরায় সবাই দেখলে তাতে 'মরা' এই কথাটা লেখা। কাজেই পূর্বের কাগজটা যে 'বাঁচা' লেখা ছিল এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে রাজা একমত হয়ে তখনই বন্দীকে মুক্তি দিলেন।

মাদুরার রাজকুমার পাণ্ড্য সাগর পার হয়ে সিংহলের উত্তর অঞ্চল দখল করে রাজা হয়ে বসেন পঞ্চম শতকে (৪৩৩ খৃস্টাব্দ)। এই পাণ্ড্য রাজারা ২৭ বছর সিংহল শাসন করেছিলেন।

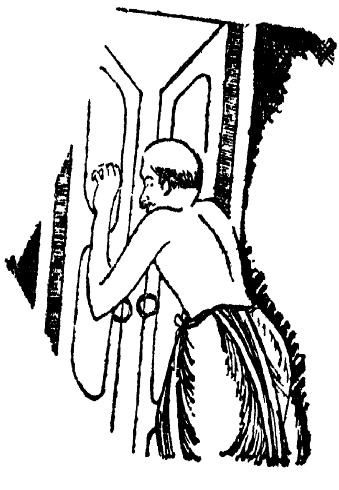
পূজার চাঁদা

শ্রী রবিদাস সাহা রায়



বারোয়ারী পূজার চাঁদা!
হায় কি বিষম জ্বালা!
শুনে শুনে কান দুটো যে
হচ্ছে ঝালাপালা।
বাইরে গিয়ে বাঁচোয়া নেই,
পূজা সকল পাড়ায়,
চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে,
সামনে এসে দাঁড়ায়।

দূর স্থবাদে কারুর দাদা,
কারুর মামা হলে,
যে পাড়াতে যাও না কেন,
চাঁদার খাতা চলে!
ক'দিন পরে দেখবে খুলে
হিসাব-খাতা যেই,
পূজার জামা কাপড় কেনার
মোটেই টাকা নেই।
তার চেয়ে এক বুদ্ধি খাটাও
মিটবে চাঁদার জ্বালা
ঘরের ভিতর ঘুমাও স্থখে
বাইরে দিয়ে তালা।



জীবনকেষ্টর জীবন-নাট্য

*

শ্রী শিবরাম চক্রবর্তী



॥ এক ॥

জীবনকেষ্টর সব কাণ্ড লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়। তার কীর্তিকথা একমুখে বলবার নয়। তাহলেও সবার সম্মুখে বলবার মতো। সেই বিচিত্র কাহিনী এখানে সুরু করা হচ্ছে।

জীবনকেষ্টর ধারণা তার শিক্ষার বয়স এখনো পেরোয়নি। সত্যি বলতে, কারোই সে বয়স পার হয় না! কখনই না, কিন্তু আশ্চর্য, কারো সে ধারণা নেই। সেই ধারণাটাই জীবনকেষ্টর হয়েছে, সর্বসাধারণতার থেকে এইখানেই তা ব্যতিক্রম।

শিখবে তো, কিন্তু কী শিখবে? শেখবার মতো কী আছে? আছে অনেক কিছু যা তার শক্তির বাইরে—শেখবার শক্তি এবং ধারণা শক্তি বাইরেই তার,—আবার অনেক কিছু আছে যা তার এক-আধটু আধা খ্যাঁচরা শিখে রাখা।

যেমন এই মোটর-চালানো শিক্ষাটাই ধরা যাক না! একবার একজনে গাড়ী বাগে পেয়ে এই শিক্ষাটা বাগিয়ে আনবার সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দখল হবার আগেই গাড়ীটা বে-দখল হয়ে গেল। যার গাড়ী, জীবনকেষ্টর কৃপায় সে অধিকতর শিক্ষালাভ করে লোহার দরে গাড়ীটা বেচে দিয়ে সেই মূলধন নিয়ে লোহার কারবারে জমে গেছে। তার কেমন ধারণা হয়েছিল, জীবনকেষ্ট যেভাবে লেগেছে তাতে ও-গাড়ী থাকবার নয়—এমন কি, অচিরেই গাড়ী আর জীবনকেষ্ট দুজনেই যাবে। একসঙ্গে এক সহমরণে

অতএব বেচে দিয়ে গাড়ীর তিন কুল বাঁচানো গেল—গাড়ী, জীবনকেষ্ট এবং নিজেকে।

লোহার কারবারে এখন সে এত লোহা জমিয়েছে, যাকে জমানো সোনা বা রূপাই বলা চলে,—শোনা কথা নয়, জীবনকেষ্ট স্বচক্ষেই গিয়ে দেখল সেদিন। লোকটাও লৌহ-ঘটিত হয়ে কেমন যেন লক্কর হয়ে গেছে। সে লোক থাকলেও সে লৌকিকতা নেই। এখন তো ইচ্ছে করলে অমন গাড়ী সে চারখানা কিনতে পারে, এমন অলৌকিক কিছু না। কিন্তু জীবনকেষ্টর প্রস্তাবে সে ঘাড় নাড়ল আর বলল—আর না। ভাবখানা যেন এ রকম, যে গাড়ী একবার বেচেছে, আর তার মুখদর্শন করবে না—অন্ততঃ জীবনকেষ্ট বেঁচে থাকতে নয়। তবুও সে হাল ছাড়েনি, বলেছে, আচ্ছা, আমি যদি ভালো করে মোটর চালাতে শিখি? তাহলে? তাহলে কিনবে ত?

—শেখোতো আগে। তখন দেখা যাবে।

জবাবটা যেন একটু আশাবাদীর মতই। শিখতে আরম্ভ করে পঠদ্দশায় হয়ত সে এমন করেই চালাবে যে, অক্লেশেই নিজেকে পরপারে চালিয়ে নিতে পারবে সেজন্যে তার বন্ধুর আলাদা গাড়ী কেনার দরকার হবে না।—বন্ধু হয়েও কি রকম স্বার্থপর হতে পারে জীবনকেষ্ট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পায়।

ওকালতির অবশ্যি সে কিছু কম করেনি। এও বলেছিল—বিনে পয়সায় আমার মতো একজন ড্রাইভার পাচ্ছ। অমনি পেয়ে যাচ্ছ—এটা কি তুমি লাভ বলে মনে করো না? অমনি তোমার গাড়ী চালাব, এক পয়সা নেব না, অথচ হুকুম করলেই হাজির! এক পাড়াতেই তো আছি। যাব কোথায়?

তবুও ঘাড় নেড়েচে তার বন্ধু। কী ভেবে কে জানে। বস্তিত্ব উভয়েই পাশাপাশি বটে, কিন্তু মোটর কেনার পর জীবনকেষ্ট অপঘাতে না গেলেও তার অস্তিত্ব কোথাও থাকবে বলা কঠিন। সত্যি বলতে, কলকাতার কোথায় না থাক্‌বে! টালা থেকে টালীগঞ্জের মধ্যে সব রাস্তাতেই সে ঘুরচে—উক্ত মোটরের ড্রাইভার আসনটিতে তাকে দেখা যাবে। তোমার আর অসুবিধা কি? মাঝপথে হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো, দেখতে পেলেই হাঁক ছাড়ো, গাড়ী তোমার পাশেই এসে হাজির, উঠে পড়ো তখন! অসুবিধেটা কি?

কিন্তু জীবনকেষ্টর বন্ধুত্বে যতখানি আগ্রহ, যেমন অকৃত্রিমতা, বন্ধুর জীবনকেষ্টত্বে ঠিক ততখানিই ভেজাল। যাই হোক, ওর মোটর চালানো শিখতে তো কোনো হানি নেই—নিজের প্রাণহানি বা অন্য প্রাণী-হানির সে কেয়ার করে না। তারপর শিখে চালাবার লাইসেনস্ পেলে পর, বিনা-দক্ষিণার বদলে না হয় বেতন নিয়েই সহর প্রদক্ষিণ করবে। তার বন্ধু না হোলো বয়ে গেল, শোফারের চাকরিই না হয় সে করবে যে কোনো মোটরওলার কাছে—মন্দ কি? মোটর চালানো একটা কাজ তো? আরামের কাজ! তাছাড়াও, একটা মোটরকে নিজের আয়ত্তে আনা কম কাজ নয়।

এক মোটর-শিক্ষালয়ের ঠিকানা জানা ছিল। সখের খাতিরে বা পেশার জন্য কেউ মোটর চালানো শিখতে চাইলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তার সুব্যবস্থা আছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পাঠে একথা সে জেনেছিল। সেইখানেই গেল সে।

শিক্ষালয়টা একটা মেরামতি কারখানা মাত্র, জীবনকেষ্ট দেখল। কয়েকখানা মোটরগাড়ী নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর জনকয়েক উঠে পড়ে লেগেছে। আস্ত মোটরকে ভাঙছে, আর ভাঙা মোটরকে জুড়ছে। একখানাকে তিনখানা, আর তিনখানাকে একখানা করা—এই তাদের কাজ বলে তার মনে হোলো। মোটরদের তারা দস্তুরমত শিক্ষা দিচ্ছে—হয়ত বা বলা গেলেও, তাদের কাউকে বিজ্ঞাপন-কথিত উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক বলে জীবনকেষ্টর বোধ হোলো না।

কারখানার একদিকে আপিস ঘরের মতো একটুখানি ছিল। টেবিল চেয়ারে জমানো জায়গাটা। জীবনকেষ্ট সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিল।

আরেকটি যুবক ছিল সেখানে—সভ্য ভব্য স্মার্ট। তাকেই শিক্ষক বলে সন্দেহ করে এগিয়ে গেল জীবনকেষ্ট—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আপনই কি মোটর-শিক্ষক? জিজ্ঞেস করল ও।

—আজ্ঞে না। আমি শিখতে এসেছি।

এই সময়ে হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন—দিব্যি অমায়িক চেহারার।

—কে যেন মোটর শিক্ষকের কথা বলছিল না? শুনলাম যেন। বললে সেই আগন্তুক।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি জীবনকেষ্ট জবাব দিল

—আমার ড্রাইভারটা প্রায়ই কামাই করে। মাঝে মাঝে কোথায় যে পালিয়ে যায় জানি না। দেখছি নিজে না চালাতে শিখলে আর চলে না, যুবকটি তাঁকে জানাল।

—ও, আসলে তুমি একজন শিক্ষার্থী? ভদ্রলোক বললেন।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এইবার সেই বিপুল-বপু লোকটি জীবনকেষ্টর দিকে ফিরলেন।

—এই শিক্ষার্থীটি ততক্ষণ বসুন, ইতিমধ্যে আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? জিজ্ঞেস করলেন তিনি জীবনকেষ্টকে।

এই অতিকায় ভদ্রলোক, ডাঃ প্রতুলচন্দ্রর অতিশয় ভদ্রতার কথা সে অঞ্চলে কারো অবিদিত ছিল না। তাঁর অমায়িকতায় রুগীরা যেমন মুগ্ধ ছিল, তাঁর বৌ তেমনই তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ আর কিছু না, তাঁর এই ভাব-বাচ্যের কথাবার্তা।

রুগী এবং স্বীয় পত্নীর প্রতি (তিনি রুগী না হলেও) তিনি অভিন্ন আচরণ করতেন।

সকালে উঠেই প্রথম কথা তাঁর ছিল—একবার জিভটা তো দেখতে হয়।

বৌ জিভ বার করতে একটু দেরি করলে তাঁর বাক্যের দ্বিতীয় ভাগ শোনা গেছে—জিভটা একবার আমাদের দেখানো দরকার। লজ্জা কি দেখাতে? লোকে তো জিভ বার করে ভেংচিও কাটে!

তারপর জিভ-টিভ দেখে নাড়ি-টাড়ি টিপে হয়ত বলেছেন—আজকে আমরা বেশ ভালোই আছি মনে হচ্ছে তবু একটু সিরপ অফ ফিগস্ খেয়ে রাখা ভালো। দু'চামচ মাত্রায় সমপরিমাণ জলের সঙ্গে খাব আমরা—কেমন? পেট পরিষ্কার থাকলে কখনো আমাদের কোনো অসুখ করবে না। (বলা দরকার এই সিরপ তিনি স্বয়ং কখনো খেতেন না।)

রুগী অন্তিমদশায় পৌঁছনোর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই আত্মীয়-ভাব বজায় থাকতে দেখা যেত। কেবল সেই চরম ক্ষণে, রুগীর যায়-যায় অবস্থাতেই তিনি ভাববাচ্য এবং উত্তম পুরুষের বহুবচন পরিত্যাগ করে অধম পুরুষের এক বচনে নেমে আসতেন। 'আমরা ভালো হয়ে উঠব, সেরে উঠব, ভয় কি?' যে-তিনি এই কথাই আগের ভিজেটে বলে গেছেন, সেই-তিনিই, কেন

বলা যায় না, 'আমাদের আর বাঁচানো গেল না' একথা না বলে 'ওকে আর বাঁচাতে পারলুম না। অক্কাই পেল বুঝি'—এই কথাই বলে ফেলেছেন।

যুবকের কথা শুনে প্রতুলচন্দ্রের মনে হোলো তাঁর সোফারেরও তো প্রায় সেই ব্যারাম। পালিয়ে যাওয়া ব্যারাম ঠিক না হলেও, ব্যারাম হলেই সে পালিয়ে যায়। হয়ত ডাক্তারি চিকিৎসার ভয় ততটা তার নয় যতটা বুঝি বা ডাক্তারের আত্মীয়তার—আর সে যখন বাড়ীর বৌ নয়, তখন তার পালাতে বাধা কি?

এই যেমন আজকে তার আর টিকি দেখা যাচ্ছে না প্রতুলচন্দ্র মনে করলেন, ঐ যুবকের অনুকরণীয় আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর নিজেরও মোটর-চালনাটা রপ্ত করে রাখলে মন্দ হয় না। এবং শিক্ষককেও যখন এত সহজে, আসা মাত্রই হাতের নাগালে পাওয়া গেছে তখন এ-সুযোগ ছাড়া কেন?

—একটু মোটর চালানো তা হলে শেখা যাক। কেমন? জীবনকেষ্টকে তিনি বলেছেন।—সাঁতার শেখার মতো মোটর চালানোটা আমাদের প্রত্যেকেরই শিখে রাখা দরকার—কখন কি কাজে লাগে! তাই নয় কি?

—সে কথা ঠিক। বলেছে জীবনকেষ্ট।

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র এবং তার ভাববাচ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকায় তাকেই সে মোটর-শিক্ষক বলে ভ্রম করেছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডাক্তার যে তাকেই শিক্ষক বলে ঠাউরেচেন, এ তথ্য সে ধরতে পারেনি।

তাদের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা সালুন্ গাড়ী তখনো অটুট অবস্থায় ছিল—তখন পর্যন্ত মিস্ত্রি-মজুররা কেউ তার পেছনে লাগেনি।

—এইখানাই বার করা যাক—কেমন? ডাঃ প্রতুলচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন।—ক্ষতি কি?

গাড়ীর ভেতরে কে কোন্ স্থান অধিকার করবে, তাই নিয়ে দু'জনেই একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করচেন। জীবনকেষ্ট জিজ্ঞেস করেছে—আপনি তাহলে চালকের আসনে বসুন।

—না, না। আমি কেন? জবাব দিয়েছেন প্রতুলচন্দ্র—কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়েই, বলতে কি।

—আমিই চালাবো তাহলে? জীবনকেষ্ট বলেছে: বেশ। আপনি আমার পাশে থাকচেন তো?

—তা, পাশাপাশি বসতে আপত্তি কি আমাদের? প্রতুলচন্দ্রের তাড়া দেখা গেছে এবার—চট করে বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে। বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কি?

—কোন্ দিকে যাবো? ড্রাইভারের আসনে বসে প্রশ্ন করেছে জীবনকেষ্ট।

—রাস্তায় তো বেরনো যাক আগে। তারপর হাওড়া ব্রিজ হয়ে—

—য়্যাঁ? একেবারে হাওড়া পর্যন্ত?

—নিশ্চয়। বলেচেন প্রতুলচন্দ্র: এমন কি তারও ওধারে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যদ্দুর যাওয়া যায়। চালাতে শেখার সাথে সাথে যদি একটু হাওয়া খাওয়া যায়। মন্দ কি?

গাড়ীতে স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনের পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর পেয়ে জীবনকেষ্ট চমৎকৃত—এরকম গাড়ী এর আগে সে পায়নি। হাতায়নিও এর আগে।

এক ছুটে বোঁ করে বেরিয়েছে গাড়ীটা। এত বড় গাড়ী, যার বনেট্‌টাই এতখানি, করায়ত্ত করা জীবনকেষ্টর এই প্রথম। কিন্তু তাহলেও, একজন ওস্তাদ শিখিয়ের পাশে বসে চালানোয় তার ভয়টা কি?

—বাঃ, দিব্যি ফাঁকা রাস্তা! আরো একটু জোরে চালানো যায় না? প্রতুলচন্দ্রের প্রশ্ন।

—কতো জোরে চালাতে আপনি বলছেন?

—যতো জোরে চালানো যেতে পারে।

অদ্ভুত গাড়ী! অ্যাক্‌সিলিরেটরে পা ছোঁয়াতেই গাড়ীটা তীর বেগে ছুটেছে। একটা ঘোড়ার ল্যাজে ঘেঁষে চলে গেছে উল্কার মতো।

—চমৎকার চালানো। এক চুলের জন্যই বেঁচে গেছে ঘোড়াটা। চুলচেরা বিচার করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।

এই কৃতিত্ব সত্যিই ওর চালনা নৈপুণ্য কি না, জীবনকেষ্ট ভেবেছে। ভেবে একটু অবাক হয়েছে নিজেই।

—আবার কি ঐ রকম একটা কিছু করা যায় না?

—তা—চেষ্টা করলে—বোধ হয়—

—আমাদের সামনে ঐ—ঐ যে রেসিং-কার চলেছে দেখা যাচ্ছে—

ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা চেপে ফুর্তি করে চলেছে—ওর একেবারে ধার দিয়ে—প্রায় দাড়ি কামানো গোছ চেঁছে দিয়ে যাওয়া যায় না? পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব জোরসে হর্ণ্ বাজিয়ে যেতে হবে কিন্তু?

জীবনকেষ্ট সন্ত্রস্ত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকালো। সঙ্গীন পরীক্ষাই বই কি!

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোম্‌টা রাখা যায় না। শিক্ষালাভ করতে এসে পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্রকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!

রেসিং-কারের দাড়ি চেঁছে যাবার সময় তার মনে হোলো, গাড়ীটা যেন শিস্ দিয়ে চলেছে—সেই সঙ্গে হর্ণের এমন কান ফাটানো আওয়াজ! আর সঙ্গে সঙ্গে ও-গাড়ীর হল্লাকারীদের কী বিচ্ছিরি চীৎকার। বাতাসে আর্তনাদটা গপ করে গিলে ফেলল, তাই রক্ষে; নইলে জীবনকেষ্টর কান গেছল।

—তোফা! উল্লসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। আচ্ছা, কতো তাড়াতাড়ি তুমি মোড় ঘোরাতে পারো? স্পীড একদম না কমিয়ে মোড় নিতে পারো না—অস্বাভাবিক উৎসাহে এমন কি তিনি স্বাভাবিক ভাববাচ্য পর্যন্ত ভুলে গেলেন। জীবনকেষ্টর মৃত্যু আসন্ন জেনেই কিনা কে জানে!

—বলতে পারব না ঠিক—জবাব দিল জীবনকেষ্ট।—কখনো চেষ্টা করিনি।

—আচ্ছা, সামনের বাঁকাটায় ঘোরো তো দেখি। যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়।

জীবনকেষ্টর হাত কাঁপতে থাকে ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর। শিক্ষালাভ করতে হলে প্রাণপণ করতে হয়, এমন কি প্রাণ দিয়ে শিক্ষা পাওয়াটাই আসল শিক্ষা—জীবনকেষ্টর তা অজানা নয়। 'রক্ত দিয়ে কী লিখিব—প্রাণ দিয়ে কী শিখিব—কী করিব কাজ?' রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই কলিও তার মনে পড়ে। কিন্তু তবুও তার হাত কাঁপে।

—তবে তাই হোক। তথাস্তু! মনে মনে নিজেকে এই কথা বলে জীবনকেষ্ট মরিয়া হয়ে পড়ে। মোড়ের মুখের পথিকরা, গ্রহের চক্রান্তে সেই দণ্ডে যারা প্রায় মরবার মুখে ছিল, চীৎকার করে ওঠে—গাড়ীটাও এক ধারে দুটো চাকা স্বর্গের দিকে তুলে দেয়। কিন্তু তক্ষুনি আত্মসম্বরণ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সোজা করে নিতে সে দেরী করে না।

এই সুযোগ গাড়ীটা মোড়ের পাহারোলার ল্যাজ ঘেঁষে গেছল। ধনুষ্টঙ্কারের মতো বেঁকে আত্মরক্ষা করে সেও নিজেকে সোজা করে নিয়েছে।

—অদ্ভুত! অদ্ভুত—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার।—বিলেতে যে সব মোটরের রেস হয়, তাতে আমাদের যোগ দেয়া উচিত।

—আপনি—আপনি কি সত্যি বলছেন? আমি—আমি কিন্তু কখনো সে কথা ভাবিনি। জীবনকেষ্ট নিজেকে অভাবিত জ্ঞান করে।

—আচ্ছা, এই যে সব গাড়ীঘোড়া যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে রেখে এঁকে বেঁকে—যেমন করে ফুটবল কেরামতি করে নিয়ে যায়, তেমনি করে এদের ভেতর দিয়ে যেতে পারোনা তুমি?

—আপনি কি মনে করেন? পারব কি?

—তুমি সব পারো। ডাক্তার হাসতে থাকেন: আমার মনে হয় তোমার অসাধ্য কিছু নেই।

অকস্মাৎ জীবনকেষ্টও মনে হয়, সে সব পারে। এতক্ষণ তাদের গাড়ী বড় রাস্তা দিয়ে ছুটছিল বটে, কিন্তু এবার আরো চওড়া রাস্তায় চড়াও হোলো। চারি ধারে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরীর ছড়াছড়ি; ট্রাম যাচ্ছিল, আসছিল। প্রতুল ডাক্তার জীবনকেষ্টর কানে কানে কী যেন বললেন। কানাকানি করবার মতই কথা বটে! এক মুহূর্তের জন্য জীবনকেষ্ট ভয়ে জমে যেন জড় পদার্থ হয়ে গেল! তারপর বলল, কোন্ ধার দিয়ে যাব? যে ট্রাম যাচ্ছে তার ডান্ ধার দিয়ে, না কি, যে ট্রাম আসছে তার—

—তা কেন? যা বললাম! দু'টো ট্রামের মাঝখান দিয়ে—তারা সামনা-সামনি এসে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে কেটে বেরিয়ে যাও?

জীবনকেষ্ট ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না।—কি রকম?

—আহা! এ ট্রামটা যাবে আর ও ট্রামটা আসবে—তারা মুখোমুখি এসে পড়বার মুখে তাদের মাঝখান দিয়ে বন্দুকের গুলির মতো সোঁ করে গাড়ীটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সিকি সেকেণ্ডের এদিক-ওদিক হলে দু'টো ট্রামের মাঝখানে পড়ে পিশে চ্যাপ্‌টা চকোলেট হয়ে যাব আমরা। এবার বুঝেছে?

প্রাণকেষ্ট ঢোঁক গিলল। চরম পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে বুক বাঁধল সে। আশ-পাশের ট্রামের ঘর্ঘর-ধ্বনি যেন রেলগাড়ীর শব্দের মতো

মনে হতে লাগল তার। তার চোখের সামনে সব আবছা বলে বোধ হতে লাগল। তার ওস্তাদ্‌জী যদি অন্ততঃ তাঁর একটা হাতও ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখতেন, তাহলে সে যেন শান্তি পেত—নিশ্চিন্ত হতো একটু—কিন্তু না, তিনি তা রাখতে প্রস্তুত নন। অগত্যা জীবনকেষ্টকে স্বহস্তেই সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দু'ধারের ট্রামের আওয়াজ যেন বজ্রগর্জন বলে তার মনে হতে থাকে—মুহূর্তের জন্যই। তরে শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। সে চোখ বোঁজে।

অবশেষে চোখ খুলে—পার হয়েছি? হতে পেরেছি? এই কথায় প্রথম সে জিগেস করে।

ডাক্তার বলেন—সাবাস্।

এতক্ষণে তারা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়েছে—এর পর কি করব? জিজ্ঞেস করে জীবনকেষ্ট।

—কিছু না। ঝড়ের বেগে চালিয়ে যাও। হুকুম আসে।

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর! গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ী চলেছে—স্পীডো-মীটারে সত্তর মাইলের নিশানা।

—এরকম একজন পাকা ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য জীবনে একবারই হয়। ডাক্তার না বলে পারেন না।

—সত্যি বলছেন আপনি? জীবনকেষ্ট গদ্‌গদ্ হয়ে পড়ে।

—তোমার ব্রেকের খবর কি? ব্রেক ঠিক আছে তো?

—এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

—আমি ভাবছিলাম কি—এই স্পীডের মাথায় যদি হঠাৎ তোমায় গাড়ী থামাতে হয়—সামনে কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা এসে পড়ে—তাহলে কি করবে?

জীবনকেষ্টর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কথাটা ভাববার মতো বই কি। তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফের স্রোত ওঠা নামা করতে থাকে।

—তা হলে কি করতে বলেন? ক্ষীণকণ্ঠে সে জিগেস করে। সে রকম অবস্থায় কি করব?

—মনে হচ্ছে, অদূরে যেন রাস্তাটা ব্লক্ করে দিয়েছে—একটা লরী লম্বালম্বি খাড়া করে রাস্তাটা যেন আটকে দেয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়ীটা থামাও তো এবার।

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক। দেখতে দেখতে সেই লরীর বেড়া সামনে এসে পড়েছে; আর জীবনকেষ্টও প্রাণপণে ব্রেক্ টিপেছে। চার চাকাতেই ব্রেক এঁটে গিয়ে—হঠাৎ বিশ্রী এক কেকাধ্বনি—এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ীটাই কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেছে আকাশে।

—যাক, বাঁচা গেল! বলেছেন ডাক্তার।

—আপনি যা বলেন! আমার কিন্তু বাঁচানোর আশা একদম ছিল-না। জীবনকেষ্টও হাঁফ ছেড়েচে।

ঠিক পাশেই তার ওতোরপাড়ার থানা। সেখান থেকে দারোগা বেরিয়ে এসেছেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সন্দেহজনক এক মোটর গাড়ীর মারাত্মক গতিবিধির খবর এলটু আগেই টেলিফোনে তাঁরা পেয়েছিলেন। রাস্তা আটকেছিলেন তাঁরাই।



থানার দারোগা এসে জীবনকেষ্টকে পাকড়ালেন—লাইসেনস্ দেখাও।

—আমি তো সবে চালাতে শিখছি। লাইসেনস্ কোথায় পাবো! জীবনকেষ্ট বলেছে: উনিই তো মাষ্টার। উনিই আমায় শেখাচ্ছেন।

—আমি মাষ্টার! তার মানে? তুমিই তো আমার মাষ্টার হে! প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন। খুব শেখালে যাহোক্!

—তার মানে? দারোগা এবার প্রতুলবাবুকে নিয়ে পড়েছেন: আপনার লাইসেনস্ দেখান তো।

—আমার মেডিক্যাল লাইসেনস্—তার সঙ্গে গাড়ী চালানোর কি? ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র আকাশ থেকে আছাড় খান: এবং তাও তো আমার সঙ্গে নেই। আমার রেজিস্টার্ড নম্বর বলতে পারি। তাতে কিছু সুবিধে হবে?

—কোথ্‌থেকে আসছেন আপনারা?

—ভবানীপুরের এক মোটর গ্যারেজ থেকে।

—কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছেন?

প্রতুলচন্দ্র ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় বলে যান—ঠিক সাড়ে চার মিনিট আগে।

—ভবানীপুর থেকে ওতোরপাড়া সাড়ে চার মিনিটে এসেছেন—ঘণ্টায় কতো মাইল বেগে এসেছেন, আপনাদের খেয়াল আছে? এই রেষ্ট্রীকৃটেড্ এরিয়ায় এরূপ বে-আইনী গাড়ী চালানের জন্য আপনাদের আমরা সোপর্দ করব—

এমন সময় একটি যুবক দৌড়ে এসে হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—

—এই যে···ডাক্তার রায়···কি ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছেন।······ এত তাড়াতাড়ি আপনি আসতে পারবেন, আমরা ভাবতে পারি নি। আপনাকে ফোন করবার পর থেকে এই ক'মিনিট যে কি করে কাটছে আমাদের! মুখুজ্যে মহাশয়ে হার্ট ট্রাব্‌লটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে উঠেছে—প্রায় যায় যায় অবস্থা। আসুন তাড়াতাড়ি। থানার পাশের দু'খানা বাড়ী বাদ দিয়ে ঐ বাড়ীটা আমাদের।

॥ দুই ॥

জীবনকেষ্টও বাসে উঠে এক কীর্তি করে বসল।

কথায় বলে কীর্তির্যস্য স জীবতি। কিন্তু আমাদের জীবনকেষ্টর বেলা তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। কীর্তি করে সে মারা যাবার দাখিল; ফাঁসি ঠিক না হলেও নিজেকে ফাঁসিয়েছে যে, তার ভুল নেই। যে পথ দিয়ে

লোকে ফাঁসি যায়—এবং তার কাছাকাছি আরো যেসব, তীর্থক্ষেত্র—জেল হাজত ইত্যাদি বাস করে সেই পথে সেই আদালতেই এসে তাকে হাজির হতে হয়েছে।

কেন যে তার ধৈর্যচ্যুতি হোলো বলা যায় না, বাসে যেতে যেতে মোটা-সোটা এক মেয়কে হঠাৎ সে এক চাঁটি মেরে বসলো এবং তার ফলে, আহত ব্যক্তিটি স্থূল বলে নয়, মেম্‌ বলেই বেজায় হুলস্থুল পড়ে গেছে।

সবাই এসে বলচে,—"জীবনকেষ্ট, এমন কাজ তুমি কেন করলে? এ কাজ তোমার উপযুক্ত হয় নি।"

কিন্তু জীবনকেষ্টর কোনো জবাব নেই।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছলো নাকি? নইলে হঠাৎ অমন ক্ষেপে ওঠবার কারণ?" জিগেস করে একজন।

জীবনকেষ্ট চুপ করে থাকে।

"না কি মেম্‌ তোমাকে মারতে এসেছিল বুঝি? তাই বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই বোধ করি…?" আরেকজন সংশয় প্রকাশ করে: "কিন্তু মেম্‌রা তো সচরাচর কারুকে কিছু বলে না কামড়ায়ও না বড় একটা?"

জীবনকেষ্ট রা কাড়ে না তবুও।

"মাতৃবৎ পরদারেষু এ কথা কি তোমার জানা নেই জীবনকেষ্ট? তবে? তবে হ্যাঁ, মেম্‌কে মাতৃতুল্য মনে না করতে পারো বটে। আমাদের কাম্ন বাবা আর কটা মেম্‌ বিয়ে করতে গেছে! কিন্তু—কিন্তু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, এটা তো মানো? মেম্‌ কিছু তোমার নিজের দ্রব্য নয়…? নিজস্ব জিনিস না?" পণ্ডিতগোছের এক ব্যক্তি শাস্ত্রের দ্বারা জীবনকেষ্টকে আঘাত করেন। চাণক্যশ্লোক মেরে ওকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন তিনি। "পরের মেয়ের গায়ে হাত তোলা কি তোমার উচিৎ হয়েছে? তুমিই বলো?"

জীবনকেষ্ট কিছুই বলে না—কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এবং ওই ঘোঁৎকারের বেশি আর কিছুই তার কাছে আদায় করা যায় না।

কেউ দুঃখ করে, কেউ বা সহানুভূতি জানায়, কারো কারো চেষ্টা হয় জীবনকেষ্টকে অভিনন্দন দান করার। সম্বর্ধনা-দাতাদের প্রত্যাশা,

জীবনকেষ্টর এই তো সবে হাতে খড়ি, মেম্ থেকে সুরু করেছে, এর পরে আস্তে আস্তে ও সাহেবের দিকে এগুবে—এবং ক্রমে ক্রমে সহীদ্ হবে—যদি প্রাণপণে লেগে থাকে !

বেশির ভাগ লোক অবশ্যি ছি-ছিই করে। কিন্তু জীবনকেষ্টর হুঁ হাঁ না নেই।

খবরের কাগজ থেকে ফোটো নিতে এসেছিল, একটি সদ্যজাত সাপ্তাহিকের সম্পাদক বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, পাড়ার হাতে-লেখা ত্রৈমাসিকের নাছোড়বান্দা ছেলেরা জীবনী ছাপতে রাজী হয়েছিল—তাদের একমাত্র মুখপত্রে যার মুদ্রণ মাত্র ১—কিন্তু জীবনকেষ্ট তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এমন কি, জীবনকেষ্টর এক পাড়াতুত ভাই বড় মুখ করে এসেছে বলেছিল, "পানুদা, তুমি একটা বিবৃতি দাও।" জীবনকেষ্ট তাতেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

সেই ঘটনার পর থেকে জীবনকেষ্ট কেমন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে।

অবশেষে জীবনকেষ্টর বিচারের দিন এল। আদালত ভীড়ে ভীড়াক্কার ! কাঠগড়ায় দাঁড়ালো জীবনকেষ্ট ! মুখে তার সকাতর হাসি। একবাক্যে বীর আর কাপুরুষ আখ্যা লাভ করলে যেমনধারা মানুষের দেখা যায়।

জীবনকেষ্ট এইবার মুখ খুলবে সবাই আশা করে।

কিন্তু জীবনকেষ্ট মুখ খোলে না।

জীবনকেষ্ট উকিল দেয় নি, নিজেও জেরা করেছে না—সাক্ষীরা একে একে সাক্ষ্য দিয়ে যায়—আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত—বাসের কিম্বিধ পরিস্থিতির মধ্যে কিরূপ তার অপচেষ্টা—সমস্তই প্রায় ঠিক বলে যায় জীবনকেষ্ট কান পেতে শোনে। অধোবদন জীবনকেষ্ট।

অবশেষে হাকিম নিজেই জীবনকেষ্টর জবানবন্দী চান। কেন সে এমন হঠকারিতা করে বসল—তার কৈফিয়ৎ তলব করেন।

জীবনকেষ্ট মুখ খুলল। অবশেষে মুখ খুলতে হোলো ওকে :

"শুনুন ধর্মাবতার, বলি তাহলে"—ম্লানহাসি হেসে সুরু করল জীবনকেষ্ট।—"কেন যেন এমনটা ঘটে গেল তাহলে বলি। শ্বেতাঙ্গী মহিলাটি বাসে উঠলেন, উঠে বসলেন। তারপর উনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মণিব্যাগ বার করলেন, তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, মণিব্যাগ খুললেন খুলে একটা আনি বার করলেন। আনিটি বার করে মণিব্যাগ বন্ধ

পর্যায়ে এই দাম্পত্য পড়ে না : ওই নয়কে জড়িয়ে, একসঙ্গে ওতপ্রোত করলে যে জর্জর রস দেখা দেয় তাই হচ্ছে দাম্পত্য। দাম্পত্য দশম রস।

এবং বিষম দশা। ওর রসিকের ব্যাখ্যাও উলটো। যে নাকি রসির দ্বারা বদ্ধ এবং সিকের দ্বারা বিদ্ধ হতে পারগ এবং ঐ বিঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়বার জন্য সর্বদা তৎপর, সেই হচ্ছে আসল দাম্পত্য-রসিক—নম্বর এক। একেবারে অকৃত্রিম জাতীয় : তার মধ্যে কোনো ভ্যাজাল নেই।

এরূপ রসিক বিরল নয়। আমাদের জীবনকেষ্টই একজন। বিয়ের প্রথম পর্বে ঐ রসটা যখন টগ্‌বগে হয়ে থাকে ও এখন সেই অবস্থায়। এর পরে আরো পর্ব আছে—সে এক মহাভারত। তার ভেতরেও কুরুক্ষেত্র, শরশয্যা ইত্যাদি বাদ নেই, তবে সে ক্রমশঃ প্রকাশ্য। জীবনকেষ্ট এখন আদি পর্বে। এই অনাদি রস যখন গাঢ় হয়ে ওঠে, কিম্বা আপনা থেকেই থিতিয়ে পড়ে, কিম্বা চাঁছি হয়ে প্রায় পুঁছে যাবার যোগাড় হয়, আর রসিকের অন্তস্তলে স্বভাবতঃই নানান প্রশ্ন জাগে, যথা : এই সে দাম্পত্য—এ কি দামে পোষায় এবং আদৌ পথ্য কিনা—এবম্বিধ প্রশ্ন : সেই পার্বণে পৌঁছতে জীবনকেষ্টর এখনো কিছু দেরি।

অর্থাৎ জীবনকেষ্টর সবে বিয়ে হয়েছে।

এবং বিয়ে করে সে দেশের বাড়ীতে নিয়ে এসেছে বৌকে।

প্রথম মধুনিশা পোহানোর পর ঘুম থেকে উঠে কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে প্রাণকেষ্ট বৌয়ের মুখের দিকে তাকালো। প্রথমেই প্রাতরাশের কথা মনে পড়ল ওর।—"আমার লক্ষ্মী সোনা, কী খেতে চাইবে কে জানে!"—আপন মনেই বলল ও।

ওর বৌ গাঢ় নিদ্রায় অচেতন—তখনো। তার কপালে রেখা পড়তে দেখা গেল। সূর্যের কিরণলেখা যেমন উষার ললাটে অবলীলাক্রমে লীলায়িত হতে থাকে প্রায় তেমনি। ডিমসেদ্ধ কি অম্‌লেট পেলে খেতে পারি।" নিদ্রাজড়িত স্বরে জবাব দিয়েছে ওর বৌ।

"বেশ। ডিম আছে, বাড়ীতেই আছে, আমার বিশ্বাস।" উঠে পড়ল জীবনকেষ্ট : "ঝিয়ের কাছে খবর নিচ্ছি।"

কেবল বৌ-ঝি নিয়েই জীবনকেষ্টর সংসার, তিন কূলে কেউ নেই। সহুরে মেয়ে বিয়ে করে এনে হিম্‌সিম্‌ খেতে হবে, অনেকে ওকে ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু সহরের সমস্ত দাপট যদি কেবল ডিম-টিমের ওপর

দিয়েই যায় তাহলে কিসের ভাবনা! যতই অজ হোক, ডিম আজো দুর্লভ নয় পাড়াগাঁয়।

"ডিম আছে বাড়ীতে?" ঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

"না। নেই তো।"

কেন নেই, কেনই বা যোগাড় করে রাখা হয়নি? এই প্রশ্ন জীবনকেষ্টর গলায় ঠেলা মেরে উঠলেও সে সামলে নিল। বিয়ের পরে প্রথম কলহটা বুঝি ঝিয়ের সঙ্গে হওয়া বিধি নয়। নিরীহ সুরে সে বলল:

"গোটা দুয়েক যোগাড় করতে পারো ঝি? যদি মুর্গির নেহাৎ না পাও, হাঁসের হলেও চলবে।...নিদেন একটা?"

"কোথায় পাবো? পাড়বো নাকি?" ঝিয়ের ঝঙ্কার।

"আচ্ছা আমি নিজেই দেখছি। তুমি উঠে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হও, আমি আনছি ডিম। তারপর স্টোভ ধরিয়ে আমি নিজেই তোমায় অম্‌লেট বানিয়ে দেব।" এই কথা বলে (ঝিকে নয়, বৌকেই বলে) জীবনকেষ্ট মুখ হাত না ধুয়েই বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত। আগে ডিম, তার পরে অন্য কথা।

"একবার ভাঁড়ার ঘরটা খুঁজে দেখি আগে। থাকতে পারে ডিম।"

ভাঁড়ার ঘর এবং রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুঁড়ি হাতড়ে দেখা গেলো—কিন্তু সব ভাঁড়েই ভবানী। এ ঘরের ও ঘরের আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোলো—কোথ্‌থাও নেই।

"কী আশ্চর্য! কোথ্‌থাও একটা ডিম নেই গো। অদ্ভুত বাড়ী বটে!" হাঁপ ছাড়ল জীবনকেষ্ট।

এ তাক ও তাক—বাক্স প্যাঁটরা তোরঙ্গ তছনছ করে ফেলা হোলো—

—বৃথাই! অবশেষ সুটকেস্ হাতড়াতে গিয়ে শার্ট পাঞ্জাবী ইত্যাদির তলায় ডিমের মতন কী যেন একটা ঠেকল ওর হাতে। অশেষ উৎসাহে তুলে নিয়ে দেখল জীবনকেষ্ট, নাঃ, ডিম নয়। দাড়ি কামাবার সেফ্‌টি সেট্। সাগ্রহে একবার দেখে তারপর সুটকেসেই অবশেষে তাকে রেখে দিল—"না, এমন নয়। ফিরে এসেই কামানো যাবে।...পাড়ায় ডিম পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক!"

"খুব বেশি দেরি হবে না তো ফিরতে তোমার?" জিগেস করল বৌ। শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে জীবনকেষ্টর কার্যকলাপ দেখছিল।

"নাঃ, দেরি কিসের? যাবো আর আসবো।" জীবনকেষ্ট জানায়। সীতার জন্যে স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বেরুতে রামচন্দ্রের প্রাণ কেমন করেছিল কে জানে, কিন্তু বৌয়ের খাতিরে ডিমের মৃগয়ায় বার হতে জীবনকেষ্টর বেশ আরাম লাগে। তাঁর তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট, আয়েষার তুষ্টিতে জগৎসিংহ তুষ্ট, বৌয়ের আয়েসে জীবনকেষ্ট পরিতুষ্ট। তার প্রাণ কানায় কানায় ভরে ওঠে। মনের মধ্যে ডিণ্ডিম বাজে।

দৃঢ়চেতা জীবনকেষ্ট হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়ে। এত সকালে সগুবিবাহিতের শোভাযাত্রা দেখে জনৈক পড়শী পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, জীবনকেষ্টর প্রশ্নাঘাতে একটু দাড়ি চুলকে সে বলল—

"ডিম? ডিম কোথাও পাওয়া যায় তা তো বলতে পারব না। তবে একটু এগিয়ে বাজারের কাছটায় নতুন চায়ের দোকানে দেখতে পারেন। যদি থাকে ঐখানেই থাকবে। তবে সঠিক করে কিছু..."

কিন্তু শ্রোতা ততক্ষণে নতুন চায়ের দোকানের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেচে।

"না মশাই, ডিম আমরা রাখি না। ডিম আর পাড়াগাঁয় কটা লোক খায় বলুন রোজ? ডিম রাখলে পচে যায়। দু-পয়সা কাপ্ চা, তারই দাম পাই না মশাই, তার ওপরে আবার ডিম......"

অতো কৈফিয়ৎ শোনার তার সময় নেই। ততক্ষণে সে পাশের বেগুনির দোকানে পাশ ফিরেছে।

গ্রহবৈগুণ্য আর কাকে বলে? বেগুনিওয়ালা তো ডিমের নামোচ্চারণেই নৃত্যকালী। কপালে করাঘাত করে সে চেঁচিয়ে উঠেচে—"ডিম? এই সকালে ডিম? এখনো বউনি করিনি আর প্রথমেই তুমি অযাত্রা ওই ডিমের নাম করলে?......" সে হায় হায় করতে থাকে।

সে বউনি করেনি তবে জীবনকেষ্ট করেচে, কিন্তু তার টীকা-ভাষ্যের চেয়ে টিকে থাকার পক্ষে পালানোই সে শ্রেয়ঃ বোধ করল। সেখান থেকে পালিয়ে জীবনকেষ্ট আরেক দোকানে হানা দিল। দোকানের মাথায় আলকাতরা-লাঞ্ছিত দেবাক্ষরে তক্তার সাইনবোর্ড লাগানো: "আমরা গেরস্থর যাবতীয় জিনিস সরবরাহ করি।"

এখানে আবার পাছে সেই বউনির গেরো বাঁধে—(বউনি আর বউ নিয়ে সর্বত্রই মুস্কিল!) জীবনকেষ্ট আগেই আধ সেরটাক্ গুড় কিনে বসল। তারপর দোকানীর কানের গোড়ায় ফিস্ ফিস্ করে বললে, (ঠিক

যেমন করে লোকে কোকেনের খোঁজ করে থাকে) ভায়া, আমাকে গোটা দুই ডিম দিতে পারো? বড্ড দরকার।

শুনে দোকানদারের হাসি আর ধরে না। "—ডিম? বিয়ে করলে লোকে রসিক হয় বাস্তবিক—বিয়ে করলে—"

রসিক ছাড়াও আরো কি কি হয়, গোরু ভেড়া গাধার মতো কোনো চতুষ্পদ হয়ে যায় কিনা এই ধরণের আরো মন্তব্য হয়তো ওর ছিল, কিন্তু অট্টহাসির দ্বিতীয় চোট এসে পড়ায় সেটা চাপা পড়ে যায়।

জীবনকেষ্ট বিরক্ত হয়ে আধ সের গুড় ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে। এবার গাঁয়ের চৌকিদারের সঙ্গে দেখা। যে-লোকটা এত চোর-ডাকাতের খবর রাখে সে কি আর একটা ডিমের খোঁজ দিতে পারে না? আইনের রক্তচক্ষু যদিও, তবু বউয়ের কোমল দৃষ্টির কথা স্মরণ করে তার সামনে এগিয়ে যেতে সে ভীত হলো না। চৌকিদারকেই গিয়ে পাকড়ালো।

"ডিম? ডিম ইখানে কুথ্‌থাও পাবা না। দাগী আসামীর মতো ডিম সব চালান যায়।. এই রাস্তা ধরে দেড় মাইল গেলে রহমান মিঞার বাগান মিলবে, তিনি মুর্গি পোষে আমি জানি। তার লগে গিয়ে মাগলে দু' একটা ডিম তিনি দিতে পারে, মর্জি করে যদি।" বলে চলে গেল চৌকিদার।

ডিমের লালসা পরিত্যাগ করবার জীবনকেষ্টর বাসনা হোলো বারেক। কিন্তু লালসা তার নিজের নয়, নইলে ঘোড়ার ডিমের পাঠশালা থেকে একদা যেমন সে পালিয়েছিল, তেমনি এই ডিমের ত্রিসীমানা থেকে পালিয়ে যেতেও তার কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু লালসা তার নিজের নয়, ঐখানেই বাধা এবং ঠিক এই কারণেই ওর এই প্রাণপণ।

এবার প্রাণপণ হণ্টন স্বরু হোলো ওর। নিজের গাঁ ছাড়িয়ে, ছোটখাট আরো দু একটা গণ্ডগ্রাম ডাইনে বাঁয়ে রেখে আড়াই মাইল হেঁটে গেলে রহমৎপুরে রহমান খাঁর বাগান। বাগান এবং বাড়ী।

দেড় মাইল কখন পেরিয়ে গেছে কিন্তু রহমান খাঁর বাগান আর আগায় না। সূর্য আকাশে কতো মাইল উঠে গেল বলা কঠিন, বেলা বোধ হয় ন-দশটার কম নয়, হেঁটেই চলেছে জীবনকেষ্ট। একটা ডিমের জন্য তার সর্বস্ব যায় যায়!

যেতে যেতে হঠাৎ, কোকিলের কুহুধ্বনি শুনে পথিকেরা যেমন চমকে ওঠে, জীবনকেষ্টও তেমনি বিচলিত হয়ে উঠল। অদূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল—"কোকরকোঁ……!"

থমকে দাঁড়ালো জীবনকেষ্ট। বেড়াঘেরার আড়ালে একটা বাগানের মতো না? এইটাই কি তবে সেই আস্তানা—রহমান সাহেব এবং তাঁর মুর্গিদের? কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে পথ এবং কোন্ ধারে তাঁর রহমৎখানা কিছু বোঝবার উপায় নেই। অগত্যা, বেড়া ফাঁক করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকাই প্রশস্ত বোধ করলো জীবনকেষ্ট।

এভাবে বেড়ানো, বিশেষতঃ অপরের বাগানে, খুব নিরাপদ নয়। তবু যতটা দৃষ্টির ওপরে নির্ভর করা যায়, কোনো ধারে কেউ কোথাও নেই ভালো করে সে দেখে নিয়েছে। তারপরে অদৃষ্টের ভরসা। দূরদৃষ্টি আটকানো যায় না, অনেক সময় দেখা যায়।

বেড়ার ফাঁক না বলে বেড়ার ফাঁকি বলাই উচিৎ। কেননা গর্তটা যেমন বেঁটে, জীবনকেষ্ট নিজে তেমন খাটো নয়। কাঁটা ঝোপের বেড়া, জীবনকেষ্ট নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে প্রবেশ করলেও তাদের তেমন ভদ্রতা-বোধ নেই—পিঠের থেকে পাঞ্জাবী খানিকটা খাবলে নিয়েছে।

তা নিক, জীবনকেষ্ট পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার পাত্র নয়—কাঁটার আক্রোশে হাত, পা, গা এবং গাল ছড়ে গেলেও এত ক্রোশের পর সে ডিমের নাগালে এসেছে। কাঁটাকে কাটিয়ে ধুলোয় কাদায় মাখামাখি এবং কণ্টকিত জীবনকেষ্টর বাগানে হস্তক্ষেপ—পদক্ষেপও বলা যায় কিন্তু সমস্ত কষ্ট মূহূর্তের মধ্যে সে ভুলল, যখন দেখল তার সকল কাঁটা ধন্য করে বাগানের মধ্যে ফুল ফুটে আছে: প্রায় ডজনখানেক মুর্গি বসে আছে অদূরে: বড় বড় অধ্যবসায় নিয়ে বিরাট কর্মীরা যেমন করে বসে থাকে।

একটু পরেই একটা মুর্গি উঠে গেল এবং তার পরিত্যক্ত স্থলে সে দেখল—স্পষ্টই দেখল মণির চেয়েও মহার্ঘ—উজ্জ্বল একটি ডিম। জীবনকেষ্ট তার প্রাণ দেখতে পেল যেন।

সেই প্রাণের ডিমটি হাতে নিয়ে জীবনকেষ্ট যেন তার প্রাণ হাতে পেল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ডিমটি তুলে যেমনি না পকেটজাত করা, অমনি তার নজরে পড়ল এক বাঘা কুকুর। কুকুরটাও তাকে দেখেছিল।

দেখেছিল অনেক আগেই। এতক্ষণ হয়ত অবাক হয়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছিল, কিন্তু এবার তেড়ে এসে প্রতিবাদ না করে পারল না। আর সে কী প্রতিবাদ!

কুকুরের ওষুধ হচ্ছে মুগুর ও লগুড়ও হয়ত-বা, কিন্তু জীবনকেষ্টর হাতের কাছে গুড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাও ওজনে আধসের টাক্ মাত্র। অগত্যা তাই ছুঁড়েই সে কুকুরটাকে তাক্ করল। এবং সেই ফাঁকে ক্ষিপ্রতর হামাগুড়ি-প্রদানে বেড়ার সুঁড়িপথ ধরে লম্বা দেবার চেষ্টা দেখল।

এদিকে গুড়ের তাল সামলে কুকুরটাও ওর পেছনে এসে লেগেছে। এসেই তার কাছায় বসিয়েছে এক কামড়। সে এক প্রাণ নিয়ে টানাটানি



কাণ্ড—জীবনকেষ্টর টানাপোড়েন! কুকুর টানে কাছা আর জীবনকেষ্ট টানে আপনাকে। এধারে কাঁটা ঝোপের পক্ষপাতিত্বে তার আগপাশতলা ছড়ে যেতে থাকে।

অবশেষে উভয়পক্ষেরই জিৎ! জীবনকেষ্ট প্রাণ নিয়ে গলে এল, কুকুর ওর কাছা নিয়ে চলে গেল।

যাকগে, দুঃখ নেই, ডিমের কোনো অঙ্গহানি হয়নি। অটুট অবস্থাতেই রয়েছে তার পকেটে। প্রাণে তার কোনো ক্ষোভ ছিল না, বিজাতীয় আনন্দে বরং একটা বিজয়ীসুলভ মৃদুহাস্যই ছিল ওর মুখে।

জীবনকেষ্ট এখন ফিরতি পথে। ছিন্নবেশ, ভিন্নকচ্ছ, পাগলের মতো চেহারা জীবনকেষ্টর।

ভাবতে ভাবতে চলেছে। পৃথিবীতে অন্নকষ্ট সব নয়। অন্যান্য কষ্টও আছে। যেমন এই ডিমের কষ্ট। বিয়ে করার কষ্টও কিছু কম না। ভেবে দেখলে, জীবনধারণ করাই কষ্টকর। কষ্ট করার জন্য—কষ্টের ধারণা করার জন্যই মানুষের জীবন।

তবু মানুষের অন্নকষ্ট দূর হওয়া দরকার, কেউ কেউ বলেন। সত্যই কি দরকার, জীবনকেষ্ট ভেবে ছাখে! যাদের অন্নকষ্ট আছে তাদের ঐ কষ্টটাই একমাত্র, আর কোনো বালাই তাদের নেই। ডিমের কথা তারা চিন্তাই করে না।

যদি তাদের অন্নকষ্ট দূর হয়, তখনই তাদের জীবনে, জীবনকেষ্টর মতো ডিমের কষ্ট দেখা দেবে। নানাজাতীয় ডিমের কষ্ট: অজানাকে না জানার দুঃখ, জানাকে আরো জানার দুর্দশা; কত কিছু পেয়ে কিম্বা না পেয়ে হারানোর ব্যথা, কত কী পেয়ে না হারানোর গ্লানি; কত রকমের সুখের কষ্ট আর সখের কষ্ট! অন্নভাণ্ড যদি পূর্ণ থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের কত না কষ্ট আপনা থেকেই এসে গায় পড়ে—কাব্যজিজ্ঞাসা থেকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পর্যন্ত,—ওরই মধ্যে হয়তো কখন আবার ভগবানকে না পাওয়ার কষ্টও দিতে কসুর করে না, সুখের মধ্যে এসে ভূতেরা কিলকিলিয়ে যায়!........ বাস্তবিক, একবেলার মধ্যেই জীবনকেষ্ট প্রচণ্ড দার্শনিক হয়ে উঠল।

বারোটা বাজিয়ে জীবনকেষ্ট বাড়ী ফিরল। বিমুগ্ধদৃষ্টিতে বৌয়ের দি ক তাকিয়ে বলল ও: "ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে গেল—না গো?"

বৌয়ের চোখেও পলক নেই।—"একি? এ দশা কে করল তোমার?"

যে করল, তাকে চোখের সামনে দেখা গেলেও, তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে জীবনকেষ্ট সেটা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করে না।

॥ চার ॥

অনিমা ছটফট করেছে তখন থেকে। সাতটা বেজে গেল—এখনো জীবনকেষ্টর দেখা নেই। হয়ত এখনই মহিমারা এসে পড়বে। আপিস থেকে একটা দিনও—আজকের দিনটাও—কি একটু চটপট বাড়ী ফিরতে নেই?

ওঁর আসার আগে যদি ওরা এসে পড়ে আর গৃহকর্তাকে অভ্যর্থনাকালে অনুপস্থিত গ্যাখে তাহলে কী বিচ্ছিরি হবে ভাবো দিকি? কোনো দিনও কি একটু আক্কেল হবে না ওঁর?

অণিমা ছটপট করে। ছটপট করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এধারের জিনিস নড়িয়ে ওধারে রাখে, ওদিকের জিনিস সরিয়ে এদিকে আনে—তারপর এক এক সময়ে দূরে সরে এসে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে—হ্যাঁ, এইবার দেখতে আরো একটু ভালো হলো। বেশ মানানসই হয়েছে এবার।

কিন্তু তা যেন হলো—তাই দেখালো—কিন্তু এই অনুগৃহীত জগতের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য, গৃহস্থ যে, তারই এখনো দেখা নেই।

ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর কক্ষচ্যুত হবার সম্ভাবনা হয় বলে শোনা যায়। কিন্তু সংঘর্ষের আগেই জীবনকেষ্ট ঘর ছেড়ে পালাবে—এই বা কি কথা? আর তাছাড়া, মহিমারা কিছু ধূমকেতু নয়, মহিমার বর যদিও ধূমপান একটু ভালোবাসে আর দেখতেও একটু ধূমসো—কিন্তু তাই বলে তাকে ঐ ধূমায়মান আখ্যা দেওয়া যায় না।

নেপথ্যের একটুখানি আওয়াজেই জীবনকেষ্টর আবির্ভাব টের পাওয়া গেল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো অণিমা: হ্যাঁগা আজকের দিনেও কি দেরী করে? আজো কি একটু সকাল সকাল বাড়ী আসতে নেই? আমি আধ ঘণ্টা ধরে ছটপট করছি, কখন তুমি আসো, কখন তারা আসে। আর তুমি এদিকে—

জীবনকেষ্ট প্রতিবাদচ্ছলেই কিছু বলতে দু'বার হাঁ করেছিল, কিন্তু অণিমার তোড়ের মুখে নিতান্তই তা 'না' হয়ে বুজে গেল।

"—যাও, অমন করে আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুনিই তারা এসে পড়তে পারে, জানো তো।"

"সেকথা বার বার জানাবার দরকার করে না অণু," জীবনকেষ্ট বলে। "আসবেই তারা, আমি জানি।"

"যখনই আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন আসে তুমি যেন কেমন ধারা হয়ে যাও।" অণু ফোঁস করে ওঠে: "আপনার লোক আসুক, কে না

চায়? তারা বাইরের চাঞ্চল্য বয়ে আনে, জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। বাঁধা ধরার একঘেয়েমি থেকে বাঁচায় আমাদের।"

"একঘেয়েমি দূর করতে অনেক ঘা খাবার কোনো মানে হয় না।" জীবনকেষ্ট জানায়।

"হ্যাগা, তুমি যেন কী! দিনকে দিন কী যেন হয়ে যাচ্ছ—একলষেঁড়ে একগুঁয়ে কী রকম যেন! কোনো আমোদ স্ফূর্তি নেই প্রাণে—যেন একটি জরদ্গব! মহিমার বর নিরঞ্জনকে ছাখো তো! তোমার চেয়ে বয়সে বড় অথচ কেমন ফূর্তিবাজ!"

"দেখেচি। গতবারে যখন এসেছিল তার ফূর্তির চোট দেখা গেছল। দু'খানা চেয়ার দিয়ে সেই যে কী কায়দা দেখিয়েছিল—"

"ভাবো দিকি কী আমোদ—"

"কায়দা দেখাতে গিয়ে চেয়ার দু'খানা ভাঙল—দু'খানাই দামী দামী চেয়ার—সেই সঙ্গে নিজেও পা ভেঙে পড়ে রইলো মাসখানেক। দিনরাত রুগ্ন শয্যার পাশে তটস্থ থেকে সেবা-শুশ্রূষার হাঙ্গাম—সেই ডাক্তার ডাকো—ওষুধ আনো—সে সব কি ভুলবার? তার ওষুধের দাম, রোগের পথ্যি, ডাক্তারের ফি—তাও আমাদের গুণতে হয়েছে। অথচ চেয়ার নিয়ে ঐ ফুর্তি না দেখালেই কি তার চলতো না? ফূর্তিবাজের বাজে ফুর্তি যতো! এ কি রকমের আত্মীয়তা?"

"আত্মীয়তার মানে তুমি বোঝো? নিজে কখনো কোথাও যাবে না, বেরুবে না, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেবে না, কেবল নিজের ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকবে। আত্মীয়তা কী জিনিষ তুমি কি জানবে? মহিমারা এসে এবার বেশ কিছুদিন এখানে থাক তাই আমি চাই।"

"তাই না কি?" জীবনকেষ্ট বলে। 'তাহলেই হয়েছে!' একথাটা সে আর উচ্চারণ করে না।

মড়ক মারী দুর্ভিক্ষ অনেক সময় পথ ভুল করে, পতঙ্গপালও ভুল করে অপর ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে, মৃত্যুও শিয়রে এসে অজান্তে ফিরে যায় এক এক সময়, কিন্তু আত্মীয়দের বেলা কখনো অন্যথা হয় না। যে গাড়ীতে আত্মীয়রা আসে তাতে কলিশন হবার কথা কদাপি শোনা যায়নি। জীবনকেষ্টর

এইসব শ্রুতি এবং স্মৃতিসুলভ দার্শনিক অভিজ্ঞতাকে সত্য প্রতিপন্ন করে মহিমা আর নিরঞ্জন যথাসময়ে নিরঞ্জন মহিমায় দেখা দিল।

দরজার কড়া নড়তেই অণিমা কান খাড়া করছে। জীবনকেষ্ট বলেচে—"ঐ রে! ওরা এসেছে! ওরাই! ওরা ছাড়া কেউ না।"

বলতে বলতে ওরা এসে পড়ল। অণিমার বোন মহিমা, মহিমার বর নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের দুলালী ইলা।

"এই যে জীবনকেষ্ট! কেমন আছো প্রাণ? বহাল তবিয়ৎ তো?" নিরঞ্জনের পুরাতন ফূর্তি দেখা গেল—প্রথম দর্শনেই।

"নিরঞ্জন যে! ভালো আছো বেশ?" জীবনকেষ্টর শুকনো অভ্যর্থনা। "মহিমা, আমাদের যে ভুলে যাওনি, তুমিও যে এসেছো—তাতে যে কী খুসী হলাম বলতে পারি না।"

"আপনাদের কখনো ভোলা যায় জামাইবাবু, কী যে বলেন!" মহিমা বলে: "ইলা, তোমার মেসোমশাইকে প্রণাম করো।"

"থাক থাক। হয়েছে। ওতেই হবে।" প্রণামাঘাতের ভয়ে জীবনকেষ্টকে পশ্চাদপদ দেখা যায়। "ইলা আমাদের খুব লক্ষ্মী মেয়ে।" অযাচিত সার্টিফিকেট দিয়ে ফ্যালে।

"লক্ষ্মী মেয়ে! হ্যাঁ, লক্ষ্মীই বটে!"—নিরঞ্জন উছলে ওঠে: "আর দু' এক বছর তুমি সবুর করো ভায়া, তারপর দেখো ইলাকে! তখন ওর পদভরে সারা বাংলা টলমল করবে। বলে, এখনই আমাদের পাড়া কাঁপছে!"

"আশ্চর্য নয়। যেমন বাপ-মার মেয়ে! ঘোড়া না হলেও—কিছু না হলেও—খোরা খোরা তো হবে!" জীবনকেষ্ট মনে মনে বলে এবং এখনই তাকে একটু কম্পান্বিত দেখা যায়।

"তাই নাকি, ইলামণি? এত বড়ো হয়েও এখনো তুমি পাড়াময় ছুটোছুটি করে বেড়াও নাকি?" সারা দেশময় ছুটোছুটির কথা জীবনকেষ্ট ভাবতেই পারে না।

"ছুটোছুটি! ছুটোছুটি কি হে! তুমি যে অবাক করলে বন্ধু! ইলা ছুটবে কি? ইলা নাচে। এর মধ্যেই ও যা নাচ শিখেচে দেখলে তাক লাগে।" নিরঞ্জন বিশদ করে দেয়।

ইলাও প্রতিবাদ করে: "আমি এমন কি বড় হয়েছি মেসোমশাই? আমার বয়স তো বারো মোটে।"

পাইকিরি হাসি পড়ে যায়।

"ও, তাই নাকি ?" জীবনকেষ্ট নিজের ভুল বুঝতে পারে।

জলযোগের পর সবাই আরাম করে বসেছে, জীবনকেষ্ট বলল: "হ্যাঁ, ভালো কথা! নিরঞ্জন, এবার তোমরা বেশ—বেশ কিছুদিন এখানে থাকচ তো ?" মনের কথাটা প্রাণের বহির্গত না করে সে পারে না।

"আঃ, চুপ করো—" অণু উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

"তা—মেরে কেটে দিন পনেরো থাকা যাবে 'খন। ছুটি পেলে আরো কিছুদিন কাটানো যেত কিন্তু···"

"সত্যি! দিদির এখানে এমন আরামে দিনগুলো কাটে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তোমার যা আপিস বাবা!" মহিমাই স্বামীর বাক্য সম্পূর্ণ করে দেয়।

"ওহে, সিগ্রেট আছে ?" নিজের পকেট হাতড়ানো শেষ করে নিরঞ্জন পকেটের বাহিরে অনুসন্ধান করে।—"আমার ফুরিয়ে গেছে দেখছি।"

"সিগ্রেট। সিগ্রেট তো আমি খাই নে, জানো তো!"

"আচ্ছা, আনিয়ে দিচ্ছি সিগ্রেট।" বলে সে উঠে পড়ে। "নিয়ে আসছি, বোসো।" বলে নিজেকেই আনতে পাঠায়।

"সত্যি! আনিয়ে রাখা উচিত ছিল, আগেই। নিরঞ্জনবাবু ভীষণ সিগ্রেট ভালোবাসেন।" অণিমা বলে: "আমিও বলতে ভুলে গেছি আর উনি—উনি যে নিজের থেকে খেয়াল করে কিছু করবেন তবেই হয়েছে!"···

নৈশ ভোজন সমাধার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল। অণুর অনুস্বর শোনা গেল: "ওগো শুনছ ?"

"কী—বলো ?"

"ছাখো, ইলা না হয় আমার কাছে শোবে। মহী আর নিরঞ্জনকে আমাদের বাড়তি ঘরটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তুমি শুচ্ছ কোথায় ?"

"তাই তো! আমি কোথায় শুই!" জীবনকেষ্ট ভাবনায় পড়ল,—"তা—আমার শোয়া—আমাকে শোয়ানো কি এতই দরকার ?"

"নাও, রসিকতা রাখো। ভাঁড়ার ঘরে যে বেঞ্চিটা আছে তার থেকে হাঁড়িকুড়িগুলো নামিয়ে তোমার জন্যে বিছানা করে দেব ?···ডবোল করে পাতা যাবে 'খন—বিছানা তাতে পুরু হবে বেশ। আরাম করে শুতে পারবে।"

"সেই বেঞ্চিটা, যার থেকে সেবার আমি পড়ে গেছলাম? সেবারে নিরঞ্জনরা এলে শুয়েছিলাম যাতে—সেইটে তে? না, তাতে আর আমি শুচ্ছিনে।"

"অবাক করলে! কেন, বেঞ্চিতে কি শোয়া যায় না? শোয় না মানুষ? রেল গাড়ীতে তবে লোকে শুয়ে যায় কি করে?"

"প্রাণ হাতে করে। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—নিজেকে হাতে করে থাকা আমার পোষাবে না। তার চেয়ে আমি মাটিতে শোব।"

"বেশ। তাহলে স্নানের ঘরে তোমার জন্যে বিছানা করে দিই? কেমন?"

"আমি স্নানের ঘরে শোব মাসিমা।" ইলাকে উৎসাহিত দেখা যায়: "চান করবার ঘর—আহা—সেখানে শুতে কী আরাম!"

"না। তুমি কেন স্নানের ঘরে শুতে যাবে? তুমি আমার কাছে থাকবে।"

"আমি স্নানের ঘরে শুতে পারব না। কলটা খারাপ হয়ে গেছে। টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়ে।" জীবনকেষ্টর আপত্তিকর কারণ জানা যায়। —"আর মাথায় জল পড়লে আমার আবার ঘুম হয় না।"

"কেন, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুমোনো যায় না—না কি? তুমি তাজ্জব করলে!"

এমন আশ্চর্য কাণ্ড—এমন কি, অণুরও অনুমানের বাইরে—জীবনকেষ্টর এহেন আদিখ্যেতা প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেবে তা সে ভাবতে পারেনি।

"তার চেয়ে আমি বাইরের ঘরে শোবো। আমার আরাম চেয়ারে।" জীবনকেষ্ট জানায়।

"নিরঞ্জন তো ঐ চেয়ারটায় আরাম করবে। অনেক রাত অবধি সে গল্পের বই পড়ে—জানো না নাকি?"

"তাহলে আমার শোবার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আরো বাইরে গিয়ে শোব। সামনের ফুটপাথেই। সেও আমার ভালো।"

জলন্ত দৃষ্টি হেনে, জীবনকেষ্ট ফুটপাথের সন্ধানেই কিনা বলা কঠিন, সবেগে বেরিয়ে যায়। অণিমা ইলার দিকে ফেরে: "তোমার মেসোমশাই ঐরকম! আপনার লোকরা বাড়ী এলে য্যাত খুসি হন যে বলা যায় না। যাতে সবার আরাম হয়, সবাই সুখে থাকে তাই উনি চান। নিজের জন্যে ভাবেন না মোটেই।"

কিছুক্ষণ ফুটপাথে ফুটপাতে, শুয়ে শুয়ে নয়, ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কাটিয়ে অবশেষে প্রাণান্ত অবস্থায় জীবনকেষ্ট কয়লার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়—ছুঁচো এবং ইঁদুরদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই। তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের দিকে দৃকপাত না করে এক কোণে কয়লা সরিয়ে কোচার খুঁট দিয়ে একটু ঝেড়ে ঝুড়ে সে লম্বা হয়ে পড়ে। ছুঁচোদের সুখসুবিধা কেন সে দেখতে যাবে? ছুঁচোরা কিছু তার আত্মীয় নয়।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবে। মানুষের সবচেয়ে কঠিন পীড়া এই আত্মীয়পীড়া, নানারকমের মারাত্মক বীজাণু আত্মীয়ের ছদ্মবেশে এসে বাসা বাঁধে। সহজে সারে না, একেবারে সারে। এ ব্যায়রামের প্রধান লক্ষণ এই, ব্যয় আছে, কিন্তু আরাম নেই। তাছাড়া উপসর্গ অনেক—কোন্‌টা কখন দেখা দেবে বলা কঠিন।

আত্মীয়-ঘটিত এই পীড়ায় সবচেয়ে দুর্লক্ষণ দেখা দেয় আত্মীয়ের পীড়া হলে। সেটা পীড়ার ওপরে পীড়া; একেবারে পীড়াপীড়ি। সংস্কৃত করে বললে পীড়ম্‌পীড়া। আর চলতি ভাষায় বলতে গেলে, গোদের ওপর বিষফোড়া। খুব সম্ভব, সর্বস্বান্ত হওয়া কিম্বা ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই সেই দুশ্চিকিৎস্য উৎপীড়ার প্রতিকার।

আত্মীয়রা পর নয়, কাজেই পরম্পরায় পীড়াদায়ক হলেও তাদের মেরে ধরে তাড়ানো রীতি নয়। তাতে আত্মীয়তা অটুট থাকে না। অথচ এধারে আত্মরক্ষা ও আত্মীয়তা রক্ষা একাধারে অসম্ভব। জীবনকেষ্ট কী করবে? পাগল হয়ে যাবে কিনা এই কথাই সে শুয়ে শুয়ে ভাবে।··· কিন্তু পাগল। দাওয়াটা কি সহজ? ইচ্ছে করলেই কি পাগল হওয়া যায়? পাগল হওয়া এক রকমের দৈব ঔষধ—দৈবাৎ এক আধজন পাগল হয়। দাওয়াইটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বটে, কিন্তু সবাই কি পায়? জীবনকেষ্টর তেমন বরাত নয়। অতো সুখ নেই ওর অদৃষ্টে। দেবতার আশীর্বাদে সে বঞ্চিত।···শুয়ে শুয়ে হাত কামড়ায়, মাথায় চুল ছেঁড়ে, কি করলে পাগল হওয়া যায় প্রাণপণে তার পাঁয়তারা ভাঁজে।—পাগল হতেই বুঝি ওর বাকী রয়েছে কেবল!

ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন ছাখে। স্বপ্ন ছাখে কি সত্যি ছাখে কে জানে, আকারে প্রকারে হুবহু ওর মতোই

আরেক জীবনকেষ্ট—সেই কয়লার ঘরে তার সামনে এসে দেখা দেয়। "বাবা জীবনকেষ্ট!" ডাক ছাড়ে লোকটা।"

জীবনকেষ্ট চমকে ওঠে—"য়্যাঁ! কে তুমি—কি বলছ?"

"তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম বুঝি?" লোকটা একটু কিন্তু-কিন্তু হয়।

"বিশ্রাম? না না, এমন কিছু বিশ্রাম নয়। অবিশ্রাম বলতে পারো বরং, নিজের চোখেই তো দেখেছো!" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"দেখলাম বলেই তো ছুটে এলাম। না এসে পারলাম না। তুমি যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছ তার ওষুধ আমার জানা আছে—সেই কথাই তোমাকে জানাতে এলাম। আমায় চিনতে পারছ কি?…"

জীবনকেষ্টর চেনা-চেনা মনে হয়, সে নিজেই যেন ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে চোগা-চাপকানের ভেতর সেঁধিয়েছে। আর, যে কারণেই হোক, বহুৎ দিন দাড়ি কামায়নি। কিন্তু 'আত্মানং বিদ্ধি' এই কথা যে-উপনিষৎকার বলেছিলেন তিনি নিজেই কি আত্মাকে বিদ্ধ করতে পেরেছিলেন? জীবনকেষ্টরও তেমনি নিজের শ্রীবৃদ্ধি স্বচক্ষে দেখেও নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

"না তো!" ম্লানমুখে সে জানায়।

"কি করে চিনবে! তোমার জন্মাবার ঢের আগেই যে আমি পটল তুলেছে। আমি তোমার বেশ কয়েক পুরুষ আগেকার—তোমারই পূর্বপুরুষ! আমার নাম ধিনিকেষ্ট। শ্রীধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ডি। আমি কোম্পানির আমলের লোক।"

"ও—তাই বলো! তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি তো চিনব কি করে? কিন্তু সে কথা থাক, আমার এই আত্মীয়সঙ্কটের কি একটা ওষুধ তোমার আছে—বলছিলে না?"

"হ্যাঁ, সেই কথাই। আমার আত্মীয়েরা তোমার মতো নয়—তারা আরো নিকটাত্মীয় ছিল। যারপরনাই আপনার, তাদের খর্পর থেকে কি করে বাঁচলাম—সেই কথাই বলছি।"

"বলো কি? তোমাদের সময়েও আত্মীয়রা হানা দিত নাকি? আমি তো জানতাম এ সব ব্যাধি আধুনিক সভ্যতার আমদানি। তখনো আত্মীয়রা ছিল—বটে?" জীবনকেষ্টকে অবাক হতে হয়।

"ছিল বলে ছিল! আমার বাবা তিনশো তেয়াত্তরটা বিয়ে করেছিলেন।

বড়ো জ্যাঠামশাই চারশো নিরানব্বইটা বিয়ে করতেই দেহরক্ষা করেন—পাঁচশো পূরো করে যেতে পারলেন না—এই দুঃখ নিয়ে নব্বই বছর বয়সে সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন। তারপর আমার মেজ-সেজ-ন-রাঙা-ছোট এই সব জ্যাঠা আর খুড়োরা মিলে সবশুদ্ধ কতো যে বিয়ে করেছিলেন তার লেখাজোখা হয় না। আমার সহোদর ভাই ছিল সাতজন—কিন্তু পৈতৃক ভাইয়ের সংখ্যা এগারো শো চুরোশী—এবং এরা তো শুধু আত্মীয় নয়, আপনার ভাই, আত্মীয়ের বাড়া। তার সঙ্গে জেঠতুত খুড়তুত সব যোগ করে ক' হাজার দাঁড়িয়েছিল তা ধারণা করা যায় না। এই সব আত্মীয়—এবং এদের আত্মীয়—এবং তাদের আত্মীয়দের আত্মীয়তা—এত ধাক্কা আমাকে সামলাতে হয়েছে। ঠ্যালা বোঝো!"

জীবনকেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে চায়, কিন্তু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই সব পরাৎপর আত্মীয়দের কি করে তিনি পরাস্ত করেছিলেন জানতে ব্যাকুল হয়।

"তা, এত আত্মীয় নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছিল বোধ হয়?"

"বিপদ? বিপদ বলে বিপদ! কোম্পানীর চাকরি নিয়েছিলাম বলে আমার একটু রোজগারপত্র ছিল। তাই সবাই মিলে আমার স্কন্ধে এসে ভর করল। নিকট আত্মীয়, দূর আত্মীয়, সুদূর আত্মীয়—কোনো দুরাত্মাই বাদ দিল না। কেউ ছেড়ে কথা কইলো না। তবে ভগবানের ভারী দয়া ছিল আমার ওপর—এক বছরের মড়কে আমার অনেক আত্মীয় খসে গেল—আরেকবার পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গেল কতকগুলো—আর আমার সেজশালীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘে—"

"আহা, মহিমাকেও একটা বাঘে টেনে নিয়ে যেত যদি!" জীবনকেষ্ট গুমরে ওঠে।—"কিন্তু বাঘ কি আর আছে আজকাল? এই কলিকালে?" থাকলেও যথাস্থানে সময়মত নেই জেনে ওর দুঃখ হয়।

"বাকী যারা রইলো তারা নাছোড়বান্দা। একেবারে যমের অরুচি। বাঘ ভালুক কুমীর-টুমীর কেউ তাদের ছোঁয়া না। কি করি? তখন করলাম কি, কোম্পানী চা-বাগান খুলেছিল—সেই চা-বাগানে তাদের চালান করে দিলাম। ধরে ধরে নিয়ে জোড় করে মাথা পিছু কুড়ি টাকা হিসেবে বেচে দিয়ে এলাম। একটু কষাকষি করলে আরো কিছু দর উঠত জানি, কিন্তু কে অতো সবুর করে? ওরা আমাকে এমন জ্বালিয়েছিল

যে অমন সব আত্মীয়ের দর বাড়াবার একটুও আমার মেজাজ ছিল না—ভাবলাম আর অতো আদরে কাজ নেই। কিসের এত গরজ? নগদ যা মেলে তাই লাভ! আর বলতে কি, আত্মীয়দের থেকে এত উপায়, এমন লাভ আমার জীবনে আর হয়নি। পতিতুণ্ডি বংশেতো নয়। ভেবে ছ্যাখো, ১২০৲ হিঃ ডজন—তু'শো টাকা করে কুড়ি—এই দরে কতো ডজন কতো কুড়ি যে বেচেছি তার ইয়ত্তা হয় না!" সেই স্মৃতির সৌরভে এতদিন পরেও ধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ডিকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখা যায়।

"আহা, আমিও যদি পারতুম", জীবনকেষ্ট বলে: "তাহলে নিরঞ্জন-জোড়াটিকে বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু কিনবে কে? সে চা-বাগান কি আর আছে? বাগান আছে কিন্তু অমন করে বাগানো নেই। এখন কেনাবেচা করতে হয় না—এখন ওমনি লোকে সেধে গিয়ে চা-বাগানের চাকরি নেয়। সভ্যতা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের অসভ্যতা যেমন বেড়েছে, তেমনি অসুবিধাও বিস্তর।"

"তাহলে—তাহলে আমার ওষুধ তোমার কোনো কাজে লাগবে না মনে হচ্ছে।" ধিনিকেষ্টকে ম্রিয়মান দেখা যায়।

এমন সময়ে খড়ম খট-খট করে লাল চেলী পরণে জীবনকেষ্টর আরেক প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হলেন। তাঁর এক হাতে মড়ার খুলি, তাতে তরল মতো কী যেন পানীয়।

তাঁকে দেখে ধিনিকেষ্ট সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পায়ের ধুলো নিল।—"ঠাকুরদা যে! কি মনে করে এখানে?

"আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে। সেইজন্যেই আসতে হোলো আমায়।" জীবনকেষ্টকে দেখিয়ে তিনি বল্লেন।

জীবনকেষ্টর তুই চোখে—"? ?"—এক জিজ্ঞাসা।

"ইনি আমাদের আরো পূর্বপুরুষ, বুঝলে জীবনকেষ্ট! আমার ঠাকুরদা কুলাচার্য শ্রীমৎ কালীকেষ্ট পতিতুণ্ডি। সেকালের একজন নামজাদা তান্ত্রিক ছিলেন। কালীসাধন করতে গিয়ে শেষে ইনি কাপালিক হয়ে যান।"

"বৎস জীবনকেষ্ট! তুমি আত্মীয়দের নিয়ে বড় বিব্রত বোধ করছ—তাই না? আর কিছু না, এক কাজ করো। খেয়ে ফ্যালো।" কাপালিক কালীকেষ্ট তাকে এই উপদেশ দিলেন।

"খেয়ে ফেলব—কী বলছেন?" সে হাঁ করে। "কাকে খাবো?"

"কেন, ঐ আত্মীয়দের। এক একটাকে ধরো, আর ধরে ধরে খাও। এ ছাড়া আর উপায় নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে আয়নায়।"

"আত্মীয়দের খাবো, বলছেন কি আপনি! তা কি করে খাওয়া যায়? তারা অতি অখাদ্য যে!" জীবনকেষ্ট তেমন উৎসাহ পায় না।

"মোটেই না, তোমার ধারণা ভুল। শুধু ঐ ভাবেই ওরা সুস্বাদু হতে পারে। রসনার পথেই ওদের রসালো করা যায়—নতুবা ওরা ভারী বেরসিক। আমি কাপালিক হলাম কেন? কেন? ঐ খাবার লোভে আমার আত্মীয়দের—যারা আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল আর আমার গৃহে স্থান নিয়েছিল—তাদের গর্ভে ধারণ করতে দ্বিধা করিনি। আমাদের সময়ে একটা সুপ্রথা ছিল। নরবলির প্রথা। এখন আর নেই বোধ হয়? কিন্তু তুমি এক কাজ করো। আগে ওদের কালীঘাটে নিয়ে যাও মার কাছে বলি দিয়ে তারপর খেয়ো। তাহলে আর কোনো দোষ থাকবে না। তুমিও উদ্ধার পাবে, ওরাও উদ্ধার হয়ে যাবে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা —ওরই নাম মহাপ্রসাদ।"

"না, যতই ত্যক্ত হই—তা আমি পারব না।" জীবনকেষ্ট বলে: "ও কাজ করলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। যাদের খাওয়াতে ফতুর হতে হয় তাদের খেলে না-জানি আরো কী দুর্গতি হবে! হয়তো সেটা ফাঁসির খাওয়া হতে পারে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই, মা আছেন। এই নাও, একটু কারণ-বারি পান করে নাও। মনে জোর পাবে।" মড়ার খুলিটা কালীকেষ্ট বংশধরের দিকে এগিয়ে দেন।

"ছি, ঠাকুরদা! এমন জ্ঞানী, প্রবীণ, বিবেচক হয়ে তুমিও কিনা শেষটায় ছেলে বখাচ্চো, ছিঃ!" ধিনিকেষ্ট আপত্তি না করে পারে না।

"কোনো দ্বিধা কোরো না, জীবনকেষ্ট! পান করো। তোমার ওপরে আমি অনেক ভরসা করেছিলাম। আমাদের বংশে আরেকজন কাপালিক জন্মাবে এই আমার সাধ ছিল। যদি আমার সে-আশা তোমার দ্বারা পূর্ণ হয় সারা বংশ কৃতার্থ হবে, আমিও ধন্য হবো।"

উপরোধে পড়ে জীবনকেষ্ট কারণের একটুখানি স্বাদ নেয়, কিন্তু কার্যের বিষয়ে তার কোনো উদ্দীপনা দেখা যায় না। কার্যকারণের সমন্বয় না দেখে কুলাচার্যও একটু ক্ষুণ্ণ হন।

জীবনকেষ্ট তাঁকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে: "আজ্ঞে, একেবারে না খেলে কি হয় না? রামকেষ্টদেব—তিনি আমাদের পতিতুণ্ডি বংশের কিনা জানি না—বলতেন যে ফোঁস করো, তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু ছোবল মেরো না কখনো। তা, তা, আত্মীয়দের বেলাও, না খাবলে কেবল ফোঁস করলে হয় না?"

কালীকেষ্ট ফোঁস করে ওঠেন।—"রামকেষ্টদেব? কে সে? তিনি দেবতা হতে পারেন কিন্তু আমাদের আত্মীয়দের তিনি কী বোঝেন? কী জানেন তিনি? এ বিষয়ে কদ্দূর তাঁর অভিজ্ঞতা—শুনি?"

"তা বটে! এ সব দৈত্য নহে তেমন।" জীবনকেষ্ট সায় দেয়।

"তাছাড়া, যদ্দূর মনে হচ্ছে, তিনি পতিতুণ্ডি ছিলেন না। কে ছিলেন রামকেষ্টদেব? আমরা কখনো তাঁর নাম শুনিনি—তিনি যেই হোন, যত বড় দেবতাই হন, পতিতুণ্ডিদের সমস্যা বোঝা তাঁর কর্ম নয়। বরং আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বটকেষ্ট পতিতুণ্ডির কথা বলতে পারো। তিনি বলতেন, যদি ফোঁস করে ছেড়ে দাও তো পরে আপশোস করবে। ফোঁস নয়, আগে গিয়ে ফাঁসাও—নইলে দেখবে সেই এসে তোমাকে ফুস করে দিয়েছে—আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়েই। তাই ফাঁসি যেতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু আগে ফাঁসিয়ে যাওয়া চাই।"

জীবনকেষ্টর টনক নড়ল: "কে আসচেন না? চেনা চেনা আওয়াজ পাচ্ছি। আমাদের কোনো আত্মীয়ই বোধ হয়?"

আত্মীয়ই বটে। নামাবলী গায়ে, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, জীবনকেষ্টর অনুরূপ আরেক শ্রীমূর্তি দর্শন দান করেন।

"আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীহরেকেষ্ট পতিতুণ্ডি। তোমাদের ইনি কে হন—তোমরা নিজেরাই তা আন্দাজ করে নাও।" কুলাচার্য নত হয়ে প্রভুপাদের পদধূলি নেন।

জীবনকেষ্টর আন্দাজ অতদূর পৌঁছায় না—একটু চেষ্টা করে সে হাল ছেড়ে দেয়। "প্রভুপাদ এমন বেশে এখানে যে হঠাৎ?" জিজ্ঞেস করেন

"আর বলো কেন? বংশলোপের আশঙ্কায় আসতে হোলো। বেচারা জীবনকেষ্ট পাছে বাড়ী ছেড়ে বিবাগী হয়ে যায় সেই ভয়ে—"

"প্রভু! একটুখানি আমাদের কুঁড়ে, আমাদের দুজনেরই কুলোয় না। তার ওপরে—" জীবনকেষ্ট প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে।

"ঠিক কথা। আমার জীবনেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমার কুঁড়েতেও রাজ্যের কুড়ে লোকের আমদানি দেখেছিলাম। তবে আমি কিন্তু তাদের তাড়ালাম না, আসতেও বারণ করলাম না—তাদেরই ঘাড় ভেঙে আমার প্রসাদ বানালাম। কালক্রমে সেই প্রসাদ ফলাও হয় বেড়ে ওঠে মহাপ্রাসাদ হয়ে দাঁড়ালো।"

"হ্যাঁ, উনি বলছিলেন বটে—মহাপ্রসাদের কথা।" জীবনকেষ্ট বলে: "কিন্তু ওতে আমার তেমন রুচি হচ্ছে না"

"মহাপ্রসাদ নয় মূর্খ, মহাপ্রাসাদ। রাজরাজড়াদের যা থাকে, তাই। নবাবদের রঙ্‌মহল শীস্‌মহল সব জড়ালে যা একখানা হয়, তার কথাই বলছি।"

আ-কারভেদে প্রসাদ এবং প্রাসাদের পার্থক্য অনুভব করার প্রয়াস পায় জীবনকেষ্ট: "প্রভু, কি করে তা হোলো আমায় সবিশেষ বলুন!"

"সেরেফ্ মন্ত্রের জোরে। আবার কি?" প্রভুপাদ প্রকাশ করলেন "তারাও আসতে লাগল, আমিও তাদের মন্ত্র দিয়ে গুরুদক্ষিণা নিয়ে ছাড়তে লাগলাম। গলায় কণ্ঠি আর কীর্তন দিয়ে, কণ্ঠে আর পৃষ্ঠে নামাবলী দান করে ছেড়ে দিলাম। তাদের ইহলোকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পরলোকের পথ মুক্ত করে দিলাম। যেমন হাসতে হাসতে তারা এসেছিল—কাঁঠাল হাতে করে আমার মাথায় ভাঙবার মৎলবে—কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল একদিন। কিন্তু তা কান্না নয়—তাই জীবের সম্বল—তারই নাম কৃষ্ণ-কীর্তন!"

"কীর্তন আমি শুনেছি, কিন্তু অমন মারাত্মক বলে তো মনে হয়নি।"

"শুনেছো কিন্তু শোনার মতো করে শোনোনি। তাহলে মন্ত্রের মতো ফল দেখতে। তোমরা একালের ছেলেরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করো না, নইলে এই কলিতে কেবল নামমাহাত্ম্য। নাম ছাড়া আর কী আছে? কলৌ নামৈব কেবলম্! প্রভো, তুমিই সত্য!" প্রভুপাদ যুক্তকরে তাঁর প্রভু কার প্রতি যেন নমস্কার-নিক্ষেপ করলেন।

"তা জানি। এ যুগে নামের জন্যই যা কিছু করা। তা ঠিক।" জীবনকেষ্ট ঘাড় নাড়ে, অনেকটা নমস্কারের মতো করেই।

"আর কী নাম! কেমন মন্ত্রের মতো অব্যর্থ এই নাম! যেমন জোরালো তেমনি ধারালো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! অর্থাৎ তিনিই সব হরণ করেন, আমরা শুধু নিমিত্তমাত্র, তাঁর সহায় হই বই তো না! তিনি তো বলেই গেছেন, নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী। নিমিত্ত হও, নিমিত্ত হলেই সব্যসাচী হতে পারবে।"

"কেবল নাম দিয়ে আপনি কাম ফতে করলেন? মন্ত্রের কেরামতিতে ঐ কুড়েদের দ্বারা, কুঁড়ে ঘরের থেকে আপনার মহাপ্রাসাদ হোলো? এসে দেখছি আলাদিনের কাণ্ড!……এ কি আমি পারবো?…আমার মধ্যে কি অতো গুরুত্ব আছে?"

"খুব পারবে বৎস। আত্মীয়দের ধনেপ্রাণে মারতে পারবে না—কী যে বলো! তুমি যে তাদের আত্মীয়, সেকথা কেন ভুলে যাচ্ছ? আত্মীয়ের পক্ষে এর চেয়ে সহজ কাজ আর কী আছে? প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে গ্যাখো—খোদ্ কেষ্টর কথাটাই ভাবো না একবার!"

"খোদ্ কেষ্ট? তিনিও কি পতিতুণ্ডি ছিলেন।" জীবনকেষ্ট অবাক হয়।

"পতিতুণ্ডি না হোন, পতিতপাবন তো বটেন। সমগোত্র বইকি। আত্মীয়কবলে যারা পতিত তাদের উদ্ধারকর্তাও তিনি। নিজে তিনি কি করেছিলেন মনে নেই? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছিল কে? তিনিই তো! অতো আত্মীয়-নিপাত আর কোন্ যুদ্ধে হয়েছে? তাতেও শান্তি না পেয়ে শেষে নিজের যদুবংশ ধ্বংস করে তবে তিনি ক্ষান্ত হন। এতেই বোঝে।"

জীবনকেষ্ট বোঝে। কিন্তু বুঝেও বোঝে না—"আমি কি পারবো? অমন একটা কুরুক্ষেত্র করতে পারবো কি আমি?"

"খুব পারবে; সংশয় কোরো না। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। প্রত্যহ গীতাপাঠ করো। নাকের ওপর তিলক চড়াও। সেই সঙ্গে পাইকিরি দরে নামাবলী আর কণ্ঠির বায়না দিয়ে রাখো। আত্মীয়দের ডাকো। সহজে না আসে নিমন্ত্রণ করে খাবার লোভ দেখিয়ে আনাও। আর তারপরে, নামাবলীর বাস জড়িয়ে—নামজাদা গামছা গলায় দিয়ে—বুঝতেই পারছ। শেষটায় আমি আর আত্মীয় অনাত্মীয় বাছিনি। যে এসেছে, কাছে ঘেঁষেছে যাকে ধরতে পেরেছি তাকেই দীক্ষা দিয়েছি। হাড়ে হাড়ে দীক্ষা! না দিয়ে তো নিস্তার নেই—জীবে দয়া নামে রুচি আমাদের ধর্ম কিনা!"

"আমার বেলায় কিন্তু জীবে রুচি আর নামে দয়া—দয়াটা আমার নামমাত্র কিন্তু রুচিটা আপনার চেয়ে বেশি।" কুলাচার্য বলেন।

"তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তিন কুল খেয়ে শেষ করেচ তাদের বাঁচিয়ে রোজগারের উপায় করলে কতো লাভ হোতো, সেটা একবার ভেবে দেখেছিলে?…প্রভো, তুমিই সত্য।" প্রভুপাদ নিজের টিকিতে হাত বুলান।

"আর তুমি বুঝি আমাদের বংশের এক মহাপুরুষ? তাই না?" কুলাচার্যের কুলোপনা চক্র দেখা দেয়। এক ঢোঁক কারণবারি গিলে নিতেই তাঁর চোখ জবাফুলের মত টকটকে হয়ে চর্কির মতো ঘুরতে থাকে: "বটে? পুরুষ তো অনেক দেখলাম—চোখেও দেখেছি—মহাপুরুষকে তো দেখি একবার! মার দয়ায় সাধারণ পুরুষই মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু আস্ত একটা মহাপুরুষ কিরূপ দাঁড়ায় সেটাও তো একবার দেখতে হয়!"

এই বলে কুলাচার্য প্রভুপাদকে তাড়া করতেই তিনি—"ওরে বাবারে! খেয়ে ফেল্লেরে!"—বলে, প্রাণান্ত এক ডাক ছেড়ে কয়লা ঘরের জানলা টপ্‌কে উধাও হলেন। কুলাচার্যও পেছনে পেছনে দৌড়ল—খড়ম হাতে করে।

"বেশ, একটা ঘরোয়া বৈঠক জমেছিল—এমন ভাবে ভেঙে গেল!" জীবনকেষ্ট মনোকষ্ট জানায়।

"ধরতে পারলে খেয়ে ফেলবে ঠিক! আমি চললাম। দূরে দাঁড়িয়ে দেখি গে—কদ্দূর গড়ায়। মহাপ্রসাদ পর্যন্ত গড়ায় কি না দেখা যাক। ফাঁক পেলে একটু ঝোল চাখব না হয়।" এই বলে ধিনিকেষ্টও চলে যান।…

"হ্যাঁগা উঠলে?" কয়লাঘরের দোরগোড়ায় ডাক ছাড়ে অণু।

"রক্ত চাই—রক্ত চাই।" জড়ানো গলায় জবাব আসে।

"য়্যাঁ, কী বলচো?…" অণু ভেতরে গিয়ে অনুসন্ধান করে।—"কী হয়েচে তোমার? দেখি—ইস্! গাটা যেন গরম দেখছি।"

"আমি খাবো। ধরব আর খাব—একেকটাকে ধরে কেটে কুটে মসলা দিয়ে গর্‌গরে করে রাঁধব, চপ্—কাটলেট—কালিয়াকোর্মা—কোপ্তা—কালিয়া—কিমাম। তারপরে সেই কালিয়াদমন করা আমার কাজ। আমাদের চোদ্দ পুরুষের কম্মো। আমাদের বংশের আদিপুরুষ কে ছিল জানো? খোদ্ কেষ্ট—যে কুরুক্ষেত্র আর কালিয়দমন করেছিল। আমিও করব।" জীবনকেষ্টর চোখ ঘুরছে।

খাবে বই কি। চা হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে খাবে এসো।"

"হতভাগাটা বকছে কী?" দাঁতের ব্রুশ হাতে নিরঞ্জন যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। "রাত্রে ইঁদুরে কামড়েছে—র‍্যাট্ পয়জন হয়েছে ব্যাটার বোধ হয়।"

"কেন, আমি কি কুরুক্ষেত্র করতে পারিনে?" নিরঞ্জনকে দেখেই সে লাফ ছাড়ে। "ময় ভূখাহুঁ!" হাঁক ছেড়ে তাড়া করে যায়।

"আরে মোলো যা!" নিরঞ্জন তিন হাত পিছিয়ে যায়। "ভূখা হু তো আমি কি করব? তোমার গিন্নিকে বলো, খাবার এনে দেবে।"

"খাবার নয়, তোমায় খাবো। হাড় খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব। কেন, আমিও কি তোমার আত্মীয় নই? চপ্ কাটলেট্ বানিয়ে খাব তোমাকে।"

"সাধের কথা শুনে মরে যাই!" নিরঞ্জন বলে। মুখে সে বিরক্তি দেখায় বটে কিন্তু মনে মনে ভয় খায়। দাঁত মাজা ব্রুশ দিয়ে কতোদূর আত্মরক্ষা করা যাবে চিন্তা করো। এধারে ওধারে তাকিয়ে লাঠি শড়কি কিছু তার চোখে পড়ে না। "ভালো আপদ হোলো। ওর কি আজকাল মাঝে মাঝে এম্নি ধারা হয় না কি?

"কই কখনো তো দেখিনি!" অণু কাতর হয়ে পড়ে, "বাড়িতে হতে দেখিনি তো কখনো।"

হাঁক ডাক শুনে ইলা, ইলার মাও এসে পড়েছে। ইলার খুব মন্দ লাগছে না, বেশ আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু ওর মা ভাবিত হয়ে পড়েছে— "জামাইবাবুর কী হোলো দিদি?" চাপা গলায় সে জিগেস করেছে।

কী যে হয়েছে তা জানবার জন্য জীবনকেষ্ট নিজেই তৈরি। ধেই ধেই করে সে নাচতে আরম্ভ করে আর রক্ত চাই বলে চেঁচায়। চেঁচানি আর নাচানিতে তার একাকার! নাচতে নাচতে আবার ছড়া কাটে :

"বল্ রে বন্য হিংস্র বীর।
দুঃশাসনের চাই রুধির॥
চাই রুধির, রক্ত চাই।
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই॥
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!…

"বাঃ মেসোমশাই, তুমি তো বেশ নাচতে পারো।" ইলা বাহবা দে "আমাদের যে নাচ শেখায় তার চেয়েও দেখছি তুমি ওস্তাদ।"

"তোকে আমি খাবো। কড়মড় করে খাবো। চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো, চেটে পুটে খাবো।···চেঁছে পুঁছে খাবো···তোর কাটলেট্ বানালে কেমন হয়?" লোলুপ কণ্ঠে সে শুধোয়।

"বেশ হয়। কিন্তু আমাকে একটু চাখতে দেবে তো?" ইলার অনুরোধ থাকে।



"তা দেখা যাবে। আগে তো তোকে কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দিই। কাটলেট্—সে তখন পরের কথা। কাটবার পর।"

"ওমা, কী অলুক্ষণে কথা গো। মিন্‌সে বলে কি? ষাট্ ষাট্ বালাই ষাট্।" মহিমা ইলাকে হস্তগত করে সরে দাঁড়ায়।

জীবনকেষ্ট গুণে গুণে ছাখে—"এক দুই তিন। মোটমাট পৌনে এক গণ্ডা। কোয়ার্টার ডজন। চা বাগানে নেয় না আজকাল—তবে কসাইখানায়

বে। দশ টাকা দরে বেচলেও পৌণে এক গণ্ডার দাম তিরিশ টাকা—ন্দ কি? তবে পুরো এক গণ্ডা হলেই ভালো হোতো। ভালো তো হোতো, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?"

"মাসিমাকেও ধরো, তাহলেই গণ্ডা পুরবে।" ইলা বাতলায়।

জীবনকেষ্ট অণুর দিকে তাকায়: "ওটা গণ্ডার। গণ্ডার কসাইরা ছোঁবে না। গণ্ডার মানুষে খায় না তো।"

অণু এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, এবার আর পারে না। জীবনকেষ্টর এহেন অনুমান তার আত্মাভিমানের ঘা লাগে, চোখে আঁচল চেপে সে ফোঁপাতে থাকে। অকস্মাৎ তার এ কী সর্বনাশ হোলো, ডাক ছেড়ে কাঁদলেও যার দুঃখ যায় না। সেই অনুচ্চারিত দুঃখে সে গুমরে ওঠে।

"হঠাৎ কেনা বেচার কথা কেন মেসোমশাই? খাবার কথাটা কি বাদ পড়ে গেল নাকি?" ইলার অনুসন্ধান।

"কেন বাদ পড়বে কেন? খাবো তো আল্‌বাৎ! কচি পাঁঠা—বৃদ্ধ মেষ—দইয়ের মাথা ঘোলের শেষ।" জীবনকেষ্ট থেমে থেমে আওড়ায় আর ভাঁটার মতো তার চোখ খাঁড়ার মতো তার হাত নাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে ইলা—নিরঞ্জন—মহিমা হয়ে অবশেষে রোরুদ্যমান অণিমার ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। কী ভেবে অবশেষে সে বলে: "না—ঘোল আমি খাব না। ঢের ঘোল খেয়েছি।"

"খাবো তো বলছো—খাচ্ছো কই?" ইলার ভারী মজা লাগে। মেসোমশাইকে সে প্রেরণা দিতে চায়।

"দাঁড়া। কাটি তোদের। বঁটি আনি আগে।" এই বলে, এক লাফে সে অন্য ঘরে গেল—আর পরমুহূর্তেই বঁটি হাতে আরেক লাফে ফিরে এল। এসেই "জয় মা কালী—!" বলে তার এক বীভৎস আওয়াজ "মা কালী, বলি দিচ্ছি মা, কিছু মনে করিস নে!"

কালী থেকে কালিয়া—কালিয়া-দমনের কথা তার পড়ে। কিন্তু তার আগে ঐ বঁটি না দেখেই নিরঞ্জন মহিমাকে, মহিমা ইলাকে, পরস্পর হ্যাঁচকায় এক টানে—টেনে না নিয়ে—মুক্ত দ্বারপথে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে যায়। পরস্পর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখতে পরস্পর সম্বদ্ধ হয়ে দৌড় মারে, দাঁড়ায় না আর।

জীবনকেষ্ট তবু পিছু পিছু যায়। কিছুদূর। তার মুখে আর নজরুল নয়,

রবীন্দ্রনাথই এখন—"উজাড় করে নাও হে আমার যা কিছু সম্বল—ফিরে চাও, ফিরে চা—ও, ফিরে চাও হে চঞ্চল!"

জীবনকেষ্ট গান গাইছে! যার গলা কখনো সুড় সুড় করেনি সে সুরেলা হোলো? তবে সত্যিই তার স্বামীর ক্ষেপে যেতে আর বাকী নেই—অণুর কান্না বাগ মানে না।

জীবনকেষ্ট ফিরে এল। কিন্তু চঞ্চলরা ফিরল না, ফিরে তাকালো না পর্যন্ত! বঁটি রেখে হাঁপ ছেড়ে আরাম চেয়ারে গিয়ে কাৎ হয়ে পড়ল সে—আরাম করে ছড়িয়ে পড়ল। ছাড়লো তার দীর্ঘনিঃশ্বাস।—"আর ওরা ফিরবে না। এ জন্মে নয়!…আঃ, বাঁচা গেল!"

জীবনকেষ্টর সহজ গলা শুনে চোখের আঁচল সরালো অণু। বাদলার পর্দা সরে গিয়ে আলোর ঝিলিক দেখা গেল সেখানে।

"আমিও বাঁচলাম।" সে বললে।

"আমার কালকের কেনা নতুন টুথ ব্রাশটা নিয়ে গেল—যাক্ গে! আত্মীয়তা থাকলে অমন কতো যায়! স্যুটকেস আর হোলড-অল রেখে গেছে…মন্তর না দিয়েই পাওয়া গেল—মন্দ কি? যথা লাভ।"

অণু হাসল। কেন হাসল সেই জানে।

পারসিকেরা জরথুস্ট্রের ধর্মমতে বিশ্বাসী অগ্নি উপাসক। মুসলমানরা যখন তাদের দেশ দখল করে, তখন কিছু সংখ্যক পারসিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে দেশত্যাগ করে। খোরাসান থেকে তাদের প্রথম দলটি ভারতে এসে আশ্রয় নেয় পশ্চিম ভারতের থানা জেলার সঞ্জন অঞ্চলে। সেই থেকে তারা এ দেশেই আছে। তাদের ধর্মাচরণে কোনদিন কোন বাধা পড়েনি। তারাই এদেশে পার্শী নামে খ্যাত।

সে ৭৩৫ খৃস্টাব্দের কথা।



হবি মানে বাতিক

স্বপন বুড়ো

খোদন টিফিনের ঘণ্টায় মাথা নেড়ে বটুককে বললে—ত্থাখ বটুক, একটা কিছু 'হবি' না থাকলে এই জীবনটাই বৃথা।

বটুক ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, 'হবি'? 'হবি' আবার কি? বরং তার চাইতে বল 'হকি', এই তো কিছুদিন আগেই ইডেনগার্ডেনে হকি খেলা নিয়ে কি মাতামাতি।

খোদন বেঞ্চের ওপর চাপড় মেরে বললে, দেখ বটুক, তুই হচ্ছিস বিংশ শতাব্দীর একটা অভিনব বোকা! নইলে 'হবি' কথাটার মানে জানিস নে? 'হবি' মানে 'সখ'। প্রত্যেক মানুষেরই একটা করে সখ থাকে। হবির বাঙলা তুই বাতিক করতে পারিস। লোকের নানান রকম বাতিক থাকে। ধর—কেউ গান গায়, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ছবি আঁকে, আবার কেউ বা বাগান করে। মাছ ধরার বাতিকও অনেকের আছে।

বটুক ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলে। তারপর বললে, ও! এই কথা! ব্যাপারটা আগে বললেই হত। হকি নয় হবি। হ্যাঁ, যদি আমার

জিজ্ঞেস করিস তা হলে আমি বলব, আমার হবি হচ্ছে—এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া—

—দুর-দুর ওটা আবার হবি? একেবারে তৃতীয় বাতিক!

বিরক্তিতে বমি আসছে ঠিক এই রকম মুখের ভাব করে ভুরু কুচ্‌কে মন্তব্য করলে খোকন। তারপর একটু চুপচাপ থেকে বললে,—আমার কি হবি হবে জানিস?

—কি রে?

—আমার হবি হবে গান গাওয়া। আমি এখন থেকে গান গাইতে স্থুরু করবো।

বটুক হাসবে কি কাঁদবে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলে না।

বললে—অ্যাঁ! খোদন তুই গান গাইবি? ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি? তোকে তো কোনো দিন হারমোনিয়ামের ধারে কাছে যেতে দেখিনি।

গম্ভীরভাবে খোদন উত্তর দিলে,—দেখিসনি তাতে কি? কেউ আগে জলে নামেনি বলে জীবনে আর কখনো জলে নামবে না—এটা কি একটা যুক্তি হল?

বটুক খানিকটা কি ভাবে। তারপর খুশিতে ফানুষের মতো ফুলে উঠে বললে, হুঁ বুঝতে পেরেছি।

—কি বুঝতে পেরেছিস?

খোদন যেন মারমুখী হয়ে উঠবে এমনি একটা ভাব।

বটুক কিন্তু এতটুকু দমল না ওর ভাবভঙ্গী দেখে। শুধু ফোঁড়ন কেটে বলে,—ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় হিমাদ্রীর খাতির দেখে তোর মনে এই ইচ্ছে জেগেছে। বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, আমার কথা সত্যি কিনা?

খোদন বটুকের কথার কোনো জবাব দিলে না, রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল আর এক দিকে।

এর দু'দিন বাদেই পাড়ার লোকেরা মরিয়া হয়ে থানায় গিয়ে হাজির।

কী তাদের নালিশ?

সবাই মিলে জানালে যে, খোদনের গলা সাধার দৌরাত্ম্যে সারা দিনের খাটা-খাটনীর পর এ অঞ্চলে কেউ চোখের পাতা এক করতে পারছে না।

একটা ভালো কাজের বিরুদ্ধে পাড়া শুদ্ধ সবাই যে একতাবদ্ধ হতে পারে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় খোদন ঘেন্নায় গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে।

এইবার খোদনচন্দ্র স্থির করলে যে, ছবি আঁকবে। যত্নের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। কাজেই নিজের বাড়ীতে বসে যত খুশী ছবি আঁকতে পারবে না কেন?

প্রচুর কাগজ এলো, রঙীন পেন্সিল, ক্রেয়ন কেনা হল। সস্, জল রঙ তেল রঙ, আয়োজনের কিছুই বাকি রইল না।

খোদনের খেলাধুলা বন্ধ হ'ল, ইস্কুল কামাই করতে স্থরু করলে। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে দিনরাত পেন্সিল আর তুলি চালাতে লাগলো।

এক হপ্তা খাটুনির পর সে এত ছবি এঁকে ফেললে যে, বাড়ীর লোকেরাই তার একাগ্রতা দেখে অবাক হয়ে গেল।

ওর চোখের জ্যোতি কমে যাবে—এই ভয়ে ঠাকুমা খোদনের জন্যে নিত্যি মাছের মুড়ো খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঠাকুর্দা ছেলেমেয়েদের আর খোদনের বন্ধুদের ধমকে দিলেন, কেউ যেন না ওর ছবি আঁকবার সময় গোলমাল করে। কালে নিশ্চয়ই খোদন দেশের একজন নামকরা শিল্পী হবে। এ সম্পর্কে কারো মনে আর কোনো সংশয়ই রইল না।

অবশেষে একদিন খোদনের কাকা ইস্কুলের ড্রইং টিচারকে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি অনেক্ষণ ধরে খোদনের আঁকা রাশি রাশি ছবির মধ্যে ডুবে গিয়ে খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো বসে রইলেন।

খোদনের ঠাকুর্দা উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, কি রকম দেখছেন মাস্টারমশাই? আমাদের খোদন নিশ্চয়ই একজন দেশবরেণ্য শিল্পী হবে?

ড্রইং টিচার তাঁর চশমাটা কপালের উপর তুলে ধরলেন, তারপর মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু প্রত্যেকটি ছবির তলায় স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে—এটা ঘোড়া কি ব্যাঙ। নইলে লোকে বুঝবে কি করে?

খোদনের কাকা ড্রইং টিচারের জবাব শুনে প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তারপর মুখখানা বাঁকা করে শেষ দিয়ে বললেন, মডার্ণ আর্টের কোনো খবরই দেখছি মাস্টারমশাই রাখেন না। ছবি দেখে সহজভাবে বোঝা যাবে—কলা আর মূলো, খোদনের আর্ট কিন্তু সে স্তরের নয়। আপনি সেকেলে মাহুষ, হয়তো মডার্ণ আর্টের কোনো খবরই রাখেন না।

ড্রইং টিচার উত্তর দিলেন, তা হয়ত হবে। না হয় আমার চোখের দোষ হয়েছে।

আর কথা না বাড়িয়ে শিক্ষকমশাই নিজের ছাতাটা হাতে নিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

কিন্তু রাগে ফেটে পড়ল খোদনচন্দ্র। রঙ তুলি ছড়িয়ে ফেলে আঁকা ছবিগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

বললে, না, আর আমি ছবি আঁকবো না।

ঠাকুর্দা ছুটে এলেন, ঠাকুমা ছুটে এলেন। বললেন, তা হলে তুই ইস্কুলে যাওয়াই সুরু কর। মিছিমিছি বাড়ীতে বসে থেকে সময় নষ্ট।

খোদন ফোঁস করে উঠল, ওই ইস্কুলে আমি যাবো ভেবেছ? যেখানে আমার ছবির আদর নেই, সেখানে আর আমি যাচ্ছি নে!

ঠাকুর্দা বললেন, তাহলে তুই কি করবি শুনি? ষাঁড়ের গোবর হয়ে চুপচাপ বসে থাকবি?

খোদনের মাথায় তখন নতুন প্ল্যান এসেছে। মাথা দুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললে, আমি বাগান করবো।

যে কথা সেই কাজ!

খোদনচন্দ্র বাগান করার কাজে লেগে পড়ল। বাড়ীর পেছনে একটা বাগান আগে থেকে ছিল। খোদন কোদাল নিয়ে, মালকোচা মেরে মাটি কোপাতে সুরু করে দিলে। ফুল তাকে ফোটাতে হবে। নানা রকম সার এনে খোদন বাগানের মাটিতে মেশাতে সুরু করলে। এক বন্ধু এল, পরামর্শ দিলে এনতার চুন মিশিয়ে দে সারের সঙ্গে। তাহলে যে কোন ফল-ফুলের গাছ ফন্ ফন্ করে বেড়ে উঠবে। ফুল ফলও ফলবে প্রচুর।

ফুল ফোটাবার মূলমন্ত্র পেয়ে খোদন সারের সঙ্গে রাশি রাশি চুন মিশিয়ে নিলে।

এর আগেই খোদনের ঠাকুর্দা তাঁর সখের বাগানে অনেক দামী দামী গাছ লাগিয়েছিলেন। এইবার সেই সব গাছের গোড়া খুঁজে খুঁড়ে চুন ঢেলে দিতে দুদিনের মধ্যেই অমন সুন্দর সুন্দর গাছগুলি শুকিয়ে একেবারে আমসী হয়ে উঠলো।

ব্যাপার দেখে ঠাকুর্দা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, বললেন,—ঢের

হয়েছে। এইবার ক্ষ্যামা দাও। তোমার আর বাগান করে আমার পিণ্ডি চটকাতে হবে না।

কাজেই খোদনচন্দ্র ছেড়ে দিলে ও পথটাও। বদলে ফেললে মতলবটা।

তারপর কয়েকদিন ধরে খোদনের দেখাই পাওয়া যায় না। পাগলের মতো কোথায় যে ঘোরে কেউ তার হদিশ পায় না। অবশেষে বাড়ীর সবাই একদিন অবাক হয়ে দেখলে খোদনচন্দ্র একটি ময়না যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। দিনরাত্তির ঘরের দরজা বন্ধ করে ময়নাকে বলছে—পড়ো, ময়না পড়ো—

ভালো কাজ করিবার বহুৎ বাধা—
কৃষ্ণ নাম সাথে তুমি বলিও রাধা।

ঠাকুর্দা মাথা নেড়ে বললেন—এইবার আসল বাতিক হয়েছে খোদনের।

সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে তুর্কিদের বিতাড়িত করে রাজা বিজিতসংগ্রাম খোটান রাজ্য দখল করেন। তাঁর বংশধরেরা সেখানে শত বছর রাজ্য করে: বিজিতকীর্তি, বিজিতবিক্রম, বিজিতধর্ম, বিজিতসম্ভব ও বিজিতবাহন প্রভৃতি রাজাদের নাম পাওয়া যায়।

এই খোটান রাজ্যের পত্তন করেন সম্রাট অশোকের পুত্র কুস্তন। সে আরও প্রায় আটশো বছর আগের ব্যাপার।

যে যা নয় সে তা হলে * শ্রী হরেন ঘটক

কাকাতুয়া কাক হয়ে
যদি কা কা ডাকতো
ঘরে তাকে কোন দিন
পুষে কেউ রাখতো?

কাক যদি তাক করে
গুলি ছুঁড়ে মারতো।
উট পাখী উড়ে গিয়ে
পালাতে কি পারতো?

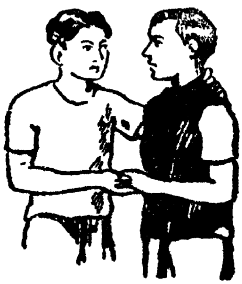


বাজ পাখী বাঘ হয়ে
যদি ঘাড়ে পড়তো!
বল দেখি তার ঘায়ে
কে না তাতে মরতো?

চিল যদি দিল খুলে
ভাটিয়ালী গাইতো!
রেডিওতে তার গান
কে না বল চাইতো?

বক যদি সখ করে
বাড়ি গাড়ি করতো!
ঝিলে নেমে খপাখপ্
সে কি মাছ ধরতো?

ঘোড়া যদি খোঁড়া হয়ে
জোরে জোরে ঘুরতো!
বল দেখি এক্কাতে
কা'কে এনে জুড়তো?





বাঘ যদি রাগ করে
প্রাণী মারা ছাড়তো!
নিরামিষ-ভোজী জীব
হতে সে তো পারতো?

যে যা নয় সে তা হলে
কী যে হতো দুনিয়া
চট্ করে জ্যোতিষীরা
বলুক না গুণিয়া?



পরোপকার পরম ধর্ম * শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

পরের উপকার করা কর্তার একটা বাতিক। মাঝে মাঝে পরোপকার করতে না পারলে কর্তার মনে হয়, জীবনের কটা দিনই বৃথা গেল। হঠাৎ একটা পরোপকার করে দেখাতে পারলে বেশ কিছু দিন তাঁর সুখে এবং শান্তিতে যায়। সব সময় তিনি পরোপকারের ধান্ধায় ঘোরেন। সুযোগ একবার এসে গেলে, সে যতটুকু সুযোগই হোক ছেড়ে দেন না। পাত্র-অপাত্র কোনো বাদ-বিচার নেই। যাকে হাতের কাছে পান তারই উপকার করতে কর্তা সদা প্রস্তুত। লোকে বলে, অহিংসা পরমো ধর্মঃ, কর্তা বলেন—'পরোপকার পরম ধর্ম।'

গরু হারিয়েছিল একজনের। পাড়াতে থাকত সে। মুখ শুকিয়ে ঘুরছিল রাস্তায়। কর্তা চিনতেন না লোকটাকে, কিন্তু তার শুকনো মুখ আর হাতে দড়ি আর খুঁটি দেখেই ঠিক চিনছেন যে এর গরু হারিয়েছে। সব কাজ পড়ে রইল, ভিড়ে পড়লেন তার সঙ্গে গরু খুঁজতে। কিন্তু হারানো গরু কি আর অত সহজে পাওয়া যায়? কার ক্ষেতে হয়তো ঢুকে গাছ নষ্ট করছিল, সে বেঁধে রেখে দিয়েছে। কর্তার বয়স হয়েছে। তার

কর্তার আসরে আসতে আরম্ভ করলেন। আর কর্তা শুরু করে দিলেন গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করা।

ছেলেটা গুলি খেলা ছেড়ে দিল। পরের বারে সত্যি সত্যি ভালভাবে পাশ করে গেল। এই নিয়ে কর্তার আর আনন্দের সীমা নেই।

একবার কর্তার হাত ফস্কে মস্ত একটা পরোপকার পালিয়ে যায়। মুখে প্রকাশ করেননি যদিও, কিন্তু মনে মনে কর্তা সেবার ভারী দুঃখ পেয়েছিলেন। কর্তা ছিলেন পণ-প্রথার বিরুদ্ধে। বলতেন, ওটা আমাদের সমাজের একটা জঘন্য প্রথা। সেই কর্তার আসরের বংশীবাবু শোনা গেল ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাপের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পণ আদায় করছেন। শুনে কর্তা রেগে আগুন। বললেন—এ অনাচার বন্ধ করতেই হবে। ছুটলেন কন্যাগৃহে। বুড়ো বাপ অন্নদাবাবুকে বললেন—খবরদার, আপনি এ পণ দেবেন না।

অন্নদাবাবু বললেন—তবে আমার মেয়ের বিয়ে হয় কি করে?

কর্তা বললেন—পণ না দিয়েই বিয়ে হবে। আমি দেখছি। বলে ছুটলেন বংশীবাবুর বাড়ি। বংশীবাবুকে এই মারেন তো এই মারেন। খুব বকুনি দিয়ে শেষে বললেন—তুমি যদি এমন অনাচারের প্রশ্রয় দাও তাহলে তোমার আমি মুখ দর্শন করব না।

বংশীবাবু চুপ করে সব শুনে তারপর কর্তার সামনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ এগিয়ে দিয়ে বললেন—তবে শুনুন কর্তা, আমার কথাটা আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে অন্নদাবাবুর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পণ আদায় করছি এ কথা সত্যি। তারপর দেখুন, আমার মেয়ে বীণা-মার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে জগবন্ধুবাবুর ছেলের সঙ্গে। জগবন্ধুবাবু আমার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পণ আদায় করছেন।

কর্তা লাফিয়ে উঠে বললেন—অ্যাঁ, বল কি? তোমার উপরেও এই অত্যাচার? এ বন্ধ করতেই হবে।

বংশীবাবু বললেন—শুনুন। আমায় আগে কথা শেষ করতে দিন। জগবন্ধুবাবু তো আমার কাছ থেকে পণ পাবেন। এদিকে জগবন্ধুবাবুর মেয়ে আশা বড় হয়েছে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে—নরেশ হাজরার ছেলের সঙ্গে। নরেশ হাজরা পণ চাইছেন তিন হাজার টাকা। তারপর দেখুন নরেশ হাজরারও তো মেয়ে আছে। বছর দুইয়ের মধ্যে তারও

বিয়ে দিতে হবে। নরেশবাবু চেষ্টা করছেন অন্নদাবাবুর ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ করার। এ ক্ষেত্রে অন্নদাবাবুর নিশ্চয়ই তিন হাজার টাকা পণ চাইবেন। তাহলে হিসেব করে দেখুন কর্তা কার লাভ হচ্ছে, কারই বা লোকসান। আপনি যে পরোপকার করতে চেয়েছেন, আগে ঠিক করুন কার উপকার করবেন ?

কর্তার গর্ব ছিল, তিনি অঙ্কটা বেশ ভালো জানেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে মনে মনে অঙ্কের হিসেবটা করবার চেষ্টা করলেন। অন্নদাবাবু, নরেশবাবু, বংশীবাবু, জগবন্ধুবাবু এতগুলি নাম আর তিন তিন হাজার টাকার দেনা-পাওনা একসঙ্গে মাথার মধ্যে ঢুকে জট পাকিয়ে গেল। শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন যা গরম পড়েছে, মাথাটা ঠিক খেলছে না। বল তো বংশী, কার লোকসান হচ্ছে ? চেষ্টা করে দেখব যদি তাকে কিছু পুষিয়ে দিতে পারি।

বংশীবাবু হেসে ফেলে বললেন—এটাও বুঝলেন না কর্তা, যতগুলো তিন হাজার হাত বদলা-বদলি করলো, সবগুলোই শেষাশেষি কেটে গেল। কারুরই লোকসান নেই। পণপ্রথাকে আপনি গালাগালি করেন, কিন্তু বার করুন এর খুঁৎ।

কর্তা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে আর তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তিতে বাধা দেওয়ায় বংশীবাবুর উপর খানিকটা চটে বাড়ি ফিরে এলেন।

বংশীবাবুর ছেলের বিয়ে নির্বিঘ্নে চুকে গেল।

এর পরের ঘটনায় কর্তার পরোপকার প্রবৃত্তি যে চোট খেলো তা কাটিয়ে তিনি উঠতে পেরেছেন কিনা এখনও জানা যায়নি। একদিন কর্তার সকালের আসর ভেঙ্গেছে, বন্ধুরা যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছেন, কর্তা স্নানের জন্যে তেল মাখতে যাবেন বলে উঠি উঠি করছেন সেই সময় একজন অচেনা লোক কাঁচুমাচু মুখে তার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন। একটু কাছে আসতে কর্তা দেখলেন তার বুকপকেটটা ছেঁড়া। ছেঁড়া পকেটটা খাতার পাতার মতো লটপট করছে।

কর্তা তাঁর দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন,—হুজুর, এই অবেলায় এসে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কি হল আপনার ?

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন—আমি আজ সতের বছর দত্তপুকুরের দত্তদের বাড়ি গৃহ-শিক্ষকতা করছি, কিন্তু এমন বিপদে কোনদিন পড়িনি।

কর্তা সোজা হয়ে বসে বললেন—বলেন কি ? বলুন তবে বিশদভাবে, শুনি।

ভদ্রলোক বললেন—দত্তবাড়ি থেকে আজ মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। দত্তবাবুদের অনুরোধ করেছিলুম তিনমাসের মাইনে অগ্রিম দিতে। একটা বাড়ি করাচ্ছি তার ছাদ ঢালাই করা দরকার। তাই টাকার বড় প্রয়োজন। দত্তবাবুরা দিয়েছিলেন। অনেকগুলো নোট—বুকপকেটটা উঁচু হয়েছিল, তাই বাঁ হাতে করে পকেটটা চেপেই রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলুম একটা ওষুধের খোঁজে। এখানকার এক ডাক্তারখানার ডাক্তারের উপর আমার অসীম বিশ্বাস। বহুদিনের পুরানো পেটের ব্যথা যখন খুব বেড়ে ওঠে, ঐ ডাক্তারের এক শিশি ওষুধ খেলেই কমে যায়। ওষুধ নিয়ে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে হনহন করে বাড়ির পথে আপনাদের ঐ বুড়ো বটতলায় যেই না এসেছি, অমনি পিছন থেকে একজন মারল ধাক্কা। আমি ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ি আর কি, বুক পকেট থেকে তখন হাত সরে গেছে, সেই সময় কে একজন—আহা-হা পড়ে গেলেন ? বলে পিছন থেকে আমায় জাপটে ধরল। আমি আর পড়লুম না বটে, পিছনের লোকটি আমায় বাঁচিয়ে দিল, কিন্তু সামলে নিয়েই দেখলুম আমার পকেট খালি, ডানহাতের ওষুধের শিশিটাও নেই। চকিতে পিছন ফিরে আমি সেই লোকটাকে ধরে ফেললুম। ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। চোর বলে মনে হয় না। তাহলেও চোখ পাকিয়ে তাকে বললুম—আপনি আমার পকেট মেরেছেন, শিগ্‌গির বার করুন টাকা। ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, বাঁচালুম আপনাকে, আবার বলেন পকেট মেরেছি ? লোকজন জড় হচ্ছিল ততক্ষণে। সকলের সামনে আমি ভদ্রলোককে সার্চ করলুম। একটি নোটও পেলুম না। মহা অপ্রস্তুত। বুঝলুম টাকাটা চোখের পলকে পাচার করে দিয়েছে। ওষুধের শিশিটা পর্যন্ত। বোকা বেনে গেলুম কর্তা। কি করব, ছেড়ে দিলুম লোকটাকে। তারপর নিঃস্ব হয়ে আপনার দ্বারে এসেছি।

বলে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

কর্তা বললেন—আমার পাড়ায় চুরি যখন হয়েছে আমি এর বিহিত করছি। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। যতক্ষণ না ডাকি এ ঘরে আসবেন না।

বলে ভদ্রলোককে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাকরদের বললেন—বাবুকে অমৃতি আর ডাবের জল দে।

কর্তার পাড়ায় বুড়ো বটতলার কাছেই ছিল পুরণ গুণ্ডার আড্ডা। কর্তা সকলেরই পরোপকার করেন, পুরণ গুণ্ডারও একবার করেছিলেন। পুরনের চোরাই কোকেনের ব্যবসা। সন্ধান মুলুক পুলিশের দল একবার ভোর রাত্রে পুরনের আড্ডায় হানা দিয়েছিল। পুলিশ আসছে খবর পেয়েই পুরণ তার কোকেনের থলি সমেত কর্তার বাড়ি এসে কর্তার পায়ের কাছে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। কর্তা ভোরে উঠে তাঁর বেলফুলের ঝাড়গুলি থেকে আগের রাতের ফোটা বেলফুল তুলে তুলে হাতের মুঠোয় জমা করছিলেন। সেই সময় সাক্ষাৎ পুরণ গুণ্ডার প্রবেশ।

পুরণ হাত জোড় করে বললেন—হুজুর বাঁচান।

দুঃস্থ এসে আশ্রয় চাইছে। কর্তার পরোপকার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। পুরণকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার থলিসুদ্ধ তাকে তক্তাপোষের তলায় লুকিয়ে রেখে দিলেন। পুলিশ এসে কাউকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেল।

এই পুরণ গুণ্ডাকে কর্তা ডেকে পাঠালেন। পুরণ শুনে বললেন—বুড়ো বটতলায় যদি রাহাজানি হয়ে থাকে তবে আমার জানপছন লোক। কিছু ভাববেন না, এনে দিচ্ছি। এই বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহশিক্ষকের তিনশ' পনের টাকা আর খালি ওষুধের শিশিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কর্তা বললেন—ওষুধ কি হল ?

একটা লোক জ্বরে কাঁপছিল তাকে খাইয়ে দিয়েছে।

কর্তা আঁৎকে উঠে বললেন—সে কি ? ও যে পেটের অসুখের ওষুধ। জ্বরের রুগীকে খাইয়ে দিলে ?

—আমরা হুজুর গরীব মানুষ, আমাদের একটা ওষুধ হলেই হল। ঠিক সেরে যাবে।

—তাই বলে পুরো এক শিশি ওষুধ খাইয়ে দিলে, বোধহয় দু'দিনের ডোজ।

—হুজুর, জ্বরটা একটু বেশি হয়েছিল ভাল ফলই হবে।

—জ্বর কেন, মানুষসুদ্ধ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাক। এই বলে আর কথা না বাড়িয়ে কর্তা পুরণকে বিদায় দিলেন। তারপর খালি ওষুধের শিশি আর টাকা নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

গৃহশিক্ষকের মুখে হাসি ধরে না। ওষুধটা নেই বলে কর্তা দুঃখ করতে লাগলেন। গৃহশিক্ষক বললেন—যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। বলে কর্তার পায়ের ধুলো বার বার মাথায় নিয়ে—বেলা বেড়ে গেল কর্তা এবার স্নান করুন—বলতে বলতে বিদায় হলেন।

কর্তার সেদিন আর টুলে বসে ডলাই মলাই করে তেল মাখবার সময় ছিল না। মাথায় এক খাবলা তেল মেখে স্নানের ঘরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় পুরণ গুণ্ডার পুনঃপ্রবেশ।

—কি পুরণ? আবার কি মনে করে?

—হুজুর, দত্তবাড়ির মাস্টারকে কি তার টাকা ফেরৎ দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, এই মাত্তর তো দিয়ে দিলুম। শুধু ওষুধটা দিতে পারলাম না।

—তবে তাজ্জব ব্যাপার হুজুর। বুড়ো বটতলায় গিয়ে দেখে এলুম একজন বসে বসে কাঁদছে। তাকে দেখে তো দত্তবাড়ির মাস্টার বলেই মনে হয়। পকেট কিন্তু তার খালি।

—বলিস কি রে? আবার পকেট মারা গেল নাকি? চল্ তো দেখে আসি। বলে স্নান মাথায় উঠল, খড়ম পায়ে দিয়ে কর্তা ছুটলেন বুড়ো বটতলায়।

সেখানে সত্যিই একজন লোক বসে কাঁদছিলেন। তার চেহারা কিন্তু কর্তা যাঁকে দত্তবাড়ির গৃহশিক্ষক বলে চিনেছিলেন তাঁর মত মোটেই নয়।

খোঁজ-খবর করে সহজেই জানা গেল ইনিই দত্তবাড়ির সত্যিকারের গৃহশিক্ষক। এরই পকেট মারা গিয়েছে। তিনমাসের মাইনে তিনশ' পনের টাকা আর এক শিশি পেটের অসুখের ওষুধ লোপাট। নকল গৃহশিক্ষকের কোথাও কোন চিহ্ন নেই।

কর্তাকে আরো একবার পরোপকার করতে হল। প্রথমেই পাশের ডাক্তারখানা থেকে ভদ্রলোকের এক শিশি পেট ব্যথার ওষুধ কিনে দিলেন। টাকার শোকে ভদ্রলোকের পেটের ব্যথা বেড়ে উঠেছিল। টাকার শোকে যত না কাঁদছিলেন পেটের ব্যথায় কাঁদছিলেন তার চেয়েও বেশী। ওষুধ

খাইয়ে শিক্ষক মহাশয়কে ঠাণ্ডা করে কর্তা বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। তারপর তিনশ' পনেরটি টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আমার এই সামান্য উপহারটুকু দয়া করে গ্রহণ করুন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে শেষ অবধি গ্রহণ করলেন টাকাটা। কর্তা তখন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, বলুন তো, বুকপকেট থেকে টাকা মেরে দিতে গেলে পকেটটা না ছিঁড়লেও কি চলে?

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই। এমন হাত সাফাই ওদের, জানতেই পারবেন না। আমার পকেট যেমনকে তেমনি আছে। সেলাইয়ের একটা সুতো পর্যন্ত সরেনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন এ কথা হুজুর?

কর্তা বললেন—সে কিছু নয়! আপনি আজ তবে বাড়ি যান। বলে বলে ভদ্রলোককে বিদায় দিলেন।

কর্তার একটা পরোপকার আজ হল বটে, কিন্তু অন্য পরোপকারটা করতে গিয়ে যে বেদম ঠকে গেলেন সেটা ভুলতে পারছিলেন না। তেলা মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে ঢালতে কেবলই বলতে থাকলেন—ইস্, ছেঁড়া পকেটটা দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে লোকটা ঠগ্।

দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্যরাজের মন্ত্রী হন এক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত মাণিক্য বাচকর। মাদুরার এই পণ্ডিতটি পরে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে সন্ন্যাসী হন, ও চিদাম্বরমের মন্দিরে সারা জীবন কাটিয়ে দেন। জনশ্রুতি আছে অন্তিমকালে দেব বিগ্রহের মধ্যে তিনি মিলিয়ে যান।

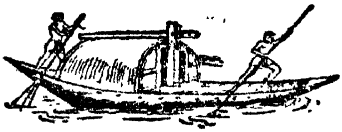
মাদুরার আরেক ব্রাহ্মণ কুমার সম্বন্ধর। ষোল বছর বয়সের মধ্যে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত হন। মাদুরার রাজা ও রাণী তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। নালুর-পেরুমানম্ মন্দিরে তিনি যান দেব দর্শনে। অর্চনা শেষে দেব-বিগ্রহ থেকে একটা জ্যোতি নির্গত হয়ে তাঁকে দগ্ধ করে।



ভাবছি হলো কি !

শ্রী পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

"যা হবার তা হয়েই গেছে কালবোশেখীর ঝড়ে।
ভেবে কি আর কররে ভায়া? ভেবেই লোকে মরে।
নদীই বলো, ঝড়ই বলো, খাতির রাখে কার?
নৌকোটা কাৎ হলে মাঝি কিইবা করবে তার!"



দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তখন বলে আবদুল গনি—
"ভাবছি না মুই—ডুবলো আমার লা'টা হাজার-মণী।
ভাবছি না মুই—তলিয়ে গেল মহাজনের মাল।
ভাবছি না মুই—কেমন করে সামলাবে সে টাল।
ভাবছি না মুই—কত লোকের বুকে ঠেকলো মাটি।
ভাবছি না মুই—কত ঘরে উঠলো কান্নাকাটি।
ভাবছি না মুই—খাবি খেয়ে মরলো কটা দাঁড়ী!
ভাবছি না মুই—তাদের ঘরে চড়বে না যে হাঁড়ী!
ভাবছি না মুই—আর যে কটা, তারাও মলো কি!
ও সব কিছুই ভাবছি না মুই, ভাবছি হলো কি?



মোনা ডাকাত * শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মোনা ডাকাতের নাম শোনেনি এ রকম লোক আমাদের ও অঞ্চলে নেই বললেই হয়। ইয়া লম্বা চওড়া জোয়ান। টাঙ্গির মতন গোঁফ। মাথায় একমাথা বাবরি-কাটা কোঁকড়ানো চুল। শোনা যায় নাকি গায়ের জোর তার অসাধারণ।

তার এই গায়ের জোর নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী যে লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় তার আর অন্ত নেই। মোনা নাকি একবার একটি হাতী মেরেছিল, বন্দুকের গুলি তার কিছুই করতে পারে না, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তিনতলা চারতলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফানো—এসব ত তার কাছে ছেলেখেলা!

থাকবার মধ্যে গ্রামের একটেরে মোনার একখানা কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। মোনা নিজেই কতবার বলেছে, চুরি-ডাকাতি করা টাকা-পয়সা থাকে না বাবু। কেমন করে সে কোনদিক দিয়ে যে উড়ে যায় নিজেই বুঝতে পারি না।

লোকে বলে, বুঝতেই যদি পারিস চুরি তাহলে করিস কেন ?

সোনা একটুখানি হেসে জবাব দেয়, থাকতে পারি না বাবু। স্বভাব যায় না মলে।

সংসারে তার নিজের বলতে একদিন সবই ছিল। এখন মাত্র পাঁচ ছ' বছরের ফুটফুটে সুন্দর একটি নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই।

স্ত্রী-পুত্র তার কেমন করে গেল তারও একটা গল্প আছে। সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে যা বলে তাই বলছি।

আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সোজা চলে গেছে। এই গ্রাণ্ডট্রাংক রোডই ছিল মোনার শিকারের জায়গা। রাত্রির অন্ধকারে শহর থেকে জিনিষপত্র নিয়ে যারা যাওয়া-আসা করত মোনার হাতে তারা নিস্তার পেতো না। কত রকম কত নিরীহ যাত্রী যে, মোনার হাতে প্রাণ দিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। না চাইতেই মোনার হাতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র যারা তুলে দিত তাদের সে কিছু বলত না, কিন্তু জোর জবরদস্তি করলেই মুস্কিল! মাথার উপর প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাতেই তাকে সে শেষ করে দিত। মৃতদেহ কোনদিন বা রাস্তার ওপরেই পড়ে থাকত, কোনদিন বা রাণী-সায়রের পাকে দিত পুঁতে।

এর জন্যে পুলিশ যে মোনাকে ধরেনি তা নয়। কতবার ধরে নিয়ে গেছে, কতবার সে জেল খেটেছে কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েই যে-কে সেই!

প্রায় হপ্তাখানেক ধরে মোনার একবার কোনো শিকারই মেলেনি। মনের অবস্থা ভারি খারাপ। সন্ধ্যায় সেদিন প্রচুর মদ খেয়ে প্রকাণ্ড একটা লাঠি হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে রাণী-সায়রের একটা গাছের তলায় মোনা দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকারে হন্ হন্ করে একটা লোক এগিয়ে আসছে দেখে মোনা ছুটে গিয়ে মারলে তার মাথায় এক লাঠি!

লাঠি খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ল। বললে, বাবা, আমি।

আমি কেরে ব্যাটা! আমি-টামি শুনছি না বাবা, আজ সাতদিন চুপ করে বসে আছি, দে তোর সঙ্গে কি আছে দে!

বলেই মোনা হাত পাতলে। কিন্তু একি! লোকটা আর কথাও কয় না, নড়েও না! বোধহয় এক লাঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে সে তার

গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, গায়ে জামা নেই, হাতেও কিছু নেই। টাকাকড়ি হয়ত ট্যাঁকে গোঁজা আছে ভেবে কোমরের কাপড়টা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলে, ছ'টি মাত্র পয়সা। তাই তা-ই। পয়সা ছটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবারে বাঁচতে পারিস ত বেঁচে ওঠ্ বাবা, আমার কোনো আপত্তি নেই।

শিকারের সন্ধানে সে আরও কিছুক্ষণ রইলো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেদিন আর ওই ছটা পয়সার বেশি সে পেলে না, মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে এলো।

পরের দিন সকালে গ্রামের মধ্যে এক হুলস্থুল কাণ্ড। মোনা ডাকাতের ছেলে মাধবের মৃতদেহ রাণী-সায়রের পাড়ে আছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সেখানে ভিড় করে গিয়ে দাঁড়ালো, থানা থেকে পুলিশ এলো, কনস্টেবল এলো, চৌকিদার এলো।

কথাটা মোনার কানে যেতেই সে একবার চমকে উঠলো। তার পর থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে সে ছুটল রাণী সায়রের দিকে। চোখ দিয়ে তখন তার দরদর করে জল গড়াচ্ছে। গিয়ে দেখলে, মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ত্রী তখন চীৎকার করে কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। বৌ কাঁদছে মাটিতে শুয়ে আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাধবের দশ বছরের মেয়ে রাণী আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

সর্বনাশ! সবাই জানে রাস্তার ধারে রাত-বিরেতে ঠেঙ্গিয়ে মানুষ মারে মোনা ডাকাত। আজ সেই তার ছেলেকে কে মারলে কে জানে! মোনাই যে তাকে মেরেছে সে কেউ ভাবতেও পারলে না। হোক না ডাকাত, তাই বলে নিজের ছেলেকে কেউ মারতে পারে নাকি?

অনেকে বলতে লাগলো, এমনিই হয়। কত লোকের কত ছেলেকে সে মেরেছে, তার ছেলে মরবে না ত কে মরবে! ভগবান আছেন ঠিক।

পুলিশ লাস নিয়ে চলে গেল। কে যে তাকে মেরেছে তার আর কোন কিনারা হলো না।

এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে দিন পনেরো খুব আন্দোলন চললো। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শুধু এই কথা ছাড়া যেন আর কথা নেই।

তারপরেই সব চুপচাপ।

এমন দিনে মোনার বাড়ীতে আর এক বিপদ।

ছেলেকে নিজের হাতে খুন করে পর্যন্ত মোনা যেন কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল। কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতো না, কাজ-কর্ম তার একদম বন্ধ, বাড়ীতে নিত্য অভাব যেন তার লেগেই রইলো।

স্ত্রী তার ঝগড়া করতে লাগলো, যেমন কর্ম তেমনি ফল। এত অধর্ম সইবে কেন?

মোনা চুপ করে রইলো, একটি কথারও জবাব দিলে না।

তারপর মোনা একদিন কিছুতেই আর থাকতে পারলে না। সত্যি কথাটা এখনও সে কাউকে বলেনি। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় তার মনে হলো কথাটা না বললে এবার সে হয়ত ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে মরেই যাবে। তাই সে তার স্ত্রীকে বলে ফেললে, ছাখো, মাধবকে সেদিন আমি মেরে ফেলেছি।

স্ত্রী তার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইলো, তুমি? কেন?

অন্ধকারে চিনতে পারিনি। নেশার ঝোঁকে—

কথাটা যে আর শেষ করতে পারলে না। শুয়ে শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

মোনা ডাকাতকে এমন করে কাঁদতে তার স্ত্রী কোনদিন দেখেনি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল, রান্নাঘরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে মোনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, রইলো বিধবা বৌ আর নাতনী।

বিধবা বৌ তার অনেকদিন থেকেই জ্বরে ভুগছিল। এমনি মজা, শাশুড়ী মরার মাসখানেক পেরোতে না পেরোতেই বিধবা বৌটাও তার মরে গেল।

বাকী রইলো শুধু তার নাতনী রাণী!

লুকিয়ে লুকিয়ে লোকে বলতে লাগলো, এবার ওটাও যাবে।

মোনারও কেমন যেন মনে হলো বিধাতার অভিশাপ! পাপীকে ভগবান বুঝি এমনি করেই শাস্তি দেন।

রাণী বড় সুন্দরী মেয়ে। মোনার বাড়ীতে মেয়েটাকে মোটেই মানায় না—এত সুন্দরী !

সারা গ্রামের মধ্যে তার মত রূপসী আর আছে কিনা সন্দেহ। সাদা ধপধপে করছে তার গায়ের রং। যেন দুধে-আল্তায় গোলা। কালো কালো চুলের গোছা তার সারা পিঠটাকে ঢেকে দেয়। মুখের পানে তাকালে আর সহজে চোখ ফেরানো যায় না। দশ বছরের মেয়ে এমনি বাড়ন্ত গড়ন, মনে হয় যেন এরই মধ্যে সে কৈশোর অতিক্রম করেছে।

এখন এই মেয়েটাই হলো মোনার একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাকে, দিদি !

রাণী কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে, কি বলছো দাদু ?

মোনা বল্লে, কিছু বলিনি দিদি। কি করছো তাই জিগেস করছি।

রান্না করছি দাদু। অম্বলটা হয়ে গেলেই তোমাকে খেতে দেবো।

মানুষ মারার ব্যবসা মোনা এখন একদম্ ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে শুধু এই মেয়েটার জন্যে।

নিতান্ত যখন অভাব পড়ে, এতদিনের অভ্যেস, এক একবার তার মনে হয়—যাই মাকালী বলে কিছু রোজগার করে আনি ! কিন্তু লাঠিটা হাতে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখে। মনে হয় ভগবান যদি তাকে আবার শাস্তি দেন ! যদি এই মেয়েটাও মরে যায়।

আগে সে জেল-কয়েদকে মোটেই ভয় করতো না। কতদিন কত ব্যাপারে তার জেল হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে জেলে গিয়ে ঢুকেছে, আবার মেয়াদ ফুরোতেই বুকের ছাতি ফুলিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছে।

এখন মনে হয় জেলে যাওয়া তার কোনমতেই চলতে পারে না। সে যদি জেলে যায়, এই মেয়েটা পথে দাঁড়াবে। একে দেখবার আর কেউ নেই। দু'বেলা দুমুঠো খাবার অভাবে হয়ত মরেই যাবে।

রাণীকে মোনা সুখে রাখতে চায়। সংসারের কাউকেই ত সে সুখে রাখতে পারেনি। একরত্তি এই মেয়েটাকেও যদি সে সুখে রাখতে না পারে ত বৃথাই তার জীবন ! বৃথাই সে পুরুষ হয়ে জন্মেছে।

মোনা দিনকতক দূরের একটা শহরে গিয়ে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু দিনকয়েক পরে দেখলে, ভিক্ষে তাকে আর কেউ দিতে চায় না। কেউ

বা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, কেউ বা বলে, দিব্যি শরীর রয়েছে, খেটে খাওগে বাবা।

মোনা কি যে করবে বুঝতে পারে না। কায়স্থের ছেলে, লেখাপড়াও শেখেনি যে কাজকর্ম করবে।

গ্রামের জমিদার বৃদ্ধ অজয় চৌধুরী মস্ত বড়লোক। এক একবার ভাবে, জমিদারকে গিয়ে ধরিগে! আবার ভাবে, এককালে এই জমিদারকে সে গ্রাহ্যও করেনি। কতবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছে, এমন কি যখন সে জোয়ান ছিল, এই পৃথিবীটাকে সে অন্য চোখে দেখতো, তখন সে তাঁকে একটু আধটু অপমানও করেছে। সেই লজ্জায় এখন সে তাঁর কাছে যেতেও পারে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে তাকে একদিন হলোই। জমিদারবাবু বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, মোনা তার হাতের লাঠিটা মাটিতে নামিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ঢিপ কোরে একটি প্রণাম করলে।

অজয় চৌধুরী মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কিরে? মোনা কি মনে কোরে?

মোনা বললে, বাবু একটা চাকরি-বাকরি দিন।

কেন? ডাকাতি করগে যা না।

মোনার চোখ দুটো ছল ছল করে এলো, বললে, আর লজ্জা কেন দিচ্ছেন কর্তা!

খানিক চুপ করে থেকে জমিদারবাবু বললেন, চাকরি করবি? বেশ, তবে কাল থেকে আমার চাপরাসীর কাজ কর!

মোনা হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীতে ঢুকেই ডাকলে দিদি!

রাণী ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো।

মোনা বললে, কাল থেকে জমিদার বাড়ীতে চাকরি করবো দিদি! এবার আর তোর ভাবনা নেই। ভালো ভালো শাড়ী এনে দেবো···তুই যা চাইবি দিদি, তাই এনে দেবো।

আমার কিছুই চাই না দাদু, বলে রাণী চলো যাচ্ছিল, মোনা বললে, চলে যাচ্ছিস কেন ভাই, শোন! কিছু চাইনে? ভালো একটি বর যদি এনে দিই···

যাঃ-ও!

লজ্জায় এবার সে সত্যিই চলে গেল।

আনন্দে মোনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো

দুই নাতনী-ঠাকুদার পরমানন্দে দিন কাটছিল। মোনার সংসারে আর তেমন অভাব নেই। মাইনে যা পায় তাই দিয়ে দু'জনের বেশ চলে যায়।

জয়নগরের একটা বাঁধের দখল নিয়ে দুই জমিদারে বাধল একটা মামলা। এক তরফে আমাদের অজয় চৌধুরী, আর এক তরফে জয়নগরের জমিদার। বাঁধে জোর করে মাছ ধরিয়ে দখল নিতে হবে।

অজয় চৌধুরী মোনাকে ডেকে বললেন, মোনা পারবি?

জমিদারবাবুকে একটি প্রণাম করে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে মোনা উঠে দাঁড়ালো।

তারপর জনকতক জেলে সঙ্গে নিয়ে মোনা একাই গেল পুকুরের দখল নিতে।

প্রকাণ্ড বড় বড় পাঁচটা মাছ নিয়ে মোনা ফিরে এলো। জমিদার খুসি হয়ে তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, তার কাপড়ে কাঁচা রক্তের দাগ, লাঠিটা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে, একি! খুন-খারাপি হয়ে গেছে নাকি?

হাসতে হাসতে মোনা বললে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন ত হয়েই থাকে বাবু। বেশি কিছু হয়নি, একটা ছোঁড়া মনে হলো যেন পড়ে গেছে।

পড়ে গেছে কিরে?

একটা ছোঁড়া এসেছিল আমার মাথায় লাঠি চালাতে। জনপঞ্চাশেক এসেছিল বাবু, তা কেউ এগোলো না। শুধু ওই একটা ফাজিল ছোঁড়া বলে কিনা—রেখে দে তোর মোনা ডাকাত, বুড়ো হয়েছিস্ এখন আর তোর— আর বেশি কিছু বলতে দিইনি বাবু।

অজয় চৌধুরী জিগ্যেস করলেন, খুন করে ফেললি?

মোনা বললে, আজ্ঞে না, খুন আমি আর করব না পিতিজ্ঞে করেছি। মাথায় মারিনি, খুন ঠিক হবে না, তবে হাত দুটো হয়ত গেছে।

চৌধুরী বললেন, তা বেশ করেছিস। যা কাপড়টা বদলে হাত পা ধুয়ে ফ্যাল।

কিন্তু তারপরের দিন বাধল এক মহা গণ্ডগোল! পুলিস এলো মোনাকে ধরে নিয়ে যেতে।

চৌধুরীমশাই অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু মোনা ডাকাত এ অঞ্চলে বিখ্যাত লোক। গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে চিনে ফেলেছে। পুলিস শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু অজয় চৌধুরী জামিন দিয়ে সেইদিনই তাকে ছাড়িয়ে আনলেন।

মামলা চলতে লাগলো। অজয় চৌধুরী চেষ্টার ত্রুটি করলেন না, টাকাও বিস্তর খরচ করলেন। কিন্তু মোনাকে তো খালাস কিছুতেই করে আনতে পারলেন না। মোনার একমাস জেল হয়ে গেল।

মোনা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল। একমাস মাত্র জেল, তারই জন্যে মোনা আজ কিনা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। অবাক কাণ্ড। এরকম জেল তার কত হয়েছে। কোনদিন কেউ তাকে কাঁদতে দেখেনি।

সবাই বলতে লাগল, চিরদিন কি আর কারো সমান যায় রে বাবা। বুড়ো হয়েছে, আর কি সে জেলের কষ্ট সইতে পারে।

কিন্তু হায়, কেউ তার মনের কথা বুঝলে না। জেলের জন্যে সে কাঁদেনি, কেঁদেছে রাণীর জন্যে। কাঁদতে কাঁদতে সে জেলে গিয়ে ঢুকল।

একমাস মাত্র তিরিশটি দিন। দেখতে দেখতে কেটে গেল। মোনা গ্রামে ফিরে এলো। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে সে তার বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলে, দিদি। দিদিমণি! আমি এসেছি।

কিন্তু একি! কারও সাড়া না পেয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, দরজায় তালা বন্ধ। বাড়ীতে কেউ নেই, রাণী গেল কোথায়?

মোনা তখনি জমিদারের বাড়ীর দিকে ছুটল। অজয় চৌধুরী বাইরের ঘরে একলা বসে ছিলেন, উন্মাদের মত মোনা তার পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল, আমার দিদিমণি কোথায় গেল বাবু?

দিদিমণি? চৌধুরীমশাই হাসতে লাগলেন, বললেন, সে পালিয়েছে।

পালিয়েছে কি? মোনা তাঁর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে বললে, হাসছেন যে?

দাঁড়া আসছি। বোস একটু ঠাণ্ডা হ। বলে চৌধুরীমশাই বাড়ীর ভিতর উঠে গেলেন।

মোনা হতভম্বের মত বসে রইলো। ভালো করে কিছুই বুঝতে পারলে না।

খানিক পরেই জমিদারমশাই-এর বদলে সেখানে এসে দাঁড়ালো রাণী।

রাণীকে দেখে মোনা চীৎকার করে উঠল, দিদি!

রাণীও তার কাছে ছুটে এলো, বললে, দাদু তুমি এসেছো? আমার জন্যে সেখানে খুব ভাবছিলে বুঝি?

পরস্পর মুখের পানে তাকিয়ে কেঁদে ভাসালে। তারপর কান্না থামলে, তাদের যে কত কথা।

মোনা দেখলে রাণী এখানে বেশ সুখে আছে। কেনই বা থাকবে না। একে জমিদারের বাড়ী, তার উপর ভালো করে দু'বেলা খেতে পায়। ভালো ভালো শাড়ী পরে, গয়না পরে—রাণী সেজেছে ঠিক রাণীর মত।

মোনা তার দিকে তাকিয়ে আর যেন চোখ ফেরাতে পারে না।

রাণী বললে, চল দাদু, এবার আমরা যাই।

মোনার যেন ধ্যান ভাঙল। বললে, কোথায় যাবি ভাই?

রাণী বললে, আমাদের বাড়ীতে।

আমাদের বাড়ীতে? কেন দিদি, এখানে ত বেশ সুখে আছিস।

রাণী কিন্তু জিদ ধরে বসলো, তা হোক দাদু, আমি তোমার কাছে থাকবো।

আমার কাছে? মোনা একটু হেসে বললে, আমার কাছে দু'বেলা পেটভরে যে খেতেও পাস না দিদি?

রাণী বললে, না দাদু, তা হোক তুমি চল।

মোনা কি করবে কিছু বুঝতে পারলে না। খানিক চুপ করে কি যেন ভেবে বললে, এক গ্লাস জল আনত ভাই। ভারি পিপাসা পেয়েছে।

রাণী ছুটল বাড়ীর ভেতর থেকে জল আনবার জন্যে।

বেশিক্ষণ যায়নি। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে রাণী ফিরে এলো। এসে দেখে দাদু নেই।

দাদু! দাদু! কিন্তু কোথায় দাদু?

বর্ষাকাল। চারিদিক অন্ধকার, বাইরে তখন ঝমঝম করে বাদল নেমেছে।

এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় সে গেল?

গ্লাস হাতে নিয়ে দরজার কাছে অনেকক্ষণ রাণী দাঁড়িয়ে রইলো। মোনা তবু ফিরল না। গ্লাসটা নামিয়ে রাণী একলা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট্ট মেয়ে। কেন যে দাদু তার চলে গেল কিছু বুঝতে পারলে না।

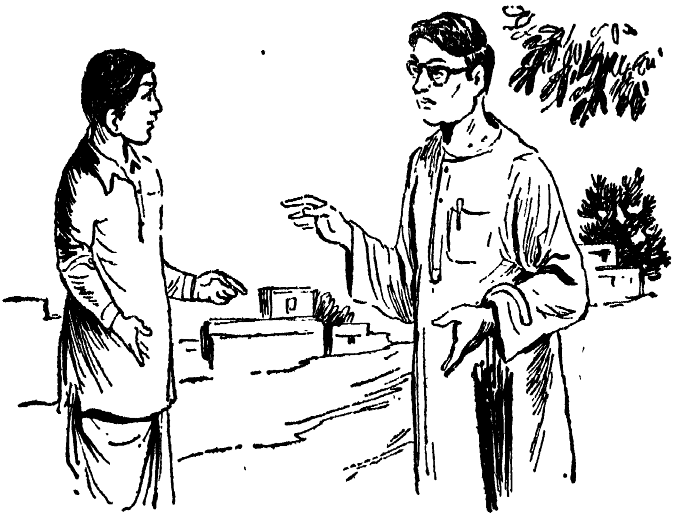
কেন যে গেল, কি কষ্টে যে গেল, তা একমাত্র তার দাদুই জানলে আর জানলেন অন্তর্যামী।

রাণীর কাছে ফিরে যাবার জন্যে, আর একটিবার তাকে দেখবার জন্যে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। কিন্তু তবু কিছুতেই সে ফিরতে পারলে না। ফিরতে পারলে না এই ভেবে, সে সাক্ষাৎ অমঙ্গল, সংসারের কোন মানুষই শুধু তার জন্যে সুখী হয়নি। তার কাছে থাকলে হয়ত তার রাণীরও কষ্টের আর অবধি থাকবে না। তার চেয়ে মূর্তিমান অভিশাপ যে, তার দূরে সরে যাওয়াই ভালো।

রাণীর স্থান রাজার বাড়ীতে—ডাকাতের বাড়ীতে নয়।

দশম ও একাদশ শতকে এদেশ থেকে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী চীনদেশে যান শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মপ্রচার করতে। কোন কোন বছরের হিসাবে দেখা যায় তাঁদের সংখ্যা লক্ষ অতিক্রম করেছে :

১০২১	খৃস্টাব্দে	চীনদেশে	ভারতীয় ভিক্ষু	৩,৯৭,৬১৫	ভিক্ষুনী	৬১,২৪০
১০৩৪	”	”	”	৩,৮৫,৫২০	”	৪৮,৭৪০
১০৬৮	”	”	”	২,২০,৬৬০	”	৩৪,০৩০



রাজুর মামার বাড়ী * শ্রী কমলা দত্ত

রাজুর মামা বিমলবাবু রেলে কাজ করতেন, হালে রিটায়ার করেছেন। রিটায়ার করে প্রথমেই তাঁর ইচ্ছে হোলো এবার একখানা বাড়ী করবেন। খুব বড় নয়, এই তিন চারখানা ঘর থাকবে—সামনে থাকবে একটু বারান্দা—ভেতরে অল্পস্বল্প খানিকটা জায়গা। ট্রাম-বাসটা দু'চার মিনিটের মধ্যে পাওয়া চাই;—নয়তো, বড় ছেলেটি চাকরী করে—তার যাতায়াতের সুবিধে চাই, ছোট ছেলেটি যাদবপুরে পড়ে—তাকেও কলেজ করতে হবে, আর মেয়েটিকে হালে বিয়ে দিয়েছেন বেহালায়,—জামাই মেয়ের আসা-যাওয়া—একটু রাত অবধি না পেলে চলে কি করে? আর বিমলবাবু চিরকাল দক্ষিণ কলিকাতায় থেকে অভ্যস্ত, সুতরাং দক্ষিণ অঞ্চলেই বাড়ী করবেন এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

জমি খোঁজাখুঁজি করছেন রাজুর মামা। রাজুর সঙ্গে তাঁর দেখা সেদিন রাজুর বাড়ীতেই। "কী মামা, জমিটমি ঠিক হোলো?"

"এবার তো মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। ঢাকুরিয়ায় একটা জমি দেখেছি, আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। তবে লেখাপড়া হয়নি এখনো—একবার তোর মামীমা আর ছেলে-মেয়েদের দেখিয়ে নিই।"

আবার ক'দিন পরে,—"হয়ে গেছে জমি, মামা?"

"নাঃ, হোলো না। ওদের বিশেষ মত নেই। বলেছে সামনের রাস্তাটা বাঁধানো নয়—বর্ষাকালে একটু কাদা হতে পারে। অথচ ওরা বুঝছে না—চৌরঙ্গী রোডের ওপর বাড়ী করার ক্ষমতা তো নেই। সস্তাও চাই—অথচ পছন্দটা হবে এত উঁচু স্তরের—এ হলে তো পারি না। তবু কী করব—ওদের সুখ-সুবিধে দেখেই আমাকে চলতে হবে।"

এর পর বেশ কিছুদিন রাজুর মামার সঙ্গে দেখা হোলো না। রাজু তো ভাবছে মামা বোধ হয় জমি কিনে একটা বাড়ী আরম্ভ করে দিয়েছেন। শেষে রাজুই মামার কাছে গেল একদিন।

"—এই যে মামা, জমি কেনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই?"

"আর হচ্ছে কোথায়? কতগুলি তো দেখলাম, একটা না একটা অসুবিধে বেরিয়েই যাচ্ছে। তবে এবার একটা জমি দেখছি—একটু দূরে অবশ্য যাদবপুরে। রাস্তা থেকে একটু ভেতরে বটে—তবে সামনেকার রাস্তা পাকা। এক সঙ্গে পাঁচ কাঠাই নিয়ে নেব ভাবছি। একটু খোলামেলা হবে। একটু-আধটু বাগান-টাগানও করা যাবে। আমার জানাশোনা লোকের জমি, সস্তাতেই দেবে বলেছে।"

সুখবর—রাজু ভাবে। এতদিনে যদি মামার একটা বাড়ী হয়। কিছুদিন পরে, আবার দেখা হোলো মামার সঙ্গে। এবারে এক লোকাল ট্রেণের কামরায়। ট্রেণটি যাচ্ছিল যাদবপুরের দিকেই। রাজু বুঝল, তা হলে মামা যাদবপুরের সেই জমিটাই কিনে ফেলেছেন। ভালোই হোলো—ট্রেণ বাস দুটোরই সুবিধা পাবেন।

"যাদবপুরে যাচ্ছেন বুঝি, মামা? ঐ জমিটাই তা হলে হয়ে গেল?" রাজু জিজ্ঞাসা করল।

"কই আর হোলো?"

"কেন—কী হোলো আবার?"

"না—গরজ বুঝে সেও হাঁক দিয়েছে। এত আশা-ভরসা দেবার পর এমন করবে বুঝতে পারিনি।"

"তাহলে এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"যাচ্ছি ঐ জমির খোঁজেই গড়িয়া, গাঙ্গুলী বাগানে। রিটায়ার করে তো এই এক চাকরী হয়েছে আমার, কেবল একটু জমির জন্য এদিক সেদিক ছুটোছুটি।"

"এতদূরে? মামীমা রাজি হবেন তো?"

"আরে তার গরজেই তো যাচ্ছি। তার ভাই বাড়ী করেছে সেখানে। তার পাশের জমি—শীঘ্রই বিক্রী হয়ে যাবে। একেবারে বাস রাস্তার পাশেই নাকি। ভাবছি দোমনা না করে ঐ জমিই কিনব। এদিকে তো দিনকে দিন জমির দর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। একটু দূর হবে বটে, তবে জায়গাটা নাকি ভালো—প্রচুর লোকজন বাড়ী ঘর, আর বিশেষ করে তোমার মামীমার ভাই তো পাশেই রইলেন।"

"সে ঠিক কথা মামা, এবার ঝট্ করে কিনে ফেলুন—আর দেরী করবেন না। যে পরিমাণে জমির দাম বাড়ছে আর জমি লোকে কিনছে, এর পর আর আমার আপনার মত লোক জমি কিনতেই পারবে না।"

এর পর আবার মাস তিনেক দেখা নেই। হঠাৎ একদিন জগুবাবুর বাজারে দেখা। রাজু প্রশ্ন করে—"কী মামা, বাড়ী আরম্ভ হয়ে গেছে?"

"নাঃ—আমার আর জায়গা কেনা হচ্ছেই না।"

"কেন সেই গড়িয়ার জমি?"

"সে আবার বড় ছেলের আপত্তি। চাকরীতে পদোন্নতি হয়েছে—তার অফিসের বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে এতদূরে আসা না কি অসম্ভব। কাজেই সে জমিও ছেড়ে দিলাম। যাক্‌গে—আর একটা জমির চেষ্টায় আছি—এই বালিগঞ্জেই পণ্ডিতিয়া রোডে। জমিটা ছোট, দু'কাঠারও কম। তা অন্য সব সুবিধে যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আর বড় জায়গা দিয়ে কি হবে? কোন মতে বাড়ীটা উঠলেই হয়।"

মাস খানেক কাজেকর্মে রাজু মামার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। আবার যখন দেখা হোলো—প্রশ্ন করলো—"কি মামা, কেনা হয়ে গেছে জায়গাটা?"

"নাঃ, ওটাকেও ছেড়েই দিতে হোলো।"

"কেন—দামে বনেনি?"

"না না, সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধে হয়নি। সেদিন জামাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম, ও খুব অপছন্দ করলো। অবিশ্যি ওর কথাটা ঠিকই, প্লটটার একটা দিকে একটা রাস্তা ছাড়া আর কোন দিক খোলা নয়। কিন্তু কলকাতার ওপরে খোলা হাওয়া পাওয়া যায় এমন বাড়ী আর ক'খানাই বা আছে? অন্য দিক দিয়ে সুবিধে ছিল বলেই রাজি হয়েছিলাম।"

"তা আপনার যদি পছন্দ হয়েই ছিল তবে জামাই অপছন্দ করাতে পিছিয়ে গেলেন কেন? জামাই তো আর সদাসর্বদা এ বাড়ীতে থাকছে না?"

"সে তো ঠিক কথা, কিন্তু এমনভাবে আপত্তি করছে! নতুন জামাই হয়তো ভাববে তার কথাটা রাখলাম না। যাক্—জায়গা তো দেখেই যাচ্ছি, একটা হবেই।"

এবার রাজুর কাছে ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে। তাই কয়েকদিন পরে সে নিজেই একদিন মামার কাছে এসে হাজির।

"কী মামা, হোলো কিছু ঠিক?"

"এবার এক রকম ঠিকই হয়ে গেছে। খুব সস্তাতেই তিন কাঠা জমি পাচ্ছি হিন্দুস্থান পার্কে। কর্ণার প্লট, পূর্ব দক্ষিণ দুটো দিকই খোলা। এক বন্ধুর মারফৎ পাচ্ছি। সেদিন হঠাৎ আশ্চর্য যোগাযোগ। বাসে দেখা তার সঙ্গে—বোধ হয় বিশ বছর পর দেখা হোলো। তারপর দু'জনে চায়ের দোকানে ঢুকে খবরের আদান-প্রদান করছি—উঠল জমির কথা। আমি জমি চাইছি শুনে তক্ষুনি আমাকে টেনে নিয়ে গেল জমি দেখাবে। খোলা জমি প্রায় আধ বিঘের মত পড়ে আছে। কোন দিককার জমি পছন্দ তাই জিজ্ঞেস করলো। আমি তো একেবারে কোণের জমিটাই দেখিয়ে এলাম। দামও বেশ সস্তা। সে-ই সব বন্দোবস্ত করে দেবে বলল। দেবে ঠিক—ও আমার সেই স্কুল-জীবনের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

"জমিটা কি আপনার বন্ধুর-ই?"

"না—জমিটা তার এক বন্ধুর। তবে সে নাকি ওকেই জমি বিক্রীর ভার দিয়েছে। ৫০০৲ টাকা পরদিন দিয়েও এসেছি।"

"এ্যাডভান্স, মানে বায়না?"

"না, ওর সেই বন্ধু দলিল তৈরীর খরচা হিসেবে নিয়েছে। তবে কথা আছে—জমি কেনার সময়ে এ টাকার হিসেব হবে।"

"তা হলে দলিল রেজেষ্ট্রী হচ্ছে কবে?"

"সেটা কয়েকদিন পরে হবে। সে ভদ্রলোক কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, ফিরে এলেই হবে।"

প্রায় মাস আড়াই পর রাজু গেল তারই এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ী। মামা উকিল আলিপুরে প্র্যাকটিস্ করেন। সেখানে তাঁরই

অফিস-ঘরে বিমলবাবুকে কাগজপত্র নিয়ে আলোচনা করতে দেখে অবাক হয়ে যায় সে।

"কী মামা, ব্যাপার কি? মামলা মনে হচ্ছে!"

"আর ঝামেলার কথা কী বলব! সেই যে জমিটা—সেই হিন্দুস্থান পার্কের জমি—"

"কেন—সেটা হয়নি?

"আর হোলো কোথায়? যার জমি বলে জেনেছিলাম আসলে তার নয়, তার বিক্রীর কোনো ক্ষমতাই নেই। তাই দেখিয়ে কিনা আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ঠকিয়ে নিলে! এমন জোচ্চোর কে জানতো?"

"কেন—আপনার সেই বন্ধু, তিনিও জানতেন না?"

মামা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "জানতো সবই। ও-ও যে এতবড় জুয়াচোর হয়েছে কী করে বুঝব বল? ওরা দু'জনে মিলে-মিশেই তো এ কাজ করেছে। আর শুধু কি আমি? ওদের পাল্লায় আরও অনেকে পড়েছে বলে কোর্ট থেকে খবর পেলাম। জমি চুলোয় যাক্—আমার টাকাটাও যদি ফেরত পেতাম!"

"নালিশ করে আদায় হয় না?"

"সে পথেও অনেক বাধা। ওকে হয়তো কিছুদিন জেল খাটানো যায় কিন্তু টাকাটা গেলই।"

"যাচ্চলে—আমি কোথায় ভাবছি এতদিনে বোধহয় বাড়ীও আপনার উঠে যাচ্ছে, আর এদিকে এই বিভ্রাট!"

"বাস্তবিকই জমি-জমি করে একেবারে হয়রাণ হয়ে গেলাম। এবার ঠিক করেছি আমার নিজের যেটা পছন্দ হবে—কাউকে কিছু না জানিয়েই কিনে নেব। তাতে কারুর অপছন্দ হয়তো হবে। রিটায়ার করে যে টাকাটা পেয়েছি চট্‌পট একটা বাড়ী না করলে সেটা খরচই হয়ে যাবে। কয়েকদিনের মধ্যে যা হোক্ একটা কিনে ফেলব।"

রাজু তারপর দিন কয়েকের মধ্যেই কলকাতার বাইরে অফিসের কাজে চলে যায় এবং বহু জায়গায় অনেকদিন ঘুরোঘুরি করে প্রায় বছর খানেক পর কলকাতায় ফিরে আসে। কয়েকদিন পর মামার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের পর জিজ্ঞেস করলো জমি ও বাড়ীর কথা। "বাড়ী তো নিশ্চয়ই আরম্ভ হয়ে গেছে?"

"নাঃ, হোলো আর কোথায়! দেখেশুনে কিনতে তো হবে,—আর তোর মামীমা ছেলে-মেয়েদের পছন্দ অপছন্দকেও একেবারে উড়িয়ে দিতে তো পারি না। অবশ্য কয়েকটা জমির খোঁজ আছে, দেখে শুনে এরই মধ্যে একটা কিনে নেব।"

রাজু আর কথা বাড়াল না। উঠে পড়তে পড়তে বলে "তাই দেখুন। আপনার বড় ছেলে মাণিকও ততদিনে রিটায়ার হয়ে যাবে। দু'জনের টাকা একত্র হলে আরও বড় জমি কেনা যাবে তা দিয়ে, বাড়ীও বেশ বড়-সড়ই হবে। বাড়ী হলে বরঞ্চ একবার খবর দেবেন মামা, দেখে আসব। অবশ্য যদি তখনও বেঁচে থাকি।"

খলিফা হারুণ অল রশিদের আমন্ত্রণে পণ্ডিত মঙ্ক বোগদাদে যান। হারুণ অল রশিদ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে, মঙ্কের চিকিৎসায় তিনি নিরাময় হন। খলিফা এক আতুরশালা প্রতিষ্ঠা করে মঙ্ককে সেখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। পণ্ডিত মঙ্ক শুশ্রুতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আরবীভাষায় অনুবাদ করেন।

তারপর বহু হিন্দু পণ্ডিত আমন্ত্রিত হয়ে বোগদাদে যান এবং দর্শন, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, বীজগণিত, পাটিগণিত প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। সে ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খৃস্টাব্দের কথা।



মুস্কিল আসান * সুনির্মল বসু

প্রথম দৃশ্য

[মাথায় হাত দিয়ে হরু খুড়ো বারান্দায় বসে বিলাপ করছে।]

হরু। হায়-হায়-হায়
সব যায় যায়।

[ভাগ্নে ঝণ্টু এলো]

ঝণ্টু। কি হয়েছে মামা ?

হরু। হবে আর কি ঝণ্টু, আমার মাথা আর মুণ্ডু—

ঝণ্টু। কেন, হোলো কি মামা ? ব্যাপার কি ? খুলেই বল না।

হরু। জানিস্ তো, আমার অবস্থার কথা, পাকিস্থানে সব খুইয়ে প্রাণটুকু হাতে করে এখানে এসে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছি এই সংসারের জঙ্গলের মধ্যে। সহায় নেই, সম্বল নেই, অনেক কষ্টে হাড়-পাড় করে মা-মরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি—শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে এই সাতগাঁয়ে।

ঝণ্টু। সে তো সুখের কথা মামা—তাতে আর 'হায় হায়' করবার কি আছে?

হরু। শোন-শোন, এখন কি গেরোয় পড়ে গেছি—শুনলে হকচকিয়ে যাবি,—ভিরমি খাবি।

ঝণ্টু। গেরো আবার কি?

হরু। ঠিক ছিল মাধুরীর এই বিয়েতে আসবে মাত্র পাঁচজন বরযাত্রী—

ঝণ্টু। তারপর তারপর—

হরু। হৈ-হৈ করতে করতে হাজির হয়েছে প্রায় পঁচিশজন, ইয়া ষণ্ডা ষণ্ডা গুণ্ডার দল সেই গ্যাঁড়াতলা থেকে। মাত্র পাঁচজনের খাবার ব্যবস্থা করেছি, এখন এই গণ্ডা গণ্ডা অপগণ্ডগুলিকে বুঝ দেই কি দিয়ে। কোথায় টাকা, কোথায় পয়সা, কোথায় খাবার, কোথায় কি? হায়, হায়, সব গেল, সব গেল।

[ভেতর থেকে গোলমাল শোনা গেল। কেউ কেউ চেঁচাচ্ছে "ও মশাই, রাত তো অনেক হোলো, পেট যে চুঁই চুঁই করছে।" কেউ বলছে, "খিদেতে যে নাড়ী টন টন করছে। এবার ব্যবস্থা করুন। বাড়ী ফিরতে হবে অনেকদূর, সেই গ্যাঁড়াতলায়।" কেউ গান গাইছে, "তেরি মেরি সেঁইয়া, লাড্ডু লাগাও ভেঁইয়া।"]

হরু। শুনছ ঝণ্টু, ওদের উল্লাসের বহর, তেরি মেরি সেঁইয়া—ভয়ে যে আমার বুক দুর দুর করছে। ষণ্ডারা না খেতে পেয়ে আমায় ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা না করে। এদিকে গোধূলি লগ্নে বিয়েও প্রায় শেষ হয়ে গেল। ঐ শোন্ শাঁখ বাজছে অন্দরে। এবার ওদের খাওয়াই কি দিয়ে, হায়—হায়—হায়।

ঝণ্টু। আমি দেখছি ঐ খ্যাঁটবাজদের। এক একজনের পেল্লাই ভুঁড়ি দেখলে মনে হয় ব্যাটারা এক-একটি আধমণি কৈলেশ। ঠিক হয়েছে মামা—কুছ্ পরোয়া নেই। বিয়ে তো শেষ হয়ে গেল আর ভয় কি? আমিই সব ব্যবস্থা করছি—তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। এই তে-এঁটেদের খাওয়াবার ভার আমি নিচ্ছি।

হরু। সে কীরে ঝণ্টু—পাঁচজনের খাবার পঁচিশজনকে খাওয়াবি কি করে? মাটি করবি সব। হায় হায় হায়—

ঝণ্টু। ঝণ্টুর মগজের কাছে ঐ গ্যাঁড়াতলার বিটলে ভূতগুলো নেহাৎ বালখিল্য। দাঁড়াও, গোপনে তোমায় বাৎলে দি আমার বুদ্ধিটা। বুদ্ধির প্যাঁচে প্যাঁচে ওসব ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ জব্দ করে দেব। পাঁচজন বলে এলো পঁচিশজন—দাঁড়াও টের পাওয়াচ্ছি মজা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। ছোটলোক কোথাকার!

হরু। কি করবি শুনি? ওরা যে খাওয়ার জন্য হা-পিত্যেশ সুরু করে দিয়েছে—বাপরে বাপ। গেল ইজ্জৎ, গেল মান—হায় হায়, আমার মা-মরা মেয়ে মাধুরীর বরাতে শেষে কিনা এই ছিল!

[আবার ভিতর থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল। "ও মশাই শুনছেন—চটপট খ্যাঁটের বাবস্থা না করলে আমরা কিন্তু ঝটপট উঠে যাব বলে দিচ্ছি।" আর একজন "ইয়ার্কি নাকি, উঠা কি হে, মাইরি নাকি, ইল্লি, তা হবে না; খ্যাঁট সেরে তবে উঠব—যত ইতরোমি, নেমন্তন্ন করে এনে হুজ্জৎ করা—ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—ক্ষিদে পেয়েছে, এক্ষুনি খাবার চাই। ধাপ্পাবাজিতে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়।"

হরু। (কাঁদো কাঁদো সুরে) শুনেছিস্ ঝণ্টু—হায় হায় হায়—

ঝণ্টু। (ভেতরের ঘরের উদ্দেশ্যে) মশাইরা, একটু সবুর করুন, এই ঠাঁই হলো বলে। খাবার-দাবার সব প্রস্তুত। (আস্তে) এই মামা—তোমার গোয়ালে সেই নতুন কেনা দুরন্ত খ্যাপা গরুটা আছে তো?

হরু। তাতো আছে, কিন্তু তা দিয়ে কি হবে এখন?

ঝণ্টু। হবে, হবে মামা, ওই তো আমার অস্তর। পাঁচজনের জন্যে খাবার-টাবার যা করেছে তাই প্রথমে বেড়ে দাও ওই পঁচিশজনকে। খেতে সুরু করুক ওরা। প্রথমে পাতে দাও দু'খানা করে লুচি, কিছু তরকারী, তারপর—

হরু। তারপর কি?

ঝণ্টু। তারপর যেই মৌজ করে ব্যাটারা খাওয়া আরম্ভ করবে অমনি আমি তাদের খাওয়ার জায়গায় ছেড়ে দেব তোমার সেই দুরন্ত গরুটা। পিঠে দু' ঘা লাগলেই গরুটা তিড়িংমিড়িং লাফাবে আর শিং নেড়ে ওদের গুতোতে যাবে। হি-হি-হি মামা, তারপর দেখবে মজাটা। তোমার

সব বিপদ কেটে যাবে। যাহা মুশকিল তাঁহা আসান। যাও তুমি চটপট পঁচিশটা জায়গা করে দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় মেয়ে জামাইকে ছাদ্‌নাতলা থেকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মেয়ে জামাইয়ের মাথায় টোপর। শাঁখ বাজানো হচ্ছে, মেয়েরা উলুধ্বনি করছে। মেয়ের বাবা হরু মামা উপস্থিত।]

হরু। যাক, ভালয় ভালয় বিয়েটা তো চুকলো। এইবার ঠ্যালার নাম বাবাজি। ঝণ্টু—ও ঝণ্টু—

[ছুটতে ছুটতে ঝণ্টু এলো।]

ঝণ্টু। কী মামা?

হরু। বিয়ে তো চুকলো, এইবার?

ঝণ্টু। এইবার আমরাও সব প্রস্তুত। ঠাঁই হয়ে গেছে সেঁইয়া-মেইয়াদের পাঠিয়েছি।

হরু। আমি সটকে পড়ি এইবার?

ঝণ্টু। তুমি সটকাবে কেন? গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো মামা। সটকাবে তো ওই সেঁইয়া-মেইয়ার দল।

তৃতীয় দৃশ্য

[ভিতরে ভীষণ হট্টগোল শোনা যাচ্ছে আর হাম্বা হাম্বা করে একটা গরুর ডাকও শোনা যাচ্ছে। দেখা গেল সেঁইয়া-মেইয়ার দল ছুটে পালাচ্ছে হাত চাটতে চাটতে।

প্রথম জন। ওরে পালারে পালা। ব্যাটা শিং বাগিয়ে যা তেড়ে এসেছে, ভাগ্যিস পালিয়ে এসেছি। পালাতে গিয়ে তিনবার হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, বাপস্—

দ্বিতীয় জন। ভাগ্যিস আমার এমন নধর ভুঁড়িতে শিংয়ের গোঁতা মারেনি। রান্নাটা বেশ জুৎসই হয়েছিল, না ভাই যজ্ঞেশ্বর?

তৃতীয়জন। সবেমাত্র মাছের কালিয়াটা মুখে দিয়েছি অমনি তেড়ে এলো কিনা শিং নেড়ে গরুটা তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে। কালিয়া খেতে খেতে পালিয়ে আসতে হলো।

(হাত চাটতে লাগলো।)

চতুর্থ জন। না, মেয়ের বাবা আয়োজন করেছিল ভালো, গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, তরকারী…

[আবার গরুর হাম্বা হাম্বা আওয়াজ পাওয়া গেল।]

সবাই। পালারে পালা, আবার আসছে এদিকে তেড়ে। ব্যাটা ক্ষেপে গেছে; আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

(সবাই পালাতে লাগল। ঝণ্টু এসে পড়লো।)

ঝণ্টু। আপনারা পালাবেন না– দই আছে, মোণ্ডা আছে, পানতুয়া আছে, রসগোল্লা রাবড়ি—প্রচুর ব্যবস্থা—

(আবার কাছেই হাম্বা হাম্বা আওয়াজ শোনা গেল। তাই শুনে সবাই পিট্টান দিল। আসর খালি।)

ঝণ্টু। (হাসতে হাসতে) ও মামা বিপদ কেটে গেছে। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। এবার গরুটাকে গোপনে আটকাও। হি হি হি! সাত-গেঁয়ের কাছে মামদোবাজি!

যবনিকা

জৈনধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন আদিনাথ। তাঁর পরে তেইশজন সিদ্ধপুরুষ তীর্থঙ্কর এই ধর্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন তাঁদের নাম: ১। আদিনাথ, ২। অজিতনাথ, ৩। সম্ভবনাথ, ৪। অভিনন্দন নাথ, ৫। সুমতিনাথ, ৬। পদ্মপ্রভু, ৭। সুপার্শ্বনাথ, ৮। চন্দ্রপ্রভু, ৯। সুবিধিনাথ, ১০। শীতলনাথ, ১১। শ্রেয়ংসনাথ, ১২। বাসুপূজ্য, ১৩। বিমলানাথ, ১৪। অনন্তনাথ, ১৫। ধর্মনাথ, ১৬। শান্তিনাথ, ১৭। কহ্নুনাথ, ১৮। অবনাথ, ১৯। মল্লিনাথ, ২০। মুনি সুব্রত, ২১। নমিনাথ, ২২। নেমিনাথ, ২৩। পার্শ্বনাথ, ২৪। মহাবীর।

শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ছিলেন বুদ্ধদেবের সমকালীন মানুষ।



বদ্‌রাগী রাজা * শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

এক যে ছিলেন রাজা
সামনে যারে পেতেন তারেই
ধরে দিতেন সাজা।
এমনি ছিলেন বদ্‌রাগী সে রাজা।
হল কি একদিন,
হেঁচকি তুলে বলেন রাজা,
গা কেন ঘিন ঘিন?
হেঁচকি কেন ওঠে?
শুকনো গলা, সাড় কেন নেই জিভে এবং ঠোঁটে?
উজির, নাজির, আমির সবাই আনতে ছোটে হকিম,
আকার টুকুর ভুল করে সব এনে হাজির হাকিম।
হাকিম বলেন, দাঁড়ান দেখি হেঁচকি তোলার আইন,
রাজা হাঁকেন, দাও বেয়াদব তের সিকে ফাইন।
তের সিকেয় পয়সা কত ভেবে হাকিম সারা,
ভেবে ভেবেই গেলেন শেষটা মারা।
হাকিম গেলেন, এলেন এবার বড় গণৎকার,
গুণে বলেন, দেখছি চমৎকার!

আড়াই যামের সাত বিপলে হেঁচকি যদি ওঠে,
রাজার দফা রফা হবে, শহরতলীর ভোটে।
বিষম রাগে ফুলে,
রাজা বলেন, চড়াও ওটায় শূলে।
গণৎকার ত শূলে গেলেন, হেঁচকি থামে কই
সারা দেশে পড়ল হৈ-চৈ।
হেঁচকি নিয়ে বিচার করে দিগ্‌গজেরা সব,
টউন হলে বসল সভা, বিষম কলরব।
অবশেষে কবিরাজ এক এসে ধরেন নাড়ি,
বলেন, দেখি বেজায় বাড়াবাড়ি।
বুঝতে বাকি নেই তবুও কেন ওঠে হেঁচকি,
খেয়েছিলেন রাণীর রাঁধা ছেঁচকি।
রী রী করে ওঠে রাজার গা,
বলেন, মোটেই না।
রাজা হয়ে এতই বুঝি গেছি অধঃপাতে?
ছেঁচকি ত খায় যত হাড় হাবাতে।
যা খায় তাই হজম করে মরে
হতভাগা গরীব উড়ন চড়ে।
পোলাও বিনে পেট ফাঁপে না, কিসের রাজা তবে,
কালিয়া কাবাব খেয়ে যদি বদহজম না হবে।
শুনে ভয়ে যেই কবিরাজ মলতে গেলেন কান,
দেখেন, আগেই গিয়েছে গরদান।
পড়ল ঢেঁড়া হাটের মাঝে, ওঠে রাজার হেঁচকি,
ঘুমিয়ে আছে দেশ কি?
জলদি এসে যে পার সে থামাও।
হয় বখশিষ নাও নইলে জানটা দিয়ে যাও।
রাজার যত হেঁচকি ওঠে, দেশে লাগে মড়ক।
তৈরী হল মশান যাওয়ার চওড়া পাকা সড়ক।
কত এল দেশ-বিদেশের গুণী, রোজা ওঝা।
নামিয়ে গেল শুধু মাথার বোঝা।

জড়ি বুটি খাওয়ায় কেউ বা, কেউ বা করে মালিশ,
শোওয়ায় বসায় নানাভাবে, পেটে-পিঠে বালিশ,
জল খাওয়াল ঘড়া ঘড়া, জালা জালা ঘোল,
ফুলে রাজার পেটটি হল ঢোল।
হেঁচকি তবু ওঠে,
দেশে বুঝি জন-মানুষ রইল না আর মোটে।
সবার শেষে এল হেসে ডানপিটে এক ছেলে,
বলে, পারি রোগ সারাতে খেংরাকাঠি পেলে।
খেংরাকাঠি নিয়ে রাজার নোংরা নাকে পুরি,
যেমনি সে না দিয়েছে সুড়সুড়ি,
বাজের মত পড়ল বিষম হাঁচি।
রাজার ভুঁড়ি ফেসে গেল, শুনে আমরা বাঁচি।





প্রফেসর পোকাহোণ্টাস * শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)

হৈ-হৈ ব্যাপার! রৈ-রৈ কাণ্ড! এক হপ্তা ধরে ন্যাশন্যাল থিয়েটার হলে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস, দিনে দু'বার করে। প্রত্যেক বারই হলের ভেতরে বাইরে লোকে লোকারণ্য। এমন অদ্ভুত ম্যাজিশিয়ান নাকি এদিকে আর কখনো আসেন নি। যেমন তাঁর চেহারা তেম্নি অদ্ভুত সাজসজ্জা, তেম্নি জমকালো আসবাবপত্র। নানা রকম বিচিত্র পোষাকে ডজন দু'য়েক সহকারী আর সহকারিণী। শুধু তাই নয়, নিজের কনসার্ট পার্টিও আছে প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের। তাতে রয়েছে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতের—এমন কি বিভিন্ন যুগেরও—অগুণতি রকম বাজনা।

প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের খেলাগুলো যেমন রহস্যময়, প্রফেসর নিজেও তেম্নি। কোথায় তাঁর আদিনিবাস কেউ জানে না ; কেউ বলে কাম্‌স্‌কাটকা, কেউ বলে দক্ষিণ আমেরিকা, কেউ বলে মিশর, কেউ বলে হনলুলু। কেউ কেউ আবিসিনিয়াও যে বলে না তাও নয়। যেসব পোষাক পরে তিনি স্টেজে খেলা দেখান সেগুলো এত বিভিন্ন আর এত বিচিত্র রকমের যে তা থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই।

প্রফেসর হোঁদারামের অ্যাসিস্টান্ট অর্থাৎ সহকারী রামকাঠি বললে, "যারা দেখেছে তারা সবাই বলছে, এমন সব আশ্চর্য তাক্ লাগানো ব্যাপার, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। চলুন না দাদা, একদিন, প্রফেসরকে নিয়ে। আপনি বললেই উনি যেতে রাজি হবেন।"

বললাম। প্রফেসর হোঁদারাম তখন তাঁর ল্যাবরেটরিতে, অর্থাৎ গবেষণা মন্দিরে বসে গবেষণা করছিলেন কি করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে খুসি মতো কমানো-বাড়ানো যায়। ফুলস্ক্যাপ কাগজে নানা রকম নক্শা এঁকে নানা রকম ফরমুলার অঙ্ক তাঁকে কষতে হচ্ছিল এই গবেষণার জন্যে। আমায় দেখেই খুশী হয়ে বলে উঠলেন, "আজ অনেকখানি এগিয়েছি, ধনুদা। এভাবে এগুতে পারলে মাসখানেকের ভেতরই মাধ্যাকর্ষণকে একেবারে তুলো ধুনে ছেড়ে দেবো দেখবেন।"

আমি বললাম, "তার আগে চলুন একবার প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের ম্যাজিক দেখে আসি ন্যাশন্যাল থিয়েটার হলে। রামকাঠি বলছিল অতি চমৎকার, অতি আশ্চর্য।"

প্রফেসর হোঁদারাম বললেন, "আপনি যখন বলছেন, তখন চলুন একদিন যাওয়া যাক। আপনি, আমি, রামকাঠি আর বড়মামা।"

মস্ত উকীল বৈকুণ্ঠ বটব্যালকে রাজী করানো গেল। ভাগনে হোঁদারামের যে কোনো অবদার রাখতে রাজী তিনি। বললেন, "অনুরোধটা মন্দ করো নি। সেই কবে যাদুকর গণপতি আর রাজা বোসের ম্যাজিক দেখেছি—তখনো অবশ্য এত বড় উকীল হই নি—তারপর আর কোনো ম্যাজিশিয়ানের চেহারাও দেখিনি আজ পর্যন্ত। কি পোকা বললে যেন?"

"পোকাহোণ্টাস। প্রফেসর পোকাহোণ্টাস।"

সন্ধ্যা ছ'টার টিকিট কাটা হলো—পনেরো টাকার চারখানা, প্রথম সারির মাঝামাঝি।

একটু আগেই গিয়ে আমাদের আসন দখল করে বসলাম আমরা চারজন। প্রথমে বড়মামা, তারপর আমি, তারপর প্রফেসর হোঁদারাম, তারপর রামকাঠি। সমস্ত হলে চোখ বুলিয়ে দেখলাম একটি আসনও খালি নেই।

উর্দি পরা আর্দালী গোছের একটি লোক দামী আর্ট পেপারে ছাপা অনুষ্ঠান-সূচী অর্থাৎ প্রোগ্রাম পুস্তিকা বিক্রী করে গেল। দাম এক টাকা। মলাটের ওপর পাঁচরঙে ছাপা প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের ছবি। তাতে

কোনোটিতে প্রফেসর পোকাহোণ্টাস চোখ বাঁধা অবস্থায় ভিড়-জমা বড় রাস্তায় স্কুটার চালাচ্ছেন, কোনটিতে স্টেজের ওপর থেকে একটি গাধাকে অদৃশ্য করবার তোড়জোড় করছেন, কোনোটিতে খালি ঠোঙা থেকে খরগোস বার করছেন, কোনোটিতে···এম্নি সব আরো অনেক ছবি। প্রোগ্রাম পুস্তিকার একেবারে মাঝখানে পাশাপাশি দু'পৃষ্ঠা জোড়া খেলার ফর্দ, যে খেলাগুলো আজকে দেখানো হবে।

খেলার ফর্দ দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রফেসর হোঁদারাম বলে উঠলেন, "ধনুদা, দেখেছেন? এই দেখুন।" বলে আঙুল দিয়ে দেখালেন আমাকে একটি খেলার নাম আর বর্ণনা। পড়ে দেখলাম—"দি গ্রেট লেভিটেশন অ্যাক্ট। প্রফেসর পোকাহোণ্টাস ডিফাইজ গ্র্যাভিটেশন!!" তার মানে—শূন্যে ভাসবার খেলা, যাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে 'ডিফাই' করবেন, অর্থাৎ বুড়ো আঙুল দেখাবেন মহাযাদুকর প্রফেসর পোকাহোণ্টাস!!

ভাগনের উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন না উকীল বৈকুণ্ঠ বটব্যাল। তিনি আইন সংক্রান্ত একখানা পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন—ম্যাজিক দেখার ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পাবেন তার সদ্ব্যবহার করবার জন্য। সেই পত্রিকাটিই তিনি মশগুল হয়ে পড়ছিলেন, অন্য কোনো দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না।

আমি বললাম, "দেখলাম। কিন্তু আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?"

প্রফেসর হোঁদারাম বললেন, "হবো না? আপনি বলছেন কি ধনুদা? আমার দফা সেরে দিলে, গবেষণার একেবারে গোড়া মেরে দিলে পোকাহোণ্টাস!"

"কি রকম?"

"ভেবেছিলুম মাধ্যাকর্ষণকে আমিই প্রথম ডিফাই অর্থাৎ অগ্রাহ্য করব, কিন্তু এ দেখি আমার আগেই ডিফাই করে বসে আছে।"

এইবার পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। মাধ্যাকর্ষণ বিজয়ের বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রথম আবিষ্কারের গৌরবটা হাতছাড়া হয়ে গেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে প্রফেসর পোকাহোণ্টাস, এই মহাদুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে প্রফেসর হোঁদারামের।

"আমার অ্যাদ্দিনের এত গবেষণা, রাতজাগা, হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ, এত অ্যাল্‌জেব্রা, জিওমেট্রি, অ্যারিথমেটিক—সব জলে গেল ধনুদা! জীবন আমার বিফলে গেল।" কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বললেন প্রফেসর হোঁদারাম।

আমি অভয় দিয়ে বললাম, "অনর্থক আগাম মন খারাপ করবেন না প্রফেসর। আগে দেখেই নিন না ব্যাপারটা।"

ছ'টা বেজে আধ সেকেণ্ড হবার সঙ্গেই সঙ্গেই স্টেজের ওপরকার পর্দা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে গেল। দেখা গেল স্টেজের ওপরটা একেবারে ফাঁকা। হলের সবগুলো আলো নিভে গেছে, আলো রয়েছে শুধু স্টেজের ওপর। আর স্টেজের আড়াল থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত রকমের গা-ছম্‌ছম্ করানো আবহ সংগীত অথবা আওয়াজ। সে আওয়াজ লিখে বোঝানো অসম্ভব। তবু লিখতে হলে লিখতে হয় ও—ও—ও—উ—উ—উ উম্ ম্ ম্...ও—ও—ও—উ—উ—উ—উম্-ম্ ম্...। হল ভরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে উদগ্রীব উৎকর্ণ। হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্টেজের ঠিক মাঝখানে চোখের পলকে দেখা গেল যেখানে ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন......

অন্তরীক্ষ থেকে দৈববাণীর মতো গম্‌গমানো আওয়াজ ঘোষণা শোনা গেল :

"প্রফেসর পোকাহোণ্টাস!"

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল যেন। আশ্চর্য কায়দায় শূন্যে দু'হাত তুলিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন পোকাহোণ্টাস। মাথা তুলে ডান হাত বাড়াতেই কোথা থেকে তাঁর হাতে এসে পড়ল একটা যাদুলাঠি, ম্যাজিশিয়ানরা যাকে বলেন ম্যাজিক ওয়াণ্ড।

এইবার হলের আলোগুলোও জ্বলে উঠল। খেলা শুরু করলেন যাদুকর পোকাহোণ্টাস। কথা কইতে লাগলেন প্রায় আস্ত ইংরিজীতে, আধ হিন্দীতে আর সিকির চেয়েও কম বাংলায়। হল শুদ্ধ সবাই যেন তাঁর সব কথা গোগ্রাসে গিলছে। আদালতে কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে বাজীমাৎ-করা মহা-উকীল বৈকুণ্ঠ বটব্যাল বললেন, "লোকটা খাসা বলে হে ধনপতি। যেমন হাত সাফাই, তেম্নি মুখ সাফাই। সাবাস! সাবাস! গণপতি আর রাজা বোসের পর এমনটি আর দেখি নি।"

"আপনারা অনেক ম্যাজিশিয়ানকে দেখেছেন খালি টুপি থেকে আস্ত খরগোস বার করতে।" বললেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। "আমি বার করব আস্ত খরগোস থেকে খালি টুপি। আমাকে কেউ একটা আস্ত খরগোস ধার দিতে পারেন?"

হল্ শুদ্ধ সবই নিস্তব্ধ। কারও কাছে আস্ত খরগোস নেই। সবাইকে আচ্ছা জব্দ করেছেন পোকাহোণ্টাস।

হঠাৎ রামকাঠির দিকে তাকালেন যাদুকর। একে তো রামকাঠির যে চেহারা, তাতে হাজার লোকের ভিড়ের ভেতর থেকেও তাকে খুঁজে নেওয়া যায়; তার ওপর সে আজ যে নতুন ডিজাইনের জামা পরে এসেছিল, তাতে প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের নজর আটকে যাওয়া স্বাভাবিক। জামাটা দর্জির তৈরী, কিন্তু ডিজাইনটা রামকাঠির। "দয়া করে একবার স্টেজের ওপর পদার্পণ করবেন কি?" পোকাহোণ্টাস বললেন রামকাঠিকে। চেয়ে দেখি রামকাঠির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। হল্ শুদ্ধ এতগুলো লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে? সর্বনাশ!

কিন্তু স্টেজে উঠতে হ'ল না রামকাঠিকে। ঝপাং করে স্টেজ থেকে রামকাঠির সামনে লাফিয়ে পড়লেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস; বললেন, "আপনার পকেটে খরগোস আছে?"

ভালো ছেলের মতো দাঁড়িয়ে উঠে রামকাঠি বললে, "খরগোস, স্যার আমার পকেটে একদম নেই। কখনো থাকেও না।"

প্রফেসর পোকাহোণ্টাস হেসে বললেন, "যদি পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সেটা আমার সম্পত্তি হয়ে যাবে। রাজী?"

রামকাঠি মাথা নেড়ে বললে, "রাজী।"

ম্যাজিশিয়ান পোকাহোণ্টাস তখন রামকাঠির বিচিত্র ডিজাইনের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা আস্ত খরগোসের বাচ্চা বার করে দেখালেন। হল ভরে গেল হাততালিতে।

খরগোস নিয়ে স্টেজে উঠে গেলেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। তারপর খরগোসের কানে হাত দিয়ে, মনে হলো, যেন কানের ভেতর থেকেই এক টানে বার করে আনলেন একটা পুরো সাইজের আস্ত টুপী। আবার হাততালি।

টুপীটাকে একটু টানতেই বড় হয়ে গেল। টুপীর ভেতর খরগোসটাকে রেখে দিয়ে তারপর টুপী থেকে সেটাকে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেবার ভান করতেই দেখা গেল, এ কি, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আস্ত খরগোসটা! তারপর টুপীটাকেও আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেবার ভান করে অদৃশ্য করে দিলেন পোকাহোণ্টাস। এম্নি আশ্চর্য খেলার পর খেলা দেখিয়ে

আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন তিনি। রামকাঠির চক্ষু ছানাবড়া। উকীল বৈকুণ্ঠ বটব্যালও বলতে লাগলেন, "বলিহারি! বলিহারি! যাদুকর গণপতির পর এমনটি আর দেখি নি।" এরপর আরো চমক লাগানো খেলা একটির পর একটি দেখতে দেখতে প্রফেসর হোঁদারাম উদগ্রীব হয়ে রইলেন, সেই মাধ্যাকর্ষণকে তুড়ি মারার খেলাটা কখন স্বরু হবে।

সেই খেলা স্বরু হলো মধ্য-বিরতি অর্থাৎ ইণ্টারভ্যালের পরে।

"অ্যাণ্ড নাউ, লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আই বেগ টু প্রেজেণ্ট দি গ্রেট লেভিটেশন অ্যাক্ট। সী হাউ ম্যাজিক ক্যান ডিফাই গ্র্যাভিটেশন।" বললেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। তারপর ভাঙা বাংলায় বুঝিয়ে বললেন, "এইবারে আপনাদের দেখাব মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ম্যাজিকের শক্তির কাছে কেমন করে আমি হার মানাব। আমি এই যে খেলা আপনাদের দেখাব এ খেলা আর কেউ আপনাদের দেখাতে পারে নি।"

এইবারে চেয়ারে শক্ত হয়ে বসলেন প্রফেসর হোঁদারাম। পোকাহোণ্টাসের প্রতিটি নড়াচড়া দু'চোখ দিয়ে গিলতে লাগলেন। একেবারে ফাঁকা স্টেজ, এক ফোঁটা আসবাব নেই। সেই স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রফেসর পোকাহোণ্টাস ডান পা শূন্যে তুলে শুধু বাঁ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বাঁ পাটাও মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে শূন্যে নিশ্চল হয়ে রইলেন তিনি, তারপর ধীরে ধীরে পা নামিয়ে নিয়ে স্টেজের ওপর দাঁড়ালেন। হল্ শুদ্ধ সবাই বিস্ময়ে অবাক, হাততালি দেবার মত ক্ষমতাও যেন কারও অবশিষ্ট নেই। এবপর আরো অদ্ভুত। মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে পা দু'টো একসঙ্গে পিছন দিকে তুলে দিলেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। স্টেজের সমতল থেকে হাত তিনেক উঁচুতে স্টেজের সমান্তরালভাবে হাওয়ায় ভেসে রইল তাঁর দেহ। অলৌকিক ব্যাপার। চটাপট হাততালি পড়ল। বড়মামা বৈকুণ্ঠ বটব্যাল বললেন, "এ যে জেনুইন মিরাকল,—একেবারে সত্যিকারের যাদু! সেকালের যাদু সম্রাট গণপতিকেও হার মানিয়ে দিলে!"

৺গণপতিকে হার মানিয়েছেন পোকাহোণ্টাস, সেটা বড় কথা নয়। প্রফেসর হোঁদারামের মনে হতে লাগল, প্রফেসর পোকাহোণ্টাস তাঁর দুটি গালে চড় মেরেছেন।

ডজন দেড়েক ভঙ্গীতে শূন্যে ভেসে থেকে মাধ্যাকর্ষণকে তুড়ি মেরে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন পোকাহোণ্টাস, এমন সময় চেয়ার ছেড়ে

উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর হোঁদারাম। বললেন, "দয়া করে এখানে একবার আসবেন প্রফেসর?"

স্টেজ থেকে নেমে এসে প্রফেসর হোঁদারামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রফেসর পোকাহোণ্টাস বললেন, "বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য?"

"এখানে একবার মাধ্যাকর্ষণকে দয়া করে তুড়ি মারুন।" গম্ভীরভাবে বললেন প্রফেসর হোঁদারাম। শুনে পোকাহোণ্টাসের ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠল এক মুহূর্তে, কোণঠাসা হওয়ার অপমানে—রাগে। প্রফেসর হোঁদারামের এ চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু হাজার হোক পেশাদার যাদুকর সহজে জব্দ হবার পাত্র নন। এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে বুঝিয়ে দিলেন স্টেজের ভেতর অল্প জায়গায় বাতাসকে তিনি যত ঘন করতে পেরেছেন এখানকার হালকা বাতাসকে তেমন করা যাবে না, সুতরাং এখানে তিনি এখন সফল হবেন না।

"আরো কিছুদিন পর যখন হাওয়ার চাপ বদলানো আমার আরো ভাল রকম রপ্ত হবে, তখন এখানেও ঠিক ঐ জিনিস করে আপনাদের দেখাতে পারব।" বললেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস।

প্রফেসর হোঁদারামও যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, "বেশ, আমি স্টেজে উঠছি। স্টেজে আমায় আপনি শূন্যে ভাসাতে পারবেন?"

এ আবার আরেক চ্যালেঞ্জ। সমস্ত হল নিস্তব্ধ। মাত্র কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। তারপর বললেন, "পারব, আসুন আপনি।" বলে উঠে গেলেন স্টেজে। উঠে আবার বললেন, "আসুন।"

রামকাঠি ভয় পেয়ে বললে, "আপনি যাবেন না প্রফেসর! চটেছে পোকাহোণ্টাস। কে জানে শেষকালে—"

প্রফেসর হোঁদারামের তখন জেদ চেপে গেছে। তিনি বললেন, "আলবৎ যাবো। থোড়াই কেয়ার করি পোকাহোণ্টাসকে।" বলে স্টেজের ওপর উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন পোকাহোণ্টাসের মুখোমুখি।

স্টেজের সামনে একটা মাইক্রোফোন ছিল। প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের সঙ্গে কি সব কথা কয়ে তারপর মাইক্রোফোনের সামনে এসে তিনি হলের সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাগণ! আমি প্রফেসর হোঁদারাম।"

নামটা শুনেই জোর হাততালি পড়ল। বোঝা গেল প্রফেসর হোঁদারামকে স্টেজে দেখে সবাই বড় খুসী হয়েছেন।

"আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে বিনা প্ররোচনায়" হোঁদারাম বলতে লাগলেন, "এ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছি সম্পূর্ণ আমার নিজের দায়িত্বে। অপ্রিয় কিছু ঘটলে সে জন্য প্রফেসর পোকাহোণ্টাস দায়ী হবেন না।"

রামকাঠি, দেখলাম, ভয়ে যেন কাঁপতে স্বরু করে দিয়েছে। আমার কানে কানে সে আস্তে আস্তে বললে, "ব্যা-ব্যা-ব্যাপারটা সু-সু-সুবিদে লা-লা-লাগছে না, ধনুদা!"

খট্‌কা আমার মনেও একটুও লাগলেও ভয়ানক যে কিছু একটা ঘটবে তা আমার মনে হলো না। ভাবলাম প্রফেসর হোঁদারামকে নিয়ে প্রফেসর পোকাহোণ্টাস একটু ম্যাজিশিয়ানী রগড় করবেন মাত্র। তাতে কারও গায়ে ফোস্কা পড়বে না, বরং একটু হেসে হাল্‌কা হওয়া যাবে। কিন্তু এর পরে যা ঘটবে সে জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বৈকুণ্ঠ বটব্যাল উকীল মানুষ। আইনের দিক্‌টাই তাঁর নজরে পড়ল সবার আগে। তিনি বললেন, "ও হে ধনপতি! ঐ যে হোঁদারামকে দিয়ে অতগুলো লোকের সাম্নে কবুল করিয়ে নিলে অঘটন কিছু ঘটলে পোকাহোণ্টাসের এক ফোঁটা দায়িত্ব নেই, সব দায়িত্ব হোঁদারামের,—ওটা একটু কেমন-কেমন লাগছে না?"

আমি বললাম, "ও সব হচ্ছে ম্যাজিশিয়ানী তামাসা। আপনি কিছু ভাববেন না মামাবাবু!"

মামাবাবু আর কিছু বললেন না বটে, কিন্তু যে ভাবে তিনি হাতের আইন-পত্রিকাখানা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তা দেখে মনে হলো তিনি একটু ভাবিত হয়েছেন।

"হিপ্‌নোটাইজ করে আপনার শরীর হাল্‌কা করে দিতে হবে প্রফেসর!" বললেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। "সে সময় আলোর চোট লেগে আপনার চোখের লোকসান হতে পারে, তাই এই কালো রুমাল দিয়ে আপনার চোখ বেঁধে দেবো। তারপর এই চাদরখানা দিয়ে আপনাকে ঢেকে দেবো। আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি, প্রফেসর?"

ভয় বোধ হয় একটু পেয়েছিলেন হোঁদারাম। কিন্তু মুখে তিনি সেটা

স্বীকার করলেন না। হোঁদারামের চোখ কালো রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন পোকাহোণ্টাস। তারপর একটা বড় চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তাজ্জব ব্যাপার!! স্টেজের মেঝের ওপর পড়ে গেল চাদরখানা। মুহূর্তের ভেতর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন প্রফেসর হোঁদারাম!!!

চাদরখানা তুলে ঝেড়ে-টেড়ে দেখলেন আর দেখালেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস। প্রফেসর হোঁদারাম নেই। আশ্চর্য, ভুতুড়ে ব্যাপার! দেখে অনেকে হাততালি দিয়ে উঠলেন হলের ভেতর। এ খেলা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অপ্রত্যাশিত। এ জিনিস আগে কখনো দেখান নি প্রফেসর পোকাহোণ্টাস।

প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের মুখ দেখে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এ ব্যাপারটা তাঁর কাছেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। চলতি ভাষায় তিনিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন।

রামকাঠি বললে, "এখন কি উপায় হবে ধনুদা? তখনি প্রফেসরকে বলেছিলুম যাবেন না, মতলব ভালো নয় পোকাহোণ্টাসের।"

উকীল বড়মামা চিন্তা করছিলেন এ ব্যাপারের আইনগত দিকটা। তিনি আমাকে বললেন, "ব্যাপারটা বড় জটিল হয়ে উঠল। পোকাহোণ্টাসের কাছে যদি হোঁদারামের ফেরৎ দাবী করে আদালতে নালিশ করি, সে দাবী আইনে টিকবে কি? মোকদ্দমার ইতিহাসে এ ধরণের কোনো নজিরও নেই।"

রামকাঠি বললে, "আমরা মানহানির মামলা করতে পারি না, ধনুদা?"

মামাবাবু বললেন, "প্রাণ নিয়ে প্রশ্ন, তুমি বলছ মানহানির মামলা! তুমি দেখছি আচ্ছা ইয়ে হে রামকাঠি!"

ভুল শুধরে রামকাঠি বললে, "তাহলে প্রাণহানির মামলাই করব মামাবাবু!"

"কিন্তু প্রাণহানির প্রমাণ কোথায় হে রামকাঠি?" বললেন উকীল মামাবাবু। "যা খুশি বললেই তো আর আদালত তা মেনে নেবে না। প্রাণহানির দেহ কোথায়?"

তারপর বললেন, "তা ছাড়া হল-ভরা এতগুলো লোককে সাক্ষী মানবে পোকাহোণ্টাস। এরা সবাই একবাক্যে বলবে হোঁদারাম নিজের মুখে সমস্ত দায়িত্ব আগাম নিজের ঘাড়ে নিয়ে সব দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে গেছে

পোকাহোণ্টাসকে। ঘোড়েল ছেলে এই ম্যাজিশিয়ান ; তাকে আটকাবো কি দিয়ে ?"

রামকাঠি বললে, "পোকাহোণ্টাসই তো আমাদের সকলের চোখের সামনে উড়িয়ে দিলে প্রফেসরকে। সবাই সাক্ষী দেবে।"

"কিন্তু পোকাহোণ্টাস যদি তা অস্বীকার করে ? যদি বলে হোঁদারাম নিজেই উড়ে গেছে ?"—বললেন বড়মামা বৈকুণ্ঠ বটব্যাল।

এমন সময় স্টেজের নেপথ্য থেকে এসে একটা লোক—দলের লোকই হবে বোধ হয়—কানে কানে কি যেন বললে, প্রফেসর পোকাহোণ্টাস মাথা নাড়লেন বার দুয়েক। লোকটা চলে গেল।

প্রফেসর পোকাহোণ্টাস বললেন, "লেডিস আণ্ড জেণ্টল্‌মেন, এইবার আমাদের পরবর্তী খেলা—"

কথাটা শেষ করতে পারলেন না পোকাহোণ্টাস। বৈকুণ্ঠ বটব্যাল উকীল হলেও মামাও তো বটেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হোয়াট, হোয়াট, হোয়াট! হোয়্যার ইজ প্রফেসর হোঁদারাম ? হোঁদারাম কোথায় ?"

প্রফেসর পোকাহোণ্টাস বললেন, "আমি ভুলে ওঁকে একটু বেশী হিপনোটাইজ করে ফেলেছিলাম, উনি তাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। খবর পেয়েছি তিনি হাওয়া থেকে শীগগীরই আবার আগেকার মতো শরীরে ফিরে আসছেন। আপনারা এইখানেই তাঁকে আবার দেখতে পাবেন কিছুক্ষণ পরে।"

শুনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। একটু আগে ঐ লোকটা বোধ হয় প্রফেসর পোকাহোণ্টাসের কানে হোঁদারামের খবরই দিয়ে গেছে। এরপরের দু'টো-তিনটে খেলা আমরা দেখলাম ধৈর্য ধরে। মনে উদ্বেগ যে একেবারে ছিল না তা নয়।

তারপর দেখা গেল ফাঁকা স্টেজের মাঝখানে সেই চাদরটা বিছিয়ে দিলেন প্রফেসর পোকাহোণ্টাস আর কয়েকবার পায়চারি করলেন সেই চাদরের ওপর। খানিক বাদে তিনি চাদরটা তুলে নিলেন দু'হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল স্টেজের মাঝখানে বসে আছেন প্রফেসর হোঁদারাম ঠিক যেমন হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন চোখে কালো রুমাল বাঁধা অবস্থায়। সেই রুমালটি তাঁর চোখে তখনও তেমনি বাঁধা।

"রুমালটা চোখ থেকে খুলে এগিয়ে আসুন প্রফেসর হোঁদারাম!"

চোখের বাঁধন খুলে ফেলে এগিয়ে এলেন প্রফেসর হোঁদারাম। জোর. হাততালি। সে হাততালিতে আমরা তিনজনও যোগ দিলাম। রামকাঠির দিকে তাকিয়ে মনে হলো তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে।

তারপর বাকী আধঘণ্টার খেলা আমরা চারজনে মিলে দেখলাম। আর এরি মধ্যে এ ব্যাপারের দরুণ বেশ একটু নামও হয়ে গেছে প্রফেসর হোঁদারামের।

খেলার শেষে ফিরবার পথে গাড়ীতে বড়মামা শুধালেন, "তুমি আবার ম্যাজিক শিখলে কবে হোঁদারাম? হঠাৎ অমন রহস্যময় অন্তর্ধান করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিলে কি করে?"

হোঁদারাম বললেন, "ম্যাজিক-ফ্যাজিক কিছু নয় মামা! চোখ তো পোকাহোণ্টাস রুমাল বেঁধে দিলে। তারপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেবার সময় যাই একটু পিছিয়েছি, অমনি মনে হল পায়ের নীচ থেকে যেন তক্তা সরে গেল, আমি ঝপাং করে নীচে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস নীচে পুরু গদী ছিল, তাই হাত-পা ভাঙে নি। কিন্তু বেশ একটু ঝাঁকুনি লেগেছিল। পোকাহোণ্টাসের দলে গা মাসাজ করবার পাকা লোক, ভাগ্যিস, ছিল। মাসাজ করে মিনিট পনেরোর ভেতর বেশ আরাম দিলে আমাকে বড়মামা!"

বৈকুণ্ঠ মামা বললেন, "স্টেজের নীচে তাহলে একটা ঘর আছে বলো, স্টেজের ওপরকার ঝাঁপ দরজা দিয়ে যাতে নেমে যাওয়া যায়?"

হোঁদারাম বললেন, "হ্যাঁ মামা! পোকাহোণ্টাসের ঐ তলার ঘরের অ্যাসিষ্টাণ্টরা তলার দিকে ঝাঁপ দরজাটা ঠিকমতো আটকে দিতে ভুলে গিয়েছিল। আমি নীচে পড়ে যেতেই খেয়াল হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিলে।"

বৈকুণ্ঠ বটব্যাল বললেন, "এ দেখছি ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে, সেই অবস্থা হলো। হলো অ্যাকসিডেণ্ট, আর সবাই ভাবলে এ এক নতুন ম্যাজিক।"

রামকাঠি বললে, "হঠাৎ অদৃশ্য হলেন, না জেনে ফাঁদে পা দিয়ে স্টেজের তলায় চলে গিয়ে। কিন্তু ফাঁকা স্টেজের মাঝখানে অমন হঠাৎ আবির্ভাব হলেন কি করে?"

প্রফেসর হোঁদারাম বললেন, "তা ঠিক বোঝাতে পারব না রামকাঠি।

কিন্তু মনে হল ওরা আমার চোখে রুমাল বেঁধে বসিয়ে যেন ঠেলে আমায় ওপর দিকে তুলে দিল।"

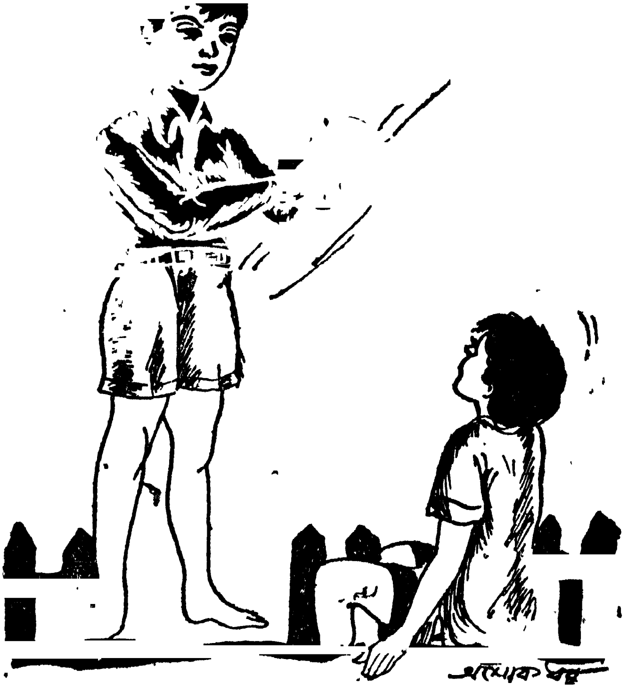
"ম্যাজিক তাহলে আগাগোড়া ফাঁকি, আগাগোড়া ধাপ্পা! কি বলো?" বললেন বৈকুণ্ঠ বটব্যাল। "চুরি বিদ্যার মতোই এও এক বড় বিদ্যা, যতক্ষণ না পড়ে ধরা?"

রামকাঠি বললে, "তাহলে ঐ যে প্রফেসর পোকাহোণ্টাস মাধ্যাকর্ষণকে চাঁটি মারলেন, তার ভেতরও ফাঁকি আছে?"

প্রফেসর হোঁদারাম ভারি খুশী পোকাহোণ্টাসের ম্যাজিকে ফাঁকি আছে জেনে। বললেন, "কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় আমার গবেষণা যদি সার্থক হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণকে জব্দ করবার যে কায়দা বার করব তাতে এক ফোঁটা ফাঁকি থাকবে না।"

রামকাঠি বললে, "সে কথা একশ' বার। আপনিও প্রফেসর, পোকাহোণ্টাসও প্রফেসর, কিন্তু দুই প্রফেসরে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ!"

তিব্বতের রাজা শ্রোণ-সান-গাম-পো এক সন্ন্যাসীদলকে ভারতে পাঠালেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষু সম্ভোত ষোল জন শিষ্য নিয়ে এদেশে এলেন। ভালমত সংস্কৃত ভাষা শিখে তিনি দেশে ফিরে যান। সেখানে সংস্কৃত অক্ষর থেকে তিনি তিব্বতী বর্ণমালা তৈরী করেন, ব্যাকরণও লেখেন। সেই থেকে তিব্বতে লিখিত ভাষার সূত্রপাত হলো।



ভীরু কাপুরুষ * শ্রী আশাপূর্ণা দেবী

'বাবা এত টাকা নষ্ট করে কেন যে এত বড় একটা বাড়ী বানাচ্ছেন!' ধ্রুব বলল দুঃখু দুঃখু মুখে, 'এর থেকে বাবা যদি একটা রেলগাড়ী বানিয়ে নিতেন।'

শুভো চোখ ড্যাবা করে বলে উঠল, 'বাড়ীর বদলে রেলগাড়ী? রেলগাড়ীতে থাকতাম আমরা?'

ধ্রুব জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়! থাকবার পক্ষে ওর থেকে ভাল জায়গা আর কি আছে শুনি? ওতে থাকতে পাচ্ছিস তুই, আবার দৌড় দিয়ে দিয়ে কাঁহা কাঁহা দেশে চলেও যাচ্ছিস! ঘরে বসে পৃথিবী দেখছিস?'

'কিন্তু দাদা', শুভো সন্তর্পণে বলে, 'রোজ রোজ কি রেলগাড়ীতে থাকা যায়?'

'যায় না?' ধ্রুব এই মুখ্যু গাধা ছোট ভাইটার ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠে বলে, 'কেন যায় না শুনি? কী নেই রেলগাড়ীতে? শোবার

জায়গা নেই? বসবার জায়গা নেই? চান করবার জায়গা নেই? আলো নেই? পাখা নেই? আর্শি নেই? কী নেইটা কি তাই শুনি? একেবারে নিজেদের একলার জন্যে নিজেরা যদি একটা তৈরি করে নেওয়া হয়, অন্য লোক উঠে পড়ে তো ভিড় করবে না? রোজ রোজ তো টিকিট কাটতে হবে না?'

শুভো তবুও, অসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু রেলগাড়ী তো যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। শুধু তো যাবে, আর যাবে, তাহলে?'

'তাহলে মানে? সেটাই তো মজা, সেটাই তো আমোদ। যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে তো আর থেমে থাকবে না? আবার ঘুরে ঘুরে আসবে, আবার চলে চলে যাবে। বাক্স বিছানা বাঁধতে হবে না, এত এত সব জিনিস কিনতে হবে না, একবার উঠে পড়লেই ব্যস,—সারা জীবন শুধু ঘুরে আর ঘুরে সুখে কাটিয়ে দাও। নেহাৎ জামা জুতোগুলো যখন ছোট হয়ে যাবে, তখন যা একটু অসুবিধে! তা দিল্লী কি কাশী, কি আবার এই কলকাতাতেই একবার স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি কিনে নেওয়া যায়। বড় ইষ্টিশানে গাড়ী কতক্ষণ থামে দেখিস না?'

দাদার এই উদ্দাম মজার চিন্তাটা অবশ্য ভালই লাগে শুভোর। রেলগাড়ীর মত জিনিষ আর কী আছে? আমি একটি জানালার ধারে বসে আছি আর আমার সামনে পৃথিবী ছুটছে। ছুটে ছুটে আমার চোখের কাছ দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে মাঠ-বন, নদী-পাহাড়, মন্দির বাড়ী, জল-জঙ্গল কাশফুল, ধানক্ষেত!...ঠিক সিনেমার মত। এ মজার তুলনা হয় না।

শুভোর মামাতো দিদি ঘুন্টি অবিশ্যি একদিন বলেছিল, 'ধেৎ রেলগাড়ীতে আবার আছে কী? ও তো একশো বছরের পুরনো।'

শুনে 'হাঁ' হয়ে গিয়েছিল শুভো। 'পুরনো হয়ে গেছে বলে মজা থাকবে না?' রাগ করে বলেছিল শুভো, 'ভাত তো দুশো তিনশো হাজার বছরের পুরনো, তুই ভাত খাস না? একদিন জ্বর হলেই তো পরদিন সকাল থেকেই ভাবতে সুরু করিস কখন ভাত খাবো।'

ঘুন্টিদি ওর রাগ দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। আর বলেছিল, 'আহা কী তুলনা রে! লোক এখন চাঁদে জমি কিনে রাখবার তাল করছে, বাড়ী বানাবে বলে আর ওই বোকাটা কিনা রেলগাড়ীকে ভাল বলছে!

রেলগাড়ী চড়ে তুই ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারবি? হুঁঃ, যদি বা এরোপ্লেনকে ভাল বলতিস্ তাও একটু মানে হতো!'

কিন্তু শুভো তো এরোপ্লেনের মধ্যে কোন মজা খুঁজে পায় না, বিলেত-টিলেত না হয় না গিয়েছে, দার্জিলিং তো গিয়েছিল একবার প্লেনে চড়ে? মজাটা কি হল? চড়েই তো মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানলা খুলে মুখ বাড়াবে। তার জো নেই।

তাছাড়া প্লেনে স্টেশনে স্টেশনে জিনিষ কেনা যায়? গোলাপী রেউড়ি? চীনে বাদাম? পাকা পেয়ারা? কাঁচা শশা? তানসেন গুলি? যোয়ান হজমি? পুরি মেঠাই? গরম জিলিপি? গোল গাপপা?

কেনা যায় না।

এরোপ্লেনে এ সব সুবিধে নেই। বাড়ীতেই কি আছে ছাই? বাড়ীতে শুর একটা জিনিষ কিনতে দেবেন বাবা? মোটেই না। সত্যি বলতে পৃথিবীর ওই সব সেরা খাদ্যগুলো লুকিয়েই খেতে হয় শুভো ধ্রুবকে। কারণ, দেখতে পেলে বাবা এমন হৈ-চৈ তুলবেন! উঃ!

সেদিন তো দু' আনার দু'পাতা মটর ঘুগনি ফেলাই গেল তাদের। বাবা আসছেন দেখেই দিশেহারা হয়ে জানলা দিয়ে—উপায় কি? বাবা দেখলেই এমন ভান করবেন যেন মারাই গেছে তাঁর ছেলে দুটো এই বিষ খেয়ে!

অথচ—?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, অথচ—রেলে চড়লেই বাবা নিজেই হরদম 'ওলা' ডেকে চলেছেন। এই চা, এই ঘুগনি, এই অবাক জলপান, কিছু না হোক শুধু পান-ই। আর আরো অবিশ্বাস্য বাবা নিজেই ধ্রুব শুভোকে চা অফার করছেন, 'কি হে চলবে নাকি এক ভাঁড়? রেলগাড়ীতে মাটির ভাঁড়ের চা, বেশ একটা ঐতিহাসিক জিনিষ!'

বাবা।

যে বাবা ধ্রুব শুভোকে মার কাছে বসে প্লেটে একটু চা খেতে দেখলেই বলতে শুরু করেন, 'তোমাদের এইসব আদরের কোন মানে হয় না। চা এমন একটা কিছু অপূর্ব বস্তু নয় যে, না খেলে জীবন বৃথা হয়ে যাবে।'

নিয়ম ছাড়া কিছু খেতে দেখলেই বাবা বিরক্ত হন। আর রেলে চড়লে বাবা নিজেই মাকে ডেকে ডেকে বলেন, 'রেলে চড়লেই আমার এত খিদে

পায় কেন বলতো? গাড়ী যত ঝাঁ ঝাঁ ছুটতে থাকে, আমার পেটও ততই খাঁ খাঁ করতে থাকে। বেশীক্ষণ গেলেই পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন স্থরু হয়ে যায়।'

মা বলেন, 'সত্যি, রেলে চড়লেই এত খাই-খাই কর তুমি, আমি তো অবাক!'

বাবা বলে উঠে, 'খাই খাই খাই খাই, যত খাই, তত চাই, পাই তবু ফের চাই, খাওয়া ছাড়া কিছু নাই।'

হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়।

এই হলো—রেলগাড়ীর বাবার মূর্তি।

আর—কলকাতার—এই বাড়ীর বাবা?

অন্য মানুষ! বলতে কি একেবারে বিচ্ছিরী। সকাল থেকে রাত অবধি কাজ আর কাজ, ছুট আর ছুট! ধ্রুব শুভোদের সঙ্গে কথা কইবার সময় নেই। যদি কইলেন?

'শুভো পড়তে বসনি? ধ্রুব তোমার এবারের রেজাল্টটা কেমন হবে?'

দূর! দূর! দাদা ঠিকই বলেছে বাড়ীর চেয়ে রেলগাড়ী হাজার গুণ ভাল। যত ভাবে, ততই রেলগাড়ীর মহিমায় বিচলিত হয় শুভো! সঙ্গে সঙ্গে দাদার মহিমাতেও।

দাদার মাথাতেই তো এসেছে এটা?

বাড়ীর বদলে একটা রেলগাড়ী বানানো! নিজেদের একেবারে নিজেদের একখানা রেলগাড়ী! একথা ভেবেই আহ্লাদে শরীরের সব লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে যায় শুভোর! তবু—

তবু দাদার থেকে বুদ্ধিটা তার চিরদিনই পরিপক্ক তাই বলে ফেলে, 'চিরদিন যদি রেলগাড়ীতেই থাকা যায়, তাহলে তো স্বর্গের ইন্দ্রই হয়ে গেলাম দাদা, তাই না? কিন্তু ভাবছি—'

'কি আবার ভাবছিস্?'

'ভাবছি, রেলগাড়ীতেই সারা জীবন, এর চাইতে ভাল আর কি আছে? রেলগাড়ীতে আলো পাখা আছেও সব, কিন্তু দোকান, বাজার, ইস্কুল?'

দোকান, বাজার, ইস্কুল! হায় কপাল!

ছোট ভাইয়ের এই তুচ্ছতায় অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টোয় ধ্রুব।

'ইস্কুলের কথা ভাবছিস্ তুই? দেবরাজ ইন্দ্রের সমান হয়েও ওই বাজে

জিনিষটা ভুলতে পারছিস্ না? ইস্কুল, আফিস, এই সব জিনিষগুলো খুব ভালো না? খুব চমৎকার! হুঁ! বলে—ইস্কুলের হাত এড়াবার জন্যেই যাব—যাকগে ও তোর মাথায় ঢোকানো যাবে না।'

'মাথায় ঢোকান যাবে না?'

এই অপমানে শুভো কাঁদো কাঁদো হয়, 'রেলগাড়ী বলে আমার প্রাণের মত! দিন রাত্তির শুধু রেলগাড়ী চড়ছি এ ভেবে বলে আমার—'

'থাম ছিঁচকাঁদুনে! তাহলে বলছিস্ কেন, বাজার, দোকান, হেন-তেন? বাজারের কী দরকার রে? রেলগাড়ীতে থালা সাজিয়ে খেতে দিয়ে যায় না? রেলগাড়ী থেকে রাজ্যির জিনিস কেনা যায় না?'

'সে তো যায়ই।'

'তবে?'

শুভো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তাহলে কি হবে দাদা? বাবা তো সব টাকাই ওই বাড়ী-দাড়ি করে ফুরিয়ে ফেলবেন! রেলগাড়ী বানানোর টাকা থাকবে না!'

'থাকলেও করবেন না!' ধ্রুব ধ্রুবসত্যের স্বরে বলে, 'বুদ্ধি বলে কোনো জিনিস তো আর থাকে না বড়দের; কিসে মজা, কিসে আমোদ, কিসে শান্তি তার কিছু বোঝে বড়রা? বোঝে না, যাতে কষ্ট, তাতেই মন। একধার থেকে দেখে যা তুই বড়দের, যাতে কষ্ট পাচ্ছে তাই করে চলেছে!'

শুভো একথা অস্বীকার করতে পারে না।

নিজের পক্ষেই তো দেখেছে, দেখছে। এই তো দিদিটা ছিল বাড়ীতে? বাড়ীর লোক বাড়ীতেই থাকবে। তা নয়—তাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল! অথচ আবার মজাটা দেখ, শ্বশুর বাড়ী পাঠানোর সময় কেঁদে কেঁদে নাক মুখ ফুলিয়েই ফেললেন মা! বাবাও প্রায় কাঁদো কাঁদো। শুভো ধ্রুবই কি চুপি চুপি তাই করেনি? দিদির তো কথাই নেই! এত কাণ্ডর কিছুই তো হত না, যদি দিদির বিয়েটা না দেওয়া হতো! কী দরকার ছিল বাপু বাড়ীর মেয়েটাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে কেঁদে নাক ফোলানোর? বুদ্ধি থাকলে করে কেউ এমন কাজ?

সর্বদা! সর্বদাই ডেকে ঝঞ্ঝাট আনছে বড়রা। এই তো আজ সকালেই ছুটির দিন মা বাবা ছোট কাকা বেশ জমিয়ে বসে গল্প করছিলেন, শুভো ধ্রুব

মোহিত হয়ে বসেছিল, হঠাৎ মা বলে বসলেন, 'পিসেমশাইয়ের জ্বর শুনেছিলাম একবার দেখতে যাওয়া উচিত।'

বাস, হয়ে গেল।

ভেঙে গেল আড্ডা!

চললেন দুজনে 'উচিত' করতে সেই দমদম না পাকপাড়া কোথায়! অকারণ ধ্রুবকে খুব খানিকটা শাসিয়ে গেলেন যেন ঝগড়া না করে, যেন পড়তে বসে, যেন রাস্তায় না বেরোয়।

হলটা কি শেষ পর্যন্ত?

না, মার সেই কালো মোটা গুঁফো পিসেমশাইকে একটু দেখে আসা হল।

জ্বর?

সে তো ছেড়েই গেছে।

দূর! দূর শুধু কষ্ট পাবার জন্যেই। 'উচিত! উচিত!' যেন শুধু কষ্ট পাওয়াই উচিত মানুষের।

যা ভাল লাগবে তা করা চলবে না! এতেও বলতে হবে বুদ্ধিমান?

না, দাদার কথাই ঠিক!

'দেখ শুভো'—বলল ধ্রুব, 'বাবা রেলগাড়ীর কথা শুনলে স্রেফ্ হেসে ওড়াবেন, তার চেয়ে—'

'কী দাদা?'

শুভো চোখ ড্যাবা করে।

'তার চেয়ে আমরাই বেরিয়ে পড়ি। যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাই—বাবা মা যদি খোঁজেন, যদি খুঁজে বার করতে পারেন, বলবো—আমাদের চাও তো একটা রেলগাড়ী বানাও, সারা জীবন সেই গাড়ী চড়ে আমরা শুধু চলবো আর চলবো, ঘুরে ঘুরে আসবো, আবার যাবো, চলা আর ফুরোবেই না।'

একেবারে নিরুদ্দেশের মত মজা হবে। আর দেখা না হলে তো স্রেফ্ নিরুদ্দেশই! সেও মজা!

শুভো ভয়ে ভয়ে বলে, 'তোর সাহস আছে দাদা?'

'সাহস নেই? সাহস নেই মানে? চল না দেখবি সাহস আছে কি না আছে!'

'কিন্তু টাকা?'

'টাকা! টাকা আবার কি? বলবো আমরা ছোট ছেলে টাকা কোথায় পাবো? আর কতই বা জায়গা নেবো আমরা? জিনিস নেই পত্তর নেই।'

'তাহলে চল!'

তাহলে চল!

মানে চিরকালের মত চল।

বাবা মা যদি খোঁজেন আর যদি খুঁজে পান তবেই হয়তো আবার দেখা হবে। না হলে নয়।

আজই শেষ দেখা।

শুভো খেতে বসে মায়ের মুখের দিকে তাকায়, আর হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে কী একটা ঠেলা দিয়ে ওঠে তার। রুটি আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। কাল সকালে আর দেখতে পাবে না মাকে। কাল না, পরশু না, তর্সু না!···কোনো দিনই না।

হঠাৎ মা বলে ওঠেন, 'ওরকম করছিস্‌, কেন রে শুভো? রুটি মুখে দিচ্ছিস আর ফেলে দিচ্ছিস?'

শুভো কষ্টে বলে, 'পেট ব্যথা করছে!

পেট ব্যথা!

'সর্বনাশ! খাসনি, মোটে খাসনি আর। চট্‌ করে শুয়ে পড়গে যা!'

বাবা বলেন, 'পেট ব্যথা করবে তার আর আশ্চর্য কি, দেখ ক' আনার ফুচ্‌কা পেটে অবস্থান করছে।'

শুভো এর প্রতিবাদ করে না। বাবার মুখের দিকে তাকাতেই পারে না। বাবাকে যে এত ভালবাসতো শুভো তা তো জানত না কই?

আশ্চর্য, দাদা তো বেশ পাত ফর্সা করে ফেললে, নাঃ, দাদা সত্যিই সাহসী, সত্যিই বীর। দাদা যদি বুঝতে পারে শুভোর পেট ব্যথা করেনি, শুধু মা বাবাকে দেখতে পাবে না বলেই—কী লজ্জা দেবে দাদা শুভোকে।

দাদার সামনে কি করে শক্ত থাকবে, তাই ভাবতে ভাবতে শুতে যায় শুভ। তাদের নিজেদের ঘরে। সে ঘরে শুভো আর ধ্রুব শোয়।

শুয়ে শুয়ে মনে মনে বলে, 'হে ভগবান, আমাকে সাহসী করে দাও।'

একটু পরে ধ্রুব এসে ঢোকে।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বেশ জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না রাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মন্দ নয়। শুভো চোখ গোল করে দেখে দাদা কি যেন পকেট থেকে বার করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। রাত দুপুরে কী ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে দাদা ?

ধড়মড় করে উঠে আসে শুভো।

চুপি চুপি বলে, 'কী দেখছিস রে দাদা ?'

ধ্রুব একটু ঘুরে দাঁড়ায়।

চড়া গলায় বলে ওঠে, 'সব তাতে দরকার তোর ? ফেলছিলাম রুটি। বুঝলি ? রুটি আলুর দম ! হলো ?'

'রুটি ! আলুর দম !'

শুভো হাঁ হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'পকেটে রুটি আলুর দম রেখেছিলি তুই ?'

ধ্রুব আরো চড়া গলায় বলে, 'হ্যাঁ, রেখেছিলাম। কী করবি ? চিরকালের মতন চলে যাচ্ছি কাল, জন্মে আর মা বাবাকে···বসে বসে রুটি খেতে পারে মানুষ ?'

চড়া গলা হঠাৎ গলে জল হয়ে গলার স্বরটাই বন্ধ করে দেয় ! ঝপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা চাদর নিয়ে মাথা অবধি ঢাকা দেয় ধ্রুব !

শুভোও মলিন মুখে শুয়ে পড়ে।

এবং দাদার মতই কাজ করতে থাকে সে।

অনেকক্ষণ পরে খাট বিছানা নড়া বন্ধ হয়। শুভো আস্তে ডাকে, 'দাদা !'

দাদা নীরব।

শুভো চাদরের ওপর থেকে নাড়া দেয়, 'দাদা, ভেবে দেখছি আমরা যদি চিরকালের মতন চলে যাই, তাহলে তো সেই বড়দের মত বোকাই হলাম। যাতে কষ্ট তাই সেধে সেধে করা হল।'

ধ্রুব হঠাৎ উঠে বসে।

আন্দাজে শুভোর পেটে পিঠে কোথায় যেন একটা চড় বসিয়ে দেয়, ভাঙা ভাঙা চড়া গলায় বলে ওঠে, 'জানি জানি, তোর জন্যেই আমার নিরুদ্দেশ যাওয়া হবে না, ঠিক জানি। ভীরু কাপুরুষ কোথাকার !'



রাজা হবু মন্ত্রী গবু

*

শ্রী অতীন মজুমদার

কালকে রাতে টাকশালেতে হঠাৎ হল চুরি!
হবু রাজা তাই হেঁকে কন দুলিয়ে বিরাট ভুঁড়ি,
'মন্ত্রী গবু, থাকতে তুমি কাণ্ড একি হয়,
রাজ্যে যত সান্ত্রী-সেপাই ঘুমিয়ে কি সব রয়?'
হবুর কথায় মন্ত্রী গবু হাঁকেন, 'কতোয়াল,
টাকশালের ঐ ফটকে কোন্ সেপাই রাতে কাল
দিচ্ছিল হে পাহারা? তায় এক্ষুনি দাও ডাক।'
এই না শুনে কতোয়াল তো দিলেন বিরাট হাঁক।
কাল রাতে যে সেপাই ছিল নাম হাতী সিং তার,
এক হাতে ঢাল অন্য হাতে মস্ত তলোয়ার,
হাজির হতেই গবু বলেন চক্ষু করে লাল,
'টাকশালেতে পাহারাদারী করছ কতকাল?
মাইনে তো নাও নগদ টাকা—কাজেতে দাও ফাঁকি,
নইলে বাপু টাকশালে চোর ঢুকতে পারে নাকি?
কালকে রাতে জেগে যদি থাকতে ফটকেতে
চোরকে বাপু ঢুকতে তুমি দেখতে ঠিকই পেতে।
কাজে ফাঁকি দেওয়ায় তোমার শাস্তি হবে তাই,—
নাকটা কেটে সারা গায়ে মাখিয়ে দিয়ে ছাই



গাধার পিঠে সারা শহর ঘুরবে বার মাস,
তার পরেতে চির-জীবন কাটবে ঘোড়ার ঘাস!'
গবুর কথায় হাতী সিংহের চমকে উঠে পিলে,
বাহান্নবার ঢোঁক গিলে সে শেষে জবাব দিলে,—
'প্রভু, যদি দেন অভয় তো সত্যি কথাই কই,
প্রাণের ভয়ে মিথ্যা বলার মানুষ আমি নই।
সারাটা রাত জেগেই ছিনু, রাত হল যেই ভোর
আমারই তো সামনে দিয়ে ঢুকল তখন চোর,
করল চুরি, তারপরে সে পোঁটলা বেঁধে নিয়ে
গেল যখন তখনো ঠায় ছিলাম যে দাঁড়িয়ে।'
'দেখেছ সব, তবু তাকে ধরলে না?' কয় গবু।
বললে হাতী সিং—'কি করে ধর্ব্ব তাকে প্রভু?
দু হাতই ছিল জোড়া—এক হাতে এই ঢাল,
অন্য হাতে আমার ধরা ছিল যে তরোয়াল!
গবু শুনে ভাবেন, এতো বলছে কথা ঠিকই।
দু'হাত জোড়া, যায়নি ধরা, এতো স্বাভাবিকই!
শেষে গবু হবুকে কন, 'শুনুন মহারাজ,
এক্ষুনি এক নয়া হুকুম জারী করুন আজ—
রাজ্যে যত সান্ত্রী-সেপাই রইবে পাহারাতে
এবার থেকে ঢাল তলোয়ার রাখবে না কেউ হাতে।'
শুনে হবু বলেন, 'গবু, ঠিক বলেছ ঠিক,
বাত্তিখানায় দাও তো খবর—ঢাক পিটিয়ে দিক!'



হারপুন

শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যিক রামগতিবাবু কলকাতার বাইরে বেড়াতে এলেন।

কলকাতার গণ্ডগোলে ভদ্রলোকের যেন দম আটকে যাওয়ার জো হয়েছিল। লেখার তাগিদ, প্রকাশকের তাড়া, সভা-সমিতির হাঙ্গামা—উঃ! এর মধ্যে মানুষ বাঁচে কখনো। এইবারে নিশ্চিন্তে একটি মাস কাটিয়ে যাবেন এখানে। বেড়াবেন, ঘুমোবেন, নিজের হাতে বাজার করে ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া করবেন আর সময় সুযোগমতো মনের আনন্দে দুটো একটা গল্প-কবিতা লিখবেন।

বাসাটিও পেয়েছেন বেশ মনের মতো। ছোটো বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে লন আর ফুলের বাগান—বড়ো বড়ো গোলাপ ফুটে বাগান যেন আলো হয়ে আছে। বসবার জন্যে পাথরের বেদী। সেখানে বসলে দূরে নীল পাহাড়ের সারি দেখা যায়—তাদের কোলে মেঘ খেলে বেড়াচ্ছে আর ছোট্ট একটি নদী পাহাড়ের বুক চিরে রুপোর পৈতের মতো নেমে এসেছে।

বিকেল বেলা রামগতিবাবু লনের বেদীতে বসে এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়েছেন আর পাহাড়ের শোভা দেখছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন, আসতে পারি স্যার?

রামগতিবাবু মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, বছর বাইশেকের একটি ছেলে। পরনে পাজামা, গায়ে ঝোলা আদ্দির পাঞ্জাবী, কাঁধে সাদা শাল। ঘাড়ের দুপাশে বাবরী চুল, নাকের তলায় সরু একটি গোঁফের রেখা।

ছেলেটি আবার বললে, আসব স্যার ?

গেট পেরিয়ে ভেতরে যখন ঢুকেই পড়েছে তখন না আসতে বলার কোন মানেই হয় না। রামগতিবাবু বললেন, আসুন—আসুন।

ছেলেটি এসেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলে, তারপর হাতটা একবার জিভে ঠেকালো। গদগদ হয়ে বললে, কতদিন দূরের থেকে দেখছি, আজ পদধূলি পেয়ে জীবন ধন্য হল।

—আপনি আমাকে চেনেন নাকি ?

—বিলক্ষণ !—ছেলেটি চোখ কপালে তুলল: দিকপাল লেখক রামগতি সমাজপতিকে বাংলাদেশে কে না চেনে। কাল যখন ট্রেন থেকে আপনি নামলেন, তখনই দেখেছি। কোথায় উঠেছেন খোঁজ নিয়ে আজ দেখা করতে এলাম। আমি স্যার, আপনার লেখার দারুণ ভক্ত। আপনার উপন্যাস পড়ে আমার মনে হয় আপনি বঙ্কিমের চাইতেও বড় লেখক, আপনার অনেক কবিতা স্যার, রবি ঠাকুরের চেয়েও ভালো।

রামগতিবাবু দারুণ খুশি হলেন—পত্রিকার সম্পাদক আর প্রকাশকেরা কথাটা শুনলে কাজ হত। একটু লজ্জাও পেলেন সেই সঙ্গে। বললেন, না-না, অতটা বাড়িয়ে বলবেন না, আমি একজন সামান্য লেখক—

—সামান্য ! কী বলেন আপনি ! আমার তো মনে হয় আপনাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।

রামগতিবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতচ্ছাড়া বাংলাদেশের লোক কি তা বোঝে ! কখনো কখনো দু-একটা সমালোচক তাঁর বইয়ের এমন নিন্দে-মন্দ করে যে, মনের দুঃখে লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে। রামগতিবাবু বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বসুন—বসুন। চা খাবেন একটু ?

—আপনার এখানে চা খাব ? এ তো স্যার, আমার স্বপ্নের অতীত। তবে দয়া করে আমাকে আর আপনি বলবেন না। আমার নাম ভজনলাল পতিতুণ্ডি—আপনি আমায় ভজু বলেই ডাকবেন।

রামগতিবাবু ভজুর জন্যে চা আনলেন। কিন্তু এমন ভক্তকে কি শুধু চা

খাওয়ালেই চলে? চারখানা বিস্কুট আর ডবল ডিমের একটা ওমলেট্ও খাওয়াতে হল। দেখা গেল ভজনলাল ভোজন আর ভক্তি কোনটাতেই পেছপা নয়। বেশ চেটেপুটেই খেলো। আর আর একটা ডবল ডিমের ওম্লেট পেলেও তার আপত্তি হত না বলেই রামগতিবাবুর মনে হল। কিন্তু ভরসা করে গিন্নীকে সে কথা তিনি বলতে পারলেন না—হয়তো বা খ্যাঁক খ্যাঁক করে চেঁচিয়েই উঠবেন ভদ্রমহিলা।

খেয়ে-দেয়ে খুশি হয়ে ভজু হাত কচলাতে লাগল।

—আচ্ছা স্যার—

—বলো!

আহ্লাদে গলায় ভজু বললে, এত সব আইডিয়া আপনার মাথায় কী করে আসে? ওই যে আপনার 'কে তুমি পথিক' উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন—'এমন সময় হুলো বেড়ালটার আর্তনাদ যেন নীরব তিমিরের বুকে হারকুন বিদ্ধ করল'—কী অদ্ভুত সে জায়গাটা। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আচ্ছা, হারকুন নামে কী? তুরপুন বোধ হয়?

রামগতিবাবু বললেন, না—না, তুরপুন নয়। হারকুনও নয়, লিখেছি হারপুন। মানে এক রকম বল্লম—তাই দিয়ে তিমিমাছ শিকার করে।

—তিমিমাছ—অ্যাঁ?—কী কাণ্ড!—ভজুর চোখ দুটো একসঙ্গে যেন নাকের ওপর লাফিয়ে উঠে তারপরে তার দু কানের দিকে দৌড়ে গেল: বুঝেছি এইবারে। তিমির থেকে একেবারে তিমি মারা তারপুন। কী আশ্চর্য—একেই বলে কল্পনা! তারপুন! ওফ্!

—ওটা তারপুন নয়, হারপুন।—রামগতিবাবু সংশোধনের প্রয়াসী হলেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, হারপুন। আমি তো স্যার রাত্রে হুলো বেড়ালের ডাক শুনলে লাঠি নিয়ে তাড়া করি। আর আপনি কিনা একেবারে—ওফ্! মানে, একেবারে হারতুন দিয়ে তিমিমাছ শিকার করে বসলেন।

—হারতুন নয়—হারপুন।

—ঠিক ঠিক—হারপুন। আমি তো স্যার, কখনো তিমিমাছ শিকার করিনি আপনার মতো। জানব কী করে! উঃ—আপনি কিন্তু অসাধারণ লোক! তাই তো বলি, খালি ঘরে বসে থাকলেই কি লেখক হওয়া যায়! ডালমুট চিবিয়ে আর চা খেয়ে কি কেউ অত ভালো ভালো জিনিস লিখতে পারে। কারপুন দিয়ে তিমিমাছ শিকার করতে পারলে তবেই না—

—কারপুন নয়, হারপুন।—এবার রামগতি একটু বিরক্ত হলেন।

—ঠিক ঠিক। সত্যি বলতে কি স্যার, আপনাকে দেখে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি বড় লেখক তা জানতুম, কিন্তু তিমিমাছও মারতে পারেন তা কে ভেবেছিল? আচ্ছা স্যার, রবি ঠাকুর এত বড় কবি হলেন কী করে? উনিও বোধহয় গণ্ডার জলহস্তী এই সব শিকার করতেন—তাই নয়?

—না, রবীন্দ্রনাথ কখনো গণ্ডার জলহস্তী শিকার করেন নি।—রামগতিবাবু গম্ভীর।

—তাহলে কি ঘোড়া শিকার করতেন? তাই বোধহয় 'ঘোড়া' বলে একখানা কবিতার বই লিখেছিলেন। কিন্তু ঘোড়া কি কেউ শিকার করে?—ভজনলাল দারুণ ভাবে চিন্তা করতে লাগল: ঘোড়া শিকার করবার জিনিষ নয়। বাঘ সিঙ্গির মতো কাউকে তো কখনো কামড়েছে বলে শুনিনি। তাহলে খামোকা ঘোড়া শিকার করে—

রামগতিবাবু আরো বিরক্ত হলেন: আঃ, কী যে বকো—

—অ্যাঁ, কী বললেন? বক? ঘোড়া নয়? রবীন্দ্রনাথ বক মারতেন?

—তোমার মাথায় কিছু নেই!—এতক্ষণে রামগতিবাবু ধৈর্য হারালেন, চা আর ওমলট নেহাৎই বাজে খরচ হয়েছে বলে মনে হল তাঁর: রবীন্দ্রনাথ বক মারতেন কে বলেছে তোমায়? তাঁর বইটার নাম 'ঘোড়া' নয়—গোরা। সেটা কবিতার বই নয়, উপন্যাস। আচ্ছা, তুমি এখন আসতে পারো।

—যাব স্যার? যেতে বলছেন?—এই সাহিত্যিক সদালাপে এমন ভাবে বাধা পড়ায় ভজু ব্যথা পেলো: আপনি আমায় যেতেই বলছেন তবে?

—হুঁ, যেতেই বলছি তোমায়। দয়া করে আমায় রেহাই দাও এখন।

—ওঃ, লিখতে বসবেন বুঝি? তৈরি করবেন বাংলা সাহিত্যের আর একখানা অ্যাটম বোমা? এ বইতে তারকুন দিয়ে কী মারবেন স্যার? হাতি? ভজু তখনো কৌতুহলী।

—সিংহ—সিংহ মারব!—এবার সিংহের মতো গর্জন শোনা গেল রামগতিবাবুর।

ভজু তিন পা পেছিয়ে গেল। আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাবার মতলব বোধহয় তার ছিল, কিন্তু সাহস পেলো না। গুটি গুটি এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

—আর জেনে যাও—তারপুন নয় হারপুন।

—হ্যাঁ—তারপুন নয় হারপুন, হারপুন—ভজনলাল অদৃশ্য হল।

—বিকেলটাই বরবাদ করে দিয়ে গেল—হতচ্ছাড়া। রামগতিবাবু স্বগতোক্তি করলেন: চা আর ওমলেটের পয়সাটা আদায় করে নিতে পারলে ঠিক হত। ভক্ত না ঘোড়ার ডিম—হুঁঃ!

রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি। গিন্নি স্টোভে মাংস রান্না করছেন, পাশের ঘর থেকে তার মনোরম গন্ধ আসছে। সেই গন্ধে রামগতিবাবুর ভাব এসে গেল। চাদর দিয়ে বেশ করে কানটান ঢেকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখতে, বসলেন:

ঝম ঝম করছে রাত আর ঝিমঝিম করছে তারা,
বাইরে নেড়ী কুকুর শেয়ালকে লাগাচ্ছে তাড়া।
এই রাতে সাহারা মরুভূমিতে নেমেছে ধূসর হিম,
আর তিনজন বেদুয়িন হুঁকো টানতে টানতে খুঁজছে
কয়েকটি উটপাখির ডিম—

বেশ জমাট করে এই পর্যন্ত লিখেছেন, হঠাৎ ভাবটা কড়াৎ করে ঘুড়ির মতো কেটে গেল। বাইরে কে যেন খটাং খটাং করে কড়া নাড়ল।

আঃ, এই রাতে—এমন শীতের ভেতর কে জ্বালাতে এলো? সেই ভজনলালটা নয় তো? রামগতিবাবু ভুরু কোঁচকালেন।

আবার খট-খট-খটাং—

বিকট রকম দাঁত খিঁচিয়ে রামগতিবাবু দরজা খুলে দিলেন। ভজু এলে এবারে তাকে ঘাড়ধাক্কা দেবেন—নির্ঘাৎ।

কিন্তু ভজু নয়। মাথায় চকচকে টাক, কান পর্যন্ত তুলে দেওয়া মোটা পাকা মিলিটারী গোঁফ, গায়ে ওভারকোট, হাতে চুরুট, বদমেজাজী চেহারার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোক ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন, ইভ্‌নিং। একটু বেশি রাতে ডিসটার্ব করলুম বলে কিছু মনে করবেন না।—রামগতিবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, আপনারই নাম রামগতি সমাজপতি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো—

—আমি জে. কে. ঘোষ, কর্নেল ঘোষ বলে লোকে আমাকে জানে। মিলিটারীতে ছিলুম থার্টি ইয়ার্স। এখন রিটায়ার্ড।

—ওঃ, আসুন—আসুন! নমস্কার। ভেতরে আসুন।

ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক ধপাৎ করে একখানা চেয়ারে দেহরক্ষা করলেন। চেয়ারটা মটমটিয়ে উঠল। মোটা চুরুটটা থেকে একরাশ বিচ্ছিরি ধোঁয়া রামগতিবাবুর মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কর্নেল ঘোষ গাঁ-গাঁ করে বললেন, ক্লাবে শুনে এলুম আপনি নাকি খুব বড় শিকারী। হাতী-গণ্ডার-সিংহ এই সব শিকার করে থাকেন। আমিও আফ্রিকায় ছিলুম, কেনিয়ায়—কঙ্গোতে। শিকারী হিসেবে জে. কে. ঘোষের কিছু নামও ছিল। তাই ভাবলুম যিনি রাশি রাশি হাতী-গণ্ডার শিকার করে থাকেন, সেই বীরপুরুষকে একবার দেখে আসা দরকার।

রামগতিবাবু হাঁ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

—কিন্তু আমি তো হাতী-গণ্ডার—

কর্নেল ঘোষ মিলিটারী গোঁফে তা দিয়ে বললেন,—শিকার করেননি—করতে পারেন না। এই গোলগাল নন্দদুলাল চেহারা—ভুঁড়ি ভর্তি চর্বি—আপনি করবেন শিকার! ছোঃ! শিকারীর চেহারা কখনো এরকম হয় না।

রামগতিবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, কি জ্বালা! আপনাকে কে বলেছে আমি শিকার—

—শাট্ আপ্!—কর্নেল ঘোষ চোখ পাকিয়ে বললেন, চালিয়াতির আর জায়গা পাননি! আমি কর্নেল জে. কে. ঘোষ—আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছেন! জীবনে কোনদিন রাইফেল ধরেছেন আপনি? ধরতে জানেন? আই ডোণ্ট বিলিভ্ ইট! দেখি আপনার হাত—

রামগতিবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠতে গিয়ে হাহাকার করে উঠলেন। ততক্ষণ কর্নেল ঘোষ তাঁর ডান হাত পাঞ্জায় ধরে একটি চাপ দিয়েছেন আর হাতের আঙুলগুলো এক সঙ্গে মট্ মট্ করে উঠেছে।

—ছাড়ুন—ছাড়ুন—মরে গেলুম—উহুহু—ই-হি-হি—

—হুঁ, মারাই যাবেন এরপর। শিকারীর আঙুল! ছোঃ—একতাল কাদা! আপনাদের মতো বাজে লোকদের জন্যে খাঁটি শিকারীদের বদনাম। ফের যদি এ-সব গুলবাজী করেন তাহলে এরপর এসে দুটো হাতই ভেঙে দিয়ে যাব। রাবিশ!

কর্নেল ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন। ধাক্কা দিয়ে চেয়ারটা ফেলে দিয়ে ধড়াস করে দরজাটা আছড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ততক্ষণ মাংস রান্না ফেলে গিন্নী ছুটে এসেছেন।

—কি হলো গো? এত গণ্ডগোল কিসের।

—একটা খুনে লোক এসে বোধহয় আঙুলগুলো ভেঙেই দিয়ে গেল গিন্নী। উহুহু—

গিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন: ওমা গো—কী হবে গো! থানা-পুলিস-খুন—

—তুত্তোর থানা পুলিস!—রামগতিবাবু বিকট মুখ ভ্যাংচালেন: থানা পুলিস কী করবে মিলিটারীর কাছে। ই-হি-হি—এই শীতের ব্যথা! তুমি শিগ্‌গির এক প্যান গরম জল করে আনো—শিগ্‌গির—

সকালে উঠে গোঁজ হয়ে রামগতিবাবু ভাবতে লাগলেন, এ সব ভজার জন্যে। সে-ই যা-তা রটিয়েছে তাঁর নামে। রাত দুটো পর্যন্ত সেঁক দিয়ে এখন আঙুলের ব্যথাটা কমেছে বটে, কিন্তু মনের ভেতরে আগুন জ্বলছে সমানে। ভজাকে একবার সামনে পেলে—

কিন্তু সামনে যখন পাওয়া যাচ্ছে না—তখন মন খারাপ করে বসে থেকে আর কী হবে। আর সেই কালান্তক কর্নেল ঘোষকে—না—সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও পেতে চান না তিনি। পাওয়ার কোনো দরকার বোধ করছেন না রামগতিবাবু।

দূরে সকালের পাহাড়ী নদীটা ঝিলমিল করছিল। আরো খানিকক্ষণ ব্যাজার হয়ে বসে থেকে ভাবলেন নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসবেন। কালকে সেই উটের ডিম নিয়ে কবিতাটা বেশ জমাট হয়ে উঠেছিল, সেটার বারোটা বেজে গেছে। ভাবলেন নদীর ধার থেকে একটু মুড্ নিয়ে আসবেন।

নিরিবিলি পাহাড়ী পথের ধার বেয়ে চলেছেন। দু'ধারে সাদা সাদা পাহাড়ী ফুলে গাছগুলো ছেয়ে আছে, পাখি-টাখি ডাকছে—রামগতিবাবুর গলায় খুস্‌খুস্ করতে লাগল। সবে গুনগুন করে গানের একটা কলি ধরেছেন এমন সময় কে যেন বললে, এই যে!

ভজনলাল নাকি? দারুণ চমকে উঠে দেখলেন, ভজনলাল নয়। রোগা লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোক, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, হাতে ছড়ি।

ভদ্রলোক আবার বললেন, এই যে আপনিই বোধহয় রামগতিবাবু?

সন্দিগ্ধ হয়ে রামগতি থেমে দাঁড়ালেন।

—হ্যাঁ। কী বলতে চান বলুন।

—আমি এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার। জুলজীতে এম-এস্‌সি। আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই। আপনারা ছাইপাঁশ নভেল লেখেন—কিন্তু লেখাপড়ার ধার দিয়েও যান না কোনদিন। আপনাকে কে বলেছে তুরপুন বিঁধিয়ে হাঙর শিকার করা যায়?

রামগতিবাবুর মাথার ভেতর ধাঁ করে জ্বলে উঠল। আবার সেই ভজা! ভজাই তাঁকে পাগল করে দেবে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রামগতিবাবু বললেন, আমি কখনো এসব কথা বলিনি।

—আলবৎ বলেছেন! শহরশুদ্ধ লোককে বলে বেড়িয়েছেন। এই সব যা-তা লিখেই ছেলেপুলের মাথা খান—তারা গোল্লায় যায়।—হেডমাস্টার বেতের লাঠিটা ঠুকলেন রাস্তার ওপর: হাঙর সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে আপনার? কোনদিন দেখেছেন হাঙর?

—আগে দেখিনি। এখানে এসে দেখছি। চারদিকেই দেখতে পাচ্ছি তাদের। আপনারা সবাই হচ্ছেন এক-একটা নাদাপেটা ভেট্‌কী মুখো হাঙর।—রামগতিবাবু জবাব দিলেন।

হেডমাস্টার বললেন, ইম্‌পসিবল। মানুষ কখনো হাঙর হয় না। হাঙরের নাদা পেট হতেই পারে না। হাঙর ভেটকীমুখো হয় না—হয় গ্রপার। গ্রপারকে অবশ্য নাদাপেটা ভেটকীমুখো বলা যেতে পারে। আপনি মাছ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

—জানি না তো বয়েই গেল—বলে হন হন করে রামগতিবাবু এগিয়ে গেলেন। পেছন থেকে হেডমাস্টার চিৎকার করে বললেন, আপনি আমার ছাত্র হলে টেস্টে কিছুতেই অ্যালাউ করতুম না।

কোনদিকে না তাকিয়ে রামগতিবাবু এবার সোজা নদীর ধারে চলে এলেন। খাসা জায়গাটি। পাথরের ওপর দিয়ে ফেনা তুলে নীল জল নেচে চলেছে। দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে—ঝিরঝির করছে পাহাড়ী ঝাউয়ের পাতা। কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না। এমন মনোমত জায়গা—বসে বসে নিশ্চিন্তে দু'খানা উপন্যাস আর দশ ডজন কবিতা লেখা যেত, কিন্তু ভজার জ্বালাতেই তাঁকে এখান থেকে পালাতে হবে মনে হচ্ছে। যা নয় তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—লোকে বোধ হয় পাগল বলছে তাঁকে। এরকম মারাত্মক ভক্তও লোকের জোটে—ওঃ!

তবু নদীর ধারে বসে থেকে মনটা খানিক শান্ত হল। তারপর এদিক

ওদিক ঘুরে, বস্তি থেকে সস্তায় একজোড়া মুরগী কিনে যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন বলতে কি, বেশ ভালোই লাগছিল রামগতিবাবুর।

কিন্তু ভালো লাগাটা বেশীক্ষণ রইল না। এক পেয়ালা চা খেয়ে কালকের কবিতাটা নিয়ে কেবল বসেছেন, আর লিখেছেন :

সেই সব ডিম যা স্বপ্ন দেখছিল বালির তলায়
ভাবছিল কবে ঘোড়া হয়ে উড়ে যাবে দিগন্ত সীমায়—

ঠিক তক্ষুনি কে ডাকল : রামগতিবাবু!

নিশ্চয় ভজু! খাতা রেখে তেড়ে বেরিয়ে গেলেন রামগতিবাবু কিন্তু এবারেও—এবারেও ভজনলাল নয়।

—আমি থানা থেকে আসছি।

বলবার দরকার ছিল না, চেহারা দেখেই সেটা মালুম হচ্ছিল রামগতির।

—আমার—আমার কাছে কী দরকার?

—আপনি আজ সকালে সাংচু নদীর ধারে গিয়েছিলেন?

রামগতি ঢোঁক গিললেন।

—তা গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যাওয়াতে যে কোনো দোষ—

—থামুন। সেখানে আপনি কুরপুন না তুরপুন দিয়ে মাছ মেরেছেন কেন? —থানার লোকটির স্বর এবার গুরুগম্ভীর।

—মাছ মেরেছি?—রামগতি আকাশ থেকে পড়লেন।

—হ্যাঁ, মেরেছেন। কী বলে—কী একটা কারপুন না চারপুন দিয়ে আপনি সব জায়গায় মাছ মেরে বেড়ান—এ কথা সবাই জানে। কেন মেরেছেন মাছ? জানেন, ওটা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডারে? জানেন, বিনা পারমিশনে ওখানে মাছ মারলে ফাইন হয়?

রামগতিবাবু হাহাকার করে উঠলেন : কখনো না—আমি মাছ মারিনি। বস্তি থেকে দুটো মুরগী কিনেছি কেবল। বিশ্বাস না হয়—

লোকটি বললে—হুম্। বিশ্বাসটা কাল কোর্টে গিয়ে করাবেন। বেলা ঠিক সাড়ে দশটায়। এই নিন সমন। মাছ না মুরগী কালকেই বোঝা যাবে সেটা।

সমন তো সমন! সেইটে হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন রামগতিবাবু। একেবারে নিটোল একটি উটপাখীর ডিমের মতোই।

পঁচিশটাকা ফাইন হয়ে গেল।

আর ফাইন দিয়েই বাসায় ফিরলেন রামগতিবাবু। তক্ষুনি কুলি ডাকলেন, বিছানা বাঁধলেন, তারপর গিন্নীর গালাগাল শুনতে শুনতে সোজা স্টেশনে। এখানে আর একদিনও তিনি থাকবেন না—এক মুহূর্তও নয়! দুদিনেই এই! চারদিন পরে তো তাহলে ফাঁসি যেতে হবে!

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, ঠিক সেই সময় কোত্থেকে ভজু এসে হাজির। সেই ভজনলাল পতিতুণ্ডি। সেই শাল কাঁধে, সেই নাকের নীচে মাছি মার্কা গোঁফ, সেই গোঁফের তলায় বিগলিত হাসি।

—একি স্যার—চলে যাচ্ছেন? এত তাড়াতাড়ি?—ভজনলালের গলায় মর্মান্তিক ব্যথা: দুদিন আপনাকে কাছে পেতে না পেতেই হারালুম!

রামগতিবাবুর গিন্নী ঘোমটার আড়াল থেকে গর্জাচ্ছিলেন: আ মর মুখপোড়া—লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! কিন্তু রামগতি গর্জালেন না, হুঙ্কার ছাড়লেন না—কিছুই বললেন না। কেবল দার্শনিকের মতো বললেন, কপাল!

ট্রেনের বাঁশি বাজল।

ভজু ব্যস্ত হয়ে কাছে এগিয়ে এল।

—স্যার, আপনার কলকাতার ঠিকানাটা? কলকাতায় গেলে দেখা করব।

আরও শান্ত হয়ে গেলেন রামগতিবাবু: জানলা দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দাও—বলছি।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

জানলায় মাথা গলিয়ে ভজু সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে: ঠিকানা—ঠিকানা?

—এই যে।

দুদিনের বহুযত্নে সঞ্চয়, বহু আকাঙ্ক্ষার ফল, অনেকদিন মাসল কণ্ট্রোলের পরিণাম ভজুর গালের ওপর নামল। একটি—একটি মাত্র চড়। কিন্তু কি সে চড়! এক ডজন বোমা ফাটার আওয়াজকেও ছাপিয়ে উঠল তার আওয়াজ!

—ই—ই—ই—

ভজনলাল গালে হাত দিয়ে সোজা প্লাটফর্মের ওপর বসে পড়ল।

ট্রেন চলছে! ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে এল। আঙুলের ব্যথাটা আর নেই—পঁচিশটা টাকার ক্ষতিপূরণ চড়টাতে হয়ে গেছে বলেই মনে হল। আর এই দু'দিন ধরে, বুকের ভেতর, তারপুন—না তুরপুন—না হারতুন—না কারপুন কী একটা সেই যে সমানে বিঁধছিল, সেটারও কোনো চিহ্ন এখন খুঁজে পাচ্ছেন না রামগতিবাবু।



কারুর ভালো করতে নেই ❋ শ্রী আশা দেবী

আমাদের পাড়ার গলির পথ ধরে হাঁটতে গেলে প্রথম যাঁর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে এবং কুশল প্রশ্ন বিনিময় হবে তিনিই আমাদের রাধামাধববাবু। দেখতে একেবারে গোলগাল ডানলোপিলোর বালিশের মতো, গায়ে কালো একটা ধুসো কোট,—হাতগুলো ছোট হতে হতে ব্লাউজের মত হয়ে গেছে। বোধ হয় সেটা ওঁর অন্নপ্রাশনের উপহার—হয়তো আদর করে কোনো মাসিপিসিই দিয়ে থাকবেন।

রাধামাধববাবু কোনো চাকরী করেন না—করতে ভালোও বাসেন না মোটেই। কাজেই সংসার চলবার জন্য কতকগুলো ফ্ল্যাট তৈরী করে রেখেছেন। তারই ভাড়ায় চলে তাঁর।

ভবানীপুরে তাঁর একখানা নতুন বাড়ী আছে। তারই এক তলায় থাকেন রাধামাধববাবু আর তার দোতলাটা ভাড়া দেন। রাধামাধববাবুর নির্ঝামেলার সংসার। একটি মাত্র ছেলে—কার্তিকের মতো চেহারা নিয়ে ময়ূরে চড়ে উড়ে গেছে সিমলা পাহাড়ে চাকরী করতে, আর তার স্ত্রী বিষয়বাসিনী দেবী ছেলের কাছেই থাকেন। রাধামাধববাবু অনেক চিঠি দিয়েছেন তাঁকে আসবার জন্যে। অনেক অনুনয় বিনয় করে বলেছেন 'নিজের রান্না করে খেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে' কিন্তু তবু তাঁর স্ত্রী বিষয়বাসিনী দেবীর মন দুর্গাপুরের স্টীলের মত শক্ত হয়েই থেকেছে। এবং পত্রোত্তরে লিখেছেন: মনে করো আমি মৃত—কখনও ফিরবো না।

রাধামাধববাবু একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। এতো ভালো লোক তিনি,

এত ভালো ব্যবহার করেন সবার সঙ্গে,—সদাহাস্য মুখে থাকেন, লোকের উপকার করবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত তবু কেন লোকে তাঁকে পছন্দ করে না? তাঁর ছায়া দেখলেই গলির ছেলেরা 'বাপরে—মারে' বলে বারাসতে পালায়;—টালার লোকে পালায় টালীগঞ্জে? তাঁর পুত্র সিমলায় পালালো, স্ত্রী বিষয়বাসিনী দেবী বিষণ্ণচিত্তে পালালেন আর তাঁর অমন সুন্দর নতুন বাড়িতে ভাড়াটে কিছুতেই টেঁকে না? এর কারণ কী—? রাধামাধববাবুর কোনই ত্রুটি নেই, অথচ ভাড়াটে থাকে না কেন? রাধামাধববাবু লক্ষ্য করেছেন তিনি যত বেশি ভালো ব্যবহার করেন তত তাড়াতাড়ি তাঁর ভাড়াটে পালায়।—তিনি ভাড়ার জন্যে তাড়া দেন না। দু চার মাস ভাড়া না দিতে পারলেও—হেসেই বলেন, 'তাতে কী, যখন পারেন দেবেন। তবু সেবার ভাড়াটে পনের দিন যেতে না যেতেই পালাল, বাড়া ভাত আর আলু পোস্তর চচ্চড়ি ফেলে দিয়ে। ভাত তরকারী না হয় তুচ্ছ—,বাসনের মায়াতেও বাড়ির ত্রিসীমানায় আর ঘেঁসলো না। রাধামাধববাবু আর কী করেন—তিনি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন, তারপর কাক তাড়ালেন—ধৈর্যচ্যুত হয়ে একখানা তালপাতার পাখা নিয়ে মাছি তাড়ালেন, তারপর আর কী করেন মনের দুঃখে আলু পোস্ত চচ্চড়ি আর ভাত নিজেই খেয়ে ফেললেন।

অনেকেরই মনে হতে পারে রাধামাধববাবুর বাড়িটা নিশ্চয়ই হানাবাড়ি—ভূতটুতের উপদ্রবে বাড়িতে লোকে আসে না, আর এলেও থাকে না। কিন্তু ওসব কিছু নয়;—বাড়ি খুব সুন্দর, তায় নতুন, ভূত থাকবার কোনো কারণই নেই। কারণটা একটু ভিন্ন রকমের। সেটাই আমার গল্পের বিষয়।

রাধামাধববাবু যখন যুবক তখন তিনি সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, কাজ ছিল তাঁর ক্যানভাসিং। বাড়িতে, গাড়িতে, ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে সর্বত্র তিনি এমন তোড়ে গলদঘর্ম হয়ে চোখ কপালে তুলে বক্তৃতা দিতেন যে তাঁর কাছে কেউ কিছু কিনবে কি, কাছেই ঘেঁসতে সাহস করতো না। লোককে যত বলতে চাইতেন জিনিসের গুণাবলী সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করে—লোকে 'ওই এলো' বলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর কথা বলার এম্নি অভ্যাস হয়ে গেল যে তিনি যাকে দেখতেন তাকে আর ছাড়তেন না। একেবারে গোড়া থেকে বোঝাতে সুরু করতেন।

একদিন তার কারখানার মালিককে বোঝাতে গিয়ে তাঁরও চাকরী গেল।

মালিকেরও হার্টফেল হবার উপক্রম! তারপর থেকে তিনি আর চাকরী করবেন না ঠিক করেছেন, বাড়ি ভাড়া দিয়েই চালাবেন।

কিন্তু ভালো উপদেশ তো আর বাক্সে ভরে রাখার জিনিষ নয়। সে—'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'—সুতরাং উপদেশ কারুকে দিতেই হবে—না দিলে চলবে কী করে—এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই দেখলেন রাস্তার ধারে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আর যায় কোথায়—; তিনি গুটি গুটি পায়ে সেখানে এসে বসলেন। বেশ ঘন হয়ে বসে খানিকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ানো দেখলেন। তারপর বুঝি-বুঝি মুখ করে একটু একটু মিট মিট করে হাসতে লাগলেন। শেষে খুব কোমল অথচ গম্ভীর গলায় সুরু করেছিলেন: কিচ্ছু হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না। আরে আমাদের ছোট বেলা—সেটা ঘুড়ি ওড়াবার স্বর্ণযুগ ছিল বলতে পারে। আমরা উঠতাম একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্তে—রাত চারটের সময়—। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের নাম ভক্তি করে স্মরণ করে মাঠের দিকে ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছুটতাম। ঘুড়ি ওড়ানো ছিল আমাদের একটা সাধনা।

তারপর সুরু হলো ঘুড়ির উৎপত্তি হলো কবে থেকে, কি করেই বা তার ক্রমবিকাশ ঘটলো তারই লোমহর্ষণ বিবরণ দিতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা মানে ঘুড়ির দেবতা—প্রকৃত পক্ষে কে? তিনি ঘোড়ায় না চেপে হাতীতে চাপেন কেন? আর চাপেনই যদি তবে তাতে যথারীতি হওদা নিয়ে বেশ আরাম করে বসেন না কেন?—আরাম যদি তাঁর পছন্দই না হয় তাহলে হাতীর লেজ ধরেও ঝুলতে পারতেন, কারণ ঘুড়ি ওড়াবার পদ্ধতির মধ্যে যে ঘুড়িতে সুতো দিয়ে বাঁধা হয় গবেষণা করে দেখলেই বোঝা যাবে বিশ্বকর্মা হাতীর লেজ ধরে না ঝুললেও পরে নিশ্চয়ই ঝুলবেন, এমন একটি সম্ভাব্য ইঙ্গিত আছে। বিশ্বকর্মার বাবার নাম নিয়ে নানা মতদ্বৈধ থাকতে পারে তবে গুণীজনের মতই আমরা গ্রহণ করবো। বিশ্বকর্মার ঠাকুরদাদার কাকার পা একটু খোঁড়া ছিল, তাতে কী এসে যায়। বর দিতে তো আর পায়ের দরকার হয় না—হাতই যথেষ্ট। তবে আমাদের পাড়ার যে বিশ্বকর্মা পুজো হতো তার কি করে একটা হাত যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল আর সেবার 'আমি—তোদের কী বলবো' বলতে বলতেই খ্যাক্-খ্যাক্ ফোঁ ফোঁ করে শেয়ালের মত হাসতে লাগলেন—'বলবো কি ঝপাং করে বিশ্বকর্মা বিসর্জনের দিন গঙ্গার জলেই পড়ে গেলাম।'

জ্ঞানের কথা শুনতে শুনতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে সবাই পালিয়ে যায়, কিন্তু যাতে গল্পটি শ্রোতার অভাবে পণ্ড না হয়, সে জন্য যে দুটি ছেলেকে দু'হাতে চেপে রেখেছেন তারা মুরগীর বাচ্চার মত পাখা ঝটপট করছে—আর সামনে চেঁচাচ্ছে: 'ছেড়ে দিন—মরে যাবো—মরে যাবো—'

'মরবি কেন?' রাধামাধববাবু খেঁকিয়ে ওঠেন: ভালো কথা—জ্ঞানের কথা শুনলেও ভাল হয়! তাতো বুঝবি না কেবল 'মরবো—মরবো' বলে চ্যাচাচ্ছিস। মরতে যাতে না হয় তার জন্যে ডাক্তার আছে; তবে চল ডাক্তারের কাছে: তোর বুকটা আজ আমি না দেখিয়ে ছাড়বো না; তোরা কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ—! জাতিই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আমরা দাঁড়াবো কোথায়—? তোদের উদ্দেশ্য করেই তো কবিগুরু গেয়েছেন—'ইহাদের কর আশীর্বাদ—অ—অ—'

একজন আলুর খোসা ছাড়াবার মত করে নিজের জামা খুলে ফেলে এবং আর একটি হঠাৎ রাধামাধববাবুকে কুতুকুতু দিয়ে এমন ছুট দিলো যে কার সাধ্য তাদের ধরে। রাধামাধববাবু সমানে—'পালালো—পালালো ধর—ধর' বলে ছুটলেন কিন্তু তাদের ধরে সাধ্য কার!

আর রাধামাধববাবুর ভাড়াটেরা কেন থাকে না তার কথা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে যখন তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন ঠিক তখনই এক একটি ভাড়াটে আসে। এবারও একটি এলো। লোকটির নাম দুঃখহরণ। সরকারী চাকুরী, বাইরে থেকে বদলী হয়ে রাত চারটের গাড়িতে এসে পৌছুলেন সস্ত্রীক।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন রাধামাধববাবু নিজেই। তরতর করে উপরে উঠে গিয়ে চাবির গোছা এনে দুম দাম করে সব ঘর খুলে দিলেন, তারপর ব্যতিব্যস্ত হয়ে মুটের মাথার থেকে মালপত্র নামাতে লাগলেন। ভাড়াটে তো একেবারে হতভম্ব। ভাড়াটে গিন্নী বললেন: 'থাক থাক, রাখুন রাখুন, ওর মধ্যে কাঁচের বাসন আছে।' বলতে না বলতে একেবারে দুম করে বাক্স সুদ্ধ মেজেতে ফেলে একেবারে চুরমার! গিন্নী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন আর সেই মুহূর্তে রাধামাধববাবু আধটিন সরষের তেল হন্তদন্ত হয়ে গোছাতে গিয়ে উল্টে ফেলে দিতেই ভাড়াটের ছেলে তাতে পিছলে দুম ক'রে ধরাশায়ী হলো। কিন্তু রাধামাধববাবুকে ঠেকাতে পারে এমন লোক দুর্লভ। তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটার হাত ধরে টেনে নিয়ে তিন মাসের বাসি

চৌবাচ্চার জলে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে আনলেন। আর এ সব শেষ হলে বাইরে আসতেই দেখলেন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে খোদ ভাড়াটে—যেন মরে গেছে। এই সুযোগ, তিনি অমনি চট করে এসে পড়লেন—পাশেই একটা কালো ট্রাঙ্ক পড়েছিল তার ওপর বসে সুরু করলেন: কোথায় কোন ফার্নিচার রাখালে বেশ ভালো দেখাবে; চায়ের সঙ্গে কী-কী খাওয়া উচিত—মানে, ডিম, রুটি, বিস্কুট জ্যাম সম্পর্কে উপদেশ দিতে লাগলেন। তারপর হয়তো বলতে লাগলেন জগুবাবুর বাজারে কে ভালো মাছ বেচে, কে ঠকায়, কে টাটকা পালং শাক বেচে, কার দোকানের ডাল সেদ্ধ হয় না।

ভাড়াটে গিন্নী ছুটে এসে বললেন: 'দয়া করে আপনি একটু থামুন, ওঁর শরীর বড্ড খারাপ করছে!' কিন্তু রাধামাধববাবু নির্বিকার—এখনও তাঁর অনেক কর্তব্য বাকী আছে বলেই তিনি মনে করেন। সুতরাং সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে না থাকলে বিদেশী লোক কখন কি অসুবিধা হবে কে জানে! কাজেই ওঁর ভদ্রতা করে চলে যেতে বললেই কি আর চলে যাওয়া যায়? না ভদ্রলোকের তা যাওয়া উচিত? তার ওপর এঁরা তাঁর নিজেস্ব ভাড়াটে, কত দিন পর এসেছে এরা যদি চলেই যান?

সুতরাং কাল সকালে উঠে কি কি সম্ভাব্য অসুবিধা হতে পারে গল্প ও উপদেশ—উপদেশ আর গল্প দিয়ে ওঁদের মনটাকে একটু সরস করতে হবে। তার ওপর যে জায়গা ছেড়ে ওঁরা এসেছেন তার জন্যেও তো মন খারাপ করা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই ওঁদের মনোরঞ্জনের জন্য সুরু করলেন; ট্রাম থেকে কী ভাবে নামতে হয়—তিনি একবার চলন্ত ট্রাম থেকে উল্টো দিকে মুখ না করে নেমে কি হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিলেন। ভাতের ফেন ফেলে দিতে দিতে কি করে মৌর্যবংশ ধ্বংস হয়ে গেল আর যেন কী একটা ইতিহাসের সুদূর ক্ষীণ চিন্তা তাঁর মনে আসতে না আসতে তিনি মোহন-বাগানের কথায় এলেন এবং তাঁর ছোটবেলায় কারা কারা খেলতো তাদের মধ্যে কে কী খেতে ভালোবাসতো—কে তাঁর বাড়ীর পাশের ঘরের ভাড়াটে এই সব বেশ করে গুছিয়ে বলে শেষে সুরু করলেন ষাঁড়ের কথা। আগে খানিকটা নিজেই হেসে দিলেন তারপর বললেন; কী বদমেজাজী আর রাগী একটা কালো ষাঁড় থাকতো রমেশ মিত্তির রোডে। শোনা যায় সে নাকি শিবকে এক ঝাঁকুনিতে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তার বাবাকে পর্যন্ত তেড়ে গুঁতোতে গিয়েছিল। আর শুধু তাই? তার চোখের সামনে যে পড়তো

তাকেই সে গুঁতোতো, বলেই তিনি একটা হুঁকোর সন্ধানে ওপরে চলে গেলেন।

ভাড়াটে গিন্নী বললেন : 'বেশ হয়েছে, খুব শিক্ষা হয়েছে, আর নয়—এখুনি হোটেলে গিয়ে উঠবো। গাড়ি ডাকো এখুনি।'

রাধামাধববাবু এবার কিন্তু মনে ভারি কষ্ট পেলেন। কিন্তু কী করেন, সবই অদৃষ্ট। কত গনৎকারকে হাত দেখান—তাঁর হাতে ভাড়াটের রেখা কেমন, সবাই বলে, 'অত্যন্ত ভালো' কিন্তু তবু ভাড়াটে টেঁকে না কেন ?

তিনি এবার ঠিক করলেন। তিন দিনের মধ্যে যদি কেউ ভাড়াটে হয়ে আসে তিনি তাকে দু মাস বিনা ভাড়ায় রাখবেন। এই কথা শুনে এক হাড়-কৃপণ ভাড়া নিয়ে দাঁত কামড়ে পড়ে রইল দু মাস। তারপর একদিন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো :

'সহসা নিদ্রার বশে নাসারন্ধ্রে কটাং কটাং
মনে হলো অকস্মাৎ যেন কোন ওরাং ওটাং
নাসিকায় বাঁধিয়াছে বাসা'—তার কবিতা আর শেষ হলো না, দু মাসের দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার ফল স্বরূপ এখন সে টিকিট কেটে রাঁচীর পাগলা গারদে বাস করছে।

তারপর থেকে বাড়ি খালিই পড়ে আছে। রাধামাধববাবু বহু চেষ্টা করেও কোন ভাড়াটে জোগাড় করতে পারেনি। রাধামাধববাবু যখন হয়রাণ হয়ে পড়লেন তখন একদিন হঠাৎ কোথা থেকে এক ভাড়াটে এনে ফেলেন। নাম বজ্রধ্বজবাবু।

দেখতে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ গভীর লোমে আচ্ছাদিত পেশল বাহু। বাটারফ্লাই গোঁফের মতো বাহারী ভুরু। মুখের চেহারা গম্ভীর এবং ভয়ানক রকম গম্ভীর। নিঃসন্তান একাই থাকেন। হাঁসখালিতে ডিমের ব্যবসা করেন। কি যেন কাজে মাস দুই কলকাতায় থাকতে হবে তাই এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া। চোখ দুটো গোল, সাইকেলের চাকার মতো সর্বদাই ঘুরছে।

রাধামাধববাবু গুটি গুটি এগিয়ে এলেন। দেখলেন বজ্রধ্বজবাবু বেশ নির্বিকার চেয়ারে বসে আছেন। তিনি আর একটু এগিয়ে এলেন। এবারও বজ্রধ্বজবাবু তেমনি নির্বাক নিবাত প্রদীপের মতই বসে রইলেন উদাস হয়ে—ডাকলেনও না, বসতেও বললেন না। রাধামাধববাবু মনে মনে যেন কেমন

একটু সাহস পেলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন; বার দুই একটু কুঁই কাঁই করলেন তারপর একটু নিজে নিজেই হাসলেন যেন কত হাসির কথা তাঁর মনে পড়েছে। তারপর বলতে সুরু করলেন: মানে ধরুন ভিটামিন এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?—নিশ্চয়ই কিছুই না। কিন্তু আমি এ নিয়ে বরাবরই চিন্তা করি। কারণ ভিটামিন ছাড়া খাদ্য আর অখাদ্য সমান। আর দেখুন, পাড়ায় বড্ড কাকের উৎপাত হয়েছে মশাই। ওদের জন্যে ঝাঁটা, চামচ, জুতোর ফিতে কিছুটি রাখবার উপায় নেই—দেখলো কি নিয়ে গিয়ে বাবা বেঁধে ফেললো। সেদিন তো আমার পায়ে থেকে এক পাটি মোজাই খুলে নিয়ে চলে গেল। তাড়াতে গেলে তো চটে মাথার ওপর টক টক করে টোকা দিতে আসে। কলকাতায় যখন ট্রাম ঘোড়ায় টানতো তখন আমার পিসিমা থাকতো কালীঘাটে নাম 'অনিল'। তার মাথায় ছিল এক বিরাট টাক—

এদিকে বজ্রধ্বজবাবু সেই রুদ্ধশ্বাসে বলা গল্প শুনতে লাগলেন। তাঁর বাটারফ্লাই গোঁফের মত ভুরু ঘন ঘন নাচতে লাগলো চোখ ক্রমে গোল আর লাল হতে লাগলো এবং তিনি হঠাৎ সিংহের মত একটা গর্জন করে উঠলেন, সেই গর্জনে রাধামাধববাবুর পিসিমা 'অনিলের' টাকের গল্প বন্ধ হয়ে গেল, হাত থেকে নস্যির ডিবেটা পড়ে গেল আর একটা দাঁড়কাক টক করে সেটা ঠোঁটে করে নিয়ে উধাও হলো!

গোল চোখ ফুটবলের মত আরো পরিপূর্ণ গোলাকার করে চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে বজ্রধ্বজবাবু বললেন: ডাক্তার বলেছিল আমি বেশি কথা বলি তাই আমার মাথার দোষ হয়েছে। ঠিক করেছিলাম রাঁচী থেকে ফিরে আর কথা বলবো না। ডাক্তার আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যেন আমি কথা আর না বলি কিন্তু এখন দেখছি সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা গেল না। তবে শুনুন রাধামাধববাবু গোড়া থেকেই। জেনে নিন, ডিমের ব্যবসার নিয়ম কি।

বলেই বজ্রধ্বজবাবু বজ্র বাহুতে রাধামাধববাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে মাইক-বিনিন্দিত কণ্ঠে মহতী চিৎকার সহকারে একেবারে সূচনা থেকেই বক্তৃতা দিতে লাগলেন। শুনুন, ডিমের কথা জানতে হলে আগে জানা দরকার হাঁসের কথা। 'হাঁস এক প্রকার পক্ষী বিশেষ—জলে সাঁতার দেয় ও মানুষকে ডিম খাওয়াইয়া রাখে'—বইয়েতে এ সব কথা

লেখা থাকলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে হাঁসকে ভগবান ডিম পাড়বার জন্তেই সৃষ্টি করেছেন। হাঁসের ডিম খেতে অত্যন্ত উপাদেয়—এতে ওমলেট হয়, ডালনা হয়, সেদ্ধ খাওয়া যায়, ডেভিল হয়, চপ-কাটলেট, মোগলাই পরোটা—সবেতেই লাগে। হাঁসের ডিমকে সাহেবরা নিরামিষ খাবার বলে, আমি বলি ব্রজের আলু। মুখে দিলেই একেবারে রসগোল্লার মত মিলিয়ে যেতে চায়।

রাধামাধববাবু আর পাচ্ছেন না। তিন ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে সে কি দানবিক চিৎকার। মাথা ঘুরছে—দু কান ফেটে যাচ্ছে। তিনি দাপাদাপি করতে লাগলেন, চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন, বজ্রধ্বজবাবুকে আঁচড়াতে লাগলেন। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে শিলাবৃষ্টিতে কী ক্ষতি হয়।

ঠিক এমনি সময়ে একটা মশা কুটুস করে বজ্রধ্বজবাবুর নাকে কামড়ে দিতেই বজ্রধ্বজবাবু দু হাত তুলে যেই মারতে গেলেন আর অমনি সেই ফাঁকে রাধামাধববাবু তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে এক ছুটে একেবারে বেরিয়ে এলেন। আর এক ছুটে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি চেপে সোজা শেয়ালদহ।

বজ্রধ্বজবাবুও আর একটা ট্যাক্সি ভাড়া ওঁর পেছু নিলেন। একটা লোককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, একটা লোককে আহত করে বিনা টিকিটেই উঠে পড়লেন একটা চলন্ত ট্রেনে।

বজ্রধ্বজবাবু এসে পড়লেন কিন্তু তাঁর গাঁটে গাঁটে বাত তাই ছুটে এসেও গাড়ি ধরতে পারলেন না। সামনে চিৎকার করে বলতে লাগলেন : আপনি আমার বক্তৃতাটা শুনতে না পেয়ে যে কী ক্ষতি করলেন তা আমি কি বলবো। অনেকেই জানে না যে তারা কী হারাচ্ছে। তবু আমি চেষ্টা করবো সংক্ষেপে যতটা পারা যায় ততটাই বলি।

হাঁসকে আমরা পাখির মধ্যে সব চেয়ে বেশী মর্যাদা দি। রাজহাঁসের পিঠে সরস্বতী বসে থাকেন তাঁকে কামড়াতে চেষ্টা করলেই বীণার প্রহারে সায়েস্তা হয়—এই হাঁস—

গাড়ি ততক্ষণ 'ধর—ধর—ধর পাকুর-পাকুর' বলতে বলতে গোবর ডাঙ্গার দিকে যাত্রা করছে।

রাধামাধববাবু এখন গোবর ডাঙ্গাতেই থাকেন। এখানে একটা মঠ করেছেন—আর তাতে তিনি মৌনীবাবা—কারো সঙ্গে আর কথা বলেন না।

যা নয় তাই

*

শ্রী হাসিরাশি দেবী



টাগডুমাডুম ডুম,—
হোগ্‌লাবনের ফোক্‌লা বুড়ো খোকার আনো ঘুম।
ঘুম আনো না বোঝাই করে উড়িয়ে দিয়ে পাল,
আকাশে মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে, মুঠোয় ধরে হাল;
ঘুম আনো সাত সমুদ্দ্‌রের তুফান দিয়ে পাড়ি—
ছিষ্টি ভোলা মিষ্টি আনো—ভর্তি করে হাঁড়ি॥
টাগডুমাডুম ডুম—
খোকার আনো ঘুম।—
সোঁদর বনে বাঘ ডাকে ঐ—'হালুম-হালুম।'
সেই বনে রয় জলে কুমীর,—ডাঙ্গায় থাকে সাপ,
হায়না হাসে—হাঃ হাঃ—হিঃ হিঃ, বানরে থায় ঝাঁপ।
আরো আছে ব্যাঙ-ব্যাঙাচি, কোকিল কাকাতুয়া—
শিয়াল বলে,—"ডরছো ক্যানো? ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?"
বন-মোরগে 'কোঁকর কোঁকর'—ডাকছে ঘুরে ঘুরে—
সুঁদুরী পাতায় সবুজ নাচে সেখানে রোদ্দুরে।
রাত দুপুরে চেঁচায় পাখী, প্যাঁচায় বলে 'হুম্',
হোগ্‌লাবনের ফোক্‌লা বুড়ো,—খোকার আনো ঘুম॥



নন্তুর ভাবনা

শ্রী রণজিৎকুমার সেন

সোনা গেল, সোনার মতো দেশটা তো এই কবেই গেছে,
সবাই মিলে সবাইকে আজ পারছে যত ফেলছে প্যাঁচে।
চারদিকে আজ ডামাডোল আর এলোমেলোর বাজার দেখে
নন্তু ভাবে কষ্ট করে পাঠ্য কেতাব কে আর শেখে ?
শিক্ষকেরা ধর্মঘটের জাল ফেঁদেছে রাস্তা জুড়ে,
ছাত্র এবং ছাত্রী মিলে গান ধরেছে নতুন সুরে।
ছত্রখানের এমন খাসা দিন ছিল আর কোথায় কবে,
এই বাজারে সে-ই তো নেতা—চেঁচায় যে খুব উচ্চরবে।
ধানের দেশে ধান ফলে না, পেট পুরে কেউ পায় না ভাত ;
চিড়ে মুড়ির দিন কেটেছে, এখন শুধু কথায় মাৎ।
নন্তু ভাবে গলার জোরে মাৎ করে দেয় বাংলাটাকে,
আইন সভাতে পাকাপাকি নেয় বুঝে তার আসনটাকে ;
তারপরেতে এক লাফাতেই পারবে হতে মিনিষ্টার,
ফাইল ঘেঁটে সে বুঝিয়ে দেবে দাম কত কোন্ জিনিষটার।
রাজা নেই তাই রাজভোগেরও দিন গেছে আজ শহর থেকে,
রসগোল্লা—রাব্ড়ি—ছানা সব কিছু আজ বসলো বেঁকে।
মিষ্টি মধুর বাংলা জুড়ে ছিল কতই মিষ্টি খাবার,
নতুন করে নন্তুবাবু ফিরিয়ে সে-সব আনবে আবার।
তখন বুঝি তার মতো সব তরুণ কিশোর বালক সবে
নন্তুবাবুর বিজয়-গাথা গাইবে নতুন মহোৎসবে !!



দৈত্যের দেশে রাজকুমার * শ্রী প্রভাসরঞ্জন দে

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক রাজ্যে এক রাজা ছিল, আর এক রাজকুমার। রাজকুমারের জন্মের কিছুদিন পরেই তার মা মারা যায়, রাজা আবার বিয়ে করেছিলেন। রাজকুমারের নতুন মা রাজকুমারকে খুব ভালবাসে।

রাজকুমারের খুব ইচ্ছে নদীতে যায় মাছ ধরতে কিন্তু রাজা তার একমাত্র ছেলেকে একা নদীতে যেতে দিতে রাজী নয়। শেষে রাজা একদিন অনুমতি দিলেন, আর রাজকুমারের সঙ্গে দিলেন এক জেলেকে।

রাজকুমারের মন খুব খুশী হল, জেলেকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে গেল, সারাদিন অনেক মাছ ধরল। সন্ধ্যায় ফিরে এল ঘাটে। নৌকা থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়েই মনে পড়ল তার রুমালটি ফেলে এসেছে। রুমালটি নিয়ে আসার জন্য নৌকায় ফিরে গেল। রাজকুমার নৌকায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টানে নৌকাটি চলতে সুরু করল। নৌকাটি চলেছে ত চলেছে, দেখতে দেখতে অনেক দূর চলে গেল। ধীরে ধীরে রাত হয়ে এল। রাজকুমার এক সময় নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হলে রাজকুমারের ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ খুলে চারদিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। চারদিকে সব কিছু সাদা, নদীর চড়ায় নৌকাটি আটকে রয়েছে। নৌকা থেকে নেমে রাজকুমার এগিয়ে চলল বনের দিকে।

কিছুটা পথ এগিয়ে গেলে এক বুড়োর সঙ্গে দেখা হল। সে রাজকুমারকে দেখে অবাক হয়ে গেল, জানতে চাইল কি ভাবে সে এখানে এসেছে। রাজকুমার তাকে সব কথা বলল।

সব শুনে বুড়ো বলল—"দৈত্যরা তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। সুযোগ পেলেই তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি এগিয়ে যাও। যেতে যেতে দেখতে পাবে তিনটি মেয়েকে যাদের শরীর বালিতে ঢাকা। ঐ তিনটি মেয়ে এই রাজ্যের রাজার মেয়ে। তিন দৈত্য তিন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজকন্যারা রাজী না হওয়ায় দৈত্যরা তাদের ধরে এনে ওই অবস্থায় রেখেছে। তোমাকে দেখতে পেলে মেয়েরা তোমার সাহায্য চাইবে। প্রথম দুটি মেয়েকে এড়িয়ে যাবে। তৃতীয় মেয়েটি ছোট রাজকুমারী। তার কথা মত কাজ করলে তুমি দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে, আর তিন রাজকুমারীও মুক্তি পাবে।"

বুড়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজকুমার এগিয়ে যায়। কিছুটা পথ যেতেই দুটো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় যাদের শরীরের প্রায় সবটুকুই বালিতে ঢাকা। মেয়ে দুটো রাজকুমারকে দেখতে পেয়ে তার সাহায্য চাইল। রাজকুমার তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না, এগিয়ে গেল। আরও কিছুটা পথ গেলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল, এই হল ছোট রাজকুমারী। সে বলল যদি রাজকুমার তার কথা মত কাজ করে তবে দৈত্যের হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে।

রাজকুমারী বলল—"কিছুটা পথ এগিয়ে গেলে বনের ভেতর একটা প্রাসাদ দেখতে পাবে, প্রাসাদের দরজায় দেখতে পাবে দুটি সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা দেখে ভয় পেলে চলবে না। সিংহ দুটির মাঝে যে পথটি রয়েছে সেটি দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে যাবে। সিংহ দুটি তোমার কিছুই করবে না। পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা অন্ধকার ছোট ঘর দেখতে পাবে। সেই ঘরে তোমাকে শুয়ে থাকতে হবে। রাতে সে ঘরে তিন দৈত্য আসবে, তোমাকে কামড়ে খেতে। দেখতে পাবে ঘরের দেওয়ালে রয়েছে একটা তরবারি আর একটা শিশি। তখন তুমি তরোয়াল দিয়ে দৈত্যকে মেরে ফেলবে। শিশিতে রয়েছে ওষুধ, আঘাতের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দিলে আবার সুস্থ হয়ে যাবে।"

"তুমি যা বললে তাই করব"—বলে রাজকুমার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে এক সময় রাজকুমার প্রাসাদে হাজির হল। দেখতে পেলে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো সিংহ। সিংহ দুটির মাঝ দিয়ে সে এগিয়ে গেল। সিংহ দুটি কিছুই করল না। রাজকুমারীর কথা মত অন্ধকার ঘরে পৌঁছে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

গভীর রাতে সে ঘরে তিন দৈত্য হাজির হল। চেহারা দেখলেই ভয় হয়, দৈত্য রাজকুমারকে কামড়াতে এল। তখন তলোয়ারটি নিয়ে সে দৈত্যদেরকে টুক্‌রো টুকরো করে ফেলল।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন রাজকুমারী প্রাসাদে ছুটে এল। ধন্যবাদ জানাল রাজকুমারকে। রাজকুমার ঐ প্রাসাদে বাস করতে লাগল। কিছুদিন পরে ছোট রাজকুমারীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। বেশ সুখেই তার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে অনেক দিন চলে গেল। রাজকুমারের মন চায় তার বাবা-মাকে দেখতে। তার মুখে হাসি দেখা যায় না, সকল সময় কি যেন ভাবে। রাজকুমারী বুঝতে পারল, বলল—"তুমি ফিরে যাবে যাও, তবে তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও তোমার বাবা তোমাকে যে কাজের কথা বলবেন তুমি তা করবে। কিন্তু তোমার সৎমা যা বলবেন তা তুমি করবে না।"

রাজকুমার বলল—"তাই হবে।"

রাজকুমারী একটি আংটি দিয়ে বলল—"এ আংটির কাছে যা চাওয়া যাবে তাই পাওয়া যাবে। কিন্তু দু'বারের বেশী আংটিটি কাজ করবে না।"

রাজকুমার প্রাসাদ থেকে বের হল। বাইরে এসেই সে আংটিকে বলল—"বাবার কাছে পৌঁছে দাও।" সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির হল সুন্দর একটি পাখী। সে পাখীর পিঠে উঠে বসল। পাখী উড়ে চলল। দেখতে দেখতে রাজকুমার পৌঁছে গেল নিজের দেশে। প্রাসাদের দরজায় রাজকুমারকে নামিয়ে দিয়ে পাখীটি চলে গেল। রাজা ও রাণী অনেকদিন পরে রাজকুমারকে ফিরে পেয়ে খুব খুশী হল, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ভরে গেল।

রাণী রাজকুমারের কাছে দৈত্যের দেশের সব গল্প শুনল। বলল "ছোট রাজকুমারীকে প্রাসাদে নিয়ে এস—আংটিকে এই আদেশ করলেই আংটি রাজকুমারীকে এই প্রাসাদে পৌঁছে দেবে।"

রাজকুমার তখনই আংটিকে আদেশ দিল রাজকুমারীকে নিয়ে আসার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ছোট রাজকুমারী সেখানে হাজির হল। রাজকুমারী বলল—"তুমি

কথা রাখতে পারলে না। যা হোক আমার আর এখানে অপেক্ষা করা সম্ভব নয় এখনই আমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমাকে যে আংটিটি দিয়েছিলাম সেটি আমাকে ফিরিয়ে দাও। ও আংটি আর কোন কাজে লাগবে না।"

রাজকুমার আংটিটি ফিরিয়ে দিল। রাজকুমারী তখন তার নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিয়ে বলল—"এটি কাছে রেখে দাও। তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছিল এটিই হল আমার প্রমাণ। আমার আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমি প্রাসাদে ফিরে চললাম, তোমার জন্য আমি পথ চেয়ে থাকব।"

ছোট রাজকুমারী অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজকুমারও মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাসাদ থেকে বের হল।

রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে বহু গ্রাম মাঠ নদীকে পেছনে রেখে রাজকুমার এগিয়ে যায়। এসে পড়ল এক পাহাড়ের চূড়ায়, সেখানে এক বুড়োর সঙ্গে দেখা। রাজকুমার বুড়োকে বলল "এমন দেশটি তার জানা আছে কি যেখানকার সবকিছু সাদা।" বুড়োর জানা ছিল না। সে সব বনের পশুদের ডেকে পাঠাল। পশুরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু পশুদের কেউ সে দেশের কোন সন্ধান দিতে পারল না। বুড়ো তখন রাজকুমারকে এক জোড়া জুতো দিয়ে বলল "জুতো দুটো পায়ে দিলে বাতাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবে তুমি সাত সাগর পার হয়ে আমার ভাইয়ের কাছে। সে পাখীদের রাজা। আমার ভাই হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারে।"

রাজকুমার জুতো পায়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে সাত সাগর পার হয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় হাজির হল। চূড়ায় বসে ছিল এক বুড়ো, পায়ের জুতোটি দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল ছেলেটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছে। রাজকুমার বুড়োকে বলল সব কথা। বুড়ো সব পাখীদের ডেকে পাঠাল। পাখীরা অনেক দূর দূর দেশে ঘুরে বেড়ায়, হয়ত তাদের কারও সে দেশের কথা জানা থাকতে পারে। কিন্তু পাখীদের কেউ সে দেশের কোন সন্ধান দিতে পারল না। বুড়ো তখন বলল—"সাত সাগর পার হয়ে গেলে যে সমুদ্র পাবে সেখানে আমার আর এক ভাই থাকে। আমার ভাই হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারে।"

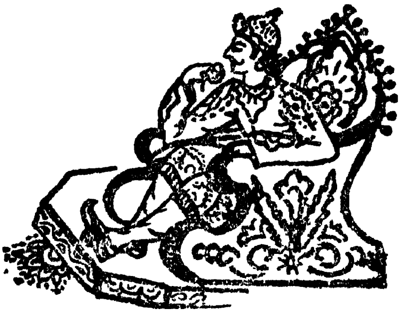
রাজকুমার আবার জুতো পায়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে সাত সাগর পার হয়ে গেল। সাগরের তীরে এক বুড়ো বসেছিল সেখানে রাজকুমারকে পৌছে দিল। রাজকুমার বুড়োকে প্রণাম

করে সব কথা বলল, বুড়ো তখন সব মাছেদের ডেকে পাঠাল। এক বুড়ো মাছ বলল—ঐ দেশটিকে সে চেনে, ঐ দেশের রাজকুমারী এক রাজকুমারকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু রাজকুমার তার দেশে ফিরে গিয়েছে আর রাজকুমারী তারই জন্য পথ চেয়ে বসে রয়েছে।

রাজকুমার বুঝতে পারল এ আর কেউ নয়—ছোট রাজকুমারী। বুড়ো তখন বললো ঐ দেশে রাজকুমারকে পৌছে দেবার জন্য। রাজকুমার মাছের পিঠে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাছটি জলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল। চলতে চলতে রাজকুমার দেখল সে রাজকুমারীর দেশে পৌছে গিয়েছে। রাজকুমারকে দেখে রাজকুমারীর মন খুশীতে ভরে গেল। সেদিন থেকে রাজকুমার রয়ে গেল সেখানে। বেশ সুখে শান্তিতে তার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

* নরওয়ের রূপকথা

ব্রহ্মদেশে লড়াই চলছে, এমন সময় একদল দেশী পদাতিক এলো ব্যারাকপুরে। ৪৭নং দেশীয় পদাতিক দল। তারা কালাপানি পার হয়ে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলো। সকালবেলা ব্যারাকপুরে কুচকাওয়াজ করার সময় সেনাপতি স্যার এডোয়ার্ড প্যাগেট নির্দেশ দিলে গুলি চালাতে। পিছন থেকে ইউরোপীয় সৈন্যরা গুলি চালালো। সেইখানেই ৬০ জন গুলি খেয়ে মরলো। বাকী সব পালালো। বারো-চৌদ্দ জনকে ধরে ফাঁসী দেওয়া হলো। সে ১৮২৫ সালের ৩রা নভেম্বরের ঘটনা।



এক যে ছিল—

শ্রী চণ্ডী লাহিড়ী

এক যে ছিল রাজা
সে একলা খেত খাজা,
গরীব মানুষ চাইতে গেলে
দিত কঠোর সাজা।
সে মানতো একটি আইন
নালিশ করলে ফাইন,
ভোর না হতে ফাঁসি ঘরে
জমত লম্বা লাইন।

এক যে ছিল পুলিস
সে ভাবত সবাই ফুলিস,
গোঁপ ছিল তার ঝাঁটার মত,
চোখটি কঠোর কুলিশ।
সে গিলত রুটি গোস্ত,
গাল দিত খুব চোস্ত,
চোরেরা সব ছাড়ল চুরি
(কারণ) ঘুষ দিতে সব খসতো।

এক যে ছিল রাণী
সে মাথায় ঘোমটা টানি
পরমান্নে লঙ্কা ফোরণ
দিত চটিখানি।
সে অমাবস্যার রাতে
ভাঙ্গা মাজার বাতে
কবরেজী ঘি করত মালিস
দালদা দিয়ে সাথে।





'গ্রহণ * শ্রী মণীন্দ্র দত্ত

আজ ক্লাস সিক্সের প্রমোশন।

অতি বড় দুষ্টু ছেলেও আজ চুপটি করে বসে আছে ক্লাসে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কখন হেডমাষ্টারমশাই ক্লাসে ঢুকবেন প্রমোশনের লিষ্ট হাতে নিয়ে।

একধারে চুপ করে বসে আছে নালক। সেও পড়ে ক্লাস সিক্সে। আজ তার প্রমোশন।

বাড়ি থেকে আসবার সময় মাকে প্রণাম করতেই মা ওর মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন পূজার প্রসাদী ফুল। তার পর সেই ফুল গুঁজে দিলেন কানে। বললেন : বংশের মুখ উজ্জ্বল করো বাবা! আমার দুঃখু ঘুচুক।

মায়ের হাসি-অশ্রুর আলো-ছায়া খেলা মুখখানিই বারবার মনে পড়ছে নালকের। ও শুধুই ভাবছে : পাশের খবর নিয়ে বাড়ি ফিরলে মায়ের মুখখানা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে খুসির দীপ্তিতে।

ঘরে ঢুকলেন হেডমাষ্টারমশাই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালো ছেলেরা। হেডমাষ্টারমশাইয়ের উদ্যত তর্জনীর ইঙ্গিতে সবাই বসলো যার যার আসনে। গম্ভীর মুখে হেডমাষ্টারমশাই খুললেন প্রমোশনের তালিকা। গম্ভীরতর কণ্ঠে একে একে পড়তে লাগলেন উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম। তার মধ্যে তৃতীয় নাম নালকের।

ময়ূরের মতো নেচে উঠলো নালকের মন। সেই মুহূর্তে উড়ে যেতে চাইল মায়ের চরণতলে।

হেডমাষ্টারমশাই চলে গেলেন ক্লাস থেকে। কারু সঙ্গে কোন কথা না বলেই বাড়ির পথে ছুটলো নালক।

নালকের বাবা সামান্য চাকরি করেন। যে মাইনে পান তাতে কোন মতেই সংসার চলে না। ধার দেনায় তিনি জর্জরিত।

বাড়ি পৌছতে নালকের কানে গেলো বাবা-মার আলোচনা।

মা বললেন: কিন্তু পরীক্ষায় যদি নালক পাস করে—

বাবা বললেন: যদি নয় বড়বৌ, পাস নালক করবেই, সে আমি ঠিক জানি।

মা বললেন: তাহলে তো ওর পড়ার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

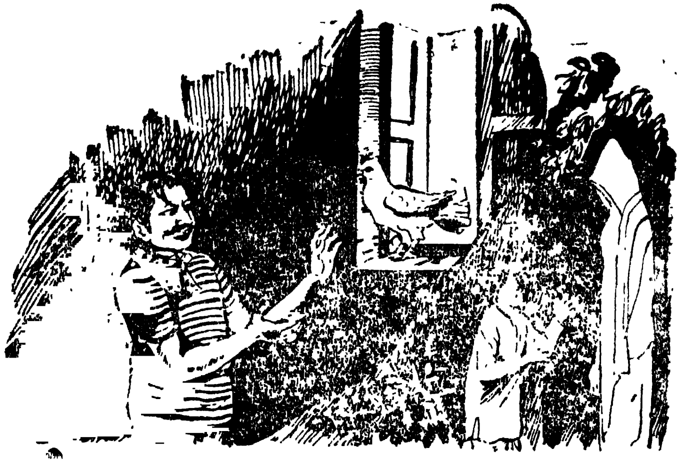
বাবা কোন জবাব দিলেন না। নালক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কান পেতে রইলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা বললেন: সেই কথাই তো ভাবছি বড়বৌ। নালক এবার ক্লাস সেভ্‌নে উঠবে। ওর অনেক নতুন বইপত্তর লাগবে। সে টাকা আমি কোথায় পাব?

আবার চুপ। একটু পরে মা বললেন: আর কোথাও যদি না পাওয়া যায়। তাহলে আমার মাথার সিঁথি বিক্রি করেই ওর বইপত্তর কিনে দাও।

বাবা কি যেন বলে আপত্তি জানালেন। কিন্তু সে কথা নালকের কানে গেলো না। নালকের ছুটো কান তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুক ভার হয়ে উঠেছে অবরুদ্ধ কান্নার স্রোতে। খসে পড়েছে খুসির পেখম। পরীক্ষা পাশ করেছে বলে কি ও বিকিয়ে দেবে মায়ের মাথার সিঁথি?

বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হরিণ-শিশুর মতো ও ছুটে পালিয়ে গেলো বাড়ী থেকে। নদীর তীরে শুয়ে ছটফট করতে লাগলো আহত স্বপ্নের ছুঃসহ বেদনায়।

আকাশে নতুন-ওঠা চাঁদের মুখ ছেয়ে গেলো কালো মেঘে।



হুকাকাশির গল্প • মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

শান্তি-ধামের অশান্তি

হুকাকাশির ঘটনাবহুল জীবনের মাঝে মাঝে এমন অনেক ছোটখাটো অ্যাড্‌ভেঞ্চার ঘটেছে যা গুছিয়ে বলতে পারলে তোমাদের বেশ কিছু গল্পের খোরাক জুটে যায়। তারই একটা আজ তোমাদের শোনাব।

ঘটনাটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, সোনার হরিণের অনুসন্ধানে তখনও তিনি হাত দেন নি। পূজোর সময় কিছুদিন বিশ্রাম-লাভের আশায় তিনি গিয়েছিলেন বিল্বনগরম্—মাদ্রাজ প্রদেশের সীমান্তে জায়গাটি, বেশ স্বাস্থ্যকর বলে নাকি খ্যাতি আছে। সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা? তা ছিল বই কি, নইলে ওই জনবিরল তেপান্তরের মাঠে নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বাস্থ্যলাভ হতে পারে কখনো? রণজিতের ছোট ভাই অভিজিৎ সে যাত্রায় হুকাকাশির সঙ্গী হয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলায় চায়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে টেবিলের ধারে মুখোমুখী বসে দু'জনে গল্পে মেতে আছেন, দেখা গেল এক মধ্যবয়সী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ফটকের সামনে এসে কেমন একটু ইতস্ততঃ করছেন,—ভাবটা ঢুকি কি ঢুকি না! হুকাকাশি মুখ তুলে চাইতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হয়ে গেল; তখন সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে ফটক খুলে তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন। হুকাকাশিকে ছোট্ট একটু নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি; ক'লকাতায়

যেখানে আপনি থাকেন সেই ডাফ্ স্ট্রীটে আমারও বাস। কালকেই নদীর পারে বেড়াতে বেরিয়ে আপনাকে এখানে প্রথম দেখতে পাই। এই তেপান্তরের মাঠে কিছুদিন একত্র বাস করলে ক্রমে আলাপ-পরিচয়ও ঘটবে আশা ছিল, কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে এক অপ্রত্যাশিত কারণে আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করা অনিবার্য হয়ে উঠবে। কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটায় এই বন্ধু-বান্ধবহীন দূর দেশে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছি; সকাল হতেই তাই পরম আত্মীয় জ্ঞানে আপনার কাছে চলে এসেছি।" ভদ্রলোক অতি করুণভাবে হুকাকাশির পানে চাইলেন।

হুকাকাশি নস্যদানটা খুলে জোর একটিপ নস্যি নিতে নিতে বললেন, "বেশ, আপনার রাত্রির অভিজ্ঞতা খুলে বলুন—আমার তরফ্ থেকে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হবে না।" তার পর অভিজিৎকে দেখিয়ে বললেন, "এর কাছে আপনার দ্বিধা করবার কিছুই নেই; আমায় যা বলবার আছে নিঃসঙ্কোচে এর সামনেই বলতে পারেন।"

ভদ্রলোক তখন তাঁর বক্তব্য সুরু করলেন:

"সব ব্যাপার গুছিয়ে বলতে হলে গোড়ার কয়েকটি কথাও আগে বলে নেওয়া দরকার। পূজোর ছুটিতে কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যায় কল্‌কাতায় বসে তারই আলোচনা হচ্ছিল, এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন বিল্বনগরম্। কেবল পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, কথা-প্রসঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে এখানে তাঁর জানাশোনা এক ভদ্রলোকের চমৎকার একটা বাড়ী আছে, এবং খুব সস্তায় সেখানা তিনি ভাড়াও দিতে পারেন।

"পূজোয় কোথাও যেতে হলে সব চেয়ে বড় সমস্যাই হল বাড়ী-সমস্যা; সেটা এত সহজেই মিটে যাওয়াতে এখানে আসাই স্থির করে ফেলা গেল। তার পর কাল সকালের ট্রেনে এখানে এসে পৌছেছি।

"এসে দেখলাম বন্ধুটি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি; বাস্তবিকই খাসা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীখানা। ভেতরে অনেকখানি কমপাউণ্ড, আর গোটা বাড়ীটাই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ীর নাম 'শান্তি-ধাম'। ও ভাড়ায় মরুভূমির ভেতরেও অমন বাড়ী কল্পনাতীত সস্তা। ঘর যা আছে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তা পর্যাপ্ত, কেন না আমরা ক'টি মাত্র প্রাণী—আমি, আমার স্ত্রী; বছর চৌদ্দ বয়সের একটি মেয়ে, আর সঙ্গের ঝি আর উড়ে বামুন। সদর দরজার

সম্মুখে মালপত্র নামিয়ে ভেতরে ঢোকবার উদ্যোগ করছি, লক্ষ্য করলাম রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে সে-ই যেন অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তাদের এই অহেতুক কৌতূহলের কোন অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝছি। এ বাড়ীতে লোকের বসবাস দেখতে তারা আদৌ অভ্যস্ত নয়, কেন না এ বাড়ীর রহস্য জানতে এ অঞ্চলের কারুরই বোধ করি বাকী নেই।

"গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ীটাকে বাসোপযোগী করে নিতেই সারা দুপুর কেটে গেল। বিকেলে এক কাপ্‌ চা খেয়ে সামনের বারান্দায় বসে সবেমাত্র খবরের কাগজখানা খোলবার উপক্রম করছি, দেখি ফটক খুলে এক প্রৌঢ় বয়সের মাদ্রাজী ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। 'গুড্‌ আফটারনুন্‌' বলে অভিবাদন করে তিনি বারান্দায় উঠে এলেন, ইংরাজীতে বললেন, 'মাফ্‌ করবেন, আপনিই কি এ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন?'

"জবাব দিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ।'

"একেবারে পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে? ভাড়া আগাম আদায় করে নিয়েছে নাকি?"

"বললাম, কথা পাকাপাকিই হয়েছে বটে, কিন্তু ভাড়াটাড়া এখনও কিছু দেওয়া হয় নি। বাড়ীওয়ালা যে ঠিক আমার অপরিচিত এ কথা বলা যায় না।"

"কি বললেন! এ বাড়ীর মালিক রমেশবাবু আপনার পরিচিত? অথচ তিনি জেনেশুনে আপনার এ বাড়ী ভাড়া নেওয়া অনুমোদন করেছেন?" ভদ্রলোকের মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ এবার ফুটে উঠল।

"বিস্মিত আমিও কম হই নি। বললাম, আপনার ইঙ্গিতটা বেশ ভাল মত বুঝতে পারলাম না, আর একটু স্পষ্ট করে বলবেন কি?"

"কিন্তু ভদ্রলোক বোধ করি আমাকে আর বেশী বিব্রত করে তোলা উচিত মনে করলেন না, কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি বিদেশী লোক, নতুন জায়গায় এসে নানা রকম অসুবিধা বোধ করা বিচিত্র নয়। সে রকম কিছু ঘটলে আমাদের খবর দিতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। আমার নাম ভেঙ্কটচারি, পাশের বাড়ীটাই আমার।'

"ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর মনের ভেতরটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল; একটা অজানা ভয়ও যে মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল না এ কথাও জোর করে বলতে পারি না। যাই হোক, সব ঝেড়েঝুড়ে মনটাকে চাঙ্গা করে

তোলবার উদ্দেশ্য বিকেল বেলা সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম নদীর ধারে—ভগবানের বিশেষ দয়া বলতে হবে, সেখানেই আপনার দেখা পেলাম। তারপর বাজার হয়ে, তরি-তরকারি আর কিছু টাটকা মাছ কিনে যখন বাড়ী ফিরলাম রাত তখন আটটা বেজে গেছে। বামুন ঠাকুর রান্নার যোগাড় আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ একটু হিমেল হাওয়া বইতে সুরু করে দিল। চারদিক একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ, ধারে-পাশে জনমানবের সাড়া নেই; আমরা জানালার সার্সি বন্ধ করে মাঝের হল ঘরটায় এসে বসলাম। আমার স্ত্রী একখানা মাসিক পত্রিকা পড়ে আমাদের শোনাচ্ছিলেন। পাশের কামরায় ঝির নাকের ডাক উঠে গেল। ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ সকলেই যেন একটু চমকে উঠলাম, মনে হ'ল আমাদের মাথার ওপরকার ছাদে অবিশ্রাম খটাখট্ খটাখট্ কেমন একটা শব্দ হচ্ছে—ঠিক যেন ছাদ-পেটানোর আওয়াজ। একটু কান পেতে থাকতেই লক্ষ্য করলাম, শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আরও একটু বাদে অসম্ভব জোরে শব্দ হ'তে লাগল—দপ্, দপ্, ধুপ্, ধুপ্—যেন ছাদময় কারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই একটু ভীতু মানুষ, চেয়ে দেখি তাঁর সারা কপাল ঘেমে উঠেছে, কেন না ছাদে উঠবার যে কোন সিঁড়ি নেই বাড়ীতে ঢুকেই তা আমরা টের পেয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ব্যাকুল আর্তনাদ কানে এল। দেখি কিনা, বামুন ঠাকুর রান্নাঘর ছেড়ে পাই পাই করে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদেরই দিকে ছুটে আসছে। বেচারার সারা দেহ বাঁশপাতার মত কাঁপছে, গায়ের প্রত্যেকটি রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে, আর চোখ দুটো ঠিক যেন ঠিক্‌রে আসার উপক্রম! একটু বাদে, বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে, কোনক্রমে সে জানালে যে কড়ার উপর তেল চাপিয়ে সবে ভাজবার মাছগুলো সে ছেড়েছে, অমনি সুমুখের জানালা থেকে দুধের মত সাদা দু'খানা হাত তার সামনে বেরিয়ে এল, ঠিক ভাজা মাছ চাইবার ভঙ্গীতে। সে আঁৎকে পিছিয়ে আসতেই ঝপাৎ করে একরাশ ছাই এসে পড়ল মাছ ভাজবার কড়াটার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে কে খিল খিল করে হেসে উঠল—রক্ত-হিম-করা এক অদ্ভুত হাসি। আর এক তিলও দাঁড়াবার ভরসা সে পায় নি, দু'হাতে পৈতাগাছা জড়িয়ে 'রাম রাম' করতে করতে পালিয়ে এসেছে। এবার ভয়ে সকলেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, গিন্নীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাঁর বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও ব্যাপারটা নিজে চোখে প্রত্যক্ষ করবার জন্য একাই আমি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে

চললাম। উঠান পার হয়ে রান্নাঘরে যেতে হয়, পথে পড়ে মস্ত একটা নেবুগাছ। সবে তার তলায় এসেছি, অমনি সেই গাছের আবডাল থেকে চওড়া লাল পাড় শাড়ী-পরা, বোধ করি সাড়ে আট ফুটেরও বেশী ঢ্যাঙ্গা একটি



স্ত্রীলোক ঘোমটা মাথায় ঢিপ্ করে আমার পায়ের কাছে একটা গড় করল। অতখানি ঢ্যাঙ্গা মেয়েছেলে তো দূরের কথা, পুরুষও আমি ভাবতে পারি না। আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। রান্নাঘরে যাওয়া মাথায় উঠল, দৌড়ে কোন মতে ঘরে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে করতে দেখতে পেলাম, হো হো করে বিকট এক অট্টহাসি হেসে স্ত্রীলোকটা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরে দুম্‌দাম্ হাঁড়ি-কলসী ফাটার শব্দ শোনা গেল; তার পরেই আক্রমণ সুরু হ'ল বাংলোখানার ওপরে—ঠিক বর্ষাকালের বৃষ্টির ফোঁটার মত অনবরত ইট আর পাটকেল, ইট আর পাটকেল! সারারাত ক'টি প্রাণী ঠায় ঘরের মেঝের উপর বসে কাটালাম, একটি বারের তরেও কারুর চোখের পাতা মুদতে সাহস হ'ল না। তার পর সকাল হলে ছুটে গেলাম পাশের বাড়ী,—ভেঙ্কটচারির কাছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে শোনবার পর তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হুঁ', যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে। কাল আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বলা হয়নি, হয়তো আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়বেন মনে করে, কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই যে, যে বাড়ীটা আপনি নিয়েছেন এ অঞ্চলে সবারই ধারণা ওটা ভূতের বাড়ী। প্রায় দু'বছর

হ'ল এমনি ধারা উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। এই দু' বছরে অন্ততঃ বার চারেক বাড়ীটা ভাড়া হয়েছিল কিন্তু এক রাতের বেশী কোন ভাড়াটেই টিঁকতে পারে নি ওখানে। রমেশবাবু বাড়ীর ভাড়া খুবই কমিয়ে দিয়েছেন, তবু প্রাণ হাতে করে কে যাবে বলুন? শেষ বারে বাড়ীটা যখন ভাড়া হয় সে আজ ছ'মাসের কথা—সে যাত্রাও এক রাতের বেশী ভাড়াটে টেঁকে নি। ভেবেছিলাম এ ছ'মাসে কিছু উন্নতি হয়তো বা হয়ে থাকবে, কিন্তু তা যে হয়নি সে তো প্রত্যক্ষই করা গেল। ওটা আমারই পাশের বাড়ী হওয়াতে মাঝে মাঝে আমারও যে একটু-আধটু ভাবনা হয় না তা নয়, তবে ভগবানের পরম দয়া, আজ পর্যন্ত এখানে কোন উপদ্রবই ঘটেনি। আপান এক কাজ করুন, এ-বেলার মত সব শুদ্ধু আমারই এখানে উঠে আসুন ; বাড়ীতে আমার মা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী সকলেই আছেন, কাজেই মেয়েদের কোনই অসুবিধা হবে না। আজকের দিনের মধ্যেই লোকজন লাগিয়ে অন্য একটা বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আমি দেখছি।

"ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, ঝি-বামুন সমেত মেয়েদের তাঁরই ওখানে পাঠিয়ে আমি সোজা আপনার কাছে চলে আসছি। কাল রাত্তিরে নিজের চোখে যা দেখেছি তা কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না, অথচ বিংশ শতাব্দীর লোক হয়ে ভূতের অস্তিত্ব, বিশেষ করে ভূতের উপদ্রবের কথা বিশ্বাস করতেও মন সায় দিতে চাইছে না। যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সত্যিই আমি তাই হয়ে আপনার কাছে এসেছি, আশা করি প্রতিবেশীর এ বিপদে তাকে সাহায্য করতে আপনি বিমুখ হবেন না।"

হুকাকাশি হাতের দু'আঙুলে অবশিষ্ট নস্যিটুকু একটানে নিঃশেষ করে বললেন, "আমায় দিয়ে যতটা উপকার সম্ভব তা অবশ্যই আপনি পাবেন। অভিজিৎ, পাঞ্জাবীটা একবার গায়ে চড়িয়ে নাও তো, বাড়ীটা একটু ঘুরে আসা যাক। হ্যাঁ, আপনার নামটা কি সেটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীভবানীপ্রসন্ন গুপ্ত।"

সদর দরজার তালা খুলে সকলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর সমস্তটাই কম্‌পাউণ্ড-ওয়ালে ঘেরা, ভেতরে জায়গা প্রায় চার-পাঁচ বিঘে। পাঁচীল বরাবর ওঁরা হাঁটছিলেন, হঠাৎ হুকাকাশি হাতের রুমালখানা টপ্ করে একবার মাটিতে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তুলে নিলেন ; ভবানীবাবু

আর অভিজিৎ কথাবার্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, কিছু টের পেলেন না। আরও খানিকক্ষণ চলবার পর দেয়ালের ধারে এসে হুকাকাশি ফের থামলেন অভিজিৎকে লক্ষ্য করে বললেন, "মাটির ওপর এ দাগগুলো লক্ষ্য করছ? বেশ করে দেখে বল দিকিনি কিসের দাগ এগুলো?"

বাস্তবিকই জায়গাটাতে—কেবল ওই জায়গাটাতেই—কোন অজ্ঞাত জীবের ছোট ছোট গোল গোল কতকগুলো পায়ের দাগ অভিজিতের নজরে এল। অনেকক্ষণ ধরে বিশ্লেষণ করার পর সে বললে, "ঠিক ধরতে পারছি না, তবে কোন জন্তুজানোয়ারের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই।"

"তুমি তো ভাল শিকারী, অনেক জানোয়ারেরই পায়ের দাগের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে—বল তো এগুলি কোন্ জানোয়ারের পায়ের দাগ?"

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত অভিজিৎকে স্বীকার করতেই হ'ল যে সে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। হুকাকাশি আবার বললেন, "দাগগুলো কেমন এলোমেলো সেটা লক্ষ্য করছ কি?"

"হুঁ।"

"আরও একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ—সব ক'টা দাগেরই একদিক খুব জোর স্পষ্ট ভাবে উঠেছে, অন্য দিকটা দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা। কেমন, নয় কি?"

অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল, "তা বটে।"

"আর ওই যে পর পর গোটাকতক নেবু গাছ রয়েছে, তাও কিন্তু উপেক্ষার বিষয় নয়। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়, কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে মাটি সর্বত্রই নরম হয়ে আছে, অথচ দাগ পাচ্ছি শুধু এই জায়গাটাতেই।"

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে আর এক অভিনব জিনিষ সকলের চোখে পড়ল—একটা চাল মাপবার ডালা বা কুন্‌কে, চল্‌তি কথায় আমরা তাকে 'পলি' বলি। "এটা আবার কোত্থেকে এল? একেবারে আনকোরা নতুন দেখছি! আপনার সঙ্গের বুঝি?" হুকাকাশি বলে উঠলেন।

"না তো!" ভবানীবাবু জবাব দিলেন।

"ওহ্, বোঝা গেছে তবে! আচ্ছা, ভবানীবাবু, সাধারণতঃ আপনি কি মার্কা সিগারেট খেয়ে থাকেন?"

ভবানীবাবু এইবার বিস্মিত হলেন। "সিগারেট? সিগারেট তো আমি খাই না! আমি ছেড়ে আমার বামুন-চাকরদের পর্যন্ত ও জিনিষটি খাওয়া

বারণ। গিন্নীর হাঁপানির মাদুলি আছে, তামাকের গন্ধ পর্যন্ত ওঁর নাকে যাওয়া নিষেধ। ওই জন্যই তো বামুন-চাকর জোটানো আমার পক্ষে এক মহা দায়! তামাক খাবে না, বিড়ি টানবে না—এমন লোক ও-শ্রেণীর মধ্যে হাজার করা বোধ করি আপনি একজনও পাবেন না।"

"নস্যিটা নিশ্চয়ই বাদ, ওতে বুদ্ধি খোলে।" হুকা-কাশি হেসে বললেন, "যাক্, রহস্য থাক, বাড়ীতে ঢুকে ঘরদোর, বারান্দাগুলোর আপনি কি অবস্থা দেখেছিলেন, বলুন তো?"

"ধুলো আর ঝুলে গোটা বাড়ীটাই একাক্কার হয়ে ছিল।"

"রান্নাঘরটা?"

"তারও ওই একই অবস্থা। পুরো এক দুপুর লেগেছে বাড়ীটাকে শুধু বাসোপযোগী করে তুলতেই।"

"উনোনও তবে পাততে হয়েছিল নিজেদেরকেই?"

"নিশ্চয়ই।"

কথা বলতে বলতে সবাই সদর দরজার দিকেই এসে পড়েছিলেন। হুকাকাশি বললেন, "চলুন, এবার আপনার আস্তানায় গিয়ে বসা যাক। এ-বেলার মত চারির ওখানেই তো আপনার থাকবার ব্যবস্থা?"

অতিথি সৎকারের জন্য ভেঙ্কটচারি তখন নিজে দাঁড়িয়ে মালী দিয়ে তাঁর বাগান থেকে কপি, বেগুন, শালগম প্রভৃতি তোলাচ্ছিলেন, সেখানেই সকলের তলব পড়ল। শিষ্টাচারের পালা শেষ হলে, চারিকে হুকাকাশি বললেন, "বাগানখানা করেছেন তো মন্দ নয়, সব রকম তরি-তরকারিই তো দেখতে পাচ্ছি!"

বাগান সম্বন্ধে ভেঙ্কটচারির সত্যিকারের গর্ব ছিল। একটু সলজ্জ হাসি হেসে তিনি বললেন, "এ আমার একটা 'হবি'। ছোট বাগান, তবে এরই মধ্যে যতটা হয় চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আসুন না, দেখবেন সবটা।"

ঘুরে ঘুরে সকলে বাগান দেখতে লাগলেন, সেই সঙ্গে রমেশবাবুর ভূতুড়ে বাড়ীটা সম্বন্ধেও আলোচনা চলতে লাগল। হুকাকাশির আরও যে সব তথ্য জানবার ছিল, চারির কাছ থেকেই তা জেনে নিলেন। রমেশবাবুর বাংলো থেকে ক্রমে গোটা সহরটার কথা উঠল। চারি বললেন, "সহরের আশ-পাশে দেখবার অনেক কিছুই আছে, চলুন একদিন সঙ্গে করে আপনাদের সব দেখিয়ে আনা যাবে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমারই গাড়ী।"

হুকাকাশি বললেন, "আপনার আবার নৌকো চালাবারও হবি আছে নাকি? কিন্তু এদেশের নদীতে কি বারো মাস জল পান?"

"নৌকো চালানো! না না, সে সব হবি আমার নেই। এগুলো আঁকশি, মালীদের ব্যবহারে লাগে। আরে, কে ও, সম্মুখম্ নাকি? রামানুজম্‌কে জিজ্ঞাসা কর্ তো, ওরা বাড়ী হোয়াইট ওয়াশ্ করে দিতে রাজী রয়েছে কিনা! ভাল কথা, গল্পে-গল্পে আসল কথাই আপনাকে বলা হয়নি ভবানীবাবু! ছোটখাট একখানা বাড়ী ভদ্রপল্লীর ভেতরেই পাওয়া গেছে। আশা করি এবার আপনার ভেকেশন্‌টা শান্তিতেই কাটবে।"

বেলা নাগাদ তিনটের সময় হুকাকাশি অভিজিৎকে খামে মোড়া একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "আমি বেরুচ্ছি, ভবানীবাবুদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাব। ঠিক পাঁচটার সময় তুমি গিয়ে ভেঙ্কটচারির হাতে এ চিঠিখানা দিয়ে আসবে; কেমন, পারবে তো?"

"তা আর না পারবার কথা কি! কিন্তু এ কিসের চিঠি? কী লেখা আছে এতে?"

"এ চিঠিতে ভেঙ্কটচারিকে লেখা হয়েছে, রমেশবাবুরও বাড়ীটাকে ভূতুড়ে বাড়ী বলে লোকসমাজে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা আজ থেকে তিনি একদম ছেড়ে দেবেন; নইলে ভেতরকার সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তিনি এ সহরে বিশেষ সম্মানিত লোক, তাঁর আর অপদস্থের সীমা থাকবে না।"

অভিজিৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। "বাড়ীটাকে ভূতের বাড়ী বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন ভেঙ্কটচারি? বলেন কি! কিন্তু তাতে তাঁর লাভ?"

"লাভ, মাটির দরে ও বাড়ীখানা কিনে নেওয়া। বসত বাড়ী এবং 'হবি'র বাগান—দু'টোরই কলেবর কিছু বৃদ্ধি পাবে, আর ফালতু আরও একখানা বাড়ী লাভ হবে, যার দাম কম-সে-কম বিশ হাজার টাকা। রমেশবাবু থাকেন সুদূর কলকাতাতে; তিনি যখন দেখবেন ভাড়াটের পর ভাড়াটে মাত্র একটা রাত্রি বাসের পরেই ভূতের উপদ্রবে বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে, ভাড়া যথেষ্ট কমিয়েও সিকি পয়সার আয় হচ্ছে না, তখন যে দাম পান তাতেই ওটা বেচে দিতে তিনি উৎসুক হয়ে পড়বেন—চার হাজার, তিন হাজার—যা আসে। প্রথমে হয়তো কোন ভাড়াটে অহেতুক কোন কারণে ভয় পেয়েছিল,

সেই থেকেই চারি ভায়ার মাথায় ফন্দিটা আসে। আসল ব্যাপারটা কি করে আমি আঁচ করলাম বলি শোন। আজ সকালে রমেশবাবুর বাড়ীর কম্পাউণ্ডটা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন রান্নাঘর থেকে অনেকটা দূরে এসে আধ-পোড়া একটা সিগারেট পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। কাল রাত্তিরে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, অথচ সিগারেটের ওপর তার চিহ্নমাত্র নেই। বোঝা গেল, বৃষ্টি থামবার পর এইখানটাতে কেউ সিগারেট ফুঁকেছে। এদিকে ভবানীবাবু বলে রেখেছেন বৃষ্টি ধরার পর তাঁরা কেউই ঘরের বার হন নি, কাজেই বুঝতে হবে এ সিগারেট বাইরের কোন লোকের খাওয়া। রুমালে করে তুলে তক্ষুণি সেটা পকেটে পুরে ফেললাম।

"তার পর আরও এগিয়ে পাচীলের কাছাকাছি আসতেই সেই রহস্যময় দাগগুলো দেখতে পাওয়া গেল। কোন অজানা জানোয়ারের পায়ের দাগও হতেই পারে না, কেন না প্রত্যেক জীবেরই একটা পা থেকে অন্য আর এক পায়ের ভেতর প্রকৃতিদত্ত একটা স্বাভাবিক ব্যবধান আছে যা মোটামুটি চলবার পথের দাগেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ও দাগগুলো একেবারেই অসম্বন্ধ, এলোমেলো—কোনটা হয়তো মাত্র দু' আঙ্গুল দূরে, আবার কোনটা পাঁচ হাত তফাতে। তা ছাড়া জানোয়ারের পায়ের দাগ হলে মাত্র একটু জায়গাতেই তা আবদ্ধ থাকবার কারণ কি? আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পাঁচীলের কাছাকাছি এ দাগগুলো পাচ্ছি, আর সবগুলো দাগেতেই পাঁচীলের বিপরীত দিক্‌টা খুব গভীর হয়ে বসেছে, অথচ পাচীলের দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। অর্থাৎ লগীর সাহায্যে পোল ভল্ট করে দেওয়াল টপ্‌কালে যে রকম হওয়া উচিত ঠিক সেই রকম। অবশ্য লগীর দাগ বলে কারো মনে যাতে কোন রকম সন্দেহ না হয় সেই উদ্দেশ্যে ওগুলোর গোড়ায় এক একটা করে বিশেষ আকারের লোহার টুপি পরিয়ে নেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। জায়গাটাকে আড়াল করে নেবু গাছের ঝাড় থাকায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল; বাস্তবিক, অলক্ষ্যে অনেক লোকের দেওয়াল টপ্‌কাবার এমন চমৎকার জায়গা আর কোথাও নেই। বুঝলাম, ভূত নয়, কয়েকজন মানুষের দ্বারাই রাত্তিরে উপদ্রবটি ঘটেছে। কিন্তু কেন? ভবানীবাবু যখন বললেন তিনি আসার আগে সমস্ত বাড়ীটা ধুলোয় আর ঝুলে ভরতি হয়েছিল তখন কোন চোর-ডাকাতের পাকা আড্ডা বলেও সেটাকে মেনে নিতে পারলাম না।

"যেখান দিয়ে লোকগুলো দেওয়াল টপকে বেরিয়ে গিয়েছিল—অর্থাৎ

পাঁচীলের ওধারটাও একবার পরীক্ষা করা দরকার বোধ হল। সেটা চারির কমপাউণ্ডের মধ্যে। বাগান দেখবার অছিলায় বরাবর পাঁচীলের আশপাশে নজর রেখে এগুতে লাগলাম। রমেশবাবুর বাড়ীর নেবুঝাড়ের বরাবর আসতেই ওধারের মত পাঁচীলের এধারেও অবিকল সেই রকম লগীর দাগ দেখতে পেলাম। বুঝলাম এ পথেই প্রভুদের যাওয়া এবং আসা হু'টি কাজই ঘটেছে।

"এইবার একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জেগে উঠল। চারি বিশেষ ধনী লোক; দাসদাসী, মালী-বেহারায় তার বাড়ী ভরতি। রাত দশটার সময় তাদের সম্পূর্ণ অজানাতে কতগুলো বাইরের লোকের পক্ষে তারই বাগানের ভেতর দিয়ে পাঁচীল টপ্‌কে ওভাবে যাতায়াত করা কি সম্ভব? মনে ঘোরতর সন্দেহ হ'ল। তারপর তার গ্যারেজের পেছনে লম্বা লম্বা অনেকগুলি বাঁশের লগী পড়ে থাকতে দেখে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল, কেন না চারি এগুলোকে আঁকশি বলে চালাবার চেষ্টা করলেও ওগুলোর প্রত্যেকটারই গোড়াতে লোহার টুপি আঁটবার ব্যবস্থা আমি দেখতে পেলাম। আর ঠিক সেই সময়টাতেই আঁকশির কথা জোর করে চাপা দিয়ে ওর বাড়ীর কথা তোলার চেষ্টা তুমিও বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে।"

অভিজিৎ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, একটুখানি চুপ করে থেকে সে বললে, "আর ওই চাল মাপবার পালিটা? ওটা ওখানে এল কোথা থেকে?"

হুকাকাশি একটু হেসে তাঁর হু'টো হাত মাথার হু'পাশ দিয়ে সোজা ওপর পানে তুলে দিলেন, বললেন, "এইবারে আমার হু' হাতের ডগায় ওটা চাপিয়ে দাও তো! কেমন, ঠিক মানুষের মাথার মতই মনে হচ্ছে কিনা? এখন যদি আমার গায়ে লালপাড় শাড়ী জড়িয়ে এই পালির ওপর ঘোমটা পরিয়ে দেওয়া হয় আর সেই অবস্থায় আমি তোমার পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকি তবে এই কার্তিক মাসেও তুমি ঘেমে উঠবে। অথচ আমি যে খুব ঢ্যাঙ্গা এ কথা বোধ হয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও প্রাণ খুলে বলতে পারবেন না।"

সে রাত্রিটা হুকাকাশি আর অভিজিৎ ভবানীবাবুদের সঙ্গে তাঁদের বাংলোতেই কাটিয়েছিলেন, আর সন্ধ্যার পরেই গোটা হুই ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের আরও একটি সঙ্গী আছে—বন্দুক। এর পর থেকে আর কোন দিন 'শান্তি-ধামে' ভূতের উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি।

॥ দুই ॥

তের নং বাড়ীর রহস্য

ব্যাপারটা ঘটেছিল এক পূজার বন্ধে; হুকাকাশি গিয়েছিলেন শিলং, আর রণজিৎ ভাড়া নিয়েছিল কল্‌কাতারই সহরতলিতে একটা বাগান ঘেরা সুন্দর বাড়ী। রণজিতেরই জিৎ হল, কেননা হুকাকাশি লিখে জানালেন, অনবরত বৃষ্টির চোটে তাঁর চেঞ্জ মাথায় উঠেছে, আর কোথাও যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। রণজিৎ তাঁকে তার নিরিবিলি বাড়ীখানাতে দিন কতক এসে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করল, হুকাকাশিও শিষ্ট ছেলের মত ফিরে এলেন।

হুকাকাশিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য রণজিৎ স্টেশনে উপস্থিত ছিল। গাড়ী করে বাড়ী আসবার পথে হুকাকাশি বরাবর লক্ষ্য করলেন, রণজিৎ যেন বেশ একটু গম্ভীর, যেন কিছু চিন্তান্বিত। "ব্যাপার কি রণজিৎবাবু, আজ আপনার নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে!" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, দেশটা দিনেকের দিন এমেরিকা হয়ে দাঁড়াল নাকি তাই ভাবছি।"

"কি রকম, লোকগুলো হঠাৎ খুব ফর্সা হয়ে যাচ্ছে নাকি? নাকি গঙ্গার ধারে ছাপান্ন-তালা বাড়ীর ভিৎ গাঁথা হচ্ছে?"

"ও দু'টোর কোনটাই খুব ভয়ের কথা নয়, কাজেই ওর জন্য চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু ইয়াঙ্কি গুণ্ডারা যে ছেলে ধরে এনে তাকে লুকিয়ে রেখে আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি পাঠায়—'পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলবে তো ফেল, নয়তো ছেলে ফিরে পাবার আশা ছাড়'—আমাদের দেশেও যদি এই ধরণের গুণ্ডামির চলন হয়, তবে একটু ভাববার কথা হয়ে পড়ে বৈকি?"

"কথাটা আর একটু সোজা ভাবায় বলুন রণজিৎবাবু। দুনিয়ার হালচাল দেখে আপনি কি একটা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করছেন, না কি বাস্তবিকই ওই ধরণের কোন ব্যাপার আপনার নজরে এসেছে?"

"দেখুন, আপনি দু'দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছেন, এখানে একটা জটিল কেস আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে স্বভাবতঃই আমার দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু পরশু রাত্রে যে অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমার মনে গুরুতর সন্দেহ জেগে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, সমস্ত জেনেশুনেও যদি চুপ করে থাকি, ভগবান হয়তো সইবেন না। ব্যাপারটা খুলে বলি, শুনুন······এখানে যে পাড়াটিতে আমি বাড়ী নিয়েছি সেটা খুবই নিরিবিলি, লোকজনের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে। আমার বাড়ীর কাছেই আর

একটা ছোট মত একতালা বাড়ী, ও রাস্তার ১৩ নম্বরের বাড়ী—আসা অবধি খালিই পড়ে আছে দেখছি। অনেক দিন থেকেই নাকি খালি আছে। পরশুদিন সারাক্ষণটাই বেশ গুমোট গিয়েছিল; অনেক রাত পর্যন্তও কিছুতে যখন ঘুম এল না, তখন দরজা খুলে বাড়ীর দক্ষিণ দিক্‌কার বারান্দাটায় গিয়ে বসলাম—যদি কিছু বাতাস পাওয়া যায় সেই আশায়। বসে আছি প্রায় মিনিট পাঁচেক, হঠাৎ মনে হল তের নম্বর বাড়ীটা থেকে কেমন একটা কাতর গোঙানির আওয়াজ আসছে। আস্তে আস্তে আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, কে যেন অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করছে—'বাবা গো গেলুম! আমি আর পারি না—এর চেয়ে তোমরা আমায় মেরে ফেলে একদম্ মুক্তি দিয়ে দাও—মুক্তি দাও। ওই ছুরিখানা দাও আমার পেটে ঢুকিয়ে দাও, এ নরক-যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারি না।'

"ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি; তৎক্ষণাৎ ওই অবস্থাতেই নীচে নেমে এলাম—ও বাড়ীটাতে গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারখানা কি। ওখানে গিয়ে কিন্তু বিস্ময় আমার শতগুণ বেড়ে গেল; সামনের দিককার সমস্ত জানলা-কপাট বন্ধ, আর সদর দরজায় ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা তালা। দেখলে স্বভাবতঃই মনে হবে যে ওই বাড়ীটাতে কেউ যে বসবাস করছে, ভেতরের লোকেরা বাইরের কাউকে তা বুঝতে দিতে চায় না। এ অবস্থায় আর ভোর না হওয়া অবধি হঠাৎ কিছু করা উচিত হবে না ভেবে সে রাত্তিরের মত চলে এলাম। তারপর সকালে গিয়ে দেখি তালাটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে দরজা বন্ধই রয়েছে। আমি বারান্দায় গিয়ে উঠতেই একটা ইতর চেহারার নিম্ন শ্রেণীর লোক বার হয়ে এল, আমার পা থেকে মাথা অবধি বার দু'তিন বেশ করে দেখে নিয়ে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই এখানে?'

"তোমরা বুঝি এ বাড়ীটাতে নতুন ভাড়াটে এসেছো?"

"লোকটা ফের সন্দেহের চক্ষে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, 'হু'

"এরপর কোন কথাই যেন আমার মনে এল না; কি বলে আলাপ আরম্ভ করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা আমার মুখের উপরই ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমারও মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল—ভেতরের লোকদের কোন কথাবার্তা শোনা যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। তৎক্ষণাৎ খুব ঘটা করে চটি জুতোর শব্দ শুনিয়ে শুনিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম; তারপর চটি বাইরে রেখে, পা টিপে চুপি চুপি বারান্দায়

উঠে এসে দাঁড়ালুম, কপাটের গায়ে কান লাগিয়ে। শোনা গেল, কে একজন ফিস্ ফিস্ করে অপর আর একজনকে শাসাচ্ছে 'হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার। কেউ টের পেলে সবশুদ্ধ মারা পড়ব—শুধু আমি একা নই, তোরাও বাদ পড়বি না। পেছনের দুয়ার······' তার পরের কথাগুলো আর কানে এল না, তবে জেলখানার কথাটার উল্লেখ যেন শুনতে পেলাম বলে মনে হল। তক্ষুনি আমি থানায় গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে আসতাম, যদি না জানা থাকত আজই আপনি এসে পৌঁছুচ্ছেন।······কি রকম মনে হয় আপনার ব্যাপারটা?"

বিকালের দিকে, বেলা নাগাদ পাঁচটায় রণজিৎকে সঙ্গে করে হুকাকাশি ১৩ নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফটক থেকে ছোট্ট একটা লাল সুরকির রাস্তা বাড়ীর সামনা দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে আবার ফটকের কাছে চলে এসেছে। সেটুকু পার হলেই বারান্দা। ওঁরা গিয়ে সেই বারান্দায় উঠতেই সকাল বেলাকার সেই চাকরটা ভিতর থেকে বেরিয়ে এল; তারপর সেই সকাল বেলাকারই প্রশ্ন—"কি চাই এখানে?"

"কর্তা আছেন? আমরা এই পাড়ারই লোক, আলাপ-পরিচয় করতে এসেছি।" হুকাকাশি বললে।

"এখন দেখা হবে না, তিনি ঘুমোচ্ছেন।"

রণজিৎ আড়চোখে একবার হুকাকাশির দিকে চাইল, বোধ হয় আশ্বিন মাসের বেলা পাঁচটা যে ঘুমোবার পক্ষে খুব প্রশস্ত সময় নয় সেই তথ্যটুকুই স্মরণ করিয়ে দিত। কিন্তু চাকরটার ভাবভঙ্গী খুবই সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়বার আর কোন বাক্যব্যয় না করে ওবেলার মত এ বেলাও ঝপ করে সে দরজা বন্ধ করে দিল। অগত্যা রণজিৎদের ফিরতে হল।

রাত তখন বোধ করি বারটা, সমস্ত সহর নিঃঝুমে, অকাতরে ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ হুকাকাশির শোবার ঘরে বার কতক কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। "কে?" হুকাকাশি প্রশ্ন করলেন।

"আমি রণজিৎ। শীগ্‌গির দোর খুলুন, খবর আছে।"

হুকাকাশি উঠে এসে দরজা খুলে দিতে দিতে বললেন, "খবর আমি জানি, মানে কাৎরানি আর গোঙানির শব্দ আমারও কানে আসছে।"

"তা হলে এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

"চুপটি করে শুয়ে থাকা, মানে ভোরের জন্য অপেক্ষা করা।"

পরদিন প্রাতঃকৃত্য এবং চা-পানাদি শেষ করে হুকাকাশি একবার দক্ষিণ

দিকের বারান্দাটা ঘুরে এলেন, তারপর বললেন, "চলে আসুন রণজিৎবাবু, কর্তাগোছের এক ব্যক্তি বারান্দার ওপরে সশরীরে দেখা দিয়েছেন। দেখা তো দিতেই হবে, কাল দু'দু'বার 'পাড়া পড়শীরা' খোঁজ নিতে এসেছিল শুনেছে, এর পরেও দরজা এঁটে বসে থাকলে যে নিজে থেকেই নিজের ওপর গুরুতর সন্দেহ ডেকে আনা হবে। আসুন, এই সুযোগে ওকে একটু নাড়া দিয়ে আসা যাক।"

খুব বেশীক্ষণ 'নাড়া দেওয়া' কিন্তু সম্ভব হল না, মিনিট পনেরো পরেই দু'জনাকে ফিরতে হল। হুকা-কাশি একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখে কি রকম মনে হল লোকটাকে? দেখি আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তিটা।"

রণজিৎ হেসে বললে, "প্রথমতঃ মাথার চুলগুলো খাড়া-খাড়া, দ্বিতীয়তঃ ডান হাতের গেঞ্জির হাতটা নীচের দিকে বার বার টেনে দেয়, তৃতীয়তঃ—তৃতীয়তঃ কি? আপনিও দু'চারটা বলুন না?"

"বেশ তো বলছিলেন, বলে যান না—তৃতীয়তঃ কাল রাত গোটা তিনেকের সময় ওর বাড়ীতে মোটরে করে লোক এসেছিল···"

"কই, তা' তো বুঝতে পারিনি, আপনি টের পেলেন কি করে?"

"অতি সহজ উপায়ে; কাল মাঝ রাত্রের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ওই তের নম্বর বাড়ীর সামনে ভিজে সুরকির রাস্তার উপর মোটরের চাকার দাগ এখন পর্যন্ত দিব্যি খাঁজ খাঁজ কাটা অবস্থায় রয়ে গেছে, কাল বিকেলে এ দাগ ছিল না। তা ছাড়া মোটরের কলকব্জাও ছিল কিছু খারাপ, খানিকটা লুব্রিকেটিং অয়েল তাই চুঁইয়ে পড়েছে। রাস্তার সমস্ত জল একদম শুকিয়ে গেছে, কেবল ওই তেলের নীচেই একটুখানি জল এখনও চিক্ চিক্ করছে শুকোতে পায়নি। এর থেকেছ স্পষ্ট বোঝা যাবে সে বৃষ্টি ধরার খুব পারে মোটর আসেনি।"

রণজিৎ খুব আশ্চর্য, এবং বোধ করি একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল, "তবে তো প্রকাণ্ড একটা সুযোগ হারিয়েছি আমরা কাল রাত্রে।"

হুকা-কাশি হেসে বললেন, "ব্যস্ত হবেন না, মোটর পালিয়ে যাবে না, আজ রাত্রেও নিশ্চয় ওটা এসে হাজির হবে। আপনি শুধু একটা টর্চের ব্যবস্থা রাখবেন।"

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর রণজিৎ হুকা-কাশিকে এসে পাকড়াও করল,

"আপনার টেবিলের ওপর আধ ছটাকটাক মুন এল কোত্থেকে মিষ্টার হুকা-কাশি ?"

"ও ওই তের নম্বর বাড়ীর মুন ; দেখবেন তরকারীতে চালিয়ে দেবেন না যেন !"

"তের নম্বর বাড়ীর মুন ? এল কি করে ?"

"আজ সকালে যখন কর্তার সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রতে যাই, তখন সিঁড়ির নীচে ন্যাকড়ায় জড়ানো অবস্থায় ওটুকু পাওয়া গেছে। আপনি টের পাননি, জুতো খুলে পায়ের আঙুলে করে তখনই ওটা আমি তুলে নিয়েছিলাম।"

পরদিন সকালে উঠে রণজিৎ চাকরের মুখে শুনতে পেল হুকাকাশি নাকি খুব ভোরেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরী হতে পারে। খুব বেশী দেরী কিন্তু হল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন সঙ্গে এক্কেবারে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। চাকরকে তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানাপত্রগুলি তাতে তুলতে বলে রণজিতের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আমায় মাপ করবেন রণজিৎবাবু, দিন কতকের জন্য একটা হোটেলে গিয়ে আমাকে উঠতেই হবে। তবে যত শীগ্‌গির সম্ভব ফিরে এসে ফের আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব, কথা দিয়ে যাচ্ছি।"

হুকাকাশির নিষেধ ছিল, তাই রণজিতের হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন আর তাঁর হোটেলে সে যায়নি, কিন্তু পরদিন দুপুরেই এসে সে উপস্থিত হল। হুকাকাশি তখন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে একখানা টাইম-টেবিলের পাতা উল্‌টাচ্ছিলেন।

হোটেলের চারধারটা একবার দেখে নিয়ে রণজিৎ বল্‌ল, "আপনার রুম অবশ্য মন্দ নয়, তবে আলো-বাতাসের দিক থেকে দেখতে গেলে পাশের কামরাটা আরও ভাল। ওটা তো তালাবন্ধ দেখছি, কেউ আছে নাকি ?"

"কেন উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ? থাকতে হবে কিন্তু 'চাটুয্যে-বাড়ুয্যে' অবস্থায়, কেননা ওতে থাকে একজন রাত্রির বাসিন্দে। রাত্রি দশটা থেকে ভোর ছটা তার এলাকা। দিনের বেলাটা অবশ্য আপনার রাজত্ব চলতে পারে।" হুকাকাশি হাসলেন—"বাস্তবিক, কি দারুণ চাকরী বলুন তো। পাক্কা পনেরো ষোল ঘণ্টা ডিউটি। তার ওপর আবার একদিন লেট্ হলে চাকরী নিয়ে টানাটানি ! দেখছি তো লেট্ হবার ভয়ে বেচারা

কাল বেগ্‌নে হয়ে গেছল, চাকরীর এমন মোহ! ভাল কথা, আমি আজ একটু বাইরে যাচ্ছি; কম্বোলির নাম শুনেছেন তো—সেইখানে। খুব বেশী দূর নয়, নৈহাটী থেকে মাত্র মাইল দুই। চলুন না আমার সঙ্গে, আপনার তো ইতিহাসে খুব ইণ্টারেস্ট, কম্বোলির মিউজিয়ামটাও এই ফাঁকে দেখে আসতে পারবেন।"

রণজিতের একেবারেই আপত্তি ছিল না, বেলা দু'টার গাড়ীতে দু'জনে রওনা হয়ে পড়লেন।

কম্বোলিতে পৌঁছে ওঁরা উঠলেন ডাকবাংলোয়। রণজিৎকে খানিকটা বিশ্রাম করে নিতে অনুরোধ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুকা-কাশি বার হয়ে পড়লেন, তাঁর কতগুলো জরুরী কাজ আছে, সেগুলো সেরে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তিনি ফেরবার চেষ্টা করবেন। কাল বরং সুবিধামত এক ফাঁকে কোন সময় মিউজিয়ামটা দেখে আসা যাবে।

যথা সময়ে ডাকবাংলায় ফিরে এসে হুকা-কাশি দেখলেন, রণজিৎ দোকান থেকে একরাশ খাবার আনিয়ে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। হুকা-কাশিকে ফিরতে দেখেই সে প্রশ্ন করে উঠল, "কদ্দূর কি করে এলেন?"

"রসুন, রসুন, অত ব্যস্ত হলে কি চলে? আরও দিন দুয়েক আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মিউজিয়াম দেখবার মৎলব বোধ হয় ছাড়তে হল—ওতে নাকি কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাই, পাস্ চাই, অনেক কিছু ভজকট সম্প্রতি হয়েছে। আমাদের এখানে চেনেই বা কে, আর পাস্‌ই বা কে দিতে যাচ্ছে?"

কিন্তু রণজিতের বরাত ভালই বল্‌তে হবে, কেননা প্রায় বিনা ঝঞ্ঝাটেই মিউজিয়াম দেখার অনুমতি মিলে গেল। রণজিৎ পরমানন্দে হুকাকাশির সঙ্গে মিউজিয়াম দেখতে রওনা হয়ে পড়ল। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমস্ত দেখে সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা নামছিলেন, রণজিৎ বললে, "চমৎকার সংগ্রহ। ব্যবস্থাও ভাল, হবে না? অতগুলো কর্মচারী অনবরত খাটছে। আপনি দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে আলাপ করছিলেন? ওই বুঝি মিউজিয়ামে কিউরেটার?"

"না, কিউরেটার উনি নন্, অন্য পাঁচজনের মত উনিও একজন সাধারণ কর্মচারী। লোকটির জ্ঞান-পিপাসা দেখে একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল—দেখুন ওঁর টেবিলের ওপর কতগুলি বই পড়ে। হ্যাঁ যা বলেছেন, সংগ্রহ চমৎকারই বটে, তবে আর দিন পাঁচ-সাত আগে এলে আরো ভাল হত,

কেননা একটা স্পেশাল একজিবিসন ছিল; সেটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"তাই না কি, কে বললে?"

"কে আর বলবে, এই দেখুন না," হুকাকাশি সিঁড়ির পাশে একখানা ছাপানো বিজ্ঞাপন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "নির্দ্দিষ্ট দিনের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে দু'জনে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, হুকাকাশি বললেন, "আপনি এবার ডাকবাংলার দিকে এগোন, কাজকর্ম আমার যা কিছু বাকী আছে সব চুকিয়ে আমিও এসে জুটছি। আজকেই আমরা ফিরে যেতে পারব আশা করি।"

বাস্তবিকই সেদিনই তাঁরা কম্বৌলি ছেড়ে ফের কলকাতা ফিরে এলেন— অবশ্য রণজিতের বাড়ীতে নয়, হুকা-কাশির হোটেলে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই হোটেলের ম্যানেজার হুকাকাশির কাছে ছুটে এলেন। "এইমাত্র আপনাকে টেলিফোন করছিল," তিনি বললেন।

"কোত্থেকে?"

"মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁরা হোটেলের আপিস কামরায় এসে ঢুকলেন। হুকাকাশি তাড়াতাড়ি টেলিফোনের হাতলটা তুলে নিয়ে অটোমেটিক নম্বর ঘুরিয়ে বললেন, "হ্যালো, মেডিক্যাল কলেজ হস্‌পিটাল? আমি হুকাকাশি। ওঃ, আপনি দারোগাবাবু! কি খবর। এক্স-রে হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, জানি এক ছড়া মালা তো? ওটা খাঁটি মুক্তোর, দাম কম্‌সে-কম পঞ্চাশ হাজার টাকা।" হুকাকাশি হেসে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

রণজিৎ স্তম্ভিত, বিহ্বলের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হুকাকাশি আবার একটু হেসে বললেন, "আপনার প্রতিবেশী তের নম্বর বাড়ীর সেই নতুন ভাড়াটেটির রহস্য ভেদ হয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য আজকে আমরা কম্বৌলির মিউজিয়াম দেখতে না গেলে এত সহজে রহস্যটা ভেদ হত কিনা সন্দেহ। আপনাকে বলেছি, পাঁচ-সাত দিন আগে ওই মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল একজিবিসনের বন্দোবস্ত হয়েছিল, নানান জায়গা থেকে অনেক দামী-দামী জিনিষ তাতে আসে। সে সমস্ত জিনিষের ভেতর ছিল এক ছড়া ষোড়শ শতাব্দীর মুক্তোর মালা, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের

সঙ্গে সেটা জড়িত। মিউজিয়মের একজন কর্মচারী দেখল, সেটাকে এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে তেমন হাত সাফাইওয়ালা লোকের পক্ষে ওটা সরিয়ে ফেলা আশ্চর্য নয়। সে তার পূর্ব-পরিচিত এক ভদ্রবেশী জোচ্চোরের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলল—ভীড়ের স্থযোগ নিয়ে জোচ্চোর সেই মালাছড়াকে ট্যাঁকস্থ করবে। লোকটা বাস্তবিকই নিপুণ হাতে মালাগাছা সরিয়ে ফেললে, কিন্তু ঠিক 'হজম' করা তার সাধ্যে কুলাল না, কেননা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিউজিয়মের রক্ষীরা টের পেয়ে গেল যে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। ব্যস্, অমনি সে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে কড়া পাহারায় প্রত্যেকের দেহ তালাস স্থরু হল। জোচ্চোর দেখলে আর উপায় নাই, এক্ষুণি নির্ঘাৎ মারা পড়বে—প্রাণের দায়ে তাই সে তখন কপ্ করে গোটা মালাছড়াই গিলে ফেললে। ফলে কর্তাদের শুধু দেহ-তালাসই সার হল, বামাল মিল্ল না। সেদিনই স্পেশাল একজিবিসন বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর নিয়ম করা হয়—বিনা পাসে মিউজিয়ামে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

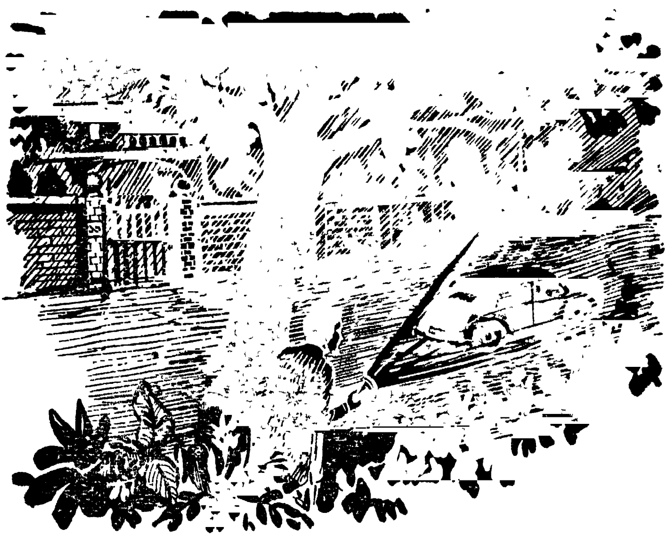
"এদিকে মালা গেলবার পরই জোচ্চোরের অবস্থা কাহিল, অসহ্য পেটের ব্যথা। বেচারা সইতেও পারে না, মুখও খুলতে পারে না, কেননা প্রকাশ্যে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলেই ভেতরের সব কথা ফাঁস হয়ে পড়বে, আর তার ফল হবে শ্রীঘর। ব্যাপার দেখে মিউজিয়ামের সেই কর্মচারী—তার নাম এখনও জানতে পারিনি, কাজেই মিউজিয়ামের কর্মচারী বলেই তাকে উল্লেখ করব—এক রাত্রে ওকে এখানে নিয়ে এসে খুব নিরিবিলি পল্লীতে একটা বাড়ী ভাড়া নিলে। পেটে অস্ত্র করা ছাড়া এ ব্যামোর আর চিকিৎসা নেই; সে রকম ডাক্তার হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু ও-চিকিৎসায় জোচ্চর বেজায় গররাজী। বুঝলেন না, পাপ মন কিনা, ভাবলে হয়ত পেট কাটার ছুতোয় পৃথিবী থেকেই তাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা হবে। তাই চেষ্টা চলতে লাগল নানা রকমের জোলাপ নিয়ে। দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর চীৎকার হলে পাড়াপড়শীর সন্দেহ জাগতে পারে, তাই ওসময়টা বেশীর ভাগই মর্ফিয়া ইন্জেক্ট করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত; জেগে থাকলেও প্রাণের দায়েই ও নিজেও দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকত। যত গোলমাল রাত্রিতে, জাগলে পরেই কাৎরানি আর গোঙানি। এই অবস্থা যখন চলছে, তখনই ব্যাপারটা প্রথম আপনার নজরে এল।

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কি করে। বলছি

শুনুন···আপনার ধারণা হয়েছিল, হয়ত আমেরিকার অনুকরণে কোন লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিপণ দিলে তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতে কিন্তু আপনার ও থিওরী টিকল না। প্রথমতঃ, বন্দীই যদি কাউকে করা হয় তবে তো তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই, বন্দীর ওপর কেন ওরা মার-ধর করতে যাবে? বরং তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখাই স্বাভাবিক, ভবিষ্যতে যাতে তার কোন আক্রোশ না থাকে। তার চাইতেও বড় যুক্তি এই যে, বাস্তবিকই অত্যাচার অথবা মার-ধর তারা যদি করেই থাকত তো আমরা—অর্থাৎ আমি আর আপনি—দু'বার ওবাড়ী যাবার পরই তা বন্ধ হয়ে যেত। ইচ্ছে করে কে কবে পাড়া-পড়শীর সন্দেহ জাগাতে চায় বলুন। না, অত বোকা ওরা নয়; সে রকম মৎলব থাকলে অন্যত্র কোথাও সরে পড়তে নিশ্চয়ই। গোলমাল যেটা হয়েছে সেটা ওদের ইচ্ছাকৃত নয়, চেষ্টা করেও সেটা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। বোঝা গেল রহস্যটা অন্য ধরণের। কি ধরণের রহস্য তাও যে একটু একটু আঁচ করতে না পারলাম তা নয়। সেদিন বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা মনে আছে? লোকটা যে ক্রমাগতঃ গেঞ্জীর ডান হাতাটা নীচের দিকে টেনে দিচ্ছিল, ওটা কোন মুদ্রা দোষ নয়—ইঞ্জেক্‌সনের দরুণ হাতের খানিকটা জায়গা ফুলে ঢিবির মত হয়ে উঠেছিল, সেইটাকেই ঢাকবার চেষ্টা। হাতের অবস্থা দেখে আর তুলের পুঁটলিটা পেয়ে যাওয়ায় ওই লোকটাকে যে ইঞ্জেকসন দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। সমস্ত দিন দোতালা থেকে ওই বাড়ীটার চারদিকে আমরা নজর রেখেছি, কাউকে ঢুকতে দেখেনি, তবে ডাক্তার এল কখন? বুঝলাম, গভীর রাত্রের ওই মোটরখানা আর কিছু নয়, ডাক্তার আমদানীর ব্যবস্থা, ব্যাপারটা কেমন আগাগোড়া গোপন রাখবার চেষ্টা হচ্ছে দেখছেন তো! খুব গোপনে তার চিকিৎসা চলছে। কি অসুখ তা তারা কাউকে জানতে দিতে রাজী নয়, কেননা তাতে নাকি তাদের জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

"ডাক্তার যখন চিকিৎসা সুরু করেছে আর রোগীর অবস্থার যখন উন্নতি হয়নি—ব্যথা চাপবার চেষ্টা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল—তখন ডাক্তারকে যে ফের আসতে হবে তা বুঝতে কষ্ট হল না। বাস্তবিকই গভীর রাত্রে আবার মোটর এল, সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে খুব ধীরে ধীরে। আমিও নীচে নেমে রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম; তারপর খানিক

বাদে মোটর ফিরে যেতেই পেছন থেকে টর্চের আলো ফেলে গাড়ীর নম্বরটা দেখে নিলাম। ডাক্তারের পাশে গাড়ীতে আর একজন লোক বসে ছিল। গাড়ীর নম্বরটা যে আসল নম্বরই তাতে ভুল ছিল না, কেননা নকল নম্বর হলে



পেছনের আলো নিভানো থাকত না। পরদিন সকালে বেরিয়ে মোটর রেজিস্টার ঘাঁটতেই দেখা গেল ওখানা এই হোটেলের গাড়ী। সেদিনই সকালবেলা আমার হোটেলে উঠে আসতে দেখে আপনি খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন নাকি?

"হোটেলের যে রুমটা আপনার খুব পছন্দ-সই হয়েছিল, আমারও প্রথম নজর পড়েছিল সেইটারই ওপর, এবং যে জবাব আপনাকে দিয়েছি সেটাও ম্যানেজারেরই দেওয়া জবাব। জবাবটা আমারও খুব আশ্চর্য বলে মনে হল—সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে লোকটা করে কি? অপিসে আর কিছু এতক্ষণ খাটায় না। কথা বলতে বলতে ম্যানেজারের সঙ্গে আমি নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ ম্যানেজার বলে উঠলেন, 'একি, ও-ঘরের ভদ্রলোক সে আজ এরই মধ্যে ফিরে আসছেন। এইতো সবে বেরিয়ে গেলেন।' তাকিয়ে দেখি একটি লোক স্টেশনের কুলীর হাতে সুটকেশ চাপিয়ে হোটেলের দিকে এগুচ্ছে, খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব তার মুখে-চোখে।

ম্যানেজারের সামনে এসেই সে বল্লে, 'মোটরখানা আর একবার চাই, ম্যানেজারবাবু, না হলেই নয়, বিশেষ দরকার।'

"ম্যানেজারের অবশ্য গাড়ী দিতে কোন আপত্তি ছিল না, বিল বেশী উঠলে তাঁর আর ক্ষতি কি? কিন্তু ড্রাইভারের আপত্তি দেখা গেল—এই রাত্তিরে সে গাড়ী চালিয়ে এল, আবার এক্ষুনি......। কিন্তু ম্যানেজার ধমকে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে, দরকার হলেই যেতে হবে!'

"দুটি জিনিস তৎক্ষণাৎ আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে গেল, প্রথমতঃ, লোকটা রেলে কোথাও যাবে বলে রওনা হয়েছিল, গাড়ী ফেল করাতে ফিরে এসেছে। নইলে স্টেশনের কুলী পেল কোথা? দ্বিতীয়তঃ, সে বলেছে 'মোটরখানা আর একবারটি চাই' তার মানে, এর আগেই সে আরও একবার গাড়ী নিয়েছে। ড্রাইভার বলছে, এর আগেই তাকে বার হতে হয়েছিল রাত্তিরে। এ থেকে আন্দাজ করতে মোটেই কষ্ট হল না যে আগেরদিনে ১৩ নম্বর বাড়ীতে মোটরে যে দুটি লোক এসেছিল, এ লোকটি হচ্ছে তাদেরই একজন। কিন্তু কোন্ জন—ডাক্তার না তার সহযাত্রীটি? যাইহোক, সম্প্রতি লোকটা কোথায় যাচ্ছে তা জানা এরপর কঠিন হবে না, কেননা ড্রাইভার এখন থেকেই যখন আপত্তি জানাচ্ছে তখন সে ফিরে এলেই ফের তাকে গাড়ী বার করতে বলা যাবে। নিশ্চয়ই সে তখন প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলবে যে এইমাত্র এত দূর থেকে সে ঘুরে এল, এখন আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তখন 'কোথায় গিয়েছিলে?' প্রশ্ন করলেই জায়গাটার নাম বেরিয়ে পড়বে।

"ঠিক সেই মৎলব অনুযায়ীই কাজ করা গেল; ড্রাইভার জানাল, বাবুটিকে সে নৈহাটিতে রেখে এসেছে। অনেক রাত্রে লোকটা আবার হোটেলে ফিরে এল। ভোরে সে যখন ফের বার হচ্ছে তখন আমি তার পিছু নিলাম। শিয়ালদায় এসে দেখি সে নৈহাটিরই টিকিট কাটছে। আমিও চল্লাম সেই সঙ্গে সঙ্গে নৈহাটি। নৈহাটি-জংসনে নেমে সে ধরল কল্লোলি—রোড; আমিও কিছু দূরে সমানে তার পেছু পেছু। তারপর কল্লোলি যে তার দিনের লীলাভূমি এ তথ্যটি নিশ্চিত জেনে আমি ফিরে এলাম কলকাতায়—বেলা প্রায় দশটার সময়।

"এর পর আপনি এলেন আমার হোটেলে আর আমরা দু'জনে রওনা হয়ে গেলাম কল্লোলিতে। এখানে আপনাকে একটু ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি

না, মিউজিয়াম দেখবার অতটা আগ্রহ যদি আপনি প্রকাশ না করতেন তবে রহস্য ভেদ হতে আরও কিছু সময় লাগত। কেননা আমার হোটেলের সেই রহস্যময় লোকটি যে কম্বোলি মিউজিয়ামেরই একজন কর্মচারী তা তখনও জানতে পারিনি। আমরা যখন ভেতরে যাই তখনও একরাশ ফাইলের সামনে বসে খুব মন দিয়ে একখানা মোটা বই পড়ছিল, তবু তার হুঁসই নাই। দেখলাম ওটা একটা ডাক্তারী বই, যে পরিচ্ছেদটা ও মন দিয়ে পড়ছে সেটা জোলাপ সম্বন্ধে, হঠাৎ আমার উপস্থিতি টের পেতেই ফট্ করে বইখানা বন্ধ করে ধরা পড়া অপরাধীর মত আমার দিকে সে চাইলে। যেন কিছুই দেখিনি এমনি ভাবে মিউজিয়াম সম্বন্ধেই গোটা কতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি সরে এলাম।

"আমার মনে তখন পর পর কয়েকটি প্রশ্ন জাগল; এ মিউজিয়ামটি হওয়া অবধি এতকাল সর্বসাধারণেরই এখানে ঢুকবার অধিকার ছিল, কোন পাসের দরকার হত না। হঠাৎ পাঁচ-সাত দিন হল সে নিয়ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ এখানে আর যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল এক্‌জিবিশন চলছিল, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যতদিন সেটা চল্‌বার কথা তার আগেই কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সব কড়াকড়ির মানে কি? তবে কি কোন দামী জিনিস হালে এখান থেকে চুরি গেছে? নিশ্চয়ই তাই, নইলে কর্তৃপক্ষের এ রকম ব্যবহারের আর কোন দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ রহস্যময় লোকটি দেখছি এখানকারই কর্মচারী! এ চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই তো? নীচে নেমেই তাই আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি মিউজিয়ামের কর্মকর্তা—কিউরেটারের ঘরে ঢুকলাম। অল্প একটু আলাপের পরই দেখা গেল আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি, বাস্তবিকই একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মুক্তার মালা চুরি গেছে। এবার পরের প্রশ্ন; কিউরেটারের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে কেউ ডেলি-প্যাসেঞ্জার নেই, সকলকেই কম্বোলিতে থাকতে হয়, তাঁর বিনা অনুমতিতে কম্বোলি ছেড়ে কোথাও কারও যাবার হুকুম পর্যন্ত নেই। অথচ এ লোকটি দেখছি আজ পাঁচ-সাত দিন ধরে রোজই রাত্রের গাড়ীতে গোপনে কলকাতা যাচ্ছে—নৈহাটীর মত অত বড় জংশন স্টেশনে কেই বা কাকে চেনে। কলকাতা সে যাচ্ছে একটা লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তার সেই রোগীটি অসহ্য ব্যথায় দিনরাত পড়ে কাৎরাচ্ছে, অথচ সে ব্যথার কারণ

ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করবার উপায় নেই, সাধারণ ডাক্তারের কাছেও না। কেননা তা হলে নাকি তাদের সবারই জেল হয়ে যাবে। এখানে হাজার কাজের মধ্যেও এ লোকটা বসে বসে চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই বই পড়ছে— নানা রকম জোলাপ সম্বন্ধে। ওষুধটা যখন জোলাপ, ব্যথাটা নিশ্চয়ই পেটের। পেটের ব্যথার সঙ্গে কোন জিনিস চুরির একমাত্র সম্বন্ধ থাকতে পারে যদি চোরাই মালটা হয় খুব ছোট, আর চোর সেটাকে গিলে ফেলে থাকে। কি অবস্থায় মুক্তোর মালা চুরি হয়েছিল কিউরেটার তা বলেছিলেন, শুনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে আপনার প্রতিবেশী ওই তের নম্বরের ভাড়াটেই মালা চোর—চুরির পরেই বেগতিক দেখে সেটা গিলে ফেলেছে। কিউরেটারকে তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বিদায় নিলাম। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা তো দেখতেই পাচ্ছেন—আমি চলে আসতেই কিউরেটার কলকাতায় পুলিসের কাছে ফোন করেছিলেন, তারা লোকটাকে মেডিকেল কলেজে ধরে নিয়ে গেছে, আর সেখামে এক্স-রে করতেই ওর পেটের ভেতর মুক্তোর মালাটির সন্ধান মিলে গেছে।"

॥ তিন ॥

হীরক-রহস্য

বেলা তখন আন্দাজ একটা; খাওয়া-দাওয়ার পর হুকা-কাশির বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে ছিলেন। এমন সময় বেহারা অমৃত একখানা ভিজিটিং-কার্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। একবার সেদিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন নামটা অচেনা। "সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এসো" বলিয়া খবরের কাগজখানা তিনি এক পাশে সরাইয়া রাখিলেন।

একটু পরেই প্রৌঢ়-বয়সী যে বাঙালী ভদ্রলোকটি ভিতরে ঢুকিয়া হুকা-কাশিকে অভিবাদন জানাইলেন, তাঁর পানে মুহূর্তকাল তাঁকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকিতে হইল। বাস্তবিকই কার্ডে লেখা নামটা আগে হইতে দেখা না থাকিলে ইনি যে বাঙালী তা বুঝিতে হুকা-কাশির মত লোকেরও কষ্ট হইত। প্রায় সাহেবের মতই ধবধবে রং, পা হইতে গলা অবধি নিখুঁত সাহেবী পোষাক, চলিবার এবং কথা বলিবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত সাহেবী ধরণের।

ভদ্রলোকের মুখখানা কিন্তু বড়ই মলিন, চোখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। আগন্তুকটিই প্রথম আলাপ শুরু করিলেন, বলিলেন, "আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমাদের ফার্মটার নাম সম্ভবতঃ আপনি শুনেছেন।"

"কোন্ ফার্ম ?" হুকাকাশি প্রশ্ন করিলেন।

"সেন এণ্ড সরকার লিমিটেড—জুয়েলার্স।"

হ্যাঁ, এ নাম হুকাকাশি শুনিয়াছেন বটে। সাধারণতঃ জুয়েলার্স বা মণিকার বলিতে যা বুঝায় ইঁহারা তা হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের। অবশ্য হীরা-জহরৎ এঁরাও বেচেন বটে, কিন্তু কারবারের প্রধান কাজ হীরা পালিশ এবং কাটাই করা। কিছুদিন হইল এঁরা দমদমে ছোটখাটো একটা কারখানা খুলিয়াছেন, সে খবরও হুকাকাশি রাখেন। ঠিক বিলাতী কায়দার না হইলেও কারখানাই বটে।

আগন্তুক—তাঁর নাম মিস্টার সেন—আবার কহিলেন, "আমিই এ কারবারের সিনিয়ার পার্টনার (প্রধান অংশীদার)। হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডামে কুড়ি বছর হাতে কলমে কাজ শিখে এসে এখানে ব্যবসার পত্তন করেছি। কাজকর্ম চলছিলও ভালোই কিন্তু মিস্টার হুকাকাশি, হঠাৎ আমার এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

হুকা-কাশি একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন, "সব কথা আমায় খুলে বলুন।"

"বিঘাউনির রাজার নাম শুনেছেন, বোধ করি, তিনি আমাদের একজন বাঁধা খদ্দের। দিন কতক আগে তাঁর কাছ থেকে একখানা হীরা আসে, সেখানাকে হাল-ফ্যাসান অনুযায়ী কেটে পালিশ করে দিতে হবে। কালকে কারখানায় আমাতে আর আমার পার্টনার সরকারেতে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়; হীরাখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি বেশ করে দেখিয়ে দিই যে কি ভাবে কাটলে ওখানার জৌলশ সব চাইতে বেশী খুলবার সম্ভাবনা। ঠিক হল, আমার উপদেশ মত, আমার সম্মুখে আজ ওটা কাটা হবে। কাল আমার সময় ছিল না, কাজের তাড়ায় বার হতে হয়েছিল। দিনের শেষে কাল যখন কারখানা বন্ধ করা হয় তখনও ওখানা ঠিক জায়গাতেই ছিল। তারপর হীরার কেস বন্ধ করে চাবি দেওয়া হল। কিন্তু আজ কারখানায় এসে দেখতে পেলাম কেসে হীরাখানা নেই, তার খোলটা খালি পড়ে রয়েছে—অর্থাৎ রাত্তির বেলায় হীরাটি চুরি গেছে। অথচ কি ভাবে যে হীরা চুরি

যেতে পারে আকাশ-পাতাল ভেবেও আমরা তার কোন কুল-কিনারা পাচ্ছি না। সমস্ত কারখানাটির একটি বর্ণনা দিলেই ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন। যে প্রকাণ্ড হলঘরটাতে আমাদের কাজ হয়—হীরা থাকে—সেটা থেকে বাইরে বেরোবার একটি মাত্র দরজা, সারা ঘরে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। ল্যাচ্ কী দিয়ে সে দরজা খোলা হয়, বন্ধও হয় সেইভাবেই। আমার আর মিঃ সরকারের হাতেই শুধু তার চাবি, আর কারো হাতে সে চাবি কখনই পৌছুতে পায় না। দরজার পরেই বাইরে শক্ত লোহার কোলাপ্-সিবল গেট, তারও চাবি শুধু আমাদের দু'জনার কাছে। কারখানা ছুটি হলে প্রত্যহ আমি নিজে হাতে প্রথমে ভেতরের দরজা, তারপর কোলাপ্‌সিবল্ গেট বন্ধ করে দিই। হলের ভেতর আলো আসবার জন্য অনেকগুলি জানলা অবশ্য রাখতে হয়েছে, তবে সেগুলো মানুষের নাগালের অনেকখানি উঁচুতে। সবগুলো জানলাতেই প্রথমতঃ মোটা মোটা লোহার শিক, তার ওপর আগাগোড়া মিহি তারের জালে ছাওয়া। মাছিটিরও গলবার জো নেই। জান্‌লার পাল্লা আগাগোড়া লোহার, কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ভেতর থেকে সেগুলো এঁটে দেওয়া হয়। ঘরের ভেতর কাজ চলবার সময় যে-সব আবর্জনা জঞ্জালের সৃষ্টি হবে তা পর্যন্ত একটু নড়চড় হবার উপায় নেই। হলের সঙ্গে লাগানো চৌবাচ্চার মাপের প্রকাণ্ড উঁচু আর একটা ঘর আছে—শুধু একটা নর্দমা দিয়েই হলঘরের সঙ্গে তার যোগাযোগ। এটাকে আমরা বলি চৌবাচ্চা-ঘর। ঐ নর্দমা পথে সমস্ত জঞ্জাল চৌবাচ্চা-ঘরে এসে জড় হয়ে। এই চৌবাচ্চা ঘরে ঢোকবারও শুধু একটিমাত্র দরজা, চাবি থাকে কেবল আমার আর মিঃ সরকারের কাছে। আমরা দু'জনা ছাড়া এ ঘরে অন্য কারো ঢুকবারই হুকুম নেই। রোজ বিকাল পাঁচটায় কারখানা বন্ধ হলে আমি এসে জঞ্জালগুলো পরীক্ষা করে দেখে আবার বন্ধ করে চলে যাই। হলঘরে তবুও জানালা রয়েছে, এখানে সে বালাইও নেই, থাকবার মধ্যে আছে কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য ছাতের কাছাকাছি দেওয়ালের গায়ে দুটো ছোট ছোট ফোকর—মোটা শিক সেখানেও এমনিভাবে বসানো যে মানুষের সাধ্য কি সেখানে কোন রকম দন্তস্ফুট করে। মেঝের ওপর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরের ছাদ চৌদ্দ ফুট। দিন রাত বন্দুক-কাঁধে বরকন্দাজ পাহারা দিচ্ছে—একজন চৌবাচ্চা-ঘরের কাছে, একজন ঠিক তার উল্টো দিকে। একতলায় কারখানা, দোতলায় আমার কোয়ার্টার। আজ বেলা দশটায় কারখানা খোলবার সময়

বরাবরকার মতই বিশেষ লক্ষ্য করে গেছি, দরজা-জানলা কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ নেই। হীরার কেসগুলোও দিব্যি তালাবন্ধই আছে। কাজেই কি ভাবে যে হীরাখানা খোয়া যেতে পারে তা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড রহস্য। আপনি হয়তো বললেন, কাজ করাবার সময় কারিগরদের ভেতরেই কেউ হয়তো এ দুষ্কর্মটি করেছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, মিঃ হুকা-কাশি, তা একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে আমাদের ওখানকার নিয়মই হ'ল এই, যে একবার কাজের ঘরে ঢুকলে কারখানা বন্ধ হবার আগে আর কেউ সে ঘর থেকে বাইরে আসতে পাবে না। টিফিনের সময়ও জলখাবার খেতে হবে ঐ ঘরেরই ভেতরে—যার যা খেতে অভিরুচি বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। ঘরের এক পাশে কাঠের পার্টিশন দিয়ে জলের কল, বাথরুম সমস্তই করে রাখা হয়েছে। বাইরে আসবার কোন দরকার নেই। কাজের ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র ভিতর-দরজাটা আমরা বন্ধ করে দিই, আর সেই বন্ধ দরজার এ পাশে সারাক্ষণ একটা দরোয়ান মোতায়েন থাকে। মিঃ সরকার এবং আমি ছাড়া সারা দিনে ও ঘরে আর কোনও প্রাণীর ঢোকবার উপায়ও নেই, হুকুমও নেই। তারপর ছুটির ঘণ্টা বেজে গেলে কারিগরদের একে একে দরজার সামনে আনা হয়, তন্ন তন্ন করে তাদের দেহ তালাস করে তবে আমি ফটকের বাইরে যেতে দিই। বিশ বছর আমস্টর্ডামে চাকরী করে এসেছি, হীরা সরিয়ে নেবার যত রকম সম্ভব-অসম্ভব ফন্দি-ফিকির আছে কোনটাই আমার জানতে বাকী নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার চোখে ধুলো দিয়ে কেউ যে সরে যেতে পারেনি, এ কথা ধ্রুব সত্য। আর তাছাড়া তার তো প্রত্যক্ষ প্রমাণই রয়েছে—দিনের শেষে কেস বন্ধ করবার সময় হীরা তো কেসেই ছিল দেখা গেছে! এক ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া এ রহস্যের তো আর কোনও সমাধানই আমি দেখতে পাই না। অথচ সময়মত রাজা বাহাদুরকে তাঁর হীরা ফিরে দিতে না পারলে আমাদের দশা কি হবে একবার ভেবে দেখুন আপনি।"

ভদ্রলোক হাতের তেলোর ওপর কপালের ভর রাখিয়া ম্রিয়মানভাবে মেঝের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

হুকাকাশি ধীরে ধীরে এক টিপ নস্যি লইয়া কহিলেন, "হুঁ, হীরা চুরির ব্যাপারটা আজকাল কলকাতায় একটু সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আপনি নন, আরও দু'একজন মণিকার এ বিষয়ে আমার পরামর্শ

চেয়ে পাঠিয়েছেন।···আচ্ছা আপনি এখন দমদমায় ফিরে যান, ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি আসছি।"

মিস্টার সেন গিয়া মোটরে উঠিতেই হুকাকাশি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন, "হ্যাল্লো······কে রণজিৎবাবু? ভারী ইন্টারেস্টিং—আর একটা হীরা চুরির কেস! হ্যাঁ, এবারে দম্‌দমার সেন এণ্ড সরকার কোম্পানী থেকে। হাতে সময় আছে? একবারটি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে ওখানে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছেন? আচ্ছা, আমি তাহলে তৈরী হয়ে থাকি।"

যথা সময়ে রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া হুকাকাশি দম্‌দমার সেন এণ্ড সরকারের কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ সেন ফটকের সামনেই অপেক্ষা করিতে ছিলেন, অল্প পরে মিঃ সরকারও আসিয়া জুটিলেন। হুকাকাশি বলিলেন, "সময় নষ্ট না করে প্রথমেই চলুন অকুস্থানে যাওয়া যাক, মানে যেখান থেকে হীরাখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে।"

দরজা খোলা হইল, চারিজনেই প্রকাণ্ড হলটার ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। সে সময়টা টিফিনের, কারিগরেরা কাজকর্ম ছাড়িয়া ঘরের মধ্যেই যে যার টিফিন খাইতে বসিয়া গেছে—কেউ টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি হইতে রুটি-তরকারি বাহির করিতেছে, কেউ বা গুড় সহযোগে চিড়া চিবাইতেছে। কারো কারো আবার স্বাস্থ্যকর জিনিষের ওপর ততটা লক্ষ্য নাই, মুখরোচক হইলেই হইল। তারা ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলিয়া বাহির করিতেছে ঝুরিভাজা। কেউ বা দুনিয়ার একমাত্র সার বস্তুটাকেই শুধু চিনিয়াছে, অর্থাৎ সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও থার্মোফ্লাস্ক খুলিয়া গিলিতেছে কেবল বাটি বাটি চা। রণজিৎ একটু হাসিয়া মিঃ সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "নাঃ, আপনার কারিগরদের ভোজন-বৈচিত্র্য আছে বলতেই হবে; কেউ কেউ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেজায় সতর্ক, আবার কেউ কেউ সে বিষয়ে কোন তোয়াক্কাই রাখে না।"

হুকাকাশি টিপ্পনী কাটিলেন, "অর্থাৎ খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ, এই তো? কিন্তু কেউ কেউ আবার বিশেষ অজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ—দুই-ই। ঐ দেখুন, পাছে বাতাস লেগে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে ওই লোকটা খাবারের বাক্সে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটো করে নিয়েছে। অথচ খাবার বেলায় খাচ্ছে তেলেভাজা বেগুনি—এক কথায় যাকে সদ্য বিষ বললেই চলে!"

মুখে রসিকতা করিতে থাকিলেও হুকাকাশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত ঘরখানাই

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিতে ছিলেন; গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "বাস্তবিকই আপনারা একটি অভেদ্য দুর্গই তৈরী করে রেখেছেন, মিঃ সেন। কোন বাইরের লোকের পক্ষে এখানে ঢুকে কোন কিছু সরিয়ে নেওয়া যেমন অসম্ভব; তেমন ভেতর থেকেও যে-কোন লোকের পক্ষেই বাইরে কোন জিনিষ চালান দেওয়াও দুঃসাধ্য ব্যাপার! ওপরের ওই জানলার পাল্লাগুলি তো দেখছি খাঁটি স্টীলের। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে নিশ্চয় ওগুলোকে ভেতর থেকে এঁটে দেওয়া হয়।......এই গুলোই বুঝি হীরার কেস ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, এগুলোও খাঁটি স্টীলেই তৈরী। কেসের ভেতর প্রত্যেকটি হীরার জন্য আলাদা আলাদা খোপ আছে, গায়ে নম্বর আঁটা। এখন কাজ চলছে, তাই কেসের ডালা খোলা, মিঃ সরকার এগুলোর কাছে কাছেই থাকেন। ছুটির সময় প্রত্যেকটি খোপে হীরা আছে কিনা দেখে নিয়ে ডালা বন্ধ করে চাবি এঁটে দেবেন। তার মানে লোহার সিন্ধুকের মধ্যেই এগুলো রাখা হল।"

"বুঝেছি, এখন চলুন, পার্টিশনটার ওধারটা একবার দেখে আসা যাক। বাঃ, এদিকেও তো দেখছি আশনাদের সতর্কতার সীমা নেই—একেবারে দুর্গ।" পার্টিশনের এধারে আসিয়া হুকাকাশি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আপনার কারিগরেরা কি মাঝে মাঝে খিচুড়ী দিয়েও টিফিন করে নাকি মিঃ সেন ?"

"খিচুড়ী ? কই, দেখিনি তো কখনও। তা খেতে পারে, আশ্চর্য কি ?"

"আমি কিন্তু রান্নাকরা খিচুড়ীর কথা বলছি না—কাঁচা খিচুড়ী।"

"কাঁচা খিচুড়ী! সে আবার কি ?"

"নইলে এগুলো এখানে এলো কোত্থেকে ? এই দেখুন।" বলিয়া তিনি গুটিকয়েক ডাল এবং চাল মেঝে হইতে তুলিয়া মিঃ সেনের হাতে দিলেন।

এগুলির দিকে কিন্তু আর কারোরই নজর পড়ে নাই। সেন এবং সরকার পরস্পরের দিকে তাকাইয়া মুখ চাওয়া-চাওই করিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা তাঁদের কিছুই বোধগম্য হইল না। কিন্তু হুকা-কাশির আর তখন সেদিকে জ্রক্ষেপ নাই, একখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ততক্ষণ তিনি ঘরের মেঝে পরীক্ষা করিতে বসিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ রণজিৎকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন তো রণজিৎবাবু, মেঝের ওপর ছড়ান এগুলো কি ?"

রণজিৎ খানিকটা দেখিয়া নিয়া কহিল, "এতো দেখছি বালি।"

"কিন্তু সাধারণ বালি নয় নিশ্চয়ই। না না, হাতে করে অত জোরে রগড়াবেন না, কি রকম খরখরে দেখছেন তো, হাত ছড়ে যাবে যে!"

মিঃ সেনেরও কৌতূহল হইয়াছিল, হাতে করিয়া জিনিষটা তুলিয়া নিয়া কহিলেন, "এ তো দেখছি কাঁচের গুড়ো, কারখানায় এ জিনিষ আনলে কে?"

হুকাকাশি বলিলেন, "আমার এদিকটা দেখা হয়ে গেছে, আর কোন জায়গা যদি দেখাবার থাকে তো চলুন মিঃ সেন।"

"আর কোন জায়গা?"

"সবই যখন দেখা হল, তখন আপনাদের চৌবাচ্চা-ঘরটাই বা বাদ যায় কেন? চলুন ওটাও দেখে আসি।"

হল হইতে বাহির হইয়া সকলে চৌবাচ্চা ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ সেন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দরজাটি খুলিয়া দিলেন—ভিতরে এত অল্প জায়গা যে চারিজন লোকের স্থান সংকুলান হওয়াই শক্ত; তার উপর আলোর অভাবও যথেষ্ট। মিঃ সেন পকেট হইতে খুব দামী একটা টর্চ বাহির করিয়া এধার ওধারে টর্চের তীব্র আলোক ফেলিতে লাগিলেন। এক কোণে ছোট্ট সাদা মত কি একটু জিনিষ দেখা গেল, আঙুলে করিয়া সেটুকু তুলিয়া আনিয়া মিঃ সেনকে হুকাকাশি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন তো, এটা কি আপনাদের হীরা কাটার কোন কাজে আসে?"

মিঃ সেন দুই হাতে জিনিষটা একটু কাল নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, "এতো দেখছি তুলো, কিন্তু সাধারণ তুলো এতো নয়, এ যে প্রায় রেশমের সামিল—এ আমাদের কারখানায় ঢুকলো কোত্থেকে?"

"ঠিক বলেছেন, কাঁচের গুড়োও যেমন অসাধারণ তুলোও ঠিক তাই! বাজারে এ ধরণের তুলো আপনি কিনতে পাবেন না। চলুন, এবারে বার হওয়া যাক, আমার কাজ হয়ে গেছে।"

দরজা বন্ধ করিতে করিতে মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কিছু আঁচতে পারছেন?"

"তা পারছি বইকি, বারো আনা রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

"বটে নাকি?" মিঃ সেন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, পলকের জন্য আশার আলোকে তাঁহার সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল, কহিলেন, "মহারাজের হীরা তবে ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে?"

"তা নেই, একথাই বা বলি কি করে! কাল আর আমার দেখা হয়ত আপনি পারেন না, তবে পরশু নাগাদ আমার কাছ থেকে একটা টেলিফোন আপনি আশা করতে পারেন। এখন যাবার আগে একটা কথা—কারখানা-ঘরের দরোয়ানটাকে আমি একটু আড়ালে ডেকে গুটি দুই প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য আপনাদের যদি তাতে কোন আপত্তি না থাকে।"

"সে কি কথা, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমাদের আবার কি আপত্তি।"

"বেশ, তবে চলুন এবার তার কাছে আমায় নিয়ে।"

হুকাকাশি ঠিকই বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই পরদিন সারাবেলা তাঁর আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপর সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তিনি ঝড়ের মত রণজিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত, কহিলেন, "চট করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিন্ তো রণজিতবাবু, একবার 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' আপিসে যেতে হবে।"

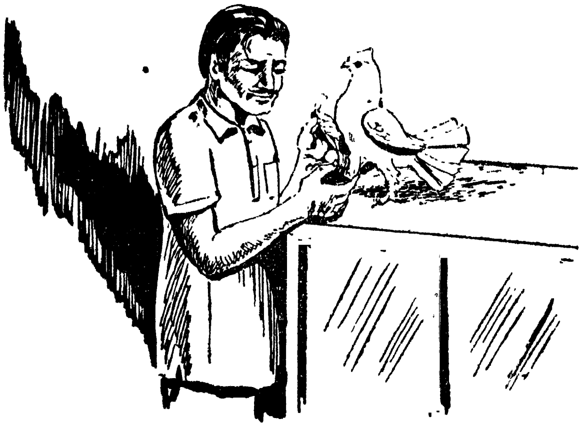
"কেন? সেখানে কি দরকার?"

"ডাট এণ্ড ডাট জুয়েলার্স একটা বিজ্ঞাপনের কপি আমার হাতে দিয়েছে, কালকের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' পত্রিকায় সেটা বার হওয়াই চাই। আমার কথায় এত দেরীতে ওরা যদি বিজ্ঞাপনের কপি নিতে আপত্তি করে, তাই আপনাকে সঙ্গে নেওয়া। খবরের কাগজ-মহলে আপনার খুব খাতির, আপনার অনুরোধ ওরা কেউ ঠেলতে পারবে না।"

খবরের কাগজের আপিস হইতে বাহির হইয়া হুকাকাশি আবার ডুব মারিলেন, পরদিন বিকাল পর্যন্ত আর তাঁর কোন খবরাখবর নাই। রণজিৎ অদম্য কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অনবরত ঘর বার করিতেছিল, এমন সময় ক্রিংক্রিং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সে রিসিভারটা কানে লাগাইল; তারপর চোঙ্গার কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল, "হ্যাল্লো, ওঃ মিস্টার হুকাকাশি? খবর কি? আমার আর আপনার দু'জনারই সন্ধ্যার পর মিঃ সেনের ওখানে নেমন্তন্ন? হঠাৎ এত আনন্দোৎসবের কারণ কি? বলেন কি, বিঘাউনি-রাজের হীরার উদ্ধার এর মধ্যেই হয়ে গেছে? আপনি মানুষ নন মিস্টার হুকাকাশি, কিছুতেই মানুষ নন্—হ্যাঁ অপদেবতা, তাই বটে! আমায় ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাবেন? আচ্ছা!"

রণজিৎ ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলে হুকাকাশি বলিতে সুরু করিলেন, "একেবারে বৈজ্ঞানিক চুরি মশাই, এদেশে এমনতর ব্যাপার বড় দেখা যায় না। অক্ষয় নামে এক নামজাদা ঝানু জোচ্চোর সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এক নতুন ধরণের জোচ্চুরি শুরু করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ণের অনেকগুলো নকল হীরা জোগাড় করে—সে সব কোথায় পাওয়া যায় আপনি না জানলেও জোচ্চোরেরা তার খবর রাখে—সে কলকাতার দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াত। খদ্দের সেজে দোকানের কাউণ্টারের ওপর হীরা পরখ করবার ছুতোয় নকল হীরা বাক্সে চালান দিয়ে, আসলখানা বার করে এনে বলত, 'না মশাই, পছন্দ হল না।' তারপর দোকানীর চোখের সামনেই খুট করে বাক্সটা টিপে দিয়ে চলে আসত। চোখের সামনে হীরা বন্ধ করা হয়েছে দেখে দোকানীর আর কোন সন্দেহ হত না। তারপর আসল ব্যাপারটি যখন খোলসা হত তখন খদ্দের একদম ভেগে পড়েছে। এই রকম বার দু'তিন ঘটতেই মণিকার-মহল সাবধান হয়ে গেল। দু' একজন আমাকেও খবর দিলে। অক্ষয়ও বুঝল, ঘন ঘন এক ফিকির বেশীদিন চালান নিরাপদ নয়, একটু অন্যপথে যাওয়া দরকার। হঠাৎ তখন তার মনে পড়ল সেন এণ্ড সরকার কোম্পানীর কথা। শোনা যায় ওদের হীরা নাকি বাজার চলতি হীরার চাইতে ঢের ঢের বেশী দামী। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? টাকা কব্‌লে বনমালী নামে সেন এণ্ড সরকার কোম্পানীর এক করিগরকে অক্ষয় হাত ধরে ফেল্লে। এবার প্ল্যান হল সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। ঝানু জোচ্চোর কিনা, হরেক রকম জোচ্চুরিরই সাজ-সরঞ্জাম ওর কাছে আছে। এই সরঞ্জামের মধ্যে আছে গুটি কয়েক শেখানো পায়রা। আপনি নিশ্চয় জানেন শিক্ষিত পায়রাকে কোন জায়গা থেকে ছেড়ে দিলে সে উড়ে গিয়ে ঠিক তার মালিকের বাড়ীতেই হাজির হবে। আগেকার দিনে সেনাপতিরা এদের পায়ে চিঠি বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে পর্যন্ত খবর পাঠাতেন। এ রকম একটি শেখানো পায়রা বনমালীকে দেওয়া হল। সেন এণ্ড সরকারের কারখানা-ঘরে কর্মচারীদের ঢোকবার বেলায় কোন রকম 'দেহ-তালাস' করা হয় না, কেননা তা অনাবশ্যক, ওটা করা হয় শুধু বার হবার সময়তেই। বনমালী তার টিফিনের বাক্সে হাওয়া চলাচলের উপযোগী গুটিকয়েক ছ্যাদা করে পায়রাটিকে তারই ভেতর পুরে ফেল্লে, তারপরে টিফিন বলে চালিয়ে বাক্সটাকে নিয়ে এলো কারখানা-ঘরের মধ্যে।

ভেস্কিওয়ালার পায়রার মত অক্ষয়ের পায়রাও ডাকে না, চুপচাপ পড়ে থাকে। বনমালী আগেই খবর পেয়েছে পাকা জহুরী মিঃ সেনের উপস্থিতি ছাড়া বিঘাউনি-রাজের হীরা কাটা হবে না, আর সেদিনই টিফিনের সময় মিঃ সেনকে কাজের তাগাদায় বেরুতে হবে ; ফিরবেন তিনি কারখানা বন্ধ হবার সময়— 'দেহ-তালাসী' করতে। কাজেই টিফিনের পরই সে সুযোগ বুঝে অক্ষয়ের দেওয়া একখানা যুৎসই নকল হীরা কেসে রেখে আসল হীরাখানা তুলে নিল। যেমন গহনাগাটির দোকানে সচরাচর হয়ে থাকে—কাজের খাতিরে সকলকেই সর্বদা কেসের কাছে যেতে হচ্ছে, সন্দেহের কোনই কারণ নেই। পার্টিশনের এধারে বাথরুমে এসে অন্যের অলক্ষ্যে পায়রার পায়ে বিঘাউনি-রাজের হীরা বেঁধে দিতে তার কোনই কষ্ট হয়নি। তারপর বাক্সে ফের পায়রা পুরে সে



আবার চলে এলো হল-ঘরে, যেখানে জঞ্জাল ফেলবার নর্দমা ঠিক তারই মুখে। এ নর্দমাটিরও সর্বদাই ব্যবহার হচ্ছে, কাজেই হুঁসিয়ারির সঙ্গে চারদিক দেখে নিয়ে কৌশলে সে যখন পায়রাটিকে এই নর্দমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে তখনও কারো কোন সন্দেহ হবার কারণ ঘটেনি। পায়রা এসে পড়ল চৌবাচ্চা-ঘরে ; সে ঘরের খুব উঁচুতে আলো ঢুকবার ফোকরগুলিতে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো। চোর আটকাবার পক্ষে তা পর্যাপ্ত বটে, কিন্তু পায়রার পক্ষে সে পথে গলে যাওয়া কিছুই কষ্টকর নয়। শিক্ষিত পায়রা সেই পথেই উড়ে এসে অক্ষয়ের হাতে বিঘাউনি-রাজের হীরা পৌঁছে দিলো।

"এদিকে এক মুহূর্তও হীরার খোপ খালি পড়ে থাকেনি বলেই ওদিকে

কারুর নজর যায়নি, আর বনমালীও এতটা সাহস পেয়েছিল। ছুটির সময় প্রত্যেকটি খোপই ভর্তি আছে দেখে মিঃ সরকারও কিছু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যকও মনে করেন নি, কেস বন্ধ করে ফেলেছেন। সকলেরই ধারণা বিঘাউনি-রাজের হীরা সারারাত কেসেই ছিল। পরদিন বনমালী এসে প্রথমেই সেই নকল হীরা, মানে কাঁচের টুকরোটা কেস থেকে তুলে এনে পেষাই-কলে ফেলে এক মুহূর্তে বালির মত মিহি করে ফেললে। তারপর সেই কাঁচের গুঁড়ো পার্টিশনের ওধারে ফেলে দিল—যাতে জলের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়িতে কাজ সারতে যাওয়ায় অল্প একটু গুঁড়ো কিন্তু মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নকল হীরাটাকে এভাবে নষ্ট করার অর্থ এই যে, মিঃ সেনের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাবে রাত্তিরেই বাইরের কোন চোর এসে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা আত্মসাৎ করেছে, ভেতরের কোন কারিগরের এর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ একদম উল্টোদিকে অনুসন্ধানের মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া।"

রণজিৎ অবাক হইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিতে ছিল, হুকাকাশির বর্ণনা শেষ হইয়া যাওয়ার পরও সে একটুকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "বাস্তবিক, এ যে আপনি কি করে বার করলেন ভেবে ভেবে কিছুই কুল-কিনারা পাচ্ছি না।"

হুকাকাশি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা শুনুন তবে, কুল-কিনারা পাইয়ে দিচ্ছি।…সেন এণ্ড সরকার কোম্পানীর কারখানায় এসে গোড়াতেই একটা জিনিষ একদম পরিষ্কার হয়ে গেল—রাত্রিযোগে বাইরের কোন চোর ভেতরে এসে যে হীরা চুরি করেনি সেটা সুনিশ্চিত। এমন একটা সুরক্ষিত দুর্গে তাদের আসাই যে শুধু দুরূহ ব্যাপার তাই নয়, দরজা অথবা জানালা কোথাও তাদের আসবার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, এমন কি হীরার কেসটি পর্যন্ত বন্ধ অবস্থাতেই দেখা গেছে। কাজেই প্রথম হতেই সে সম্ভাবনাটা একদম বাতিল করে বিচারের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে আনলাম। বাইরে থেকে কেউ যখন আসেনি তখন নিশ্চয়ই ভেতর থেকে হীরা চালান দেওয়া হয়েছে। কারখানা ঘরটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে এও বেশ বোঝা যায় যে হীরা তো দূরের কথা, একটা মাছি গলান যেতে পারে এমন ফাঁকও কোথাও নেই, বাদ শুধু ঐ নর্দমাটা। শুধু ঐ নর্দামার পক্ষেই হীরা আসতে পারে হলঘর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরে। কাজেই নর্দমাটাই হবে আমার অনুসন্ধানের প্রধান

লক্ষ্য। বিচারের বিষয় আরও সীমাবদ্ধ হয়ে এল। তারপর বিবেচ্য, চৌবাচ্চা-ঘরে মিঃ সেন ভিন্ন আর কারো ঢোকবার উপায় নেই, কাজেই সেখান থেকে হীরাখানাকে ফের কোথাও চালান দিতে হলে তার একমাত্র পথ—প্রায় চৌদ্দ ফুট উঁচুতে আলো বাতাস ঢোকবার উদ্দেশ্যে লোহার শিক দেওয়া যে দুটো ফোকর রয়েছে তারই কোনও একটা। এ অবস্থায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে হীরা চালান দেওয়া কোন লোকের পক্ষে শুধু নিজের চেষ্টায় অসম্ভব, হয় তাকে কোন যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, নতুবা কোন জীবের। এতখানি বোধসম্পন্ন যন্ত্র থাকতে পারে বলে আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। কাজেই সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিশ্চয় কোন জীবের। সে জীবটি এত ছোট হওয়া চাই যে একটা নর্দমার পথ দিয়ে অনায়াসে সে গলে যেতে পারে, একটা টিফিন বইবার বাক্সে করে অনায়াসে তাকে কারখানা-ঘরে আনা চলে, কেন না ও-ভাবে আনা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই তাকে কারখানা-ঘরে আনা সম্ভব নয়। কাজেই অন্য সব চিন্তা ছেড়ে আমায় শুধু দেখতে হবে ঘরের কোথাও এ হেন কোন জীবের কিছুমাত্র চিহ্ন পড়ে আছে কিনা। বিচারের বিষয়টা কতখানি ছোট্ট হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছেন? ঘরে ঢুকেই একজন কারিগরের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি একটু কটাক্ষ করেছিলাম মনে আছে? খাবার নষ্ট হবার ভয়ে খাবারের বাক্সে ছোট ছোট ছ্যাঁদা করে নিয়েছিল বলে! খাবার টাটকা রাখবার উদ্দেশ্যে এ কাজ সে করেছে এ কথা কিন্তু তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল যে জীবটিকে বাক্সে পোরবার পর তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া সরবরাহের জন্যই এ ব্যবস্থা। পার্টিশনের এ পাশে এসে মেঝের ওপর চাল আর ডাল দেখতে পেয়ে আপনারা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, আমি কিন্তু হইনি। এগুলো সে জীবটিরই খাবার—এ পাশে এনে তাকে খোলবার সময় বাক্স থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে তা আমি তক্ষুনি বুঝতে পেরেছিলাম। কি ধরণের জীব, খাবার দেখে তাও কিছুটা আন্দাজ হল—যদিও আমার মনে মনে ঐ রকমেরই ধারণা ছিল। তারপর চৌবাচ্চা-ঘরে তুলো জাতীয় জিনিষটা দেখে মিঃ সেনের মনেও সন্দেহ হয়েছিল যে সাধারণ তুলো ওটা নয়। আমি কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছি—সাধারণ অসাধারণ কোন তুলোই ওটা নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ, একটা সাদা পায়রার পালক। নর্দমার পথে ঘষা-ঘষিতে পায়রার রোঁয়া

ওপর-ওপর উঠে এলে সেটা ঠিক রেশমী তুলোর মতই মনে হওয়ার কথা। সমস্ত ব্যাপারটার তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল—পায়রার পায়ে বেঁধে কারখানারই একজন কারিগর হীরা চালান দিয়েছে; এবং সে কারিগরটি কে তা আঁচতেও কষ্ট হল না—ছ্যাঁদাওয়ালা খাবারের বাক্সের মালিক যিনি, তিনিই—অর্থাৎ খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা লোকটা।

"পার্টিশনের ওধারে মেঝের ওপর আরও একটি রহস্যময় জিনিষ পাওয়া গেল, মিঃ সেন ঠিকই এঁচেছিলেন, ওগুলো সত্যিই কাঁচের মিহি গুঁড়ো, হীরার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, থাকলে মিঃ সেনের মত পাকা জহুরী কখনই ভুল করতেন না। কাঁচের গুঁড়ো তাঁর কারখানায় কি করে এলো ভেবে মিঃ সেন আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ব্যাপারটাতো এই—কোন কারণে হীরা চোরের একখণ্ড কাঁচ কারখানার ভেতরে আনার দরকার হয়েছিল, তারপর দরকার চুকে গেলে সেটাকে আর কোন-মতে লুকোবার উপায় নেই দেখে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে! এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি জন্য কাঁচের টুকরোটাকে কারখানায় আনার প্রয়োজন হতে পারে। একটু বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, বিঘাউনি-রাজের নম্বর আঁটা হীরার খোপটা খালি রেখে পায়রার পায়ে সেটি বাঁধবার চেষ্টা করা বিশেষ দুঃসাহসের কাজ,—কেন না তাতে তো কিছু সময় লাগবে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। কাজেই কারিগর স্বভাবতঃই চেষ্টা করবে এক টুকরো নকল হীরা সেই খোপে রেখে সবার চোখে ধুলো দিতে। পরদিন একটু সকাল সকাল এসে সেই কাঁচখানা উড়িয়ে দিলেই হল, কারিগরের সম্বন্ধে কর্তাদের কোন সন্দেহ হবে না, পুলিশ তাদের পেছনে লাগবে না। সুযোগ বুঝে কাঁচখানাকে পেষাইকলে চূর্ণ করতে আধ মিনিটও সময় লাগে না—এ অতি সহজেই সমাধা হতে পারে। আমি গোপনে দরোয়ানের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পরশু দিন সব্বার আগে কারখানার গেটে এসে পৌছেছিল ঐ খাঁকি প্যান্ট পরা লোকটাই; বড় বেশী গরজ কিনা, তাই দেরী সয়নি। ওর নাম যে বনমালী তাও দরোয়ানের কাছে শুনেছি।"

"এর পরের ঘটনা আর বেশি করে বলবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বললেই চলবে। আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি কারখানার কাছে কোন একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারপর ছুটির পর বনমালী বার হতেই

গোপনে তার পিছু নেওয়া গেল। সে এসে উপস্থিত হল বাগবাজারের একটা বাড়ীর দরজায়। বার কতক কড়া নাড়তেই যে লোকটা এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখে আমায় দস্তুরমত চম্‌কে যেতে হল—বছর কয়েক আগে এক জোচ্চুরির ব্যাপারে ধরতে গেলে আমিই ওকে জেলে পুরেছিলাম। লোকটার নাম অক্ষয়; জোচ্চোরের ধাড়ি। ভাবলাম জেল থেকে বেরিয়েও আবার 'হীরার ব্যবসা' ধরেছে নাকি? হালে কলকাতার মণিকার-মহলে আসল হীরার জায়গায় মাঝে মাঝে যে নকল হীরা চালান হচ্ছে সেগুলির মূলে এই মহাত্মাটি নেই তো। একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে তো। ফলে পরদিন অনেকটা সময় আমায় বাগবাজারেই কাটাতে হল। বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, অক্ষয়চন্দ্র আমাদের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার মক্কেল মেসার্স ডাট এণ্ড ডাট জুয়েলার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিন তাদেরই নামে 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বার করে দেওয়া গেল—কয়েকখানা হীরা তাদের ওখানে অল্প দামে বিক্রী হবে, শো-কেসে আছে—যে কোন লোক এসে দেখে যেতে পারে। বেশ জানতাম, ভয়ের চাইতে লোভটাই অক্ষয়চন্দ্রের বেশী। 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' বিজ্ঞাপন পড়বার পর সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, একটা না একটা জোচ্চুরির মতলব মাথায় নিয়ে ঠিক এসে হাজির হবে। হলও ঠিক তাই। যেমনি সে দোকানে এসে ঢোকা, আমিও অমনি ক্যাঁক করে ওকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। বেরিয়ে এলো খান পনেরো নানান সাইজের নানান প্যাটার্নের নকল হীরা। এর পর আর বেশী কিছু বলবার নেই,—শুধু এটুকু ছাড়া যে আমার টেলিফোন পেয়ে অক্ষয়চন্দ্রেরই বিছানার তোষক কেটে মিঃ সেন পুলিশের সাহায্যে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা উদ্ধার করে এনেছেন, অক্ষয়চন্দ্র এবং বনমালী দু'জনাই এখন হাজতে। এই যে আমরা দমদমায় মিঃ সেনের বাড়ী এসে পড়েছি—এ পায়জি, রোখকে, রোখকে!"



ছড়া

শ্রী সুচেতা ভট্টাচার্য



ছড়া! ছড়া! ছড়া!
ছন্দ মধুর মন ভোলানো মিষ্টি খুশি ঝরা।
বুকের ভেতর দোল দিয়ে যায় দুরের কাঁপনগুলি।
হাল্‌কা স্রোতে মধুর রসে উঠছে পরাণ দুলি।
টুকরো হাসির কথা দিয়ে আল্‌পনা সে আঁকে!
রঙ বেরঙের তুলির যাদু লুকিয়ে সেথায় থাকে।

ছড়া! ছড়া! ছড়া!
পরীর দেশের চুরি করা রঙিন মায়ায় গড়া।
বন্ধ মনের দরজাগুলো হঠাৎ দেখি ভাঙা—
গোমড়া কচি মুখগুলি সব ডালিম-আভায় রাঙা।
হাতের মুঠোয় খুশির পরাগ দেয় ছড়িয়ে কারা।
আর কেহ নয়—ছন্দ মুখর লিখছে ছড়া যারা।

ছড়া! ছড়া! ছড়া!
লুকিয়ে মনের ভেতর থেকে হৃদয় চুরি করা।
বৃষ্টি ঝরা বাদল দিনে মন যেন কি চায়,
কেউ জানে না, তখন তারা গোপন পায় যায়
মায়ের মুখে,—হাসির মত ঝরতে শুধু থাকে।
মন ছুটে যায় তেপান্তরে,—যায় না ধরা তাকে

ছড়া! ছড়া! ছড়া!
রঙ মাখানো, ঘুম পাড়ানো, স্বপ্ন দিয়ে ভরা।
ঘাসের ডগায় পাতায় আগায়, শিশির ঝরা ফুলে
এমনি ধারা হাজার ছড়া উঠছে দুলে দুলে।
ঘুরছে ছড়া মায়ের মুখে, খোকা-খুকুর মনে,—
কেউ লেখে না, আপনি ছড়া ছুটছে ফুলের বনে।



সম্পাদক সুরেশ্বর * শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সুরেশ্বরকে চেন? আমাদের সুরেশ্বর? হ্যাঁ হ্যাঁ, 'গুঞ্জন' কাগজের সম্পাদক সুরেশ্বরের কথাই বলছি। সুরেশ্বর ছেলেবেলা থেকেই একটু-আধটু কবিতা লিখতে পারত। স্কুল থেকে ফিরে তার বয়সী অন্যান্য ছেলেরা যখন ফুটবল নিয়ে মাঠের দিকে ছুটত সুরেশ্বর তখন ছোট একটি বাঁধানো খাতা নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠত গিয়ে ছাদে। ছাদের নিরিবিলি কোণে, যেখানে ছোট্ট একটি অশথের চারা মাথা তুলেছে, তারই পাশে একা একা বসে সে কবিতা লিখত। তোমাদের মধ্যে যারা কবিতা লেখ তারা নিশ্চয়ই জান, কবিতা লেখার সব ভাল—শুধু মিলটুকু ছাড়া। তখনও আধুনিক অমিল কবিতার রেওয়াজ হয়নি (বেচারা সুরেশ্বর!) তাই অনেক সময় মনে ভাব এলেও সেই সঙ্গে ঠিকমত মিল আসত না। ভাবতে ভাবতে—ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে যেত; মাষ্টারমশাই এসে পড়তেন। ফলে সুরেশ্বরকে খাতা-পেন্সিল নিয়ে একেবারে 'কাব্য-লোক' থেকে 'অঙ্ক-লোকে' নেমে আসতে হ'ত। শিশু কবির এ দুর্ভোগ ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে?

কিন্তু এ সব দুর্ভোগ (যা থেকে বাল্মীকি-হোমারের কথা জানি না, রবি বাবুর মত কবিরাও রেহাই পান নি), সত্ত্বেও সুরেশ্বর লিখত।

সুরেশ্বর আর একটু বড় হ'ল, হাতও আর একটু পাকল। স্কুলের ছাপানো ম্যাগাজিনে তার লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ গিস্ গিস্ করে, সহপাঠীদের মধ্যে একটু খাতিরও হয়। যে সব ছাত্রের লেখা সেখানে স্থান পায় না তারা হয় খাপ্পা। ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত মাষ্টারমশাইদের ওপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে। সুরেশ্বর সম্বন্ধে আড়ালে বলে, "কোথা থেকে টুকে মেরে দিয়েছে! ও রকম আমরাও পারি!" কিন্তু—যেতে দাও ও-সব তুচ্ছ কথা।

কলেজ থেকে বেরোবার পর সুরেশ্বর লক্ষ্য করল লেখক হিসাবে তার একটু-আধটু নাম হয়েছে। চাকরীর বাজার তখন খুব খারাপ যাচ্ছে। পথেঘাটে পাৎলুনের এত ছড়াছড়ি নেই। অবশ্য সুরেশ্বরদের অবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। বাবা বললেন, "কি রে, চাকরির চেষ্টাই করবি, নাকি ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু করতে চাস?" ব্যবসার কথা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু করতে বড় মেহনৎ। যুদ্ধের আগের কথা বলছি—অর্থাৎ 'ব্ল্যাক মার্কেট' কথাটা তখন অভিধানেও ছিল না। সুরেশ্বর বলল, "ব্যবসা করব, কিন্তু সাধারণ ব্যবসা নয়। আমার ব্যবসায়ে দাঁড়িপাল্লা থাকবে না। আমি কারবার করব লোকের মনের খোরাক নিয়ে। লাভ? হয়তো অর্থের দিক্ দিয়ে তেমন হবে না, কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তিসাধন, সেটাই কি কম লাভ? তারই জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করব।"

তাই হ'ল। সুরেশ্বর এক পত্রিকা বের ক'রে ফেলল—'গুঞ্জন'।

গুঞ্জনকে ঘিরে বাংলায় লিখিয়ে মধুকরের দল গুঞ্জন সুরু করলেন। সুরেশ্বর গুঞ্জনের জন্য জীবন না হোক, অবসর ও অর্থ দু' হাতে উৎসর্গ করতে লাগল। কাগজ দাঁড়িয়ে গেল। অর্থাৎ বাংলা দেশের শতকরা নিরেনব্বইখানা কাগজের মত বছরের প্রথম দিকে ৩।৪ মাস বেরিয়েই ছাপাখানার পাওনা মেটাতে অক্ষম হয়ে প্রেতলোকে মহাপ্রস্থান করল না।

সুরেশ্বরের বাড়ীর নীচেকার তলায়ই তার আপিস। সকালে সেখানে বসেই সে লেখে, দুপুরে সেখানে বসেই সম্পাদকীয় কাজকর্ম করে, এবং সন্ধ্যার পর সেখানে বসেই সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে চা ও ডালমুঠ সহযোগে সাহিত্য-মজলিস বসায়। রবিবার আপিস বন্ধ, কিন্তু বৈকালিক সম্মেলন সমান ভাবেই চলে। নাম-করা লেখকদের হাতে রাখবারও নাকি একটা সম্পাদকীয়

কৌশল। সকালেও সুরেশ্বর সেখানেই বসে। কাজের বিরাম নেই। কবিতা লেখা চুলোয় গেছে। সম্পাদকের ও সব বিলাসের সময় কই?

সেদিনও এমনি ধারা এক রবিবার। শীত শেষ হয়ে সবে বাসন্তী হাওয়া বইতে সুরু করেছে। সুরেশ্বর আপিস-ঘরে টেবিলের সামনে বসে ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর খস খস্ ক'রে তার ঝর্ণা-কলম বাঁধানো প্যাডের পাতায় ওঠা-নামা করছে। এ মাসের কাগজ বেরুতে আর মাত্র তিন দিন বাকি, কিন্তু সম্পাদকীয়টা আলসেমি করে এখনও লেখা হয়নি। আজ শেষ না করলেই নয়। সহকারী সম্পাদক মনোহরবাবু আজ তিন দিন থেকে সামনে তাড়া দিচ্ছেন। এ বেলা শেষ করতেই হবে। মহেন্দ্রবাবুর ক্রমশঃ উপন্যাসের এ মাসের কিস্তি এখনও পাওয়া যায়নি। ক'দিন থেকে রোজ লোক গিয়ে গিয়ে ফিরে আসছে। আজ সে নিজেই যাবে। লেখকেরা একটু নাম কিনলেই যা পায়া ভারী হয় তাদের! দু'দিন আগে যারা সম্পাদকের কাছে দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করে পায়ে কড়া বাধিয়ে বসত, দু'দিন বাদে তারাই হয় যেন আর এক মানুষ। নেহাৎ লোকে পছন্দ করে, নইলে—

হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়ল। একটি বছর ২৩।২৪এর যুবক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করল, "আস্তে পারি স্যর?"

সুরেশ্বর কলম থামিয়ে ইঙ্গিতে সম্মতি জানাল। উপায় কি? অভদ্র হওয়া যায় না তো!

যুবক ঘরে ঢুকে তেমনি মোলায়েম হেসে বলল, "আমাকে হয়তো চিনবেন না স্যর, কিন্তু আমার দাদামশয়কে নিস্চয় চিনবেন—ঈস্সর বটকেস্ট বিশ্বাস।" যুবক বোধ হয় আধুনিক বানানের মত উচ্চারণটাও সহজ করতে চায়। ইংরিজি S-এর অনুকরণে শ, ষ, স-এর মধ্যে শেষেরটিকেই তার পছন্দ।

সুরেশ্বর করুণ ভাবে জানাল, ও নাম তার শোনার সৌভাগ্য হয়নি। যুবক একটু বিস্মিত হয়ে বলল, "সোনেন নি! সেই যে যিনি সুশীলগঞ্জে একটা গোল্ড-মাইন্ ইন্ভেন্সন্ করেছিলেন?—বটকেস্ট বিশ্বাস?"

সুরেশ্বর আর ঘাঁটাতে ইচ্ছা করল না, সংক্ষেপে বলল, "ও!"

যুবক সাহস পেয়ে বললে, "আমার নাম গুণসিন্ধু বিশ্বাস, সাহিত্য-সৌরভ।" তারপর ফিস ফিস ক'রে বলল, "আপনি গুণী লোক, বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনাকে লুকোবো না। ছেলেবেলায় ভারী আমাসা হওয়ায় বেসি পড়াশোনা হয়নি। কিন্তু নামের পাসে একটা উপাধি না থাকলে নেড়া নেড়া ঠেকে, তাই ভাসা

বিজ্ঞানপরিষদে কয়েকটা টাকা মনি অর্ডার করে 'সাহিত্য-সৌরভ' উপাধিটা আনিয়ে নিয়েছি। কাউকে বলবেন না যেন স্যর!"

সুরেশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"ছেলেবেলা থেকেই, স্যর, আমার পদ্য লেখার বড় সখ"—গুণসিন্ধু পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ টেনে বার করল।—"আপনাকে স্যর, একটু সুনতে হবে।"

সুরেশ্বর প্রমাদ গণল, কিন্তু এ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ম্লান হেসে বলল, "আচ্ছা, রেখে যান, পড়ে দেখব।"

"না স্যর, আমি পড়িয়ে শোনাচ্ছি। যুৎসই করে পড়তে না পারলে রসগ্রহণে ব্যাঘাত হবে। দস মিনিট সময় আমাকে দিন—মাত্র দস মিনিট।" এবার সুরেশ্বরের অনুমতির অপেক্ষা না করেই গুণসিন্ধু করল—

"দীর্ঘ দিন—আরো দীর্ঘ রাত
আছি বসে বটের কোটরে।
ঘাসের ডগায় ঝলে মাকরের জাল,
সাথে তার ক্ষুদে ক্ষুদে ডিম।
লোভাতুর টিকটিকি দূরে চেয়ে রয়,
মনে হয়—"

পড়তে পড়তে গুণসিন্ধুর কপাল কখনও বা কুঞ্চিত হ'ল, নয়ন বিস্ফারিত হ'ল, গলার স্বর ধাপে ধাপে চড়তে লাগল, আবার নামতে লাগল।

সুরেশ্বর কলম কামড়ে ধরে বসে রইল। ঝাড়া আধ ঘণ্টা পরে গুণসিন্ধু থামল। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি। বললে, "এ মাসের গুঞ্জনে কিন্তু আমার অন্ততঃ দু'টো লেখা দিতে হবে স্যর্।"

"এ মাসে! এ মাসের লেখা তো দু' মাস আগেই ঠিক হয়ে আছে। তা ছাড়া—"

"ও সব শুনছি না স্যর্! দিতেই হবে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তায় 'লিটারেট' লোক। এ লাইনেই করে খাচ্ছেন। উৎসাহ না দিলে চলবে কেন?" গুণসিন্ধু আর একবার মোলায়েম ভাবে হাসল। সুরেশ্বর বাক্যব্যয় বৃথা বুঝে বললে, "আচ্ছা, রেখে যান।"

'রেখে যান' কথাটিও একটি সম্পাদকীয় ভদ্রতা, অনেক বিপদ থেকে সুরেশ্বরকে রক্ষা করেছে।

গুণসিন্ধু চলে গেলে সুরেশ্বর মনোহরবাবুকে ডাকল।—"এই নিন আর দু'টি কবিতা। এ মাসে এই নিয়ে ক'টি হ'ল?" মনোহরবাবু একটু ভেবে বললেন, "আটশ' পূরে গেছে বোধ হয়। আর তিন দিন মাস কাবারের আছে, হাজার হয়ে যাবে। তা যাক্, সব এক পিঠে লেখা, উল্টো দিকে আপিসের রাফ্ কাজকর্ম করা চলবে। সাদা কাগজের যা দাম আজকাল!"

মনোহরবাবু পাশের ঘরে ঢুকলেন, সুরেশ্বর আবার কলম নিয়ে কাগজের ওপর মনোযোগ দিল। আবার ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে গেল। এবারে যিনি ঢুকলেন তিনি আগের মত বিনীত ন'ন, বয়নেও অনেকটা বড়। সটান ভিতরে এসে বললেন, "গুঞ্জনের সম্পাদক কে? আপনি?"

সুরেশ্বর থতমত খেয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক যেন খেঁকিয়ে উঠলেন। পকেট থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করে বললেন, "হুঁ। আচ্ছা মশাই, জানতে পারি এ লেখাটি ফেরৎ দিয়েছেন কেন? আর—আর এই লেখা—" ভদ্রলোক ফস্ ক'রে বগলের তলা থেকে একখানা পুরোনো গুঞ্জন বার ক'রে বললেন, "এটি আপনার কাছে খুব ভাল লেগেছে, না? কেন না উনি, শ্রীঅনিন্দ্য রায়, ২।৪টে ট্র্যাশ বই ছেপে বাজারে একটু নাম ছড়িয়েছেন, কেমন, এই না?"

সুরেশ্বর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখল সামনে একটি সুদীর্ঘ রচনা। লেখকের নামের জায়গায় মোট মোটা অক্ষরে লেখা শ্রীক্ষেমঙ্করী দাসী। ওপরে রবার ষ্ট্যাম্পে গুঞ্জন কার্যালয়ের ছাপ দেওয়া। তার নীচে আর একটি ছাপ—'অমনোনীত'। নীচে তার নামের আদ্যক্ষর 'সু'।

"লেখা পত্রিকার উপযোগী কিনা সেটা সম্পাদকের মতামতের ওপর নির্ভর করে। তার জন্য যদি সবাইকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তবে তো আর—" সুরেশ্বর কথাটা আর শেষ করতে পারল না, ভদ্রলোক কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "থামুন মশাই, থামুন। লেখার ভাল-মন্দ আমরাও কিছু কিছু বুঝি। সম্পাদকী করি না বলে একেবারে ঘাসও খাই না। সব আপনাদের পক্ষপাতিত্ব, নইলে—"

সুরেশ্বর তর্ক না ক'রে নিজের লেখার দিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। ভদ্রলোক ব'লে যেতে লাগলেন, "শুনুন তবে। ওটি আমার স্ত্রীর লেখা। ভেবেছিলাম মেয়েছেলে, একটু উৎসাহ পাবে। ওদিকে কাগজে তো খুব লম্বা-চওড়া লেখেন—মেয়েদের তুলতে হবে, পড়াতে হবে, হেন করতে হবে,

তেন করতে হবে—কত কি! তা যাক্, এবার দেখা যাবে ক'দিন কাগজ চালান।" ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আপনাদের গ্রাহিকা ছিলেন। নাম কেটে দেবেন। ও রকম ওঁচা কাগজ বাড়ীতে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।"

সুরেশ্বর কি জবাব দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রলোক তার আগেই বেরিয়ে গেছেন। সুরেশ্বরের মনটা খিঁচড়ে গেল। চায়ের ঝোঁকটা থাকতে থাকতে বেশ দরদ দিয়ে সে স্ত্রীশিক্ষার ওপরই এক কলম লিখতে যাচ্ছিল যে!

মিনিট দুই মাত্র। দরজা আবার ফাঁক হ'ল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বছর দশেকের গোলগাল, টোপাটোপা একটি মেয়ের হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন।

"আপনার নামই সুরেশ্বরবাবু? নমস্কার।"

"নমস্কার।"

"এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এটি আমার মেয়ে টেঁপী—মানে অলকনন্দা চ্যাটার্জি।" মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "নমস্কার করেছিস?" প্রত্যুত্তরে টেঁপী—মানে অলকনন্দা চ্যাটার্জি ড্যাবডেবে চোখে সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে কোনই ভাবান্তর দেখা গেল না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিন্তু দমলেন না। বললেন, "নিজের মেয়ে, নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখায় না। কিন্তু অদ্ভুত প্রতিভা মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না—"

বিশ্বাস করবার জন্য সুরেশ্বর প্রতিভাময়ীটির দিকে ফিরে তাকাল। বেশ কুমড়ো-কুমড়ো চেহারা। প্রতিভার কোন ছাপ, মুখে অন্ততঃ, নেই।

"বের কর তো টেঁপী—মানে অলকনন্দা, সেই ছবিটা। দেখুন মশাই, এইটুকু মেয়ে, নি-ঈজে এঁকেছে। বিশ্বাস করেন?"—বলে ভদ্রলোক সুরেশ্বরের সামনে একটি ভাঁজ করা কাগজ মেলে ধরলেন। সুরেশ্বর বিস্মিত হয়ে দেখল এবং সেটা যে টেঁপী অর্থাৎ অলকনন্দার নি-ঈজের আঁকা তাও বিশ্বাস করল। ছবির নিচে টেঁপী—অর্থাৎ অলকনন্দার মতই গোদা গোদা অক্ষরে লেখা 'ধানের আঁটি'। (ছবিখানা দেখলে হয়তো তলায় 'আমের আঁটি' বা 'গাবের আঁটি' লিখে দিতেই সাধ যাবে।) আরও নীচে অশুদ্ধ বানানে শিল্পীর নাম টেঁপী লিখে কেটে শ্রীমতী অলকনন্দা চ্যাটার্জি বসানো হয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু এই রকম: প্রকাণ্ড একটি মেয়ে—মাথাটা শরীরের

দ্বিগুণ, পটল চেরা নয়, একেবারে ঝিঙে-চেরা চোখ নিয়ে এক হাঁটু ব্লু-ব্ল্যাক্ কালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো সব ঠুঁটো। হাত ও আঙুল দুই-ই খাড়া ওপর দিকে উঠে আছে। তার ওপর ইকড়িমিকড়ি কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত কতগুলো যেন কি! সেগুলিই সম্ভবতঃ ধানের (বা আমের) আঁটি। ছবির পেছনে আকাশের গায়ে বেশ বিরাট আকারের একটি গোল সূর্য। কম্পাস দিয়ে এমনভাবে গোল করা হয়েছে যে কম্পাসের কাঁটায় কাগজ ফুটো হয়ে গেছে। তার কিছু পেছনে আধখানা কামড়ানো লুচির মত এক ফালি চাঁদই হবে বোধ হয়! এবং তারও পেছনে কয়েকটি উড়ন্ত পাখি বা মশা বা ঐ রকম কিছু একটা!

"এটি কিন্তু মশাই; আপনার কাগজে বের করা চাই। এ মাসেই। জানেন তো, সুযোগ না দিলে প্রতিভারও অপমৃত্যু হয়। ফুল মেনি এ জেম্ অব পিওরেস্ট রে সিরীন—,পড়েছেন তো?"—টেঁপীর বাবা বললেন।

সুরেশ্বরের ইচ্ছা করছিল, এখনই গলা টিপে একসঙ্গে প্রতিভা ও সেই প্রতিভার পিতৃদেবের শুদ্ধ্ অপমৃত্যুর ব্যবস্থা করে দেয়—ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রেখে। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, কাষ্ঠহাসি হেসে, সে শুধু বলল, "আচ্ছা রেখে যান।"

ক্রিং—ক্রিং-ং-ং-ং! সুরেশ্বর টেলিফোনটা কানে চেপে বলল, "হ্যালো! হ্যাঁ, গুঞ্জন অফিস। স্পিকিং। কিন্তু আজ আপিস বন্ধ, কাল বরঞ্চ—হ্যাঁ? না, ধারাবাহিক উপন্যাসের জায়গা নেই। তবু—কি বলছেন? জোরে বলুন। একটা অভিমত? কি দরকার? আচ্ছা, না না, আজ আসবেন না, উইক্ ডে-তে একদিন পাঠিয়ে দেবেন। হুঁ, নমস্কার।" খটাং করে রিসিভারটা স্বস্থানে রাখতেই আবার সামনের দরজা খুলে গেল।

তারপর পর পর সতেরো জন।

সুরেশ্বর দরজা বন্ধ করে ওপরে চলে গেল। সারা সকালটাই মাটি। ওপরে গিয়ে, ভাইপো-ভাইঝিদের চীৎকার অগ্রাহ্য করেই সে আর একবার লেখাটা নিয়ে বসবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু হায় রে, ওপরে আসতে না আসতে চাকর ছকুলাল এসে জানাল, "একটা বাবু আইসেছে। আপনাকে বোলাইছে।"

সুরেশ্বর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, বলল, "বল্ গিয়ে বাবু মরে গেছে।"

ছকুলাল ঘাড় নেড়ে বললে, "জী!"

সে সত্যি সত্যি চলে যায় দেখে সুরেশ্বর তাকে ডেকে ফেরাল। বললে, "এই শোন কি বলবি ?"

ছক্কুলাল বোকা হাসি হেসে বলল, "বলবে, বাবু বলিয়েছেন তিনি মরিয়ে গেছেন।"

"দূর গাধা! আচ্ছা শোন। কোন বাবু? কি রকম দেখতে?"

ছক্কুলাল হাতের তেলো মাটির ওপর সমান্তরালভাবে ধরে উচ্চতা দেখিয়ে বলল, "এই এত্তো বোড়ো।"

"দূর হাঁদা! কত বয়স হবে?"

"এই এক কুড়ি দু' কুড়ি হবে।"

সুরেশ্বর আর কথা না বাড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নীচে নেমে এল।

ফাল্গুনের গুঞ্জন বেরিয়ে গেছে। ২।৪ দিনের জন্য একটু নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। বাবাঃ, একেই বলে সাহিত্যসেবা! মনের খোরাক নিয়ে কারবার এরই নাম? সুরেশ্বর ভাবতে পারেনি, অতি সাধের কাজও অবশ্যকর্তব্য হলে বিরক্তিকর হতে পারে। সুরেশ্বর ঠিক করল কয়েক দিনের জন্য দার্জিলিং ঘুরে আসবে। কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই সে হার্টফেল করবে।

দার্জিলিং। লুই জুবিলী স্যানিটেরিয়াম। দলে দলে স্বাস্থ্য ও আমোদপিয়াসীর ভীড়। নিজের গায়ে ওভারকোট এবং কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে সুরেশ্বর ম্যানেজারের ঘরে এসে হাজির হল। "একটা সিংগল্-সিটেড ঘর চাই স্যর!" ম্যানেজার অবাক হয়ে বল্লেন "সিংগল্-সিটেড ঘর! এই ভীড়ে? ক্ষেপেছেন? ডবল-সিটেড ঘরও একখানা খালি নেই। তবে—আচ্ছা দাঁড়ান। একখানা বোধ হয় ডবল-সিটেড ঘর আছে। সেখানকার একজন বোর্ডার কাল চলে গেছেন। মিস্টার ভড় একা আছেন। তা সেখানে প্রায় সিংগল-সিটেড ঘরের মতই আরাম পাবেন। মিস্টার ভড় বয়স্ক লোক, আর অতি সজ্জন।"

অগত্যা সুরেশ্বর তাতেই রাজী হল। উপায় কি?

মিস্টার ভড় অর্থাৎ গোবর্ধন ভড় সওদাগরী আপিসে চাকরী করেন। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মুখে সর্বদাই হাসি লেগে আছে। সুরেশ্বরকে তিনি খুব খাতির করে গ্রহণ করলেন।

"কদ্দিন আছেন? এক সপ্তাহে কি হবে মশাই! থেকে যান, থেকে যান। এখন মেওয়া সস্তা, কপি আর কড়াইশুঁটি এন্তার। ও জিনিস এখন প্লেনে কোথায় পাচ্ছেন? তারপর জানলা খুললেই নগাধিরাজ—"

একটু পরে আবার প্রশ্ন করলেন, "কি করা হয়?"

"এই একটু কাগজ দেখাশোনা করি।"

"কাগজ! কাগজের দোকান আছে বুঝি? তবে তো রাজা লোক! উঃ কি দামটাই বেড়েছে কাগজের!"

"সে কাগজ নয়, মাসিক কাগজ—গুঞ্জন।"

"গুঞ্জন? মাসিক পত্র? আপনিই এডিটার বুঝি?" গোবর্ধনবাবুর মুখে এবার সম্ভ্রমের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সারাদিন টৈ-টৈ করে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত সুরেশ্বর সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু এখানে সবই টাইম বাঁধা; খাবার ঘণ্টা পড়লে তবে খাবার আসবে। ঘণ্টা দুই তীর্থের কাকের মত বসে থাকবার পর ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টার মত মধুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। অমনি একসঙ্গে ঘরে, বারান্দায়, উঠোনে চটি, স্যাণ্ডাল এবং ভারী জুতোর প্রবল শব্দে বোঝা গেল দার্জিলিংএ খিদেটা বোধ হয় ভালই হয়।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। প্রচুর ঠাণ্ডা। এবারে ঘুমটাও যুৎসই হবে। সুরেশ্বর মনে মনে ভাবল—দার্জিলিং-এর এই তো মজা।

সবে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় গোবর্ধনবাবু ডাকলেন, "মশাই, ও মশাই, শুনছেন? বলি ও এডিটারবাবু!"

সুরেশ্বর ধড়মড় করে উঠে বসল,—"কি! কি! কি ব্যাপার?"

"না, কিছু নয়। আপনাকে একটা জিনিস শোনাব। এখনই ঘুমুবেন কি? এখানে কি লোকে ঘুমুতে আসে?" গোবর্ধনবাবু স্যুটকেস খুলে একখানা মোটা খাতা বার করলেন। একটু যেন সলজ্জভাবে বললেন, "অনেক দিন থেকে একটু-আধটু নাটক লিখে আসছি, কিন্তু ছাপানো দূরে থাক, কাউকে শোনাতেই পারি না। আজ এতদিন পরে যোগ্য লোক পেয়েছি। একটু শুনতে হবে। বেশী নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

"অ্যাঁ—এখন?"

"না না, ওজর চলবে না। আপনি জহুরী, আপনার মতের একটা মূল্য

আছে—শুনতেই হবে। না না, শুয়ে শুয়ে হয় না, উঠে বস্থন।" স্বরেশ্বরকে আর প্রতিবাদের সময় না দিয়ে গোবর্ধনবাবু আরম্ভ করলেন :

"জাঁহাপনা।

"কী সংবাদ দূত? অসঙ্কোচে কর নিবেদন।"

স্বরেশ্বর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। গোবর্ধনবাবু অভিনয়ের ভঙ্গীতে পড়ে চললেন। তিনি শুধু নাট্যকার নন, নটও।

বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কনকনে হাওয়া জানালার ফুটো দিয়ে স্বচের মত মুখে-চোখে বিঁধছে। এইভাবে চলল পাক্কা তিন ঘণ্টা। শেষে গোবর্ধনবাবু থামলেন। "এটা ঐতিহাসিক, কাল একটা পৌরাণিক নাটক শোনাব—জরাসন্ধ বধ। সামাজিকও আছে, তা পরে হবে। সবশুদ্ধ চোদ্দখানা লিখেছি ; ঐ চোদ্দ দিনের আগে কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না।"

সে রাতে স্বরেশ্বরের ঘুম হল না। পরদিন সকালে, শোনা গেল, ভোর হবার আগেই সে কখন ম্যানেজারকে জাগিয়ে, হিসেব চুকিয়ে, এক ভুটিয়া কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে চলে গেছে। স্টেশনের দিকে নয়,—সোজা উত্তরে, বোধ হয় তিব্বতের পথে। বিশ্রাম তার চাই-ই।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার খান্দেশ অঞ্চলে ভীলেদের বাস। ১৮১৭ সালে ত্রিম্বকজীর নেতৃত্বে তারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের সংখ্যা ছিল আট হাজার। ব্রিটিশ বাহিনীর দু'বছর লাগে তাদের দমন করতে। তখন বহু ভীল-বসতি তারা ধ্বংস করে। ১৯২৫ সালে ভীলেরা আবার বিদ্রোহ করে, সিউরাম কর্মকারের নেতৃত্বে। পরে উচেৎ সিংএর নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহ হয়। দু'বারই বৃটিশ বাহিনী ত্বরিতগতিতে বিদ্রোহ দমন করে।



মামা-ভাগ্নে * শ্রী রবীন্দ্রলাল রায়

নিশুর মামা—ভীষণ, ভয়ঙ্কর মামা। চেহারা ভয়ঙ্কর নয়—লোকটি ভয়ঙ্কর! মোটা-সোটা বেঁটে-খেঁটো লোকটি, মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড দাড়ি এবং গোঁফ। তাকে ভয় করে না এমন প্রাণী নিশুদের বাড়ীতে একটিও নেই নিশুর মামী থেকে বাড়ীর কুকুরটি পর্যন্ত তাঁকে ভয় করে। আর ভয় করবেই বা না কেন? তাঁর কাছে যে সংসারে ভাল কেউ নেই। তাঁর ধারণা সবাই সব সময় তাঁর অসাক্ষাতে একটা না একটা অন্যায় কাজ নিশ্চয়ই করছে। কোথায় যে তিনি কখন আছেন তার কিছু ঠিক নেই। এই হয়তো তেতালায় ছেলেদের পড়ার ঘরের পিছনে লুকিয়ে বসে আছেন, ছেলেরা পড়তে পড়তে গল্প করছে কি না শুনছেন; পরক্ষণেই হয়তো একেবারে নীচে রান্নাঘরের জানালায় ফুটোয় চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর চুরি করে কিছু খাচ্ছে কি না দেখছেন। আবার পরের মুহূর্তেই হয়তো স্নানের ঘরের কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে—কেউ স্নানের ঘরে স্নান করতে করতে গান করছে কি না শুনবার জন্য। দিন রাতের মধ্যে খাওয়া আর শোয়ার সময়টুকু ছাড়া তিনি সব সময়ে বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন,

পাছে কোনও সময় কেউ অন্যায় করে ফেলে। শব্দ হবে বলে চামড়ার জুতো পায়ে দেন না। রবারের চটি পরে বেড়ান। কেউ একটু কোনও দোষ করেছে কি অমনি তার ভীষণ শাস্তি—শুধু ভীষণ শাস্তি নয়, অদ্ভুত শাস্তি। একেই তিনি কথা খুব কম কন, তার উপর শাস্তির সময়। আরও কম কথা। তাঁর মুখ থেকে শুধু বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বার হয়ে আসে শাস্তির অর্ডার। কারো 'না' বলবার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে হবে।

কখনও বললেন হয়তো 'এক পা এক কান,' অর্থাৎ এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক কান ধরে থাকতে হবে; কখনও বল্লেন হয়তো 'চেয়ার' অমনি চেয়ারের মত হয়ে আধো বসা, আধো দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতে হবে। কখনও হয়তো আদেশ হল 'দুবেলা বন্ধ'—অর্থাৎ দু'বেলা না খেয়ে থাকতে হবে। এমন কি যদি বলেন 'ব্যাঙ'—অমনি পায়ের উপর ভর করে দুই হাঁটুর মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দুটি কান ধরে উঁচু হয়ে বসে থাকতে হবে। এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত আরও কত কি—!

এসব শাস্তি যে শুধু ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তা নয় নিশুর মামীমা থেকে বাড়ীর ঠাকুর চাকর সকলকেই এসব শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। এই তো সেদিন নিশুর মামা তামাক খাবেন বলে কল্‌কেটিতে তামাক সেজে মাটির উপর রেখে দিয়েছিলেন। নিশুর মামীমা কি একটা কাজে যেখান দিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে না পাওয়ায় পায়ে লেগে কল্‌কেটা উল্টে যায়। মামীমা ভয়েতে চোখে সর্ষের ফুল দেখলেন, গুরু গম্ভীর একটা শব্দ কানে এল 'ব্যাঙ'। ব্যস, মামীমা বাড়ীর গিন্নী, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তবুও তক্ষুনি আর একটি কথা না বলে ব্যাঙ হয়ে বসে পড়লেন। চারিদিকে ছেলেপিলে, নাতি-নাতনী ঠাকুর চাকর-বাকর—তার মাঝে 'ব্যাঙ'! লজ্জার যার শেষ নেই। ঠাকুরটা সেদিন মাছের ঝোলে বুঝি একটু নুন বেশী দিয়েছিল, তাকেও দু'ঘণ্টা ব্যাঙ, আর একঘণ্টা চেয়ার হয়ে থাকতে হয়েছিল। এ রকম তো হচ্ছেই দিন রাত। এক এক দিন বাড়ীতে একটা দেখবার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে দিন হয়তো অনেকের দোষ একসঙ্গে ধরা পড়ে সেদিন বাড়ীময় কেউ চেয়ার, কেউ ব্যাঙ, কেউ এক পা এক কান, ছেলেমেয়ে—ছোট বড়, ঠাকুর চাকর সকলে। সে একটা দৃশ্য!

এ হেন যে নিশুর মামার বাড়ী, সেই মামার বাড়ীতে সব জেনে-শুনে পূজার ছুটিতে বেড়াতে এল নিশু। সকলে শুনে বলবে হয়তো যে আশ্চর্য সাহস তো নিশুর! কিন্তু নিশু নিজেও তো বড় একটা কেউ-কেটা ছেলে নয়। ধড়িবাজ ফাঁকিবাজ ভীষণ ভণ্ড—এক কথায় বিচ্ছু ছেলে। প্রত্যেকটি বছর প্রমোশন পেয়ে পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ ক্লাশ টেন পর্যন্ত উঠেছে অথচ কখনও বইএর পাতা খোলে নি বাড়ীতে। শুধু টুকে পাস করেছে। ওদের স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার অতুলবাবু রবার্ট ব্লেকের বাবা, তাঁর চোখ বাঁচিয়ে টোকে এমন ছেলে বিরল। কেউ তেতালায় টুকলে একতালা থেকে তাঁর টনক নড়ে। সেই অতুলবাবু শত চেষ্টাতেও তাকে কখনও ধরতে পারলেন না। সে প্রত্যহ কলকাতায় ট্রাম-বাসে ঘুরে বেড়ায়, পকেটে অথচ কানা কড়িও থাকে না। থাকলেও কখনও ভাড়া দেয় না। খুব বেশী দিন যদি কেউ তাকে না দেখে তা হলে ভাববে এমন ছেলে আর হয় না—মুখে মধু ঝরে। যাই হোক, পূজার ছুটিতে এই নিশু এল তার মামার বাড়ী মধুপুরে বেড়াতে।

বাড়ীতে ঢুকেই মামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, পায়ের উপর থেকে আর উঠতেই চায় না। তার মামা বল্লেন, "হয়েছে হয়েছে, ওঠো।" নিশু উঠে দাঁড়াল; উঠবার সময় তার মামা দেখতে না পান এমনি ভাবে নিজের কোটের পকেটে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিল, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা বই বার হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে যেন মহা লজ্জিত এবং ভীত এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি বইখানি তুলে লুকোতে গেল। অমনি মামা জলদগম্ভীর স্বরে বল্লেন "কি বই ওটা? দেখি।"

নিশু বল্লে—"না, না, ও এমনি একটা বই—"

এবার বেশ কড়া সুরেই মামা বল্লে—"দাও শীঘ্রি। নিশ্চয় কোনও নভেল বা গল্পের বই।"

নিশু ভয়ে ভয়ে বইটা এগিয়ে দিল তাঁর হাতে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বল্লেন—"একি, এ যে গীতা! পকেটে গীতা কেন?"

নিশু যেন মহা লজ্জিত, বল্লে—"আজ্ঞে, বাবা বলতেন আমাদের ছেলেদের গীতার উপদেশ অনুসারে চলা উচিত, আর সব ছেলেরই মাঝে মাঝে গীতা পড়া উচিত। আমি তাই প্রায়ই গীতা পড়ি। ট্রেণে আসতে আসতে গীতা পড়ছিলাম, পকেটেই রয়ে গেছে।"

মামা খুসী—ভারী খুসী। ভাবলেন "চমৎকার ছেলে তো! আমাদের বাড়ীর ছেলেগুলো পড়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই নভেল পড়ে—আমি বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও এবং এত শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও। আর এ ছেলে ট্রেণে যেখানে গল্পের বই বা উপন্যাস পড়লে দেখবার কেউ নেই সেখানে গীতা পড়তে পড়তে এসেছে!! আর শুধু তাই নয়, ওর—বাবা যিনি আজ তিন-চার বৎসর মারা গেছেন—তিনি কবে কি উপদেশ দিয়েছেন তাই সে আজও এমনি ভাবে মেনে চলেছে!!! ভারী খুসী—ভারী খুসী হলেন মনে মনে, মুখে বললেন "বেশ, বেশ, এই সবই তো ছেলেদের পড়া উচিত—আজে-বাজে বই না পড়ে। যাও, তোমার মামীমার কাছে যাও, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাও গে।"

নিশু মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিলে—ভাবলে, মামাকে কি রকম খুসী করেই না দেওয়া গেছে। গীতা! গীতা তো কত পড়ি!—প্রথম পাতাটাই কখনও ওল্টাই নি। মামা তো আর কাপড়ের ট্রাঙ্ক খুলে দেখছেন না যে কাপড়-চোপড়ের নীচে কতগুলি ডিটেকটিভ নভেল রয়েছে।

মামার সঙ্গে তো এই রকম চাল চেলে নিশু ভিতরে গেল। তারপর বাকী সকলকেও খুসী করে ফেললে কয়েক মিনিটের মধ্যে—শুধু তার মধু মাখা কথা দিয়ে।

নিশুর উপর সকলেই খুসী। তবে মামা সেদিন খুসী হয়েছিলেন বলে যে নিশুর উপর নজর রাখেন নি তা নয়। সে পাত্রই তিনি নন। তবে এপর্যন্ত নিশুর কোন দোষই ধরতে পারেননি। নিশু টুকে পাস করা ছেলে, সে মামার নজরের উপর নজর রাখে। মামা বেড়ান ডালে ডালে, সে তো বেড়ায় পাতায় পাতায়। মামা যতই রবারের জুতো পায়ে হাঁটুন, আর যতই পা টিপে টিপে চলুন, নিশু ঠিক আগে থাকতে জানতে পারে। ওর শ্রবণ-শক্তি হরিণ কিংবা খরগোসের শ্রবণ-শক্তির চেয়েও যেন তীক্ষ্ণ।

দু'চার দিন গেছে। নিশু চলেছে স্নানের ঘরে। যখন দালানের উপর দিয়ে স্নানের ঘরে যাচ্ছে তখন সে পাশের একটা ঘরের দরজার পাশ থেকে নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল। বুঝল, মামাবাবু ওৎ পেতে আছেন। সে স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করলেই অমনি দরজায় কান পাতবেন। একবার ভাবলে, আজ স্নানের ঘরে গিয়ে ভুলেও গানটান করা হবে না। খুব সাবধানে

থাকতে হবে। আবার ভাবলে, না আজ আর এক চাল ছাড়তে হবে। ভেবে যেন নিজের মনে মনেই একটু চেঁচিয়ে বললে (যাতে মামার কানে যায়) "ওঃ যা, দাঁতের মাজনটা আনতে ভুলে গেলাম—" বলে উপরে চলে গেল। উপরে গিয়ে মামীমার পূজার ঘর থেকে স্তবের পাতলা বইটা নিয়ে তোয়ালের ভিতর জড়িয়ে নীচে চলে এল। নীচে এসে কান পেতে শুনল। তখনও দরজার পাশ থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে। ভাবলে—মামাবাবু সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ওৎ পেতে আছেন। ধৈর্য বটে! স্নানের ঘরে গিয়েই সে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর একটু পরেই বুঝতে পারলে যে মামাবাবুর কান দরজায় ঠেকেছে এইবার। প্রথমে সে একটু গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে লাগল স্নান করতে করতে। মামাবাবু কান খাঁড়া করে আছেন, ভাবছেন এইবার গান ধরবে নিশ্চয়। কোন শাস্তিটা দেবেন ঠিক করতে লাগলেন মনে মনে। ভাবলেন, যাক্ এতদিন পরে ছেলেটা ধরা পড়েছে। হঠাৎ তাঁর কানে এল নিশু কি একটা গাইছে—কিন্তু এ কি। এ যে সুর করে স্তোত্র গাইছে দুর্গার! দুর্গা-স্তোত্র শেষ হয়ে গেল। এবার শিব-স্তোত্র। তারপর সূর্যের স্তোত্র।

মামাবাবু মোহিত হয়ে গেলেন। আহা, এমন ছেলে স্তোত্রের পর স্তোত্র মুখস্থ বলে চলেছে। স্নানের ঘরে বাড়ীর অন্য ছেলেরা গায় থিয়েটারের গান আর এ গাইছে স্তোত্র। তাঁর দুঃখ হল—এমন ছেলে যদি তাঁর হত। আস্তে আস্তে দরজার কাছ থেকে তিনি সরে গেলেন। নিশু অমনি স্তবের বইটা তোয়ালেতে মুড়ে বার হয়ে পড়ল।

নিশুর উপর দিনের পর দিন উঁচু ধারণা হতে লাগল মামাবাবুর।

আর একদিন বৈকালে বাড়ীর ছোট বড় পাঁচ-সাতজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসে নিশু খুব গল্প জমিয়েছে। যত সব ওর বাহাদুরীর গল্প—কি করে ধুতির সঙ্গে বইয়ের পাতা এঁটে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষায় ঢুকেছিল। একটা মাত্র অচল দুয়ানি পকেটে নিয়ে কি করে সমানে এক মাস বাসে-ট্রামে ঘুরেছিল। কিংবা কি করে তার ছোট কাকার খাবার জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত করে দিয়ে সারারাত থিয়েটার দেখেছিল—এমনি কত কি! কিন্তু গল্প যতই করুক চোখ কান তার ঠিক পড়ে আছে সিঁড়ির দিকে। গল্প যখন খুব জমে উঠেছে তখন নিশুর চোখ পড়ল—সিঁড়ির ঘরের জানালার কাঁচের উপর একটা ছায়া পড়েছে। নিশু বুঝল যে মামাবাবু

এসেছেন। একটুখানির জন্য সে চুপ করল। ছেলেদের মধ্যে থেকে একেবারে তিন-চার জন এক সঙ্গে বলে উঠল—"তার পর, তার পর?"

নিশু বুঝল এতক্ষণে মামাবাবু কান পেতে শুনছেন। সে খুব আস্তে বললে, "মামাবাবু এসেছেন চুপ!" বলেই বেশ জোর গলায় বলতে লাগল—যাতে সিঁড়ির ঘর থেকে শোনা যায়—"তার পর? তার পর সেই ভিখারীটাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে এক জনের বারান্দায় শোয়ালাম। মা স্কুলে খাবার জন্যে চারটে পয়সা দিয়েছিলেন। সেই পয়সা দিয়ে বরফ কিনে এনে তার মাথায় দিলাম। অনেকক্ষণ পরে সে সুস্থ হলে তাকে আমি আর একটি ছেলে ধরাধরি করে তার বাড়ী পৌঁছে দিলাম—ভিখারীর বুড়ো মা কি আশীর্বাদই করলে আমাদের—।"

সিঁড়ির ঘর থেকে মামাবাবু ভাবলেন—করবে না আশীর্বাদ? এমন দয়ালু পরোপকারী ছেলে—!

এদিকে ছেলেরা কিছুই বুঝছে না গল্পের মাথামুণ্ডু। তবু চুপ করে আছে, কারণ ওদিকে একেবারে বাঘ যে স্বয়ং।

নিশু তারপর আরও রং চড়িয়ে গল্প ধরল—কি করে তার বন্ধু নীতিশ একজন অন্ধ লোককে আগুন লাগা ঘরের মধ্যে থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের একটি চোখ হারিয়েছিল।

মামাবাবু শুনছেন আর আনন্দে গদগদ হয়ে ভাবছেন—ধন্যি ছেলে, যেমনি নিজে তেমনি সব বন্ধু।

নিশু তখন বলছে—"এমনি করে পরের জন্য প্রাণ দিতে হয়, বুঝলে তোমরা? আমরা বাঁচব শুধু পরের জন্য—এই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ।—"

মামাবাবু এবার একেবারে গলে গেলেন, ভাবলেন এই সব ছেলে বাড়ীতে থাকলে বাকী ছেলেগুলোরও উন্নতি হয়। গল্পচ্ছলে কি সুন্দর উপদেশ দিচ্ছে—কত বড় আদর্শ সম্মুখে ধরছে ছেলেদের! বাঃ বাঃ চমৎকার। আস্তে আস্তে নেমে গেলেন তিনি।

নিশু দেখল ছায়া সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে সুর সদলে হেসে বললে—"তার পর" বলে আবার সেই আগের গল্প সুরু করল—"ছোট কাকা তো অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আমি কাপড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়ে বারান্দায় রেলিং-এর সঙ্গে বেঁধে নেমে পড়লাম—"

ছেলেরা আবার কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

নিশুর আর কোনও বিপদ ঘটল না—মামাবাবু তার উপর নজর রাখা বন্ধ করলেন। এমন কি অন্য ছেলেরাও তার সঙ্গে থাকলে অনেক সময় তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন।

রোজ খুব ভোরবেলা উঠে নিশু ছেলে-পিলেদের নিয়ে বেড়াতে যায়। মামার অনুমতি নিয়েছে আগেই। বলেছিল—"বাবা বলতেন প্রাতঃভ্রমণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে। আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও বেড়ে যায়। তা আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে রোজ ভোর বেলা একটু বেড়িয়ে আসি—"

মামাবাবু বলেছিলেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঐ ছেলেগুলোকেই তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও।"

নিশু ভোরবেলা উঠে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে, আর গায়ের কাপড়ের মধ্যে একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস লুকিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়ে। অনেক দূরে মাঠের মধ্যে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। আর সবাই শোনে। একটু বেলা হলে আবার বইখানি লুকিয়ে নিয়ে বাড়ী ফেরে।

নিশুদার অধীনে থেকে এবং পরামর্শে চলে ছেলেদের আজকাল অনেক শাস্তি কমে গেছে। নিশু ওদের কাছে একটা কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে।

এমনি ভাবে তো দিন চলছে। একদিন শম্ভু বলে একটি ছেলে এল নিশুর মামার বাড়ী। দু'চার দিন থাকতে থাকতেই বেচারা মরেছে। একদিন সন্ধ্যার পর দু'ঘণ্টা ব্যাঙ। নস্যি নিয়ে ধরে পড়েছিল নাকি। শম্ভুর অবস্থা দেখে নিশুর সেদিন ভারী মায়া হল। সে শম্ভুর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল—"কাল সকালে ভোরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেও; কি করে মামার হাত থেকে বাঁচতে হয় তা সব শিখিয়ে দেব।"

পরদিন ভোরবেলা। নিশু শম্ভুর ঘরে এসে দেখে শম্ভু তখনও লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। সে বললে—"এই শম্ভু, ওঠো, চল, দেরী হয়ে গেলে মামাবাবু উঠে পড়বেন—তখন মুস্কিল হবে। শীগ্রি ওঠ, আজ একখানা নতুন বই আরম্ভ হবে—রবার্ট ব্লেকের।"

লেপটা একটু নাড়ল—শম্ভু ওঠে না।

নিশু বললে—"আরে ভয় কাকে? মামাকে তো? কোনও ভয় নেই।

যতক্ষণ এই নিশু মুখুয্যে আছে ততক্ষণ কোনও ভয় নেই। কত বড় বোম্বেটে ছেলে এই নিশুচন্দ্র তা তো তাঁর জানা নেই।"

লেপটা আরও বেশী করে জড়িয়ে নিল শম্ভু এবার। নিতান্তই কুঁড়ে ছেলেটা।

নিশু এবার লেপটা ধরে টানলে—লেপ কিন্তু শম্ভুর মাথা থেকে বা গা থেকে খুলল না।

নিশু বলল—"মামাকে অত ভয় করবার কিছু নেই যতক্ষণ আমি আছি। প্রথমতঃ গীতার চাল, দ্বিতীয়তঃ স্তোত্রের চালে মামাকে ঘাল করেছি। চল না মাঠে, সব বলব। কি করে আগে থাকতে পকেটে গীতা রেখে—কি করে আগে থাকতে মামা লুকিয়ে আছেন জেনে স্তবের বই নিয়ে গিয়ে স্নানের ঘরে বই থেকে স্তব পড়ে মামাকে বোকা বানিয়েছি—সব বলব, চল না। এই তো রোজ মাঠে বেড়াতে যাই, মামা জানেন প্রাতঃভ্রমণ করি, অথচ এদিকে একুশখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস যে শেষ হয়ে গেল মামা কি তার খোঁজ রাখেন নাকি?"

লেপটা এবার খুব নড়ছে।

নিশু বললে—"চল, চল, আমাকে ধরে এমন লোক জন্মায়নি। বাবা, কলকাতার টাট্টু মার্কা ছেলে আমি—" নিশুর কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ও যেন ভূত দেখেছে। দরজার পাশে থেকে শম্ভু যে ইশারা করছে। তবে—তবে এ লেপের ভিতর কে?

শম্ভু দরজার কাছ থেকে প্রাণপণে ইশারা করছে—"মা-মা-বাবু, মা-মা-বা-বু ওই লেপের ভিতর—"

নিশুর মাথাটা এবার ঘুরে গেল—তার পরের মুহূর্তেই এক লাফে বাইরে।

শম্ভু বললে—"কাল রাত বারোটার ট্রেনে মামাবাবুর এক কাকা এসেছেন। তাঁকে মামাবাবুর বিছানায় শুতে দিয়ে মামাবাবু আমার বিছানায় এসে শুয়েছেন কাল। আমি নিধুদার কাছে একসঙ্গে শুয়েছিলাম।"

আর শুয়েছিলাম—নিশু ততক্ষণ তার বাক্স বিছানা সব কিছু ফেলে বাড়ী থেকে ছুট—

মামাবাবুও ততক্ষণে উঠে পড়েছেন—তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বরে বাড়ী কাঁপতে লাগল—"নিশু, নিশু!"

কিন্তু কোথায় নিশু—সারা বাড়ীময় খুঁজে নিশুকে পাওয়া গেল না।

চাকরটা বলল—"নিশুবাবু ইষ্টিশানের দিকে ছুটলেন দেখলাম—"

মামাবাবুও ছুটলেন স্টেশনের দিকে—রাগে থর থর করে কাঁপছে তাঁর সারা শরীর। উঃ, এত বড় পাজী শয়তান! কি ধাপ্পাটাই দিয়েছে এতদিন। একবার পেলে হয় ওকে। স্টেশনে এসে শুনলেন তখন কোনও ট্রেন নেই। তবে গেল কোথায়? যাই হোক মধুপুরের মধ্যেই আছে, যাবে কোথায়? কিন্তু ও কি! ওই যে মাল গাড়ীটা যাচ্ছে—ওর উপর—হ্যাঁ, নিশুই তো! একটা গাড়ীর কয়লার উপর বসে রয়েছে। সত্যিই নিশু তখন প্রাণের দায়ে চলন্ত মালগাড়ীর উপরে চড়ে বসেছে—বুকটা তখন তার ধড়াস ধড়াস করছে।

মামাবাবু রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাড়ী ফিরলেন। সেদিন নাকি বাড়ীর সকলে দোষে ও বিনা দোষে ব্যাঙ আর চেয়ার হতে হয়েছিল।

আর নিশু?

এরপর নিশুর মধুপুরে যাওয়া দূরে থাকুক কোনও দিন নাকি মধুপুরের ও লাইন দিয়েও কোথাও যায়নি।

দু' ভাই সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৮৫৫ সালে। হাজার হাজার সাঁওতাল ভগলপুর থেকে রাজমহল অবধি দখল করে বসে। বহু কুঠিয়াল সাহেব তাদের হাতে খুন হয়। ব্রিটিশ সেনাপতি মেজর বারা তাদের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু শেষে বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়াতে না পেরে সাঁওতালরা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ইংরেজরা যাকে ধরতে পারে তার উপরেই অমানুষিক অত্যাচার করে।



রাজকন্যার ফাঁসী

*

শ্রী রমেন দাস (সবুজসাথী)

হবু রাজার গবু মন্ত্রী রাজকুমারের জন্যে
আনলো দেখে অপূর্ব এক সুন্দরী রাজকন্যে।
রাজপুরীতে বাজলো সানাই, হরেক রকম বাদ্য—
সাতরাজ্যের সাত সীমানায় কান রাখে কার সাধ্য !

বেজায় খুশী রাজা মশায়,
অতিথ-বিতিথ ডেকে বসায়,
খোস মেজাজে দিলবাহাদুর নেশায় হলেন মগ্ন,
এমন সময় ঘনিয়ে এলো বিয়ের পরম লগ্ন।
লগ্ন এলো, ভগ্ন মনের হঠাৎ সে চীৎকার—
কাঁপিয়ে দিলো এদিক-ওদিক হৃদয় সবাকার—
থামলো সানাই, বাদ্য বাঁশী, রোশনাই ঢাক-ঢোল,
রাজপুরীতে উঠলো এবার কান্নার সোরগোল।
বদ্যি এলেন, এলেন হাকিম, সবার চোখেই জল—
সবাই বলে : পোড়া কপাল, এই কী হলো ফল !



কী হলো তার সঠিক খবর চেষ্টা-চরিত করে—
জানতে পেলাম অনেক খুঁজে হপ্তাখানেক পরে।
সাজতে গিয়ে রাজকুমারীর গয়না-গাটির ভারে—
ফাঁস লেগেছে গলায় যে হায় এক শ' গিনির হারে।



ঠগের শাস্তি * শ্রী সতীন্দ্রনাথ লাহা

এক বৃদ্ধের ডানদিকের গালে বিশ্রী একটা 'আব' হয়েছিল। এই আবের জন্য তার মুখটা খুব বিকৃত দেখাতো। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে ওষুধ-পত্তর লাগিয়েও সে এই আবের হাত থেকে রেহাই পায়নি। চিকিৎসক আনিয়েছে, বদ্যি আনিয়েছে, কত রকমের মলম লাগিয়েছে গালে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কমে যাওয়া দূরে থাক, দিন দিন আরো বড় হতে লাগলো। দুঃখ করে দিন কাটে তার। কি আর করবে? কোন উপায় নেই।

একদিন রাত্তিরে বুড়ো লোকটা জ্বালানী কাঠ মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরছে। হঠাৎ মাঝপথে ভীষণ ঝড় জল সুরু হয়ে গেল। পথের মাঝে মাথা গোঁজবার ঠাঁই-ই বা পায় কোথা। তাড়াতাড়ি একটা গাছের কোঠরে ঢুকে আশ্রয় করে নিলে।

ঝড় জল শেষ হবার পর সে মনে করলে এইবার বেরিয়ে পড়া যাক, ফাঁপা গাছের কোঠরে বসে থেকে আর কি হবে—হঠাৎ তার কানে এলো কাছেই কোথায় যেন কোন উৎসব হচ্ছে। নাচ-গানের ও বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে কানে।

গাছের কোঠরে লুকিয়ে থেকো। তারপর রাত্তির হলেই তারা নাচ গান করতে ঐ গাছতলাতে আসবে। তখন নাচ দেখিয়ে সারিয়ে নিও তোমার বাঁ গালের বিশ্রী আব।

যথারীতি পাজি বুড়োটা ঠিক সময়ে সেই ফাঁপা গাছটা খুঁজে বার করে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ পরে ঠিক দানবদের দল এসেছে সেই গাছতলাতে।

দানবদের মধ্যে একজন বললে—নাচিয়ে বুড়ো লোকটা হয়তো অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছে। সে যা বলেছিল তা সে নিশ্চয় কথা রাখবে।

ওদের এই কথাবার্তা শুনেই পাজি বুড়োটা হাতপাখা ঘোরাতে ঘোরাতে নাচের ভঙ্গী করে গাছের কোঠর থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু নাচতে জানলে তো নাচবে। তালে তালে যার পা পড়ে না সে আবার নাচবে কি! ওর বিদ্‌ঘুটে অঙ্গভঙ্গী দেখে দলপতি তো রেগেই অস্থির। দলপতি ভেবেই পায়না কাল যে অত সুন্দর নাচ দেখিয়েছিল আজ কেন সে একেবারেই নাচতে পারছে না।

মুখ তো আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না চাঁদের আবছা আলোতে! দলপতি ভাবছে কালকের সেই সুন্দর নাচিয়ে বুড়োটাই তার কথা রাখবার জন্যে আবার নাচছে। এ যে সে নয় তা আর দলপতি বুঝবে কি করে?—এই আধা অন্ধকারে! একজন দানব বললে—খুব হয়েছে, আর নাচতে হবে না, এখন থামলে বাঁচি। বিদায় নেবার আগে কালকের যে চিহ্নটি রেখে গিয়েছিল সেইটি ফেরত নিয়ে যাও।

এই কথা বলেই দানবটা নাচিয়ে বুড়োর ডান গালের আবটা এই নকল নাচিয়ের ডান গালে বসিয়ে দিলে।

আবটাও বরাবরের জন্যে ওর ডান গালে আটকে গেল। বিশ্রী মুখ আরো কদাকার হলো। দুই গালে আব নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অত রাত্তিরে তাকে বাড়ী ফিরতে হলো।

করছো কি ! * শ্রী দিলীপ দাশগুপ্ত

নকল করো, নকল করো,
বিদেশীদের পুচ্ছ ধরো।
তোমায় দেখে বাপ মায়েরা
লজ্জাতে হোন জড়োসড়ো।
খাতা পোড়াও, বই বেচে দাও।
হিন্দি ছবির রস লুটে নাও।
পরীক্ষাতে ফি বছরই
দু' ঠ্যাং তুলে ডিগবাজী খাও।



ট্রেন থামিয়ে, বাস পুড়িয়ে,
ধোঁয়াটে মুখ না ঘুরিয়ে—
ডোণ্টকেয়ারী ভাব দেখিয়ে
নিজেকে দাও শ্রেফ্ উড়িয়ে।

এই না হলে দেশের ছেলে ?
স্বাধীনতা কী আর পেলে !
সারি সারি নিজের চিতায়
দিচ্ছ আগুন নিজেই জেলে !
অশান্ত আর দামাল হয়ে
দুঃখ ব্যাথার ছোবল স'য়ে,
'মানুষ' হবার স্বপ্ন ভুলে
অপবাদই আনছো বয়ে।





ছবি * শ্রী রাণা বসু

বৃষ্টির পালা শেষ হয়ে গেছে
মেঘেরা নিয়েছে ছুটি
সোনা-মাখা রোদ এনেছে শরৎ
কী বৃষ্টি সকালবেলা,
চড়ুই আবার ধুলো মেখে গায়
লুটোপুটি দেয় হর্ষে
গাছের পাতারা সবুজ মেখেছে
কদর্য নেই কোথাও।

ছন্দ মেলাতে জগত আবার
মেতেছে নৃত্যে ছন্দে
ভালোবাসা দিয়ে সবুজ ঘাসকে
সিক্ত করেছে শিশির
শিশু-কিশোরের কোলাহল, গানে
মুখর চতুর্দিক—
এমন দিনে কী ঘরে থাকা যায়
চলো যাই, চলো মাঠে।

জাদু দণ্ডের মায়ার স্পর্শে
পাহাড়ের ঘুম ভেঙেছে
মোহন বাঁশির আকর্ষণেতে
নিখিল ভুবন ভুলেছে—
খেয়ালী রাজার ছ-টা পাকে বাঁধা
বিশ্ব লাট্টু ঘুরছে
কী অবাক! কী অবাক!!



জগাপিসি

*

প্রভাতকিরণ বসু

এক

জগাপিসির আসল নাম যোগেশবাবু, তিনি Pleader's Clerk=P. C. তাই পাড়ার লোক নাম রেখেছিল 'জগাপিসি'। অদ্ভুত ধরণের লোক তিনি, ছটফটে, ব্যস্তবাগীশ, কোনো কর্মেরই নন, অথচ তাঁর নিজের ধারণা, তাঁর মতন কাজের লোক ভূ-ভারতে নেই। কিন্তু মনে তাঁর কোনো প্যাঁচ ছিল না। একেবারে গঙ্গাজলের মতন সাদা। বারোটি ছেলেমেয়ে তাঁর।

ভোরবেলা উঠেই পচাকে ধ'রে মাথায় চাঁটি মারতে সুরু করেছেন। পচা চেঁচিয়ে উঠল, "মা ছাখো, বাবা আমায় শুধু শুধু চাঁটি মারছে।"

পচার মা বললেন "ও কি কাণ্ড তোমার?" জগাপিসি বললেন, "মাথায় চাঁটি মারলে যদি ঠং ক'রে শব্দ হয়, বুঝবে বুদ্ধি আছে, ঠক্ ক'রে আওয়াজ হ'লে বুঝবে খালি গোবর ভরা।" ব'লেই নিজের মাথায় চাঁটি মেরে বললেন, "ঐ ছাখো, ঠং হ'ল। দেখি তোমার মাথা।" ব'লে গিন্নীর দিকে এগোলেন। তিনি 'রক্ষে করো!' বলে পালিয়ে বাঁচলেন।

'প্যানা' ছাতে ঘুড়ি ওড়াবার চেষ্টা করছিল, হাওয়া নেই বলে উড়ছিল না, জগাপিসি গিয়ে 'ধরাই দেত' বলে মেরেছেন এক হ্যাঁচ্কা টান, পাঁচীলে লেগে ঘুড়ি ফ্যাঁস্। অপ্রস্তুত হবার লোক তিনি নন, বললেন, "নিশেন কর, কিম্বা তীর-ধনুক। আয় দেখিয়ে দিই!" প্যানা শুনবে না, বললে, "আমায় ঘুড়ি কিনে দাও, কেন ছিঁড়লে?"

"ঘুড়ি কি কিনে ওড়ায় বোকা! ধরতে হয়।" বলে তিনি ঘুড়ির খানিকটা পাতলা কাগজ মুখে দিয়ে ব্যাঙ বাজাতে লাগলেন—ভোঁপো-পো,-পোঁ-প্পো-পো! এমনি সময় একটা ঘুড়ি কেটে যাচ্ছে দেখে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ধরতে গেলেন দুই বাহু তুলে, ওদিকে বড়ি শুকোচ্ছিল, মাড়িয়ে গুঁড়ো করে দিলেন। প্যানা চীৎকার করতে লাগল "ওমা ছাখো বাবা সব বড়ি"—সে

যতই চ্যাঁচায়, জগাপিসি তাকে ছাপিয়ে গান ধরেন,—"এসেছে এক রসিক পাগল বাধালে গোল নদের মাঝে—এ-এ-এ!" (যাতে গৃহিণী হরিপ্রিয়া প্যানার কথা শুনতে না পান!)

দুই

হরিপ্রিয়া চাকরকে বলছিলেন, "এক পয়সার স্বতো আনত, গুলি। বুঝেছিস্?" জগাপিসি বললেন "ওকি দেখে শুনে আনতে পারে? আমি আনছি", বলে ছুটলেন। হরপ্রিয়া বললেন "একটা ছুঁচও এনো মনে করে!" "আচ্ছা, আচ্ছা, হবে", বলে তিনি নামলেন রাস্তায়।

দোকানীকে বললেন, "গুলি দাও ত' এক পয়সার।"

সে জিগেস্ করলে, "পাথরের না কাঁচের!"

"কাঁচের।"

খেলবার গুলি নিয়ে তিনি ছুটলেন বাজারে, ছুঁচো খুঁজতে, গিন্নী বলে দিয়েছেন "ছুঁচও এনো!" তিনি শুনেছেন 'ছুঁচো!'

যেখানে পায়রা, লাল মাছ, নানারকমের পাখী, আর বেঁজীর বাজার বসেছে, সেখানে গিয়ে বললেন "ছুঁচো আছে? ছুঁচো? ছুছুন্দরী?"

তারা বললে "কাঠবেড়ালী আছে, ছুঁচো কি কেউ পোষে বাবু?"

"কেন পুষবে না? খুব পোষে! আচ্ছা দাও, একটা কাঠবেড়ালীই দাও।" গলায় দড়ি-বাঁধা একটা কাঠবেড়ালী সাড়ে সাত আনা দিয়ে কিনলেন, কারণ সেটার সাড়ে সাত মাস বয়স। পকেটে করে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে এসে দেখেন হরিপ্রিয়া কুট্‌নো কুট্‌ছেন, দিলেন তাঁর পিঠে কাঠবেড়ালী ছেড়ে। তিনি চমকে উঠে হাঁউ-মাঁউ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন "কি কাণ্ড তোমার?"

জগাপিসি বললেন, "ছুঁচো পাওয়া গেল না, কাঠবেড়ালী এনেছি। গুলিও এনেছি, এখন খেলবে? তাহলে গাব্ব, খোঁড়ো।"

কাঠবেড়ালী পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটল। জগাপিসি করলেন তাড়া। বলেন, "ধর্ ধর্, সাড়ে সাত আনার কাঠবেড়ালী।"

কাঠবেড়ালী এঁটো বাসনের কাছে। জগাপিসি খেলেন আছাড়, পাথরের থালাখানা ভাঙলেন, ঢাকাটাকে গামলা করলেন, কাঁসিটাকে কাঁসর! কাঠবেড়ালী উধাও, জগাপিসির বাঁধানো দাঁতও ছিটকে অদৃশ্য।

ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল, কাঠবেড়ালী পাঁচীল বেয়ে দোতলায় গেছে, সেখান থেকে পাশের বাড়ী। তিনি ছাদে গিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। "ও মশাই, কাঠবেড়ালী। ও মশাই! ফিরিয়ে দিন নইলে ভালো হবে না।"

রেণী বললে "বাবা, আপিস যাবে না? সাড়ে নটা হল।"

"অ্যাঃ! সাড়ে নটা?" বলেই তিনি তিন লাফে একতলায়। "ভাত দাও, ভাত দাও", বলে চীৎকার স্থরু করলেন। স্নান করবার আর সময় নেই, খেয়ে নিয়েই ছুট।

রাস্তায় এক চলন্ত রিক্সার আকর্ষণকারীকে অজ্ঞাতসারে এক ল্যাং মেরে আরোহীকে ডিগবাজী খাইয়ে তিনি ট্রামে গিয়ে উঠলেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কণ্ডাক্টার টিকিট চাইতে, পকেটে হাত দিলেন, কার পকেট দেখেন নি! আরেকজনের পকেট! সে ত' হতভম্ব। টিকিটটি কেটে তার পকেটেই রাখলেন। 'সে বললে, "মশায় করলেন কি? আমার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে টিকিট রাখলেন আমার পকেটে? আপনার মতলব কি?"

জগাপিসি রেগে বললেন, "কেন? আমার পকেট কোথায় গেল?"

সে বললে, "আপনার পকেট থাক্বে কোত্থেকে? কোটের ওপর যে কাপড় পরেছেন!"

তখন এক হাসির ব্যাপার!

তিন

তাঁর মেয়ে 'মানী', আসল নাম মেনকা। সেদিন এসে বললে "বাবা, আমাদের স্কুলের লীলাদি তোমার কাছে সাবস্ক্রিপশন চেয়ে নিয়ে যেতে বলেছে। আমরা একটা প্লে করব।"

"আর 'পেলে' করতে হবে না! তোর লীলাদিকে বলবি, সাবস্ক্রিপশনে কাজ নেই, পাগলামির জন্যে বরং একটা প্রেস্‌ক্রিপশন নিক। আর বলবি, মেয়েদের যদি এই রকম নাচায়, তবে তার দুই গালে চার চড় বসিয়ে দোব।"

মেয়েও তেমনি, যেমন শুনেছে, তেমনি গিয়ে বলেছে তার গুরুমাকে। সে ত' রেগে অস্থির! বললে "তোমার বাবাকে একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে বোল।"

মানী বিকেলবেলা এসে বললে "বাবা, লীলাদি বললে, তুমি একটু ভদ্রতা শেখো।"

জগাপিসি রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন; গিয়ে ডাকলেন "লীলাদি!"

পর্দা সরিয়ে লীলাদি বললে, "আপনার লীলাদি নই তা বলে!"

"লীলামাসী! আপনাদের নাচ-গান কবে?"

"প্লে? শনিবার। কিন্তু আপনি ওকি করছেন?"

জগাপিসি দেখেন তিনি একটি বেড়ালের ল্যাজ মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা ফোঁস-ফোঁস করছে।



লীলার পোষা 'পুসি'! জগাপিসি 'হৈ হো' বলে নেচে নিয়ে মারলেন তাকে এক স্যুট, সে ফুলদানীর ওপর গিয়ে পড়ে সেটাকে নিয়ে পড়ল, ঝন্‌ঝন্ আওয়াজের সঙ্গেই জগাপিসি 'হাওয়া' হয়ে গেলেন।

যেদিন থিয়েটার হবে, সেদিন জগাপিসি বিকেল চারটে থেকে গৃহিণীকে তাড়া দিচ্ছেন, দেরী দেখে ছেলে-পুলেদের তাড়া দিতে দিতে ধাক্কা মারতে মারতে রান্নাঘরে গিয়ে বললেন—"তোমার এখনও হয়নি?"

জগাপিসি সামনে গিয়ে বসেছেন। মানী সেজেছে রাণী, তিনি চেঁচাচ্ছেন, "মানী, ভালো করে কর, মানীরে!" সকলে বলছে 'অর্ডার অর্ডার', 'আস্তে', 'সাইলেন্স'!

প্লে মাঝামাঝি হয়েছে, জগাপিসি গ্রীনরুমে গিয়ে ঢুকেছেন, 'আমি একটা মেডেল দোব, আমি একটা মেডেল দোব' করে।

বললেন, "আমি স্টেজে গিয়ে কথাটা বলে আসি।" তাঁকে স্টেজে তোলা হল।

ইঁট সাজিয়ে থাক করে তার ওপর চৌকী দিয়ে স্টেজ হয়েছে। একটা জায়গা সবচেয়ে দুর্বল, সেখানটা ফাঁক রয়েছে, জগাপিসি লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সেইখানেই।

চেঁচিয়ে বললেন, "মশায়রা, আজকে যে নাচ-গান হল তার মধ্যে সত্যি কথা বলতে কি, মানে হচ্ছে যে, পষ্ট কথার কষ্ট নেই, তা যে যাই কেন না মানে হচ্ছে মনে করুক না—আমি দেখলুম—"

"মানে হচ্ছে যে"—দর্শকদের মধ্য থেকে একজন বললে। বক্তৃতা দিতে উঠলেই তিনি 'মানে হচ্ছে যে' মুদ্রাদোষ দেখিয়ে ফেলেন।

জগাপিসি চটে গেছেন, মনে করলেন কথাটা তাঁর ভাইপো বলেছে। বললেন, "তুই থাম্!"

একটা কলরোল উঠল।

তিনি বলে চললেন, "সব চেয়ে ভালো মানে হচ্ছে যে, যে করেছে মানী, আমার মেয়ে, যে করেছে রাণী। সুতরাং আমি তাকে একটি—"

গুলিয়ে ফেললেন, মেডেল বলবেন না পদক বলবেন? মেডেলের 'ম' পদকের 'দক' মিলিয়ে বলে ফেলবেন, "মোদক দোব।"

হৈ হৈ চীৎকার উঠল, একজন বললে, "বুড়োকে ধরে নাবিয়ে দাও না!"

"নাবছি" বলেই তিনি নেচে নিলেন, ধরণী দ্বিধা হল, গর্তর ভেতর তাঁর পা ঢুকে গেল, নীচের ইঁট সরে গিয়ে নড়বড়ে চৌকী কাৎ হয়ে পড়ল, মেয়েদের সঙ্গে লীলাদি উইংস-এর কাছে দাঁড়িয়েছিল, পপাত ধরণীতলে! 'পাল চাপা দাও, পাল চাপা দাও' করে সকলে চেঁচাতে লাগল। ড্রপ পড়তে মাঝখানে আটকে গেল, স্টেজ ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে গেল। পচা চ্যাচাতে লাগল "বাবা, পালিয়ে এসো।" কোলের মেয়েটা চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার আগেরটা চিলের মতন হাঁকছে, "বাবা পালিয়ে আয়!" সকলে ভাবছে জগাপিসি চিঁড়ে-চ্যাপ্টা!' জগাপিসি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওদিকে এক গার্ডকে বলছেন, "একটা বিঁড়ি দাও ত হে!"

সে বললে "দাঁড়ান মশাই, মানুষ খুন হল ওধারে, বুড়োটা কোথায় চাপা পড়ল, টেনে বার করি।"

সবাই বললে, "সাধে কি বলে জগাপিসি।"

হঠাৎ আওয়াজ হল "আগুন লেগেছে।"

জগাপিসি বোঁ করে ছুটে গেলেন চৌমাথায়। মোড়ের লাল বাক্সর কাঁচ ভেঙে হাতল ঘুরিয়ে দিলেন, আর সামনের বাড়ীটায় ঢুকে পড়ে টেলিফোনের হাণ্ডেল তুলে বললেন, "হ্যালো মিস্, ফায়ার! ফায়ার! ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? ফায়ার।"

ফিরে এসে দেখলেন, ভিড়ে ভিড়াক্কার!

'বড় বৌ' 'বড় বৌ' করে চ্যাঁচাতে লাগলেন, ফায়ার ব্রিগেড ঢং ঢং শব্দ করতে করতে এসে গেছে, জগাপিসি চারধারে ঘুরে লোকের পা মাড়িয়ে দিয়ে, চোখে-কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে শুধু পালাবার পথে বাধাই সৃষ্টি করতে লাগলেন, কাউকেই খুঁজে পেলেন না।

একটা ছাতা কুড়িয়ে পেলেন, তাঁর ছাতার দরকার। আগুনের আভায় একটা পেন্সিল দেখতে পেলেন, সেটাকে কুড়িয়ে পকটস্থ করলেন।

অগ্নিকাণ্ড থামান গেল; কিন্তু জগাপিসিকে থামান গেল না। তিনি হঠাৎ কাঁদতে সুরু করলেন, "আমার ছেলে-মেয়ে আর গিন্নী বোধহয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল! তাদের খুঁজে-পাচ্ছি না।"

সকলে পরামর্শ দিলে, "বাড়ীটা একবার দেখে এসে তারপর কাঁদবেন।"

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীতে ঢুকেই তিনি হেসে ফেললেন, সকলেই আছে। কেউ জেগে আছে, কেউ শুয়েছে, সকলকে গুণে নিলেন এক দুই করে।

মানী বললে, "এবার যখন কোনো প্লে হবে, বাবাকে বলছি না বাবা,—মরে গেলেও!"

জগাপিসি বললেন, "তোরা যদি আজ 'লঙ্কাকাণ্ড' প্লে করতিস, খুব জমে যেত!"

মানীর মা বললেন, "লোকে বলে মিছে না, তোমার মাথায় ছিট আছে।"

জগাপিসি বললেন, "আর তোমার মাথায় কি লংক্লথ?"

চার

জগাপিসির ছেলে ন্যাড়া সেদিন ট্রাম থেকে একখানি পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে, সেই কথা চুপি চুপি মাকে জানাচ্ছে, জগাপিসি অমনি ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন। বললেন—"না বলিয়া পরের জিনিস লইও না।"

ছেলে বললে, "তুমি নিলে কেন?"

জগাপিসি বললেন—"প্রথমতঃ তুই 'পর' নোস্, আমার ছেলে। দ্বিতীয়তঃ, বলে নিয়েছি।"

মোট কথা জগাপিসি সেটা ফিরিয়ে দিলেন না।

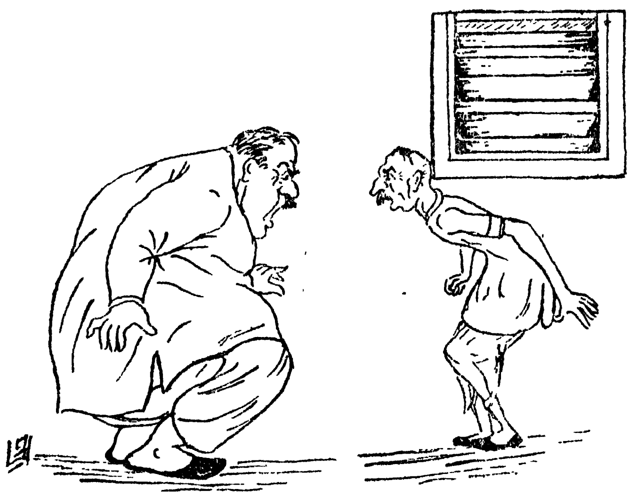
উপরন্তু তাঁর লোভ বেড়ে গেল। রোজই ট্রামে উঠে এদিক ওদিক দেখেন, সীটগুলোর তলাতে কি পড়ে আছে না আছে, খোঁজেন। অফিস থেকে ফেরবার সময় মাঝপথে তাঁর বাড়ী পড়ে, তবু প্রত্যেকদিন ডিপো অবধি যান, গাড়ী খালি হয়, ভালো করে দেখে-শুনে নিরাশ হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফেরেন।

একদিন পেন্সিল মনে করে একটা কি হাত দিয়ে তুলে দেখেন—আধ-পোড়া বিড়ি।

আরেকদিন একটা মোড়ক সন্তর্পণে খুলে দেখেন—চিবোন পান।

সেদিন জগাপিসি লেডীজ সীটে বসেছেন, একটি বছর ১৯।২০ বয়সের মেয়ে উঠেছে, তাকে কিছুতেই জায়গা ছেড়ে দেবেন না, বলেন, "ও ত ঐটুকু মেয়ে, আমার নাতনীর বয়সী, আমার পাশে এসে বসুক না, কি হয়েছে?"

কিন্তু ট্রামে তা চলে না, জায়গা ছাড়তেই হয়, দশ বছরের মেয়ে উঠলেও। সকলের পীড়াপীড়িতে জগাপিসিকে উঠতে হল, ওদিকে একটাও সীট খালি



নেই, কাজেই দাঁড়িয়ে যেতে হয়। যে লোকটি তাঁকে ওঠবার জন্যে বেশী তাগাদা করেছিল সে ছিল পাশেই। উঠেই তার সঙ্গে লাগলো ঝগড়া—"বলুন ত এখন কোথায় বসি?"

সে বললে, "চলুন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে যেতেই ত আরাম!"

"আপনি জন্ম জন্ম যান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমি কেন যাব! পয়সা দিইনি কি?"—জগাপিসি খিঁচিয়ে ওঠেন।

সে লোকটি বললে—"আমি জন্ম-জন্ম দাঁড়াব? আপনি এতবড় কথা বললেন? পারলেন বলতে? মুখে আটকালো না?"—বলতে বলতে সে পানের ডিবে খুলেছে। জগাপিসি 'শট' করে দুটো পান তুলে নিয়ে 'কপাৎ' করে মুখে পুরে বললেন, "আপনার মতন বোকা লোকের পক্ষে ঐ কথাই হল যোগ্য উত্তর!"—বলেই তারই ডিবের ডালা থেকে খানিকটা চুন আঙুলে করে নিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ!"

লোকটি ত হতভম্ব।

কিন্তু জগাপিসির তর্ক করবার মতলব নেই, ওদিকে একটি লোক চটের থলে পায়ের কাছে নিয়ে বসে আছে, সেই দিকে গেছে তাঁর খর দৃষ্টি।

যদি লোকটা ভুলে যায়, জিনিসটা নামাতে! জগাপিসি উইল-ফোর্স খাটাতে লাগলেন মনে মনে।

কি আশ্চর্য! উইল-ফোর্স খাটল। ডিপোর কাছাকাছি এসে সেই লোকটি থলেটি ফেলে রেখেই চলে গেল, ট্রামেও তখন ২।১ জন ছাড়া কেউ নেই, সেই ২।১ জনও আবার অন্য দিকে চেয়ে বসে আছে।

জগাপিসি ক্ষিপ্রহাতে ও দ্রুতপদে থলেটা নিয়ে নেমে পড়েই এক রিক্শা ভাড়া করে ফেললেন।

বাড়ীতে এসে দরজার কাছে থলেটি রেখে গৃহিণীর কাছ থেকে রিক্শা ভাড়া আনতে গেলেন, এসে দেখেন, থলেটি যেখানে ছিল সেখানে নেই, অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে এবং সচল হয়েছে।

চলন্ত চটের থলে! স্থাবরেরও প্রাণ আছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু জগাপিসির চোখ কপালে উঠল।

থলের মুখ খুলে দিতেই—মিয়াঁও—এক বেরাল ছানা লাফ দিয়ে বেরোল।

পাঁচ

জগাপিসির সর্দি হয়েছে, মানে একবার মাত্র হেঁচেছেন। অমনি গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে, পায়ে মোজা পরে, লেপমুড়ি দিয়ে চীৎকার করতে

লাগলেন—"আদা দিয়ে গরম চা!" ছুটোছুটি পড়ে গেল, চা এলো, চুমুক দিতে দিতে চাকরকে বললেন—"চারখানা টোস্ট নিয়ে আয় ঘী-মরিচ দিয়ে, আর ছুটো ডিম, মরিচগুঁড়ো তাতেও যেন থাকে।" ডাক্তারকে খবর দিতে বললেন, "গলাটা ভারী বোধ হচ্ছে। খান কয়েক গরম লুচিও খেলেন গরম জিলাপীর সঙ্গে। সবগুলোই সর্দির পক্ষে নাকি উপকারী।" হরিপ্রিয়াকে বলে দিলেন "আজ—স্রেফ উপোস।" তাকের ওপর থেকে বিস্কুটের টিনটা পেড়ে নিয়ে খান পঁচিশ থিন্ অ্যারারুট শেষ করলেন।

ডাক্তার আসতেই বললেন—"ডাক্তার আমি বাঁচব না।"

ডাক্তার মুখখানিকে অসম্ভব গভীর করে পরীক্ষা স্বরু করলেন। 'কিছু হয় নি' কিম্বা 'ভালো আছেন' বললে হয়ত এখনি তাকিয়া ছুঁড়েই মারবেন জগাপিসি।

ডাক্তার বললেন, "তাই ত! একটু সাবধানে থাকবেন। এই ছ-দাগ ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, তিনঘণ্টা অন্তর একদাগ করে খান।"

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশনটা হাতে নিয়ে জগাপিসি বললেন—"হুঁ, অয়েল সিনামন্—দালচিনির তেল, অয়েল ইউক্যালিপটাস, এটা কি লিখেছে বুঝতে পাচ্ছি না, টাকাডায়াস্‌টিস, ও ত হজমের! হল সর্দি, দিলে হজম! যাক্, নিয়ে আস্থক।"

তিনঘণ্টা অন্তর একদাগ না খেয়ে একঘণ্টা অন্তর তিনদাগ খেয়ে তিনি শিশিটি শেষ করলেন, তবুও সর্দি কিছুমাত্র কমল না, তিনি আর একবার হাঁচলেন।

ডাক্তারের পরামর্শ মত নূনজলে Gargle করতে গিয়ে খানিকটা নূনজলে ঢোঁক করে গিলে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গেই হড়াৎ করে বমি।

গলায় পেণ্ট লাগাতে গিয়ে সে এক বিপর্যয় ব্যাপার। তুলো দিয়ে তুলি করে ওষুধ লাগাতে গিয়ে তুলোটা কি করে যে পেটে চলে গেল বোঝা গেল না, এদিকে জগাপিসি 'আ—উঁ' করে এক প্রচণ্ড লাফ মারলেন, আর বড় আর্শিটায় ফাট ধরল।

বেঞ্জিড্রিন নাকে শুঁকলেন, ক্যালশিয়ম ল্যাকটেট গোটা ছুই খেলেন, একটি জাম-বাটিভর্তি গরম চিড়েভাজা কড়াইশুঁটি দিয়ে খেলেন—নাঃ, সর্দি কমল না। বেলা দশটার সময় ঘরের সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে তিনি ফুটবাথ নিলেন গরম জলে পা ডুবিয়ে, ঘামলেন কম্বল চাপা দিয়ে।

খানিকক্ষণ পরে দরজা জানলা খুলে দিয়ে বড় ছেলে ন্যাড়াকে ডেকে পাঠালেন। বললেন "অ্যালোপ্যাথিতে কিছু হল না বাপু, হোমিওপ্যাথ ডাকো।"

হোমিওপ্যাথ এসে লক্ষণ জিজ্ঞেস করলেন। জগাপিসি প্রধান লক্ষণ বললেন—"মৃত্যুভয়।"

তিনি কয়েকটা পুরিয়া দিলেন, জগাপিসির পীড়াপীড়িতে একটার নাম বললেন—'অ্যাকোনাইট'।

জগাপিসি বললেন, "ওতে কিছু হবে না মশাই, অ্যাকোনাইট খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। এমন ওষুধ দিন যার নাম জানি না, নাম শুনিনি, নইলে বেলেডোনা, ব্যাপ্টিশিয়া, ব্রায়োনিয়ার গুলি আমি অনবরত মশলার মতন মুখে পুরছি।"

ডাক্তার আর কথা বাড়ালেন না, ফী নিয়ে চলে গেলেন।

জগাপিসি ওষুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে নস্যি নিতে লাগলেন, (হোমিওপ্যাথীতে যা নিষেধ আছে) নাকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে। সারাদিনের ওষুধ দু'ঘণ্টায় শেষ করে দিলেন।

ওভ্যালটিন, কোকো, কফি, পরপর কয়েক কাপ খেলেন।

বিকেলের দিকে খানকতক গরম লুচি—এক দিস্তা হবে,—আলুভাজা দিয়ে খেলেন। বললেন, "একবাটি মাংস খাব।"

হরিপ্রিয়া বললেন, "আজকের দিনটা উপোস দাও না।"

জগাপিসি বললেন, "উপোস দিয়েই ত আছি। বড্ড কাহিল বোধ করছি যে!"

কারুর কথা তিনি শুনলেন না, দোকান থেকে এক প্লেট মাংস আনিয়ে নিয়ে খেলেন।

সন্ধ্যেনাগাদ কবিরাজকে ডেকে পাঠালেন। তার আগে আদার রস আর মধু দিয়ে মকরধ্বজ খাওয়া হয়ে গেছে।

কবিরাজ কয়েকটি ওষুধ দিয়ে গেলেন, 'চ্যবনপ্রাশ' নয় শুনে জগাপিসি দুঃখিত হলেন। মিষ্টি মিষ্টি চ্যবনপ্রাশ উনি তাল তাল খেতে পারেন।

কবিরাজ ফী নিয়ে চলে যেতে, উনি মসুরডালের খিচুড়ীর ফরমাশ করলেন, বললেন, "পেঁয়াজভাজা দিয়ে লাগবে ভালো।"

তার আগে উইল করে ফেললেন—তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেলেন

মধ্যবিত্ত সংসারের কর্তাদের জন্যে, যাদের অসুখে কেউ দেখে না,—না গৃহিণী না ছেলেপুলে।

অসম্ভব সর্দি, বারো ঘণ্টার মধ্যে হু হু করে বেড়ে গেল। আশ্চর্য সর্দি, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, শুধু তিনঘণ্টা অন্তর একটি করে হাঁচি।

হয়ত এর জন্যে আল্ট্রাভায়োলেট কিম্বা ডীপ এক্স-রে নিতে হবে, কিম্বা যেতে হবে সুইজারল্যাণ্ড, কিম্বা পায়রামারিবো। ব্যাঙ্কে যার পঞ্চাশ হাজার হার্ড-ক্যাশ, বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হওয়া মানহানিকর।

রাত এগারটার সময় কবিরাজী মোড়কটি গরম জলসহ খেয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

রাত বারোটা। হঠাৎ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের চীৎকার করে ডেকে তুললেন। বললেন—"হার্ট ফেল করেছে।"

হরিপ্রিয়া ওঁর বাতিকের কথা জানেন, বললেন, "হার্ট ফেল করলে, মানুষ অত চ্যাঁচায় না। কি কষ্ট হচ্ছে বলো?"

জগাপিসি পাশ ফিরলেন। ব্যস, আর কোনো সাড়া নেই, ভীষণ নাক ডাকছে।

পরদিন জানা গেল যে তাঁর সর্দি সেরে গেছে, কারণ সকাল থেকে তিনি আর হাঁচেন নি।

জগাপিসি ডিমের সিঙাড়া খেতে খেতে বললেন—"কালকে উপোস করে শরীরটা এখনো দুর্বল রয়েছে। সামান্য ব্যাপারে আমি কখনো উতলা হই না। আমি বলে তাই! অন্য লোক হলে এরকম অবস্থায় কী যে করত—ভাবাই যায় না।"

ছয়

জগাপিসি সপরিবারে দেওঘরে এসেছেন।

দেওঘরে বম্পাস টাউনে যে বাড়ীতে তিনি উঠেছেন তা একটি চোখের ডাক্তারের, তাই বাড়ীর নাম 'চক্ষুদান'। চক্ষুদানের আর একটা মানে হচ্ছে চুরি।

সেই সময় ও পাড়ায় বাস্তবিকই চুরি-চামারী একটু-আধটু হচ্ছিল, বাড়ী ঢুকে অবধি তাই জগাপিসির স্বস্তি নেই। দিন দুপুরে তিনি চোর দেখতে

লাগলেন। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে আলাপ করতে ঢুকেছে, জগাপিসি চেঁচিয়ে বললেন—"চোর ঢুকেছে, মেয়ে চোর।"

একটি কাদের ছেলে ঢুকেছে, বললেন—"ছ্যাচড়া চোর।"

গয়লা ঢুকেছে, বললেন—"ছিঁচকে চোর।"

তাঁর চ্যাঁচানীর আর বিরাম নেই, সকলকে সাবধান করছেন অনবরত।

কয়লাওলা বলে গেল, কোথায় নাকি ডাকাতি হয়েছে। আর যায় কোথায়! জগাপিসি সারারাত জেগে বসে রইলেন। হরিপ্রিয়া বললেন—"জেগে থেকেই বা কি করবে? তুমি কি ডাকাত সামলাতে পারবে?"

"চ্যাঁচাতে পারব ত?"

"এলে তখন চেঁচিয়ো।"

"Prevention is better than cure, সাবধানের মার নেই।"



সারারাত তিনি "কে রে—কে রে" করে চীৎকার করতে লাগলেন। গলা-খাঁকারি দিয়ে ত তাঁর গলায় ব্যথা ধরে গেল। খুটখাট শব্দ শুনেই বললেন "জেগে আছি, বন্দুকটা কোথায়?"

শেষরাত্রে একটু বৃষ্টি নাবল। তিনি বললেন—"এবার ঘুমোন যাক, বিষ্টিতে ভিজে ভিজে ডাকাত আসে না।"

কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তাঁর হাত পা কাঁপে। বলেন, "শীত পড়েছে তাই।"

জগাপিসি স্থির করলেন—ডাকাত যদি আসে একটা ঘটি ছুঁড়ে মারলেও জখম করা যেতে পারে! সর্দার যদি জখম হয় সব পালাবে। কায়দা করে কুঁজো কিম্বা পেপার-ওয়েট ছুঁড়ে মারলেও চোখ কাণা হয়ে যেতে পারে। কাণা ডাকাত দিয়ে কাজ চলে না! অভাবে ভাঙা চায়ের বাটিও কাজে লাগানো যেতে পারে। একটা হুঁকো মাথায় ফাটালেও সহজ ব্যাপার নয়। গঁদ যদি মুখে ছোঁড়া যায় তাহলেও কাজ হতে পারে। তার আগে ভারী তোরঙ্গ টেনে দরজা আটকাও।

সেদিন তিনি তাই করলেন।

রাত্রে নিজেই বাইরে যেতে গিয়ে তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন!

গৃহিনী শুধু বললেন—"বলেছিলুম!"

"বলেছিলে, শুনেছিলুম। এখন আইডিন বার করো"—জগাপিসি খিঁচিয়ে ওঠেন।

বাইরে গিয়ে তিনি কার পায়ে লেগে আছাড় খেলেন? নিশ্চয়ই চোরের পায়ে। চুরী করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিন-সেলের টর্চটা জ্বাললেন না, পাছে চোর তাঁকে দেখতে পেয়ে কায়দা করে ফেলে। বীর বিক্রমে তিনি চোরের পা দুটো ধরে ফেললেন, তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে ঘসটাতে ঘসটাতে তাকে উঠানে এনে ফেললেন। চোর বলছে—"ও কি মশাই? লাগে যে! এ কি রসিকতা সুরু করলেন!"

"রসিকতা নয় ঠাট্টা। এবার গাঁট্টা চলবে।"

সে কাজটা গৃহিণীর পক্ষেই নিরাপদ বলে তাঁকেই ডাক পাড়াপাড়ি করতে লাগলেন। তিনি আলো জেলে নিয়ে এসে বললেন—"তোমার কি জ্ঞানগম্যি কিছু নেই? ও কাকে ধরে টানছ? ও যে মুকুন্দ!"

"মুকুন্দ?" [বলতে ভুলে গেছি, মুকুন্দ তাঁর ছোট ভায়রা-ভাই, সন্ধ্যাবেলা এসেছে। জগাপিসিই ভুলে গেছেন, তা আমাদের কি দোষ?]

মুকুন্দ কিন্তু খুব রেগে গেল, সে বিশ্বাসই করলে না, জগাপিসি ভুলবশত করেছেন। একে চোর-ডাকাতের ভয় থাকা সত্ত্বেও তাকে বাইরে দালানে শুতে দিয়েছিলেন, তারপর রাত-বিরেতে অসভ্যের মতন টানাটানি,—এ স্রেফ খেতে দেবার ভয়ে তাড়ানোর মতলব! মুকুন্দ ভোরের ট্রেনেই গিরিডি চলে গেল।

জগাপিসির ছোট শ্যালিকা কড়া চিঠি লিখলে—'পা ধরে টেনে কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া কোন্ দেশী ভদ্রতা?'

জগাপিসি বললেন—"তুচ্ছ ব্যাপারে ওরা রাগ করে, বোঝেনা কিছু, ছেলেমানুষ।"

'চক্ষুদানে' কোনো উপকার হল না বলে জগাপিসি সব ঘরের খিলগুলো ভেঙে দিয়ে এলেন। এদিকে একশো টাকার দু'খানা নোট যে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সিলিংএর ক্যান্‌ভাসের মধ্যে গুঁজে রেখে এসেছিলেন সে কথা কলকাতায় এসে মনে পড়ল।

সাত

জগাপিসির মেজ ছেলে এসে বলল, "ছ'আনা পয়সা দিন, চশমাটা বেঁকে গেছে, মেরামত করতে হবে।"

"চশমা বেঁকে গেছে, হুটোপাটি করছিলি, বুঝি? তা' একটা চশমা ঠিক করতে ছ'আনা পয়সা খরচ করতে হবে, নিজেরা ক'রে নিতে পারিস্ না? খোল্, দেখি কোথায় কি হয়েছে।"

চশমাটা খুলে দিতে হাতে নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে বলিলেন, "ও, এই হয়েছে, তার জন্যে দোকানে যেতে হবে! তোদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। নিয়ে আয় বড় সাঁড়াশিটা আর ছোট হাতুড়িটা, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি! এই ত কাজ, তার জন্যে আবার—"বলে এমন এক 'হুঁ' করলেন যে তাতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা কিছু নয়!

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল হাতুড়ি, সাঁড়াশি, ছোট কাঁচি, স্টোভ, প্যাকিং-বাক্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, কর্ক-স্ক্রু প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ চারপাশে নিয়ে তিনি ভীষণ মনোযোগের সহিত চশমা সারাতে সুরু করেছেন।

হরিপ্রিয়া বললেন, "তুমি নিয়েছ! এবারে ভাঙে।"

"ভাঙ্‌বে আবার কি, ভাঙ্‌বার কি আছে"—বলতে বলতে চশমাটার একদিকের ডাঁটি সাঁড়াশি দিয়ে চেপে তিনি কটাস্ করে একটা শব্দ করলেন এবং মটাস্ করে একখানা কাঁচ দু'আধখানা হয়ে পড়ল।

"ভাঙল ত? ফল্‌ল ত আমার কথা?"

"ফল্‌বে না? যা' কাণের কাছে টিক্‌টিক্ কর! কাঁচ যাক্, চশমাটা ঠিক হয়ে গেছে!"

গৃহিণী মন্তব্য করলেন, "ছ'আনা বাঁচাতে গিয়ে এখন আড়াই টাকার ধাক্কা!"

"তা' কি হবে, কাঁচটা ছিল পল্‌কা। কোথাও কিছু না, আপনি গেল ফেটে, জাপানী চিমনীগুলোর মতই।"

বিকেলবেলা। গৃহিণী দুধে জ্বাল দিচ্ছিলেন, বিড়ালটা পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অন্যমনস্কভাবে পিছন ফিরতে ল্যাজে পা পড়ে গেল এবং সেও সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাঁ-অ্যা-স্ করে উঠল।

হরিপ্রিয়া বললেন, "আঃ মর, পায়ে পায়ে সুড়-সুড় করে বেড়াচ্ছে! দূর হ', দূর হ,' মুখ পোড়া বেড়াল মরে না।"

"কি হ'ল কি হ'ল," বলতে বলতে জগাপিসি এসে দেখলেন এই ব্যাপার। তৎক্ষণাৎ হুকে টাঙ্গানো এক চ্যাঙারি পেড়ে বিড়ালের পশ্চাতে ছুটলেন। হরিপ্রিয়া দেখে বললেন, "কিসের নোংরা হাত আমার ও ভালো ঝুড়িটায় দিলে, তোমাকে বেড়াল তাড়াতে হবে না, তোমার পায়ে পড়ি!"

"না দাঁড়াও, এই দিয়ে শালাকে চাপা দোব," বলে ধাবমান শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কলতলায় এসে পড়লেন। গৃহিণী চীৎকার করে বলতে লাগলেন, "ওদিকে যেও না গো পেছল্"—আর পিছল্! দুষ্ট বিড়াল পলায় দেখে জগাপিসি চ্যাঙারিটা ছুঁড়ে মারলেন, সাতহাত তফাৎ দিয়ে সে ত পালাল, শ্যাওলাপড়া কলতলায় রাশিকৃতি সকড়ি থালা-বাসনের উপর দড়াম করে পড়লেন জগাপিসি।

লজ্জা পেয়ে কাঁদোকাঁদো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "লাগে নি, তবে কনুইটা গেছে!"

হরিপ্রিয়া সেদিন লক্ষ্মীপূজার যোগাড় করছিলেন আপনার মনে মাথা নীচু করে বসে, বিড়ালটা তাঁর হাতখানেক তফাতে গা মেলে শুয়েছিল, বাটির গৃহিণীকে মোটেই সে ভয় করে না, যেহেতু তাঁর তরফ থেকে কখনো আক্রমণ পায় নাই। এদিকে পশ্চাৎ দিক হতে জগাপিসি ধামা নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন, বিড়ালটা হঠাৎ দেখে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ 'মা ষষ্ঠী' বলে ধামা ছুঁড়লেন, লাভের মধ্যে হল, হরিপ্রিয়া মাথায় ধামা চাপা পড়ে চমকে 'ও মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, জগাপিসি থতমত খেয়ে পিছু হটে কলার কাঁদির উপর ধড়াস্ করে পড়ে আট-দশটা মর্তমানকে চট্‌কিয়ে দিলেন, পুরুত-ঠাকুর সহসা দাঁড়িয়ে উঠে 'ব-ব-ব-ব' বলে এক ভীষণ আর্তনাদ করলেন, নিস্তারিণী ঝি হাউ-মাউ করতে লাগল, অথচ যাকে নিয়ে এত ব্যাপার, সেই বিড়ালটা দোতলার আলিশায় গিয়ে নিশ্চিন্তমনে হাই তুলতে লাগল।

অবশেষে একদিন বিড়ালটা চাপা পড়ল, জগাপিসির হাতে নয়, ছেলেদের হাতে। ধামা হতে তাকে চটের থলিতে বদলী করবার মুখে কোথা হতে জগাপিসি এসে পড়লেন এবং অত্যন্ত সাবধানতাসহকারে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে কোন্‌দিক দিয়ে বিড়ালটা সরে পড়ল বোঝা গেল না।

সকলে স্থির করল এবার যে দিন বিড়াল ধরা হবে এবং বাইরে চালান করা হবে, সেদিন জগাপিসিকে এধার মাড়াতে দেওয়া হবে না, তিনি এলেই সব পণ্ড হয়ে যায়!

কিন্তু কার্যকালে জগাপিসি কোথা হতে আবির্ভূত হলেন, বস্তাবন্দী করে বিড়ালটাকে বাইরে নিয়ে যাবার মুখে তিনি বললেন—"ধরা হয়েছে, ধরা হয়েছে, বাঃ, এখন ওকে খানিকটা আনিমানি-ঘোরানি ক'রে দে, তা'তে দিক্‌ভুল হয়ে যাবে।"

ছেলেরা কোন কথা শুনল না, চাকরটাকে বলল, "নিয়ে চল, অনেক দূরে দিয়ে আসি···"

জগাপিসি বাধা দিলেন, "না না অনেক দূরে নয়, কোথায় যাবে খেতেটেতে পাবে না, কেউ মারবে ধরবে, ওকে এই পাড়াতেই একটা ভাল বাড়ী দেখে ছেড়ে দিয়ে আয়, খাবে-দাবে ভাল, আসতে চাইবে না। যা, ঐ মজুমদারদের বাড়ীতে দিয়ে আয়···"

জগাপিসি নিজে গিয়ে তদ্বির করে সেই বাড়ীর সামনে ছেড়ে দিয়ে এলেন, বিড়ালটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল, কিন্তু জগাপিসি গৃহে ফিরে দেখলেন তাঁর আগেই বিড়ালটা ফিরেছে!

আট

জগাপিসির ভাগ্নীর বিবাহ।

জগাপিসির নিমন্ত্রণ।

কণের বাড়ীতে বাইরের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য।

সহসা জনসঙ্ঘ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শানাইয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে একজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, "এসে পড়েছি ভায়া, আর কোন ভয় নেই। ওরে তামাক দে। এ চেয়ারটা এখানে কেন? সরা। ভালো ত? নমস্কার! নাপ্‌তে এসেছে? ছাতে গিয়ে পাতা সাজাও। ওখানে অতগুলো আলো কেন? এদিকে একটা এসিটিলিন দে। নিয়ে আয়।"

সকলকে ঠেলে তিনি বারান্দায় এসে উঠলেন। সেখানে একজায়গায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন, ফরমাস করতে লাগলেন, যাকে-তাকে ধমকাতে লাগলেন, বিবাহবাড়ী জমে উঠল।

ভগ্নীপতিকে ডেকে বললেন, "ভিয়েন হচ্ছে কোন্ দিকে?"

দেখিয়ে দিতেই তিনি অন্দরে ঢুকে বামুনদের তাড়া দিতে লাগলেন—"বর এসে পড়ল, তোমরা করছ কি?"

রসুইকররা বলল, "আজ্ঞে, আমাদের ত সব তৈরী, লুচিটা ভেজে নিলেই হয়।"

জগাপিসি বললেন, "লুচি এখন ভেজো না। বরযাত্রী বসলে ভাজতে আরম্ভ করবে। গরম লুচি খাওয়ান চাই।"

"আজ্ঞে আচ্ছা বাবু"—বলে তারা তামাক টানতে বসল।

ততক্ষণে তিনি চারতলার ছাদে চলে গেছেন।

ছেলেদের দল কলরব করছিল, বলে এলেন, "পাতা করো।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হুকুম করতে লাগলেন, "ওহে, তুমি গেলাস নিয়ে যাও, তুমি খুরি সাজাও, তুমি জল দাও গে। নুন দিও পাতার ডান ধারে। ঠাকুর, অ-ঠাকুর—পটোল ভাজাটা নিয়ে এসো—পাতায় যা দেবার দাও। ওরে এটা কাদের ছেলে, হারিয়ে যাবি, মার কাছে যা। সুধো, কালী, কোথায় গেলি সব, তোর মামা বুড়ো বয়সে এত খাটছে, তোরা আজকালকার ছেলেরা—"

জগাপিসির ছোঁয়াচ বাড়ীময় লেগে গেল, যে-সব ছেলেরা দরজা বন্ধ করে পান্তয়া শেষ করছিল এবং আড্ডা দিচ্ছিল, তারাও চীৎকার করতে সুরু করল, "ওরে, পাঁপর ভাজা ওপরে নিয়ে যেতে বল। গজা, নতুন কাকীকে ডেকে দে, কাপড় তুলে নিক্। এখান থেকে জলের যায়গাটা কে নিয়ে গেল!"

বাইরে এসে জগাপিসি অভ্যর্থনা সুরু করলেন। অধিকাংশ লোককেই তিনি চেনেন না।

শানাইওয়ালাকে পুরোহিত ঠাওরে নমস্কারপূর্বক আদর করে বসালেন, পুরোহিতকে নাপিত মনে করে তাড়া দিলেন এবং একটি ইস্কুলের ছেলে যখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে 'ওয়েলকাম' লেখাটা পড়ছিল তখন তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি একলা এলে, তোমার বাবা আসবেন ত?"

ছেলেটি সভয়ে জানাল, বাবা বাড়ীতে আছেন এবং তিনি আসবেন না।

জগাপিসি বললেন, "এ ভারী অন্যায়। বোল তাঁকে যে আমরা খুব দুঃখিত হয়েছি। তুমি বোস, না খেয়ে পালিও না।"

"এস বাবাজী, বোস ভায়া।" "আপনি দাঁড়িয়ে কেন?" "বিষ্টিটা আর না এলে হয়!" "আপনাকে চিনি-চিনি বোধ হচ্ছে",—ইত্যাদি বাক্যে তিনি সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুললেন।

বর এলে, 'শাঁখ বাজাও, জল আনো' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তিনি নিত্‌বরকে কোলে করে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। হাসির হর্‌রার মাঝে তিনি ছাদে পাতা করতে ছুটলেন।

ছাদে গিয়ে দেখলেন পাতা হয়ে গেছে। পঞ্চান্নখানা পাতা হয়েছিল, তিনি আন্দাজ করে নিলেন, পাঁচশো লোকের জায়গা হয়েছে। তখনই পাঁচীল হতে গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে মুখ করে চেঁচাতে লাগলেন, "সব লোক পাঠিয়ে দাও, অনেক জায়গা আছে।"

লোক উঠতে লাগ্‌ল, তিনি সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে ছেলেদের দাঁড় করিয়ে দিলেন, বলে দিলেন, "ওপরের পথ দেখিয়ে দেবে।"

ছাদের দরজার কাছে একজনকে চীৎকার করতে' বললেন, "ব্রাহ্মণদের এই দিকে।"

তারপর তিনি তফাতে দাঁড়িয়ে নিজের বন্দোবস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলেন।

লোক ক্রমাগত আসতে লাগল এবং জগাপিসি চেঁচাতে লাগলেন "লোক পাঠাও।"

কিন্তু অচিরেই দেখা গেল সমস্ত জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে, আর অনেক লোক দরজার কাছে ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছে।

তখন জগাপিসি "আপনারা দয়া করে এখান থেকে যান, আর জায়গা নেই" বলতে বলতে বেশ সবিনয় ধাক্কা মারতে লাগলেন।

তাদের ঠেলা দিতে দিতে দোতলায় এসে দেখলেন, মেয়ের দল একটা দরজা ফাঁক করে নিমন্ত্রিত দলের ওঠানামা দেখছে।

এই অনাবশ্যক কৌতূহলে জগাপিসি অত্যন্ত চটে উঠলেন এবং যেই দেখলেন একজন লোক কাঁধের চাদর ঠিক করতে করতে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাকে জাপ্‌টিয়ে ধরে একতলায় চালান করে দিলেন। সে বেচারা যতই বলতে লাগল, "আমি বাড়ীর জামাই, মশাই", জগাপিসি ততই তাকে ভীষণ রকম বকুনি দিতে লাগলেন, "কি রকম ভদ্রলোক, মেয়েদের দিকে দৃষ্টি?"

অতঃপর ছাদে এসে তিনি দেখলেন, মহা গোলযোগ। লুচির দেরী হওয়াতে অধিকাংশ লোকই শাকভাজা পটোলভাজা শুধুমুখে খেয়ে ফেলেছে।

লুচি যেই এল জগাপিসি এক একখানি করে প্রত্যেককে দিতে বললেন। একটা চ্যাঙারী শেষ হতেই কোন দিকে দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ দিকে দেওয়া হয় নি, বুঝবার উপায় রইল না। তখন বামুনরা বুদ্ধি করে চাকরদের জন্য ভাজা মোটা এবং ঠাণ্ডা লুচি চালান করতে লাগল। ক্ষুধার মুখে অমৃতের মত তাই লোকে নিঃশেষ করতে লাগল।

কিন্তু পরিবেষণ কিছুই হচ্ছিল না। মাছের কালিয়ার পর চাটনি তারপর ধোঁকার ডাল্না এসেছে, কিন্তু সব পাতে লুচি নেই এবং জল নেই।

সকলেই নিম্নস্বরে অভিযোগ করছে—"এমন মিস্-ম্যানেজমেণ্ট !"

কিন্তু জগাপিসি একটি টুলের উপর আরাম করে বসে কাছাকাছি যারা বসেছিল তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন, "কেমন হচ্ছে হে ?"

সকলেই বাঙালীজনসুলভ ভদ্রতাসহ উত্তর দিতে লাগলেন, "বেশ হচ্ছে।"



"বেইমশাই হাত গুটিয়ে কেন ? কি দেবে ? আপনি কিছু খাচ্ছেন না।"

বেইমশায়ের পেটে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলছিল, বললেন, "আমি ঠিক খাচ্ছি, কিন্তু এধারে অনেকের পাত খালি।"

জগাপিসি শশব্যস্ত হয়ে বামুনদের তাড়া দিতে লাগলেন এবং নিজে কোঁচা গুঁজে দৈ দিতে সুরু করলেন।

কিন্তু এ কার্য বেশীক্ষণ চলল না, একজনের গায়ে ছড়াৎ করে তিনি দই ফেলে দিলেন এবং আর একজনের পাতের একেবারে মাঝখানে শ্রীচরণ ফেললেন।

এই বিভ্রাটের মধ্যে একজন বলে বসল, "যোগেশবাবু, একটা পটোলভাজা আনিয়ে দেবেন!"

কথাটা কে বলল ফিরে দেখতে গিয়ে জগাপিসির পা লেগে একজনের গেলাস উল্টে গেল, চারধারে জল গড়িয়ে দু' তিন জনের আসন ভিজে গেল।

জগাপিসি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হন নি। কাজের বাড়ীতে এ রকম একটু-আধটু হয়ই, তিনি নিজেই এর আগে বহু স্থলে ঢের গোল বাধিয়েছেন।

এর পর সন্দেশ এল, ক্ষীর এবং পান্তুয়া এল।

জগাপিসি এবার নোন্‌তা কিছু থাকে ত বের করতে বললেন, কারণ তিনি স্বয়ং মিষ্টান্নের পর নোন্‌তা খেতে ভালবাসেন।

কচুরী এবং সিঙাড়ার পর একজন এসে বলল, "ছানার পায়েস আছে।"

জগাপিসি বললেন, "এধার থেকে ছানার পায়েস দাও, ও লাইন থেকে পান দাও।"

যারা পান পেল তারা ছানার পায়েসের জন্য আর বসল না, বসুন বসুন বলা সত্ত্বেও!

জগাপিসি চ্যাচিয়ে বললেন, "এখনো লেডিগেনী আছে···"

কে কার কথা শোনে! জুতা খুঁজতে সকলে ব্যস্ত।

জগাপিসি বলিলেন, "কেমন হল বেইমশাই?"

বেইমশাই বলিলেন, "এমনটা কোথাও দেখিনি।"

জগাপিসি তা জানতেন, তিনি যা করেন অভূতপূর্বই হয়।

কিন্তু অতিশয় চীৎকার করে জগাপিসির আর কিছু খাবার প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি ছয়টা লেডিগেনী মুখে পুরে দিয়ে এক গেলাস ঘোলের সরবৎ নিয়ে খানিকক্ষণ অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এক ব্যাচ খাইয়েই জগাপিসি বাড়ী চললেন। তাঁর যেতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তাঁকে ভুলিয়ে পরদিন অফিস আছে রাত জেগে কি হবে বলে হিতাকাঙ্ক্ষীগণ গাড়ীতে চাপিয়ে দিল।

নয়

জগাপিসি সপরিবারে কাশী যাবেন। এক বৎসর আগে হতে যোগাড়যন্ত্র চলছে। খাওয়ার ফর্দ, বেড়াবার ফর্দ, জিনিসপত্রের ফর্দ ইত্যাদি সর্ববিধ ফর্দ লেখা হয়েছে।

কিন্তু আশ্বিন মাস পড়তেই যাবার দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, হরিপ্রিয়া ততই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। একদিন তাঁর বড় জামাইকে ত বলেই ফেললেন, "ওঁর সঙ্গে যেতে ভয় করে, কখনো করেন নি এ সব। এতগুলিকে কি সাম্‌লে নিয়ে যেতে পারবেন? কে কোথায় হয় ত পড়ে থাকবে—হয় ত কি একটা বিভ্রাট বাধিয়ে…"

কথা শেষ হতে পেল না। পাশের ঘর হতে জগাপিসি চেঁচাতে চেঁচাতে বললেন, "শুনতে পেয়েছি, সব শুনতে পেয়েছি। আমার নিন্দে করা হচ্ছে!"

অপ্রস্তুত হরপ্রিয়া বললেন, "না না, নিন্দে নয়। তুমি ওখানে রয়েছ, জানি না ত!"

জগাপিসি ঘরে ঢুকে বললেন, "কিছু ভেবো না গিন্নী, এমন নিঃশব্দে নিয়ে যাব যে টেরই পাবে না—শুধু হাওড়ায় ট্রেনে উঠবে, আর কাশীতে ট্রেন থেকে নাববে—আর তোমায় কিছু করতে হবে না, সমস্ত আমি দেখব।"

কিন্তু যাবার দিন জগাপিসি সকাল হবার অনেক আগে থেকেই চীৎকার আরম্ভ করলেন। ভোর চারটের সময় সকলকে তুলে দিয়ে তৈরী হতে বললেন—"রাত্রি আটটায় গাড়ী, বেলা বারোটার সময় স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে হবে। নইলে পূজার বাজার, কিছু বলা যায় না। ভীড় ত অসম্ভব হবেই।"

হরিপ্রিয়া আপত্তি করলেন, "বারোটা থেকে—"

"হলেই বা! প্ল্যাটফর্ম, জলে ত পড়ছ না?"

"লোকে ভাববে কি! যেন কখনো বিদেশে যায় নি!"

"ভাবলেই বা! কিন্তু যখন দেখবে আমরা আরামসে বসে যাচ্ছি তখন তারাই আবার হিংসে করবে! ভাববে, এরা 'বেড়ে যাচ্ছে!' "

তাই হল। বারোটার সময় দু'খানি ভাড়াগাড়ী মালে আচ্ছন্ন করে দুর্গা দুর্গা বলে চোখ বুজে বাঁ পা আগে বাড়িয়ে, মনি-ব্যাগটি ভিতরের পকেটে আছে কি না হাত দিয়ে দেখে, সকলকে হাঁচতে বারণ করে, পরম গম্ভীর ভাবে জগাপিসি পা-দানীতে পা দিলেন। হাঁচব না হাঁচব না অনবরত মনে করতেই একটা হাঁচি এল, নাক টিপে লিস্ট দেখে ছেলে-মেয়েদের ডাকতে আরম্ভ করলেন—"নেড়া—পাঁচু—রেণি—মানী—চিকাই—ধোচন—কম্বল—দম্বল—ঘটঘটি—গাম্‌লা—কেঁচো—পান্ত—গিন্নী!"

সকলেই সাড়া দিল। লিস্ট পকেটে রেখে জগাপিসি গাড়ীতে ঢুকলেন, গাড়োয়ান হাট্ ক্ল্যা ক্ল্যা বলে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল, জগাপিসির গোপন হাঁচিটি এতক্ষণে সশব্দে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তিনি হতাশ হয়ে এলিয়ে পড়লেন।

'যাত্রা' করে বের হয়েছেন, আর বাড়ী ঢুকবার উপায় নেই।

তারা ব্রহ্মময়ীর মনে যা আছে তাই হবে ভেবে তিনি রাস্তা দেখতে দেখতে চললেন।

প্ল্যাটফর্মের অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাল বিছিয়ে আপনার ক্ষুদ্র সংসারটি নিয়ে জগাপিসি বসে ছিলেন।

হরপ্রিয়ার দ্বিপ্রহরের ঢুলুনি স্থরু হয়েছিল।

জগাপিসি বললেন, "দেখোনা, চারদিকে কত রেলগাড়ী আসছে যাচ্ছে, সাতজন্মে দেখতে পাওনা ত এ সব?"

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না, জগাপিসির জন্যও করল না। সন্ধ্যা এল এবং সাতটা বাজল।

ট্রেন আসতেই জগাপিসি মালপত্র তুলে দিয়ে তিনখানা বেঞ্চে বিছানা পেতে বসলেন। প্রাণে তাঁর বড়ই আনন্দ হল। এত জায়গা পাওয়া যাবে কল্পনাই করেন নাই।

ক্রমে লোক আসতে লাগল। জগাপিসি একজনের সঙ্গে আলাপ করতে স্থরু করলেন, "আপনি কতদূর যাচ্ছেন?"

"আমি যাব পুরী।"

"পুরী, ত এ গাড়ীতে এসেছেন কেন?"

"কেন মশাই?"

"এ ত কাশী যাবে!" বলে জগাপিসি বিজ্ঞভাবে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "আজ্ঞে না, এ বি-এন্-আরের গাড়ী, এ পুরীই যাচ্ছে, আপনিই ভুল করছেন।"

'অ্যাঁঃ', বলে জগাপিসি ভীষণ একটা আওয়াজ করে নেমে একজন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ গাড়ী কি কাশী যাবে?" 'বেনারস' বললে শীঘ্রই জবাব পেতেন, কাশী সে বুঝল না, বলল, "আস্ক দি গার্ড।"

নিশান-হাতে গার্ডকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন—সত্যই এ ট্রেণ শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করছে।

মালপত্র নিয়ে যখন ডেরাডুন এক্সপ্রেসে এসে পৌছলেন, তখন সে গাড়ী ভীড়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কোন প্রকারে মেয়ে-গাড়ীতে মালপত্র ও পুত্র-কন্যা সমেত গৃহিণীকে পুরে দিয়ে তাঁকে মাল বুঝে নিতে বললেন। তিনি খবর দিলেন,—একটা ট্রাঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না।

বোধ হয় ও গাড়ীতে আছে, মনে করে জগাপিসি ছুটলেন। যে কামরায় ছিলেন তার দরজার কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন হরিদ্রাবর্ণের পরিচিত ট্রাঙ্কটি বাঙ্কের উপর স্থির ভাবে বিরাজ করছে, কিন্তু তখনই ট্রেন ছেড়ে দিল।

চলন্ত গাড়ীতে পাছে তিনি উঠে পড়েন ভেবে দু'জন রেলওয়ে কর্মচারী তাঁহাকে জাপ্‌টিয়ে ধরল, চক্ষের সম্মুখ দিয়ে তাঁর ট্রাঙ্ক পুরী যাত্রা করল।

এনকোয়ারি আপিসে জিজ্ঞেস করে খড়্গপুরে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেন, যেন তাঁর 'ট্রাঙ্ক' নামিয়ে নেওয়া হয়। সে কার্য শেষ করে এ ট্রেনে এসে দেখলেন এও ছাড়বার সময় হয়েছে, কিন্তু গৃহিণী বললেন, "কেঁচোকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

কি আশ্চর্য! কেঁচোকে ফেলে ত যাওয়া যায় না। খুঁজতে খুঁজতে জগাপিসি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বাইরে এলেন। বেশী দূর যেতে হল না। একটা লজঞ্চুসের স্টলের সামনে সতৃষ্ণ নয়নে কেঁচো দাঁড়িয়ে আঙুল চুষছিল, কাশীযাত্রার উদ্বেগ তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই।



জগাপিসি তাকে কোলে তুলে নিলেন, এবং দেখলেন, গলার হার ছড়াটি নেই, কেঁচোকে প্রশ্ন করতেই সে বলল, "নঞ্চু খাব। ওই নঞ্চু!"

ওদিকে এ কি হল? প্ল্যাটফর্মে গাড়ী ছিল, কোথায় গেল? ভুল-প্ল্যাটফর্মে এলেন না কি? প্রথম লোকের কথা বিশ্বাস করলেন না, আরো চারজনকে জিজ্ঞেস করে জানলেন—কাশীর গাড়ী ছেড়ে গেছে, এতক্ষণ লিলুয়ার কাছাকাছি।

এমনি সময়ে বড়-জামাতা এক চ্যাঙ্গারি লুচি নিয়ে ছুটছিল, তার

উপর জলখাবারের ভার ছিল। জগাপিসি তাকে ধরে জানালেন,—গাড়ী নেই, এখন উপায় ?

সকল কথা শুনে সে পরামর্শ দিল—বম্বে-মেলে গেলে আসানসোলে ওদের পাওয়া যাবে।

অগত্যা জগাপিসি ক্ষুণ্ণমনে লুচির চ্যাঙ্গারিটি নিয়ে বম্বে-মেলে চড়ে বসলেন।

আসানসোলে নেমেই তিনি চীৎকার করতে লাগলেন, "নেড়া পাঁচু রেনি গিন্নী—"

একটা গাড়ী হতে শিশুকণ্ঠে জবাব এল, "বল, এ গাড়ীতে আছি।" এককোলে কেঁচো এবং আর এককোলে চ্যাঙ্গারি নিয়ে জগাপিসি সে গাড়ী পার হয়ে যাচ্ছিলেন, সহসা শুনতে পেলেন, "ডাক একবার। বল, এ গাড়ীতে।"

বলতে হল না, জগাপিসি শুনে দাঁড়ালেন, কেঁচোকে এবং লুচির চ্যাঙ্গারিটি গৃহিণীকে জিম্মা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ?"

"অসুবিধে বলে ? আমি তখনি বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে যাওয়া নয় এখন আরও কি কপালে আছে কে জানে ?"

জগাপিসি বললেন, "আবার কি কপালে থাকবে ? এই ত এসে গেল। কাশী আর কার বাড়ী ? কিছু ভাবতে হবে না, তুমি এবার ঘুমোও। দেখ, শুধু ছেলেগুলো যেন জান্‌লা গলে পড়ে-টড়ে না যায়, কিম্বা কলঘরের ফুটো দিয়ে—"

'সিটি' দিল, শশব্যস্ত জগাপিসি ছুটে ইণ্টারক্লাস খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, পাশে সেকেণ্ড ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস (লেডিজ)—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস …ইণ্টার ক্লাস দেখতে না পেয়ে তিনি ফিরে এলেন। গৃহিণীকে বললেন, "এখানেই এখন উঠি, পরের স্টেশনে নামব।"

উঠে পড়ে দেখলেস মেয়েরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, শীতের রাত্রে আগাগোড়া র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে।

জগাপিসি বললেন, "আমার গায়ের কাপড়টা মুড়ি দিয়ে বউ সেজে এই বাক্সটার ওপর বসে থাকি, নইলে কে পুরুষ মানুষ দেখে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠবে—"

তাই করলেন, রাঙ্গা র‍্যাপার মাথায় ঢেকে, ঘোমটা টেনে, জুলজুল করে চেয়ে রইলেন।

হরিপ্রিয়া কষ্টে হাসি চাপলেন।

খানিকক্ষণ পরেই তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। 'বাপস্' বলে র‍্যাপার নামিয়ে তিনি মাথার ঘাম মুছতে লাগলেন।

ওদিককার বেঞ্চে একটি মেয়ে তখন গাড়ীর আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়েছিল, অবগুণ্ঠন ভেদ করে গোঁফ প্রকাশ হতে দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

জগাপিসি কাছে গিয়ে বললেন, "কোন ভয় নেই মা, আমি চোর নই, এই আমার স্ত্রী। আমি পরের স্টেশনে নেবে যাব, কোন ভয় নেই তোমার, তুমি আমার মেয়ের বয়সী।"

মেয়েটি চুপ করল, কিন্তু জগাপিসি নিরুপায় হয়ে আবার মুড়ি দিলেন।

পরের স্টেশনে নেমে গিয়ে একটা থার্ড ক্লাস পেলেন। থার্ড ক্লাসই সই ··· উঠে পড়ে একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের কোলের কাছে জায়গা করে নিলেন।

পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বসতে পেয়ে এইবার জগাপিসির ক্ষুধার উদ্রেক হল। কিন্তু চ্যাঙ্গারি হতে লুচি আনবার আর উপায় নেই এবং স্টেশনে পান সিগারেট ছাড়া এত রাত্রে আর কিছু বেচছে না।

মোগলসরাইয়ে পৌঁছে জগাপিসি উদরের তাড়নায় চোখে কানে কিছু দেখতে পেলেন না, গৃহিণীকে বললেন, "দেখ, কাশীতে গিয়ে বাড়ী পৌঁছতে যার নাম এগারোটা, তারপর রান্না করে খেতে দুটো। পথে আর কোথাও খাবার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে নাবো, মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ করে অন্য গাড়িতে কাশী যাব, আর ত এসে গেছি, গঙ্গা পেরোলেই কাশী।"

জগাপিসি মাল নামাতে লাগলেন।

পানি-পাঁড়েকে ডেকে দাঁতন কিনে মুখ হাত ধুয়ে তিনি লুচির সদ্গতি করতে বসলেন, গাড়ীর জন্য তাঁর চিন্তা রইল না।

সকলের পেট ঠাণ্ডা হলে জগাপিসি পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

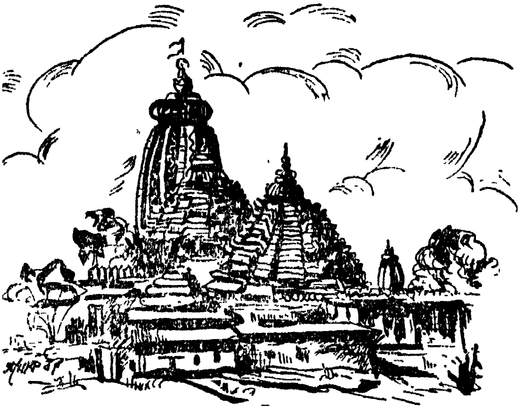
অন্য দিকের প্ল্যাটফর্মে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াতেই জিনিষপত্র লোকজন তুলে দিয়ে তিনি জানতে পারলেন—এবার এলাহাবাদ চললেন

একজন যাত্রীর কাছে সন্ধান পেলেন বিন্ধ্যাচলে নেমে জলপথে কাশী যাওয়া যায়। গৃহিণীর কাছে কোন কথা না ভেঙ্গে, বললেন, "তোমাকে বিন্ধ্যাচল দেখিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করাব!"

বিন্ধ্যাচলে দু'দিন থেকে তিন দিনের দিন গঙ্গায় গিয়ে তাঁরা নৌকা ধরলেন।

সত্যই যখন দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছিলেন, তখন তাঁর আনন্দ, চক্ষু ও ও দন্তের ফাঁক দিয়ে শতধায় প্রকট হয়ে পড়ল।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুণ্ডারা বিদ্রোহ করে ১৮৩১ সালে। তারা সরকারী আইন অমান্য করে ও প্রায় হাজারখানে বিদেশীকে নিহত করে। বৃটিশ অশ্বারোহী বাহিনী তাদের কাছে পরাজিত হয়। বহু কষ্টে তাদের দমন করা হয়। ফলে প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল স্থান জনশূন্য হয়ে পড়ে। বহু মুণ্ডা প্রাণ হারায়। এদের অন্যতম নায়ক ছিলেন বুদ্ধ ভগৎ।



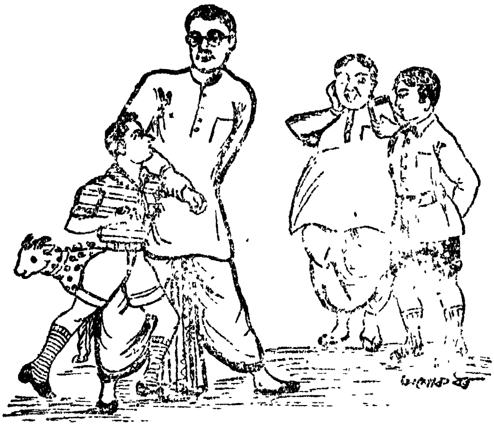
পুরীর চিঠি

*

শ্রী বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ীর সাগর সৈকত পাশে বেঁধেছি এবার বাসা,
বালিয়াড়ি-ঘেরা বাড়ীটি মোদের বেশ বড় আর খাসা।
ঢেউ-এর উপর ঢেউ ছুটে আসে তুলি সহস্র ফণা,
কী যে গর্জন, কেমনে তা লিখি, স্মৃতি তার ভুলিব না।
সোজা পথ গেছে শ্রীমন্দিরেতে, ছায়া-তরু ধীরে ধীরে,
অরুণ-স্তম্ভ হেরিয়া বারেক প্রবেশি সিংহদ্বারে।
পাথরের উঁচু দুইটি প্রকার,—ঠিক দুর্গের মত,
পাষাণ গাত্রে হেথা হোথা লেখা অতীতের কথা কত!
কণারক হতে আনা শত শিলা,—শিল্পীর সেরা দান
আঁখি ভরে দেয় আগন্তুকের, খুশীতে ভরায় প্রাণ।
কত হেরিলাম দেবদেবী—তার কাহিনী বলি যে কত,
সাক্ষী গোপাল, সাবিত্রী দেবী ভক্তিতে করে নত।
বড় দেউলের মণিকোঠা ভাই, কত যে পুণ্য ঠাঁই,
তীর্থ-পথিক জানে ভাল মতে তুলনা উহার নাই।
তিনটি ঠাকুর শোভা পান হেথা,—কলির দেবতা তাঁরা।
চর্ম চক্ষে ত্রিমূর্তি হেরি হইনু আত্মহারা।
রথের রশির লোভ থেকে গেল, এ যে আশ্বিন মাস,
মহাপ্রসাদ লাভ করি পাই আনন্দ উচ্ছ্বাস।
নীলাচলে জেনো ভেদাভেদ নেই চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ;
এক সাথে খেয়ে একটি পাত্রে শুচি করে নেয় মন।

জাতের বালাই নেইকো হেথায়, পুরীর রাজা যে তাই
রথের সময় চণ্ডাল বেশে পথ ঝাঁট দেয় ভাই!
হরিজন হেথা পরিজন হয়, অসৎ হয় যে সাধু,
এই নীলাচলে নীলমাধবের প্রেমের এমনি যাদু।
কোন যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজন গড়ে গেছে মন্দির!
কোন্ যুগ তাঁর? কে দেবে সাক্ষ্য এই পুরা কীর্তির?
ইতিহাস বলে, অনঙ্গভীম গঙ্গবংশ রাজা—
তিনি গড়েছেন এই মন্দির, আর চোখে দেখি যা যা।
গুণ্ডিচাবাড়ী শ্রীঠাকুর যান পিঠে ও পায়েস খেতে,
মাসী-বাড়ী যেতে কার বল ভাই, মন ওঠে নাকো মেতে?
আদি শঙ্কর স্থাপন করেন শ্রীগোবর্ধন মঠ,
টোটা গোপীনাথ শুনেছি ভরেন মন-মঙ্গল-ঘট।
বিগ্রহ সনে শ্রীগৌরাঙ্গ হেথা হল এক দেহ,
প্রেমের সাগর সাগরে মেশেন—এ কথাও বলে কেহ।
মহাপ্রভুর পাদুকা এবং জীর্ণ কন্থাখানি
গম্ভীরা-ঘরে অতীব যতনে রাখা আছে তাও জানি।
সিদ্ধ-বকুল আজো বেঁচে আছে, আঠারো নালার কথা
পাণ্ডার মুখে শুনিয়া বারেক বেড়ে যায় ব্যাকুলতা।
বীর হনুমান আজো কি শাসন করিছে সমুদ্রেরে?
মন্দিরে তাই কল-কল্লোল কর্ণে পশে না যে রে!
সমাধির তলে ঘুমান অদূরে যবন শ্রীহরিদাস,
পুণ্য ছড়ানো পত্রে-পুষ্পে—পবিত্র চারিপাশ।
সার্বভৌম বাসুদেব হেথা জ্ঞানের দীপিকা জ্বালে,
শ্রীচৈতন্য, বিষ্ণুপ্রিয়ার পদছাপ লই ভালে।
সারা প্রাণ-মন সাড়া দিয়ে ওঠে ঢেউরা যখন ডাকে।
সিন্ধু-শকুন সম নেচে উঠে—ছেড়ে দিই আপনাকে।
আকাশে সলিলে মিতালি হেথায় হেরি বিরাটের মেলা,
মনের সুপ্ত শিশু বুঝি তাই ছাড়া পেয়ে করে খেলা।



দু'ধারা * শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু

স্কুলের শেষ-ঘণ্টা পড়বার পর ব্যোমকেশ দু'এক জন সহপাঠির সঙ্গে স্কুলের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। ফুটপাথের উপর একটা গাছের তলায় বাঁধা একটা শিং-হীন মেড়া সর্বাগ্রে ওর দৃষ্টিপথে পড়লো।

ব্যোমকেশের দেহটা অত্যন্ত কৃশ। স্কাউটের পোষাকে লাঠিহাতে ওকে যেতে দেখলে মনে হতো, সদ্য বেলগাছ থেকে নেমে একটা বেহ্মদত্যি চলেছে। ওর শরীরে যে শক্তি থাকতে পারে, তা ওর সহপাঠিরা বিশ্বাস করতো না।

ব্যোমকেশ পাশের ছেলেটিকে বললে—ঐ যে মেড়াটা বাঁধা রয়েছে, ওটার 'ঢুঁ' তুই সহ্য করতে পারিস্? কিন্তু আমি পারি ওর 'ঢুঁ' সহ্য করতে।

ছেলেটির নাম গণেশচন্দ্র। আস্ত গোবর-গণেশ। ব্যোমকেশের কথা শুনে, ফুলো ফুলো গাল দুটি আরো ফুলিয়ে বললে—ইঃ, ভারী তোর সাহস। মাকড়সা দেখলে যে দশহাত দূরে স'রে পড়ে, সে যাবে ঐ মেড়াটার কাছে গায়ের জোর দেখাতে। তালপাতার সেপাই! ফুঁ দিলে উড়ে যান!

শিবু বললে—গণা তো ঠিক-ই বলেছে, আগে বাড়ীতে খুব ক'রে দেয়ালের সঙ্গে শরীরের ধাক্কা লাগিয়ে ওটাকে মজবুত ক'রে নে, তারপর মেড়ার সঙ্গে আসিস্ লড়তে।

ব্যোমকেশ বললে—থাম্ তুই শিবে! মনে করিস্ নি, আমি তোকে ভয় ক'রে চলবো। বলে, দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরের পুচ্ছ পরলেও সে দাঁড়কাকই থাকে, ময়ূর হয় না। ভোঁস্! সাহেব হয়েছেন উনি!

শিবু চটে উঠলো, বললে—তুই তো একটা হাড়গিলে। তোদের বাড়ীতে বুঝি আর্শি-ফার্শি নেই রে! নিজের চেহারাটা বুঝি দেখতে পাস্ নে?

গণেশ শিবুর গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে বললে—কোথা থেকে পাবে বল্ আর্শি? সেদিন ওর বাবা এসেছিল ইস্কুলে। কিন্তু এই হাঁটুর ওপরে ওঠা একটা এই-সা মোটা কাপড়, পিঠের দিকে তালি-মারা কোট! জুতোটাও দেখেছিলি তো? যেন দুটো রাঘব বোয়াল। তলাটা ছিঁড়ে 'হাঁ' ক'রে আছে।

বাবার অপমান শুনে ধাঁ ক'রে ব্যোমকেশ ওর সামনের দিকে বেরিয়ে আসা দাঁত দুটোর উপর একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে। বললে—আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা? ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখো নি?

স্কুলের হেডমাস্টার মশাই বড়ো একটা এ পথ দিয়ে বাড়ী ফিরতেন না। কিন্তু আজ তাঁর ছেলের জন্য জামার কাপড় কেনাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুটপাতে উবু হয়ে উনি জামার কাপড় পছন্দ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো ছেলেদের দিকে। তাঁর জামার কাপড় কেনা স্থগিত রইলো। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এদিকে এলেন এবং দেখলেন, গণেশচন্দ্রের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। প্রশ্ন করলেন—কে এ-কাজ করেছে—এ্যাঁ?

ব্যোমকেশ উত্তর করলে—আমি স্যার!

হেডমাস্টার মশাই বললেন—তুমি? তুমি মেরেছো একে? মিথ্যে কথা। তোমার পক্ষে এই মোটাকে ঘুষি মারা সম্ভব নয়। ঐ তো তোমার চেহারা! ওর একটা চড় খেলে তুমি তো ঘুরে প'ড়ে যাবে।

ব্যোমকেশ বীরত্বসূচককণ্ঠে বললে—আপনি দাঁড়িয়ে দেখুন না স্যার!

গণেশকে আর একটা ঘুষি মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি ওর হাতে ধ'রে ফেললেন—তোমার স্পর্ধা তো বড় কম নয় হে ছোক্‌রা, তুমি আমার সামনেই ওর গায়ে হাত তুলছো?

ব্যোমকেশ বললে—ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেবো, বাপের অপমান কোনো পুত্রই সইতে পারে না।

হেডমাস্টার মশাই কী চিন্তা করলেন। তারপর ওদের সকলকে নিয়ে এলেন স্কুলে। নিজের বসবার ঘরে ওদের বসালেন। গণেশের মুখ ধুয়ে ঠোঁটের উপর জলপটি দিয়ে দিলেন।

গণেশ তখনও ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্ ক'রে কাঁদছিল।

স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাই তখনও পাশের ঘরে টেবিল চাপড়ে পালির শিক্ষকের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। হেডমাষ্টারমশাই গেলেন ঐ ঘরে। বললেন—পণ্ডিত মশাই, আপনার ছেলেটা যে আজ মার খেয়ে পথে পড়ে থাকতো। এ-খবর তো রাখেন না যে, নাদুস-নুদুস ছেলেটি মার খেয়ে এখনও আমার ঘরে ব'সে ফ্যাস্-ফ্যাস্ করছে।

সুধীরঞ্জন পণ্ডিত মশাইকে সকলেই বদ্‌রাগী ব'লেই জানে। লম্বা শুষ্ক দেহ। মাথার চুল অত্যন্ত ছোট ক'রে ছাঁটা—যাকে আমরা চলতি কথায় কদম-ছাঁট বলি, ঠিক তাই। মাথার পিছন দিকটায় বেশ বড়গোছের দোহারা শিখাটি সর্বসময়েই একটা জবাফুল বুকে ক'রে নড়ে-চড়ে বেড়ায়। কপালটার মাঝামাঝি জায়গায় চন্দনের একটি পরিষ্কার তিলক।

হেডমাষ্টার মশাইয়ের কথা শুনে পণ্ডিত মশাই মুখখানা ছুঁচলো ক'রে বললেন—কে মার খেয়েছে—গ-গ-গণেশ? আ-আ-আমার গণ্‌শাটা? ব্যাটা একটা গো-গো-গোবর গণেশ, ন-ন-ন দেবায় ন ধর্মায়। একেবারে অপদার্থ। ছেলে নয়, ম-ম-মশাই—আ-আ-আস্ত পিলে। ম-ম-মস্ত একটা হনুমান।

হেডমাষ্টার মশাই হেসে ফেললেন, বললেন—রাগারাগি পরে করবেন পণ্ডিত মশাই। এখন আসুন এ-ঘরে। যে আপনার গোবর-গণেশকে মেরে গোবর ক'রে দিয়েছে, তাকে শুদ্ধ ধরে এনেছি।

পালির মাষ্টার এতক্ষণ নীরব হয়েই ছিলেন। কিন্তু এইবার মুখ খুললেন, বললেন—তিনি আবার কি করবেন হেডমাষ্টার মশাই? আপনি থাকতে বিচার করবেন ইনি,—এই শুষ্কং কাষ্ঠং? ক্ষেপেছেন?

সাপ আর নেউলে একটা তীব্র বৈরিতা আছে। পালির মাষ্টার এবং সংস্কৃতের পণ্ডিতের মধ্যে এই রকম একটা সম্বন্ধ বিরাজমান। দু'জনের মধ্যেই কেউ কারুকে দেখতে পারেন না।

পণ্ডিত মশাই রেগে গেলে অসম্ভব রকম তোৎলা হয়ে পড়তেন। পালির মাষ্টারের মন্তব্যে লম্বা কাঠির মতো হাত দুটি দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বারকতক শূন্যে ঘুরিয়ে বললেন—যতো ব-ব-বড় লোক নয় ততো ব-ব-বড়ো কথা?

হেডমাষ্টার মশাই বললেন—আসুন আমার ঘরে।

ওঁরা তিনজনেই একে একে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

উপবিষ্ট গণেশচন্দ্রকে দেখেই পণ্ডিত মশাই লাফ দিয়ে উঠলেন—ছো-ছো-

ছোট লোকের ছে-ছে-ছেলের মতো রা-রা-রাস্তায় মা-মা-মারা-মারি ক'রে মরছো—অ্যাঁ ?

ব্যোমকেশ একপাশে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

পণ্ডিতমশাই বললেন—এই ছুঁ-ছুঁ-ছুঁ-ছুঁচোটা এখানে আ-আ-আ-আবার কেন ? এটা তো আ-আ-আ আমার ব-ব-বন্ধু স-স-স-সত্যেনের ছেলে। পাশের বাড়ীতে থাকে। হা-হা-হাড় বদমায়েস ম-ম-মশাই। ক্লা-ক্লা-ক্লাসে টি-টি-টিক্‌তে দেয় না।

হেডমাষ্টার মশাই বললেন—তবে তো ভালোই হলো পণ্ডিত মশাই। এর ব্যবস্থা আপনিই করুন। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি চললুম।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন—দি-দি-দি-দিব্যি আছেন দেখছি। এই তিনটে গো-গো-গো-গোখরো সাপের মু-মু-মুখে আমায় ফেলে যা-যা-যাবার মা-মা-মা-মানে ?

হেডমাষ্টার মশাই ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—কেন, পালির মাষ্টার মশাই মুস্তফীবাবু তো রইলেন। আপনার ভয় কি ?

কিন্তু মুস্তফীবাবু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন—আজ্ঞে না স্যার, দরকার হলে বরঞ্চ মন্তর-টন্তর প'ড়ে সাপগুলোকে আরো রাগিয়ে দেবো পণ্ডিতমশাইর ওপর।

মুস্তফীবাবুর এই মন্তব্যে পণ্ডিতমশাই একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়লেন। বললেন—দে-দে-দেখলেন কথার র-র-র-রকমটা! শ-শ-শ-শয়তান কোথা-কা-কা-কার!

পালির মাষ্টার এবার ধৈর্যচ্যুত হলেন, বললেন—মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি!

তারপর ? তারপর আর কি ? এই দুটি মাষ্টারে লেগে গেলো মুখোমুখি লড়াই। হেডমাষ্টারমশাই এতোটা আশা করতে পারেন নি। বললেন—আপনারা থামুন বলছি। নইলে কালই আপনাদের দু'জনকেই সরাবো স্কুল থেকে। আচ্ছা মুস্কিলে পড়লাম যা—হোক···

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—এই যে-তিনটি বালক আসামীকে নিয়ে এই বিপত্তির সৃষ্টি, তারা নিজেদের ঝগড়া-মারামারি ভুলে, হাত ধরাধরি ক'রে তখন রাজপথের উপর দিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে।



প্রত্যুত্তর

*

শ্রী ফণিভূষণ বিশ্বাস

স্বামীজী সন্ন্যাসী বেশে আলোয়ায় রাজ্যে এসে
পৌছিলে, দেওয়ান শুধান,—
"ফকিরের মত কেন অতি তুচ্ছ বস্ত্র হেন
করেছেন অঙ্গে পরিধান?"
শুনিয়া স্বামীজী ক'ন, "বৈরাগ্যের এ বসন
গ্রহণেরও উদ্দেশ্য আছে।
প্রধান সুবিধা এই গেরুয়ার শত্রু নেই,
ঘেঁসে নাকো ভিখারীও কাছে!"

দে'য়ান বলেন শুনি, "আসুন অতিথি, গুণী!
দর্শন-প্রত্যাশী মহারাজ!"
উত্তরে বলেন স্বামী, "বড় ভাগ্যবান আমি,
রাজার সাক্ষাৎ হবে আজ।"
পৌছিলে স্বামীজী শেষে রাজার সভায় এসে
সসম্ভ্রমে মহারাজ ক'ন,—
"সকলেই বলে জানি আপনি পরম জ্ঞানী,
আপনার আশ্চর্য-মনন!
এ হেন প্রতিভা পেয়ে কেন যে নিষ্ক্রিয় হয়ে
উপার্জনে বিরত আছেন?"
শুনিয়া আরক্ত মুখে স্বামীজী ওঠেন রুখে,
দৃঢ় স্বরে আপত্তি করেন;
বলেন, "হে মহারাজ! অবহেলে রাজ কাজ
কেন নিত্য সময় কাটান
উদাস-আলস্য ভরে নিঠুর মৃগয়া করে
বৃথা কেন ঘুরিয়া বেড়ান?"

শুনি রাজা অপ্রতিভ লজ্জায় কাটেন জিভ
তোলেন অন্য প্রসঙ্গ-কথা।
সহাস্যে বলেন, "স্বামী, বিশ্বাস করি না আমি
শালগ্রাম পাষাণ দেবতা।
খড় মাটি শিলাতেই দেবতার চিহ্ন নেই,
লোকে তবু মূর্তি পূজা করে!"
সে কথায় কিছুক্ষণ স্বামীজী নীরব হন
মুখে কোন বাক্য নাহি সরে!
দৃষ্টি মেলে চারিধার দেখে শুনে বার বার
একখানি ছবি খুঁজে পেতে—
সভার সুমুখে রাখি' দে'য়ানেরে ক'ন ডাকি'
"ফেলুন তো থুথু দেখি এতে।"
দে'য়ান বলেন, "ছি ছি, তামাসা করেন এ কি
ক্ষুব্ধ হবে এতে রাজরোষ!
রাজার অশ্রদ্ধা হয় তা করা উচিত নয়,
সে কথাও মুখে আনা দোষ!"
স্বামীজী বলেন, "ওটি নহে তো নৃপতি খাঁটি,
শুধু তার ক্ষুদ্র প্রতিভাস—
তবু সে ছবির জন্য কী অকুণ্ঠ এ সৌজন্য,
কেন এত সশ্রদ্ধ-প্রয়াস?
কেন না এটার মাঝে রাজার স্বরূপ রাজে
ওটা তাঁর প্রতিভূ-প্রমাণ।
সেইরূপ ঘটে পটে আমরাও দেখি বটে
সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ভগবান।"



ওই সিংহল দ্বীপ

*

শ্রী ইন্দিরা দেবী

দক্ষিণ ভারতের এক নিবিড় ঘন বন—তারই পাশ দিয়ে চলা সরু পথ। সেই পথ ধরে চলেছে একজন যাত্রী—সঙ্গে ছোট দুটি ছেলে আর মা। তাদের মা আর রক্ষী দল। ছেলেটি বছর তিনেক—মেয়েটি খুব ছোট—মার কোলে বসে আছে—ছেলে মেয়ে মা পাল্কিতে—বাহক সঙ্গী জনকয়েক।

রক্ষীদের প্রধান বললেন—হুঁসিয়ার হয়ে চলো ভাই—এ জায়গাটা ভালো নয়—অনেক দেরী করে যাত্রা করেছি আমরা। আরও আগে এই বিপদজনক এলাকা পেরিয়ে এলেই হতো ভালো। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন কাঁপিয়ে উঠলো বিরাট গর্জন, একেবারে সিংহনাদ। সব ছুটে পালালো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মা, মেয়ে আর ছেলের কি হলো—কেউ খোঁজ নিতে এগিয়ে এলো না—পশুরাজের কিন্তু দয়া হলো—তাদের আক্রমণ তো করলই না—বরং পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে গেল তার গুহায়।

মা ভেবেছিলেন কেউ না কেউ খোঁজ করতে আসবে—যাচ্ছিলেন তো বাপের বাড়ী। বাবা বৃদ্ধ। কিন্তু ভায়েরা তো খোঁজ করতে আসবে? শ্বশুর কুল! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, দিন যায়, রাত কাটে, সপ্তাহ গড়িয়ে মাসে আসে, মাসের পর বছর! সিংহই তাদের খাবার জুটিয়ে আনে। অন্য জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ছেলেটা বড় হয়েছে—বুঝতে পারে। মাকে বলে—এ কী রকম জীবন মা? এমনি ভাবেই কাটাতে হবে এই জানোয়ারের রাজ্যে। মা কিছু বলেন না—শুধু ওপরের দিকে তাকান দু'চোখ মেলে। পশুরাজ কথা বলতে পারে না। কিন্তু মনের ভাব বুঝতে পারে। তার ইচ্ছে ছেলেটা এবার তার সঙ্গে শিকারে বার হয়—ছেলে তাতে রাজী। পথ-ঘাট তো চেনা যাবে, তারপর মা আর বোনকে নিয়ে একদিন বন থেকে বাইরে যেতে পারবে—নির্বাসনের মেয়াদ তখনই শেষ হবে। হলোও

তাই। সিংহ সেদিন একাই বেরিয়েছে অনেক দূরের পাল্লা। ছেলে বললে,—শীগ্‌গির এসো। বোনকে তুলে নিল কোলে। তারপর শুরু হলো ছোটা আর ছোটা। শেষ পর্যন্ত মানুষের রাজ্যে এসে পৌঁছুলো তারা।

পশুরাজ গুহায় ফিরে এসে ব্যাপার দেখে তাজ্জব। অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে রাগে ফুলে উঠলো কেশর, তার গর্জনে কেঁপে উঠলো বন—পশু-পাখীরা ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকলো। পশু হলে কী হবে! এতদিন মানুষের সংশ্রবে থেকে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত হয় তার। তাই এবার বন ছেড়ে খোঁজ করতে গেলো সহরে। কাছাকাছি জনপদে তাদের পাওয়া গেল না বটে। কিন্তু দু'চার দশজন তার হাতে প্রাণ দিতে লাগলো। আশে-পাশে সর্বত্র নেমে এলো গভীর আতঙ্কের ছায়া। শেষকালে যে সহরে এরা আশ্রয় নিয়েছিল সেখানেও শুরু হলো সিংহের অত্যাচার। দেশের রাজা হুকুম জারী করলেন—এ অত্যাচার বন্ধ করতে হবে—পুরস্কার দেওয়া হবে যে সিংহকে হত্যা করে রাজ্যের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে পারবে তাকে।

ছেলেটা এখন বড়সড় হয়েছে—বনে জঙ্গলে থেকে খুব কষ্টসহিষ্ণু। পাথরে গড়া দেহ, বুকে অদম্য সাহস। মাকে বললো,—মা তুমি অনুমতি দাও আমি যাবো।

মা বললেন,—এত দুঃখ কষ্ট ভোগের পর শান্তি পেলাম; মা বাপ কেউ আর বেঁচে নেই, শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও আমাকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। তুমিই এ দুঃখীনীর একমাত্র ভরসা। কী করে তোমাকে এ বিপদের মুখে যেতে বলি! ছেলে অনেক বুঝিয়ে বলল মাকে। শেষ পর্যন্ত মা রাজী হলেন। হাতে ভোজালি নিয়ে ছেলে রওনা হলো—গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে সবাই তাকে জানিয়ে গেল শুভেচ্ছা। গ্রাম ছেড়ে বনে ঢুকলো—হঠাৎ শোনা গেল বন কাঁপানো বিকট আওয়াজ, গাছের আড়াল থেকে বোধ হয় বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড সিংহমূর্তি। কিন্তু কী আশ্চর্য ছেলেটাকে দেখে সিংহ একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল—কিছুক্ষণ পর এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে ছেলেটির কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো। জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো তার গায়ের ঘাম। গভীর করুণা মাখানো দুটি কাতর চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ছেলেটির সর্ব দেহে। আর ছেলেটি তখন তার অস্ত্র দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো সিংহের দেহে। তবু নিশ্চল নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পশুরাজ। নির্দয় নিষ্ঠুর আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠলো তার দেহ, তবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন প্রতি-আক্রমণের চেষ্টাই করলো না সিংহ। বিরাট দেহ তার লুটিয়ে পড়লো রক্ত ঝরা মাটির কোলে।

বিজয়গর্বে ফিরে এলো ছেলেটা। রাজা তাকে পুরস্কার দিলেন। দেশবাসী সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু সুখী হন নি তার মা। হাজার হোক আশ্রয়দাতা তো বটে, স্বভাবে হিংস্র হয়েও একদিন তো পশুরাজ তাদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। দিনের পর দিন আহার আর আশ্রয় জুগিয়ে তাদের নিরাপদে রেখেছিল। সেই আশ্রয়দাতার জীবন নাশ—এ যে অধর্ম। কিছু দিনের মধ্যেই মারা গেলেন মা।

কথাটা রাজার কানে গেল। ছেলেটাকে ডেকে পাঠাতে সে সব কথা অকপটে স্বীকার করলো। রাজা বললেন,—তোমাকে পুরস্কৃত করেছি বটে কিন্তু আশ্রয়দাতার জীবন নাশ করে তুমি অধর্ম করেছ। তাই তোমাকে আমার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একখানি নৌকোয় তুলে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো জলে। অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে চললো ঢেউ-এর দোলায় ছোটো সেই নৌকো—নীল জল আর জল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল—কে জানে কিনারা পাওয়া যাবে কিনা? কখন এলোমেলো বাতাসে ভেঙ্গে যায় হাল? কখন ঢেউ-এর তলায় তলিয়ে যায় কাণ্ডারীশুদ্ধ নৌকো?

তবু শেষ পর্যন্ত কূল পাওয়া গেল।

ছেলেটা ভগবানের নাম স্মরণ করে নামলো অজানা দ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীরা খুঁজছিল সুদক্ষ নির্ভরযোগ্য সাহসী নেতা। এই অজানা, নাম-না-জানা ছেলেটাই একদিন হয়ে গেল তাদের নেতা, দেশের রাজা। তার নাম কেউ জানে না—কিন্তু তার হাতে গড়া এই রাজ্যের নতুন নাম হলো সিংহল। সিংহের আশ্রিত সিংহের হননকারী রাজার নতুন রাজ্য পরিচিত হলো সিংহল নামে।

সিংহল নামকরণের কারণ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে—আমরা যে কাহিনী বর্ণনা করলাম সেটি চীনের পরিব্রাজক হিউয়ান সাঙের কাছ থেকে শোনা—তাঁর ভারত ভ্রমণের ইতিবৃত্তে এ কাহিনীটির উল্লেখ রয়েছে।

অবশেষে দেবী আর থাকতে পারলেন না। কঠিন স্বরে তিনি প্রশ্ন করেন,—বালক, তুমি হাসছ কেন ?

রাম বলল,—মা, আমি হাসছি তার কারণ আছে। আমাদের ত একটা করে মাথা, সেই মাথায় একটা নাক আর দুটো করে হাত। তোমার কিন্তু হাজারটা মাথা হাজারটা নাক। আমাদের যখন সর্দি হয় তখন নাক মুছতে আমাদের দু'হাত লাগে, তাও হয় না, কত কষ্ট হয়। আর তোমার মা ঐ হাজার নাকে যদি সর্দি হয় তুমি কি করবে ? তোমার ত দেখছি দুটো বই আর হাত নেই।

বালকের এই মজার কথায় মা রাগ না করে সন্তুষ্টই হলেন। তিনি বললেন,—বালক, তুমি যেমন হাসির কথা বলেছ আমি বর দিচ্ছি তুমি বয়সে একজন বিদূষক হবে। তখন তোমার নাম হবে বিকট কবি।

সঙ্গে সঙ্গে তেন্নালিরাম আবার হেসে উঠল।

মা বললেন,—হাসলে কেন ?

—হাসব না, বললে রাম। তুমি যা নাম দিয়েছ তাতে বাঁ দিক থেকে কেউ পড়লে যেমন বিকট কবি, ডান দিক থেকে পড়লেও তাই হবে।

দেবী আরও প্রসন্ন হয়ে বললেন,—তুমি রাজ বিদূষক হবে। শুধু তাই নয়। রাজসভায় তুমি যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা লাভ করবে।

এই কথা বলেই দেবী অদৃশ্য হলেন।

রসিকতার জন্য পরদিন থেকেই তেন্নালিরাম খ্যাতি লাভ করতে থাকে। পরবর্তী জীবনে তিনি রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে রাজ-বিদূষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উপস্থিত বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ। একটি গল্প বলছি।—

একবার কোনো কারণে তেন্নালিরাম রাজার অসন্তোষের কারণ হয়ে পড়েন। রাজা এতই রুষ্ট হন যে তিনি আদেশ দিলেন তেন্নালিরামকে যেন হাতির পায়ের তলায় ফেলা হয়। সেই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। হাতি ওকে মাড়িয়ে যাবে।

এই আদেশ পালন করার জন্য যথা সময়ে নগরের বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় গর্ত খোঁড়া হল। সেই গর্তের মধ্যে তেন্নালিরামকে গলা অবধি পুঁতে ফেলা হল। মাটির ওপরে জেগে রইল শুধু তার মাথাটি। ওকে এভাবে রেখে ভৃত্যরা তখন হাতি নিয়ে আসার জন্য প্রস্থান করল।

এমন সময় পিঠে বোঝা নিয়ে এক কুঁজো ধোপা চলছিল সেখান দিয়ে। মাটির মধ্যে আকণ্ঠ পোঁতা রামকে দেখে সে ত অবাক। সে জিগ্যেস করল,—কি মশাই। ব্যাপারটা কি? আপনার সর্বাঙ্গ মাটির মধ্যে পোঁতা কেন বলুন ত?

—দেখ বাপু, তেন্নালিরাম চটপট উত্তর দিলেন। আমার পিঠে একটা কুঁজ ছিল। কিছুতে সারে না, তাই গেলুম এক বদ্যির কাছে। সেই বদ্যিই আমাকে এই ভাবে রেখে গেছে। মাটির মধ্যে থেকে থেকে আমার পিঠের কুঁজ কিন্তু সেরে গেছে। তুমি যদি একটু কষ্ট করে মাটিটা খুঁড়ে ফেল তাহলে দেখতে পাবে আমার ধনুকের মত বাঁকা পিঠ একেবারে সোজা হয়ে গেছে।

ধোপা মাটি খুঁড়তে লেগে গেল এবং উপরে উঠতে দেখল সত্যিই তার পিঠে কুঁজ নেই। সে তখন বললে,—দেখুন, আমার পিঠে একটা বিশ্রী কুঁজ আছে। আমাকে এই গর্তে পুঁতে দিন না মশাই, আমার পিঠটা সোজা হয়ে যাক।

তেন্নালিরাম বিলম্ব না করে কাজে লেগে গেলেন। ধোপাকে গর্তের মধ্যে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন, মাথাটি শুধু জেগে রইল তার।

তারপর ধোপার বোঝাটি পিঠে তুলে নিয়ে তিনি চললেন, সোজা রাজার রাজসভায়।

—একি? তেন্নালিরাম? এখানে এলে কেমন করে? রাজা অবাক হয়ে ওঠেন। তোমাকে না হাতির পায়ের তলায় ফেলা হয়েছিল। আমি ত সেই হুকুমই দিয়েছিলাম। তাই না?

—সত্যিই তাই মহারাজ। তেন্নালিরাম রাজাকে প্রণাম করে নিবেদন করেন,—আপনার আদেশ ঠিকই পালিত হয়েছিল। কিন্তু এক সরল প্রাণ ধোপা আমাকে গর্ত থেকে উদ্ধার করে, আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করে আছে। এই দেখুন তার বোঝা আমার পিঠে।

রাজা সমস্ত বিবরণ শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন এবং বিদূষকের শাস্তি মকুব করে মার্জনা করলেন। ধোপাও যথা সময়ে রাজানুগ্রহে উদ্ধার পেল।



জমিদারির হুকুম জারি

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

'এবার হলো বন্ধ বলি'
মায়ের পূজো স্রেফ নিরামিষ
জমিদারের হুকুম কড়া
এতটুকু হবে না উনিশ-বিশ!

গাঁয়ের লোকে অবাক হলো
পুরুত মশায় পায় না ভেবে কুল
চিরকেলে প্রথা এ যে—
তোলার কথা শোনাচ্ছে বাতুল!

খরচে যদি না কুলোয় ত
হাজার কেন লক্ষ উপায় আছে,
গাঁয়ের পূজো হোক না এবার
চাঁদা নিয়ে সার্বজনীন ধাঁচে!

মোড়ল, বুড়ো, ছোকরা, যুবো—
সবাই মিলে মিটিঙ করে শেষে
জমিদারের কাছে গেল,
আমতা আমতা করে কিছু কেসে-

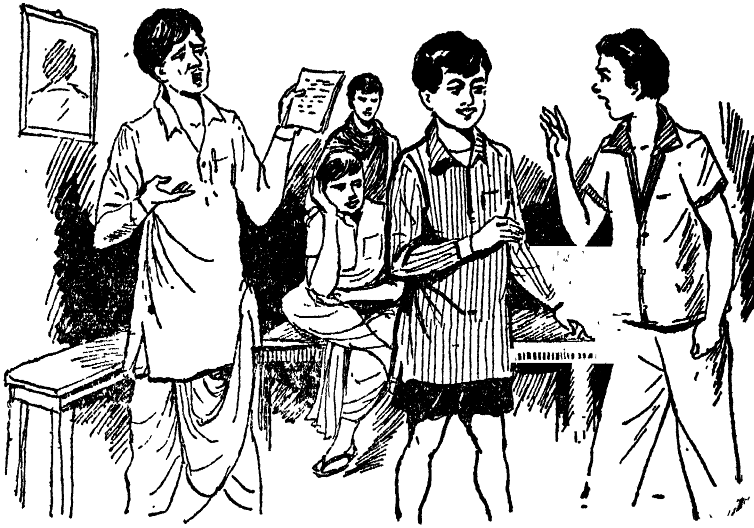
বললে—'দেখুন,—দুগ্গো পূজো
বলি ছাড়া হয় না যে হুজুর,
ডজন ডজন পাঁঠা যে চাই
মেষ ও মহিষ, হুকুম করুন দূর।'

কেউ বা কারণ শুধোতে চায়
হুকুম এবার কেন এত কড়া
জমিদারি নিয়েছে বলে
সরকারেতে—তাই কি ছড়াবড়া

এমন করে দুর্গাপূজা?
বেশ ত এবার সবাই চাঁদা তুলে
গাঁয়ের পূজোর আদিম সুনাম
রাখবো মোরা সবাই মিলেজুলে।

'হোক না পূজো, বন্ধ ত নয়,
হোক না বিরাট বেজায় ধুমধাম,
বন্ধ শুধু বলি এবার
নিয়ো না পাঁঠা-মেষ-মহিষের নাম।'

কারণটা কি? স্বপ্নাদিষ্ট?
তা নয়কো, তেমন কথা নাই,
দাঁত তুলেছেন জমিদার যে
মাংস খাওয়া নিষেধ হলো তাই!



কান্না হাসির কবির লড়াই ✱ শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

১ম প্রস্তাবক। প্রণাম করি সিদ্ধিদাতা
গণপতির পায়ে
প্রণাম জানাই বীণাপাণি
সরস্বতী মায়ে।

২য় প্রস্তাবক। প্রণাম জানাই সমাগত
. সুধীবৃন্দ সবে
আজকে হেথায় প্যারডিতে
কবির লড়াই হবে।

১ম প্রস্তাবক। ইনি হচ্ছেন বংশী কবি
বাঁশবেড়েতে বাসা
উদরখানি হাস্য এবং
কাব্য রসে ঠাসা।

২য় প্রস্তাবক (আর) ইনি হলেন গুপীবাবু
গুপ্তিপাড়ায় বাড়ী
ছন্নছাড়া জগৎ মাঝে
ছন্দের কারবারী।

১ম প্রস্তাবক। ছন্দে চলেন, ছন্দে বলেন,
ছন্দে গাহেন গান,
কান্না হাসির দোল দোলানো
ছন্দে ভরা প্রাণ।

২য় প্রস্তাবক। এঁদের মুখে শুনতে পাবেন
*করুণ রসিকতা
অশ্রুভরা বাঙলা দেশের
সুখ-দুঃখের কথা।

[বিরতি]

বংশী। কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ?
কোথায় পাবি মান?
সকালবেলা সাড়ে ন'টায়
আপিস যাবার তাড়া
স্টেট-বাস ট্রাম ধরতে লোকে
ছুটছে পাগল-পারা,
যানবাহনে মানছে না কেউ
ট্র্যাফিক অনুশাসন,
এমন যানের চাকার তলায়
পেতে চাস কি আসন?
প্রাণ তা শুনে গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
"নহে নহে নহে।"



গুপী। কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ?
কোন্ দিকে তোর টান?

স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালায়
স্বাধীন দেশের ছেলে,
চালে কাঁকর, ডালে মাকড়,
ভেজাল ঘী-এ তেলে,
বাজার-ভরা বাসি পচা
তরকারি আর মাছ,
তাই খেয়ে কি হাড় জুড়ুতে
করিস মনে আঁচ ?
প্রাণ তা শুনে করুণ হেসে
রহে নিরুত্তরে
যাব যাব করে।



বংশী। কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ ?
কোথায় পাবি স্থান ?
রাস্তা-ঘাটে আবর্জনা
রোগ বীজাণু ভরা
মশা মাছি ধুলো ধোঁয়া
গন্ধে মাতোয়ারা,
খাবার জল ও ড্রেনের জলে
বন্ধু গলাগলি,
তাদের পায়ে আপনাকে কি
দিবি জলাঞ্জলি ?
কথা শুনে এক পা দু' পা
এগিয়ে আসে প্রাণ
লোভে কম্পমান।

গুপী। কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ ?
কোন্ খানে তোর স্থান ?



ইন্‌কাম-ট্যাক্স ইন্‌সিওরেন্স
বাজার খরচ মোটা,
গয়লা মুদি ওষুধ-বিষুধ
এটা সেটা ওটা।
ভাবনা ছেড়ে করোনারী
থ্রম্বোসিসের কোলে
এক নিমেষেই প্রেমাবেশে
পড়তে চাস কি ঢলে?
কাছে এসে মধুর হেসে
বলে তখন প্রাণ।
"সেই দিকে মোর টান।"
[বিরতি]

বংশী। পণ্ডিত সেনগুপ্ত
বিদ্যালয়ের টুলের উপরে একদা ছিলেন সুপ্ত,
ব্যাকরণ 'ব্যা' করিছে হস্তে,
অর্কফলাটি ঝুলিছে মস্তে,
যতটা দীর্ঘে ততটা প্রস্থে
গাঁদা ফুলে অবলুপ্ত।
গুপী। কার অযতন-কম্পিত-কাঁচি
মাথায় ঠেকিল ত্রস্তে?
পণ্ডিতবর ঝটিতি জাগিল
নাসা গরজন পলকে ভাগিল
মন্দ মধুর মলয় লাগিল
টিকি-কর্তিত মস্তে।



বংশী। বিষম চমকি হেরিলেন গুরু
যদু নন্দীর আস্য,
বামহাতে শোভে কাটা টিকি তার,
ডান হাতে কাঁচি অতি ক্ষুরধার,
নষ্টামি ভরা ওষ্ঠে তাহার
দুষ্টামি মাখা হাস্য।

গুপী। চক্ষু করিয়া রক্তবর্ণ
কহিলেন গুরু ছাত্রে—
রে পাপাত্মা, রে দুষ্টাচার,
কেন কাটিলিরে টিকিটি আমার;
মারিয়া করিব পিঠ ছারখার
বেত্র মারিব গাত্রে।

বংশী। মধুর ভাষ্যে কহিলা নন্দী—
"ভো ব্যাকরণ চঞ্চু,
হায় হায় তুমি ভীষণ ভ্রান্ত
ক্রোধ চণ্ডালে হও হে ক্ষান্ত
আমি কাটি নাই ও টিকি প্রান্ত
কাটিয়াছে উহা পঞ্চু।"

গুপী। পঞ্চু তখনো হয়নি 'ফেরার'
ভগ্ন জানালা ডিঙ্গি
মারি মালকোঁচা চারিদিকে চায়
পণ্ডিত হাঁকে "এই দিকে আয়
বেত মারি তোর 'ফোস্কাব' গায়
হাড়-হাবাতিয়া ধিঙ্গি!"

বংশী। "দাড়ারে মূর্খ পড়া জিজ্ঞাসি
করিতেছি তোরে জব্দ,
আরে রে পিতার অতি কুপুত্র,
ভাঙ্গ রে ণত্ব-বিধান সূত্র
রূপ কর হা হা শব্দ!"

গুপী। পঞ্চু কহিল "হো হো হি হি
অ হো তদ্ধিৎ প্রত্যয়,
মা বিষীদত দুঃখ মা কুরু
ব্রহ্মতালুতে হাত দাও গুরু
করিয়াছে টিকি গজাইতে সুরু
ও যে অক্ষয় অব্যয়!!"

[বিরতি]



বংশী। রামুর ব্যাগ ছিল সার্টের পকেটেতে,
শ্যামুর হাত ছিল কাছে,
সহসা ট্রাম-কারে মিলন হল দোঁহে
না জানি কপালে কি আছে।
রামুর ব্যাগ বলে, "শ্যামুর হাত তুমি
এখনি দাও মোরে ছাড়ি।"
শ্যামুর হাত কহে, "রামুর ব্যাগ এসো
আমার কাছে চুপিসারি।"
রামুর ব্যাগ বলে,—"না—
আমি তোমার কাছে নাহি যাব।"
শ্যামুর হাত কহে, "বটে—
আমি তোমারে তবে কি না পাব?"

। রামুর ব্যাগ চাহে ছাড়াতে আপনারে
শ্যামুর হাত-মুঠি হতে।
শ্যামুর হাত চাহে রামুর ব্যাগটিরে
সাফাই করে কোনমতে।
শ্যামুর হাত বলে, "মিনতি করি ভাই
এবারে উঠে এসো দেখি।"
রামুর ব্যাগ কহে, "আ হা হা ওকি কর,
এখনি সরে যাও, একি!"
শ্যামুর হাত কহে, "না—
আমি তোমারে ছেড়ে নাহি যাব।"
রামুর ব্যাগ ভাবে, "হায়—
আমি কেমনে তবে ছাড়া পাব?"

বংশী। এমনি দুইজনে মিনতি করে দোঁহে
দোঁহারে সরাইতে চায়।
এ বলে "সর সর ছাড়িয়া দাও মোরে",
ও বলে "আয় কাছে আয়।"

সহসা একজন পুলিশ উপজিল,
দোঁহারে নিয়ে গেল ধরে,
অন্ধ কারাগারে বন্ধ করে দিল,
এ ওরে দোষারোপ করে—
রামুর ব্যাগ কহে "শোন রে হাঁদারাম,
কিছু ছিল না ক' ব্যাগে—!"
শ্যামুর হাত বলে "হায় রে গোমূর্খ,
কেন তা বলনিক' আগে ?"

[বিরতি]

গুপী। 'পাইনি কিছু'র দেশে আছে
একুশ তলা বাড়ী,
রাস্তা জোড়া পুলিশ ভ্যান ও
মিলিটারির গাড়ী,
চোর-বাজারে জিনিষ ভরা
ময়দা সুজি ধান,
মজুতদারের গুদামেতে
ধুতি শাড়ী থান,
ট্যাক্সি ফিটন রিক্সা গাড়ী
রাস্তাগুলো চষে,
সব থেকেও নেই কিছু সেই
'পাইনি কিছু'র দেশে

বংশী। ট্রাম গাড়ীতে লোক ধরে না,
লোক ধরে না বাসে,
রামুর পায়ে দাঁড়িয়ে শ্যামু
দামুর মুখে কাসে,
যদু ঘোষের পকেটেতে
মধু বোসের হাত—
মনি-ব্যাগ ও ফাউণ্টেনের
সাফাই বাজি-মাৎ।

একটি দিনের তরে হেথায়
দূরের পান্থ এসে
বুঝতে নারে কী নেই এই
'পাইনি কিছু'র দেশে।

গুপী। চৌমাথা আর তেমাথা আর
দু'এক মাথার ধারে
'ছে-ছ্যো-আনা' 'দো-ছ্যো আনা'
ফেরীরা হাঁক ছাড়ে,
বিকি-কিনির ছিনি-মিনি
চৌপদ্দিন রাত,
কেউ বা ফাঁপে কেউ বা কাঁপে
কেউ বা কুপোকাৎ,
পথের ধারে ঘুমিয়ে থাকা
রেফিউজিদের ঘেঁসে
ভি-আই-পি-দের মোটর ছোটে
হাওয়ার পরে ভেসে।

বংশী। গুদামেতে জিনিষ পচে
লক্ষ হাজার মণ,
দেশের লোকে পায় না খেতে
মজার কথা শোন—
ওষুধ ভেজাল, খাবার ভেজাল,
ভেজাল ঘি-এ তেলে,
বড় চোরে বেড়িয়ে বেড়ায়
ছোটরা যায় জেলে।
দেশবাসীরা কেঁদে মরে,
বিদেশীরা হাসে,
আমাদের এই অশ্রুভরা
'পাইনি কিছু'র দেশে।

শুপী। পথে বিষম ঠেলাঠেলি
হাটে দারুণ গোল,
ওরে কবি, এখান থেকে
পাত্‌তাড়ি তোর তোল্‌।
বাজে জিনিষ ফেল রে ছুড়ে
কমিয়ে নে তোর বোঝা,
খুঁজে নে তোর খাতাখানা
থাক আর সব খোঁজা,
পা চালিয়ে চলরে তবে
পৌছাবি দিন শেষে
তারায় ভরা আকাশ তলে
সব পেয়েছির দেশে ॥

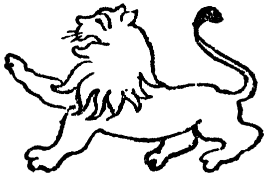
সুরাটে ইংরেজ সরকার এক নতুন কর বসালো ১৮৭৬ সালে। কার বাড়ীতে গরু মোষ ও ক'টা চরকা আছে তার হিসাব চাইল। নাগরিকরা তার প্রতিবাদে ১লা এপ্রিল হরতাল ঘোষণা করলো। ৪ঠা এপ্রিল সাধারণ মানুষ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের শান্ত করতে গিয়ে একটি ঢিলের আঘাতে আহত হলেন। ৫ই জনতা রেলস্টেশনে হামলা করলো এবং একটি কাপড়ের কল বন্ধ করে দিল। জনতা নগরের মধ্যে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও দু'জন ইংরাজকে তাড়া করলো। তাঁরা এক ডাক্তারখানায় আশ্রয় দিলেন। জনতা ডাক্তারখানায় হামলা করলো। এবার পুলিশ ও সৈন্য এসে জনতার উপর গুলি চালালো। দু-তিন জন মরলো, কয়েকজন আহত হল। ইংরেজ দু'জন, ক'জন পুলিশ ও সৈনিক জনতার ইষ্টক-বর্ষণে আহত হল। বৃটিশ আমলে এইটাই প্রথম হরতাল।



মন খারাপ

শ্রী গীতা চন্দ্র

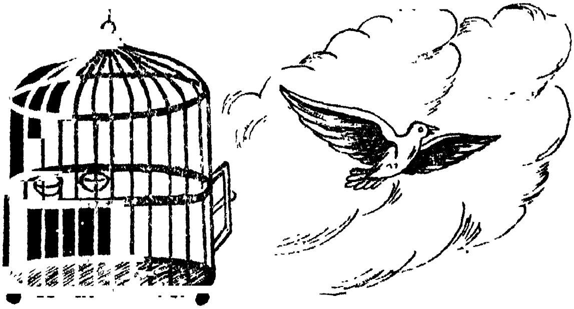
মনটা আমার বেজায় খারাপ
কিছু নাহি লাগছে ভাল,
সবুজ জিনিষ দেখছি হলুদ,
হলুদটা শ্রেফ কালো,
কালো জিনিষ লাগছে যে লাল।
লালটা যেন দেখছি নীল।
পিপঁড়েটাকে ভাবছি হাতী,
হাতীটাকে ভাবছি চিল।
বিড়াল ছানা বাঘ হয়ে যায়।
কুকুর হোল সিংহ মশাই।
সিংহ এসে বলছে আমায়—
চরণ ধুলি একটু যে চাই ॥



বলনু রেগে—বাঁদর ছেলে,
চরণ ধুলি সস্তা কিরে?
আবার যদি বলিস কথা
লাল করে কান দেব ছিঁড়ে ॥
এই না শুনে সিংহ মশায়
পালায়, বলে—বাপরে বাপ।
সবগুলি ভাই ঘটেছিল।
যখন ছিল মন খারাপ ॥
ভাবছ বুঝি মিথ্যে কথা,
এমন কথা যায় না শোনা?
সাক্ষী আছে মন্নু, টিপু,
আরো ক'জন যায় না গোনা।







টিয়া ডাক ✱ শ্রী সুকুমার দে সরকার

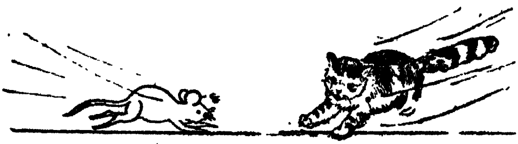
খাঁচাটা বেশ বড়সড়। খাঁচার লোহার শিকগুলো বেয়ে বেয়ে টিয়া পাখীটা চারদিক ঘুরে ঘুরে, শিকগুলো কামড়ে কামড়ে দেখে যে কোথাও কোনো শিকটাকে কামড়ে ভেঙে ফেলা যায় কি না। প্রতিদিন সকালে সূর্যি ওঠার আগে থেকেই মনে হয়—আজ, আজ নিশ্চয় সে পারবে। শহরের কাকগুলো কা-কা করে বাজার করতে যাওয়ার আগেই আসল টিয়া ডাক শুনিয়ে সে উড়ে চলে যাবে আকাশে আকাশে সবুজের বিদ্যুৎ খেলিয়ে। থাকগে শহুরে কাক আর চড়াই মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চুরি করে।

খাঁচার ভেতর টিয়া পাখিটা যেন হঠাৎ সবুজের ঝলমল। গলায় তার কিছু লাল-হলুদে মেশানো একটা রঙের বালা, লম্বা ল্যাজটা খাঁচার তলা অবধি ঝাটানো। আর ঠোঁটটা পাকা লঙ্কার মত টুকটুকে লাল।

খাঁচার লোহার শিকগুলো কিন্তু বড়ই শক্ত। হেলেও না, নোয়ায়ও।

—শুনছিস? টিয়্যাঁ-টিয়্যাঁ ভাষায় নেংটি ইঁদুরটাকে সে বলল—দে না ভাই, শিকগুলো কেটে।

রাতটা বোধহয় অন্ধকার নয়। কোন একটা আকাশে বোধহয় আজও পাকা বাতাবী লেবুটির মত টুসটুসে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু দত্যির মত লম্বা



লম্বা বাড়িগুলোর পাহারা পার হয়ে চাঁদের আলোও খাঁচাটার কাছে আসতে সমীহ করেছে। হাসি আর হাতছানিটুকু শুধু জানান দেওয়া আছে—আমি আছি। আছি রে—আছি!

আসল টিয়া-সংস্কৃত ভাষা নেংটি ইঁদুর বুঝতে পারবে কেন? খাঁচার শিকগুলোর ভেতর মুখ গলিয়ে হাতের কাছে পাওয়া টিয়া পাখির ছোলাগুলোয় ভাগ বসাতে বসাতে নেংটি বলল—হু'পেয়ে মানুষগুলোর মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকে। ট্যাঁ ট্যাঁ টিয়াপাখি পুষবে, ছোলা খেতে দেবে অথচ কিছুতেই ইঁদুর পুষবে না। ইঁদুরইতো ভগবানের সব চেয়ে ভাল জানোয়ার। তা নয়, বরং মেয়েগুলো ইঁদুর দেখলেই তিড়িং মিড়িং লাফাতে শুরু করে দেবে। এত আহ্লাদ কেন রে বাপু? হু'দণ্ড দাঁড়িয়ে ধান ছোলা দিলেই হয়। তা নয়, পুষবে হলো আর টিয়া পাখী। টিয়াগুলো তো উড়েই খেতে পারে—ধানের ডগার শিষ, গাছের গায়ের ফলন্ত কচি-কচি ছোলা, আরও কত কি। ইঁদুরেরা তো উড়তে পারে না।

ওড়ার কথা। টিয়া পাখিটা ভাবে, আহা একবার যদি খাঁচার শিকগুলো কাটা যেত, সে ঠিক উড়ে গিয়ে আকাশটা খুঁজে নিত। তারপরে? তারপরে দূরে—সেই কত দূরে সোঁদর বনে, নদী সেখানে হাজার ধারায় নেচে-কুঁদে খিলখিলিয়ে ছুটে চলেছে, সুঁদূরী আর গরাণ বনে যেখানে বুনো মৌমাছিরা তাদের দুর্গ গড়েছে, সে আর কত দূরে?

ভোরের পুবে রূপোলী আস্তর দেওয়া হয়েছে সবে। একটা বনমোরগ খুশিতে ভরে ডাকছে, আসুন আসুন দিনমণি আসুন। সেই নিস্তব্ধ রাত আর দিনের মেশার মুহূর্তে বনমোরগের চাঁচা চেঁচান ডাকটাও কি মিষ্টি লাগে। তারপর বন কাঁপিয়ে গুরুগম্ভীর সোঁদর বনের বাঘের ডাক। বুকের ভেতর শুদ্ধ গুরগুরিয়ে ওঠে।

টিয়া পাখিটা এবার আরও মিষ্টি করে বলল—দে না ভাই নেংটি, একবারটি একটা শিক কেটে দে। তোদের দাঁতে তো অনেক ধার।

দুটো ছোট ছোট থাবা দিয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে চিকচিক করে নেংটি ইঁদুরটা বলল—দে দেখি আর দুটো ছোলা এগিয়ে।

টিয়াটা আহ্লাদে নাচতে নাচতে বলে উঠল—হ্যাঁ ভাই, এইবার শিকগুলো কাটতে লেগে যা।

তার ল্যাজের ঝাপটায়, তাকে খেতে দেওয়া একটা পাকা লঙ্কা ইঁদুরটার মুখের গোড়ায় এসে পড়ল।

নেংটি বলল—ইয়ার্কি হচ্ছে? ছ্যোঃ।

এমন সময়—ম্যাও।

হুলো ভায়ার গোদা ল্যাজটা ওপরে খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখে একেবারে দধীচি মুনির মিষ্টি চাউনি।

নেংটি ইঁদুর তুড়ুক করে একেবারে হাওয়া।

হুলো ভায়া খানিকক্ষণ একটু উঁচুতে টাঙানো টিয়া পাখির খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে গোঁফটা চেটে নিল।

—দু'চক্ষে দেখতে পারিনা,—টিয়াটা বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠল। আহা ল্যাজের কি বাহার! তাও যদি টিয়াদের মত হত।

পিঠটা ফুলিয়ে, গায়ের রোঁয়াগুলো ঝেড়ে নিতে নিতে হুলো বলল, 'হ্যাঁ ভাই টিয়া পাখি, কি ছাই দিনরাত একটা ছোট্ট ঘরের ভিতর বসে থাকিস? একটু বেরিয়ে নেমে আয় না, কত ধম্মের কথা বলব। আর জ্যান্ত তাজা মুড় মুড়ে হাড়······

—বেরো! বেরো!—টিয়াটা চেঁচিয়ে ওঠে।

এমন সময় বাড়ির গিন্নীমার গলা শোনা যায়—দেখতো পাখিটা চেঁচাচ্ছে কেন? নিশ্চয় বেড়ালটা খাঁচার ধারে গেছে। ইঁদুর মারার মুরোদ নেই, টিয়া ধরার শখ, একে তো নেংটি ইঁদুরের জ্বালায় মরছি। আবার ধেড়ে ইঁদুরের গর্ত হয়েছে উঠোনো। যা তো বাবা সনাতন, বেড়ালটাকে তাড়িয়ে পাখিটাকে একটু জল ছোলা দিয়ে আয়।

সেইদিন রাতে টিয়াটার কপাল খুলে গিয়েছিল। একটা কিছু মন প্রাণ দিয়ে বিশেষ করে চাইলে সে অভাবটা না মিটে পারে না।

হুলোটাকে তাড়িয়ে টিয়া পাখির খাঁচায় জল ছোলা দিয়ে সনাতন সেদিন ঘুম-চোখে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল।

শেষ রাত। বগী থালার প্রকাণ্ড চাঁদটা নিভু-নিভু লণ্ঠনের মত মুখ করে, বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে হেলে পড়েছে। আর কিছু পরেই আকাশ উঠবে ঝকমকিয়ে। আর সেই আকাশে চিলের ডানা ভেসে যাবে। ছোট্ট হতে হতে ছোট্ট। আঃ, ডানায় বাতাসের স্বাদ, ঢেউ খেলিয়ে ছুটে যাওয়া—যেখানে হাজার-মুখো নদী কলকলিয়ে ছুটে চলেছে।

টিয়াটা ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ দেখল খাঁচার একটা জায়গায় যেন শিকগুলো নেই আর সেইখানটা দিয়ে এক চৌকো চাঁদের আলো এসে ঢুকছে।

যুদ্ধের কোন বন্দী যদি হঠাৎ দেখে যে জেলের খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো হাতছানি দিচ্ছে তখন বুলেটের ভয় কতটা তাকে আটকে রাখে গো ?

টিয়াটা এক লাফে বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওমা! বিষাদের পর বিষাদ। হুড়মুড়িয়ে ঝটপট করতে করতে মাটিতে এসে পড়ল টিয়া। বহুদিনের বন্দী অনভ্যাসে সে উড়তে ভুলে গেছে। মাটির থেকে লাফিয়ে উঠে আর একবার সে ডানা ঝাপ্‌টে লাফিয়ে উঠল। ওই তো, ওই তো চাদের ম্লান মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এবার খানিকটা উঠেছিল সে, কিন্তু আবার লটপটিয়ে উঠোনে এসে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে সে দেখল একটু দূরে নীলকান্ত মণির মত দুটো চোখ জ্বলছে। টিয়াটার ঝটাপটির শব্দে হুলোমশাই জেগে উঠে ওঁৎ পেতেছেন নিঃশব্দে।

ছুট, ছুট, নড়বড়ে ছুট। শিকারী বেড়ালের পেছু-ধাওয়া পায়ে আওয়াজ ওঠে না। হুলোমশাই লাফ মেরেছেন। মুখে গোঁফ চোমরানো খুশি। আর একবার প্রাণপণে ডানা চালিয়ে হুলোর লাফের ওপর উড়ো লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল টিয়া পাখিটা, আবার পড়ল মাটিতে। হুলো ভায়া ধনুকের মত পিঠটা বেঁকিয়ে কান খাড়া করে, ল্যাজ তুলে লাফ মারল আর কি! এবার আর বাঁচা অসম্ভব। এমন সময় সামনেই একটা গর্ত। টিয়াটার আর ভাববার সময় ছিল না। চট করে সে ঢুকে পড়ল গর্তটার ভেতর। হুলোর থাবাটা তার লম্বা ল্যাজের রগ ঘেঁষে কেটে গেল।

হাঁপাচ্ছিল টিয়াটা। সমস্ত শরীর তার তখনও থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু আপাতত তো বাঁচা গেছে। মন প্রাণ দিয়ে বিশেষ করে খাঁচার থেকে মুক্তি পেয়েচে সে, আরও মনে প্রাণে চাইলে কি হুলোর নজর এড়াতে পারবে না ?

হঠাৎ সেই সুড়ঙ্গের ভেতর কি যেন খস খস করে উঠল আর টিয়াটা সভয়ে দেখল সুড়ঙ্গের ভেতর দুটো প্রবালের মত লাল চোখ

জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে আসছে। ধেড়ে ইঁদুর। পারলে পাখি মারতে একটু বাধে না তাদের।

বাইরে সুড়ঙ্গের মুখে হুলো বেড়াল আর পেছনে হুলো ইঁদুর। ক্যাঁ-আ করে চেঁচিয়ে উঠে, লাফ মেরেছে সামনের হুলো বেড়াল আর পেছুনের হুলো ইঁদুর। কি যেন কি হয়ে গেল ওই তিনটে একসঙ্গে লাফানোর ফলে। হুলো বেড়াল পড়ল হুলো ইঁদুরের ঘাড়ে। আর নিচের থেকে একটা দমকা হাওয়া যেন লুফে নিল টিয়াটাকে।

ডানা মেলে দিল টিয়া। ল্যাজে ঈষৎ মোচড় দিয়ে হাওয়ায় পাক খেয়ে গোঁৎ মেরে ওঠা ঘুড়ির মত সে ওপরে উঠে যেতে লাগল। সাঁতার কখনও কেউ ভোলে? চাঁদের লাল মুখ তখন ফ্যাকাশে রূপোলী হয়ে এসেছে। অনুকূল হাওয়ায় ঢেউ খেলিয়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছে টিয়া। বাতাসে কি পাকা ধানের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে সুঁদুরী গরাণ বনের ভেতর বয়ে যাওয়া হাজার ধারা ভৈরব নদীর ঘ্রাণ মিশে নেই?

মনের ভেতরের গভীর আনন্দে টিয়াটা ডেকে উঠল, টিয়াদের যাযাবর যাত্রা ডাক—টিয়া-টিয়া-টিয়া।

সিপাহীযুদ্ধের আগে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে এদেশে সাতবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে ১৫ লাখ লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়। পরের পঞ্চাশ বছরে চব্বিশবার দুর্ভিক্ষ হয়, তার ফলে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়।



এসো এসো নিধে এসো, সিধে কেন দাঁড়িয়ে ?
খিদে যদি পেয়ে থাকে, এসো আগ বাড়িয়ে ।
ভাতের জোগাড় নেই, তাই বুঝি ঘাবড়ে
থমকে দাঁড়িয়ে গেছ ?   কী যে পরিতাপ রে !
ভাত নেই, রুটি আছে শাক-পাতা সঙ্গে,
ভাতের নামটি কেন নেবে আর বঙ্গে ?
পেটে খিদে, খুঁৎ খুঁৎ বৃথা কর, দূর ছাই !
কোন্ দিন পথে পড়ে যাবে বুঝি মূর্ছাই ।
দেখ না আমার নেই ওসব বালাই রে,
খিদে পেলে গুচ্ছার যা পাই তা খাই রে !
দু'চার দিস্তে রুটি, না দাও ত—দু'খানা,
পেটে কিছু থাকা চাই, কদাপিও ভুখা না ।
পেট ভরে যায় ঠিকই, মিছে বলে ফল নাই,
কল থেকে ঢক্ ঢক্ কষে লোনা জল খাই ।
ঐ তো চেহারাখানি, জল-রুটি না খেয়ে,
শুধু খেয়ে তেলেভাজা, কাপ কতো চা খেয়ে !
এখনো পাচ্ছ রুটি, এর পরে পাবে কি ?
ফিরে আর পাবে বলো সেই দিন সাবেকী ?
কাঁচকলা খাও—বলা আর নয় ঠাট্টা,
সরকারী খানা ওটা, টাকায় তা আটটা ।
সহজে যা খেতে পাবে, সে তো জল হাওয়া,
তারপর সার হবে—শুধু খাবি খাওয়া !



বংশধর * শ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

একটি সাবেকী চশমা, একখানি জরাজীর্ণ শাল, একটি পুরানো হাঁসের পেন, আর ছেঁড়া-খোঁড়া একপ্রস্থ মিল্‌টনের গ্রন্থাবলী।

রায়বাহাদুর গোলকপতি ধাড়া জিনিসগুলি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন।

বললেন,—লক্ষ টাকা দিলেও এই মহামূল্য জিনিসের দাম হয় না। কিন্তু বুঝতেই ত পারছেন, আমাদের ক্ষুদ্র পাঠাগার। এর না আছে পয়সা, না আছে লোকবল। কাজেই···

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন,—এই ঐশ্বর্য কি কেউ হাতছাড়া করে? নেহাৎ হতভাগ্য আমি, তাই এসব নিয়ে পথে বেরিয়েছি। এ নিয়ে দাম-দস্তুর করতেই আমার লজ্জা করছে। যা আপনারা সঙ্গত মনে করবেন···

ধাড়া মশায় বললেন,—আপনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাক্ষাৎ বংশধর, তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র, আপনাকে আমাদের মাথায় করে রাখা উচিত। তা আমরা আপনাকে পাঁচশো···

—যথেষ্ট, যথেষ্ট, বলে ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে গেলেন। বললেন,—আচ্ছা, রইল তাহলে জিনিসগুলো। আমি সামনের সোমবার সন্ধ্যায় ঠিক এই সময় আপনার সঙ্গে দেখা করব।

রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—যে আজ্ঞে। তবে ইচ্ছা করলে

আপনি রবিবারেও আসতে পারেন। আমি সকালে বাড়ীতেই থাকি। সকালেই সবচেয়ে ভালো, তখন লোকের ভীড় থাকে না।

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বনগ্রাম মধুমিলন পাঠাগারের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা উৎসব আর কয়েকদিন পরেই মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হবে।

মাইকেল মধুসূদন যখন কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা করছেন, তখন একবার বনগ্রামে এসেছিলেন তিনি। সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্যেই স্থাপিত হয় এই পাঠাগার।

সেই পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী, কাজেই বুঝতে পারছ, আয়োজন খুব কম হবে না।

পাঠাগার সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর গোলকপতি ধাড়া হরদম কলকাতায় যাচ্ছেন, কখনো নামী বক্তাদের, কখনো অধিকতর নামী গাইয়ে ও অভিনেতাদের নিমন্ত্রণ করতে।

ইতিমধ্যে একদিন এসে হাজির হলেন তাঁর কাছে দামোদর মোহন দত্ত—মাইকেলের একমাত্র জীবিত বংশধর। তাঁর খুড়তুত ভাই কুঞ্জবিহারীর ছেলে।

চেহারা দেখেই ধাড়া মশায় বুঝলেন, এর জন্ম নির্ঘাত মাইকেলের বংশে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চুল···

সশ্রদ্ধ আনন্দে কিনে নিলেন তিনি মধুসূদনের বই, চশমা, কলম ও শাল। এই কলম দিয়ে তিনি লিখেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্য, আর এই শাল তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর···

শুনেই রোমাঞ্চিত হলেন ধাড়া মশায়। মাত্র পাঁচশো টাকায় এই অমূল্য সম্পদ পেয়ে এত খুসি হলেন যে বিষয়টা সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রচার করে দিলেন তিনি।

রবিবার সকালে দামোদর মোহন দত্ত টাকা নিয়ে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রায়বাহাদুরের ঘরে এসে ঢুকলেন প্রফেসার ধনঞ্জয় ভৌমিক।

রায়বাহাদুরের বাল্যবন্ধু, মাইকেল-ভক্ত এই বৃদ্ধ অধ্যাপক কাগজের

বিবরণ পড়েই বনগ্রামে ছুটে এসেছেন মাইকেলের কলম, শাল, আর পড়া বই দেখতে।

তাঁকে দেখে ধাড়া মশায় বললেন,—ইস, ঠিক দুটি মিনিটের জন্যে হারালে মস্ত একটা সুযোগ। এই বেরিয়ে গেলেন ডি. এম. দত্ত, মানে দামোদর মোহন দত্ত, মাইকেলের···

—কে? যে লোকটি এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল?

—হ্যাঁ। চেহারা দেখে বুঝলে না?

—বুঝি নি আবার? এই লোকটিকেই দেখেছিলাম মাস দুই আগে বারুইপুর বঙ্কিমচন্দ্র পাঠাগারে।

—তা ত দেখবেই। অত বড় সাহিত্য-সাধকের বংশের ছেলে!

—সেখানে উনি কিন্তু হাজির হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ দৌহিত্র বলে। একটা হার্মোনিয়ম, একখানা বালাপোষ এবং একটি হুঁকো বেচে পাঁচশো টাকা বাগিয়েছিলেন উনি সেখান থেকেও।

—বলো কি হে? মহৎ মানুষদের নাম নিয়ে···

—বলি ভালো। হয়ত আর কোথাও উনি হাজির হয়েছেন রামমোহনের প্রপৌত্র বা বিদ্যাসাগরের ভাগ্নে সেজে। অর্থাৎ এই হল ওঁর ব্যবসা!

ময়মনসিং-এর হাজং ও গারোদের মধ্যে দরবেশ করম শা-এর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর ছেলে টিপু স্থানীয় জমিদারদের অনাচার সইতে না পেরে সাতশো শিষ্য নিয়ে শেরপুরের জমিদার বাড়ী লুঠ করে। তখনকার মত গবর্মেণ্টের চেষ্টায় একটা সুবন্দোবস্ত হয়। তাতে আদিবাসীরা খুসি হতে পারে নি। আট বছর পরে তারা ক্ষেপে ওঠে ও শেরপুর নগর লুঠ করে। ব্যাপকভাবে সৈন্য আমদানি করে তাদের দমন করা হয়। সে ১৮২৫ ও ১৮৩৩ সালের ঘটনা। করম শা-এর শিষ্যদের বলা হতো—পাগলপন্থী।

ছড়া * শ্রী হরি গঙ্গোপাধ্যায়

জওয়ান

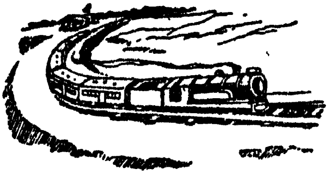
আমাদের জওয়ান
সর্বদা আগুয়ান
ভয় নেই মনেতে,
জলে, ডাঙ্গায়, বনেতে
প্রাণ দিয়ে লড়ে,
কেউ কেউ মরে—
তাতে নেই ভয়
জানে হবে জয়।
ভারতমা'র ছেলে
শত্রু কাছে পেলে
লড়ে দেয় হারিয়ে
তারা যায় পালিয়ে।
লড়াই শেষ হয়
ভারতের হয় জয়।





গোবর গণেশ

গোবর গণেশ দাদা,
খান বেশ গাদা গাদা;
তা ছাড়া বাঁধেন ছাঁদা,
দেখলে লাগে ধাঁধা।
জামা কাপড় সাদা,
জুতোর ফিতে বাঁধা।
চলেন যেন হাঁদা—
মুখটি কাঁদা কাঁদা।



মনের আড়ালে

অমলশঙ্কর রায়

মানুষের মনটা বড়ই রহস্যময়।

মনের প্রকৃতি বা গতিবিধি মানুষের কাছে অনেক খানিই অজানা। মানুষ অনেক সময়েই এমন কাজ করে, যে কাজ সে কেন করল সে সম্বন্ধে সে পরিষ্কার ভাবে বুঝে উঠতে পারে না।

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক খুব আমুদে। কিন্তু তাঁকে যদি কেউ সিনেমায় যেতে বলে। তাহলে তিনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

ভারী অদ্ভুত লাগল তাঁর ঐ সিনেমা ভীতি। ভদ্রলোক বললেন, 'মশাই' সব চাইতে বিপদ হয় যখন কেউ বলেন সিনেমায় যেতে হবে।' 'আমিও আবদার ধরি, আগে বল সিনেমার গল্পটা তারপর বলব, আমি যাব কি না।' 'তার মানে? সিনেমার গল্পটা আমি জানব কোথা থেকে? আমি কি দেখেছি, না কোন বইয়ে পড়েছি?' 'আগে খবর নেও গল্পটা কি নিয়ে, তারপর যাব কি না ঠিক করা যাবে।

ভদ্রলোক নিজেই খোঁজ নেন, ছায়াছবিটি মিলনান্ত না বিয়োগান্ত আর গল্পটি যদি হাসির হয় ও কাঁদাকাটির চিত্র কম থাকে, তাহলেই তিনি দেখতে যাবেন নইলে নয়।

ভারী অদ্ভুত কথা।

প্রশ্ন করলাম, 'এর কি কোন কারণ খুঁজে পান না আপনি?

ভদ্রলোক আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, 'বলুন তো কি হতে পারে এর কারণ?'

প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি কি ছেলেবেলায় কোন কারণে ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন?'



ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, 'একটা খুব করুণ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল।'

'শুনতে পারি ?'

ভদ্রলোক সুরু করলেন 'শুনুন তাহলে, আমার বয়েস তখন, শুনেছি, পাঁচ কি ছয় হবে। আমার বাবা, মা, আমার ছোট বোন ও আমি মেলের একটা কামরায় বসে রয়েছি। আমার বাবা ছিলেন রেলবিভাগের একজন বড় অফিসার। আমরা যাব দেওঘরে বেড়াতে। আমাদের গাড়ীটা স্টেশনের একটা সাইডিং-এ রাখা ছিল। মেল-ট্রেণ এলে গাড়ীটা আমাদের মেল-ট্রেণের সঙ্গে জুড়ে দেবে, আমাদের কোয়ার্টার্সটা ছিল স্টেশনের ঠিক পাশেই। মার হঠাৎ মনে পড়ল, বাড়ীতে কি যেন ফেলে এসেছেন। সেজন্য যেমনি গাড়ীর পাদানে নেমেছেন, অমনি সানটিং ইঞ্জিন এসে আমাদের গাড়ীটার সঙ্গে জুড়তে সুরু করেছে—ওটাকে অন্য কোন লাইনে টেনে নিয়ে যাবে বলে। আমাদের গাড়ীটা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল। মা ছিটকে পড়লেন নীচে,—একেবারে গাড়ীর চাকার তলায়। সকলে হৈ হৈ করে উঠল। আমি জানালা দিয়ে মাথা নীচু করে দেখলাম। রক্ত থৈ থৈ করছে। আমাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জানালা থেকে।'

ভদ্রলোক থামলেন। মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমি শুনছিলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'বহু বছর কেটে গেছে। এখন মার মুখখানাও মনে পড়ে না। তবে এখন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনতে কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করি। করুণ দৃশ্য দেখতে পারি না।'

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।



হালুম বাঘের রাগ * শ্রী সুবীর চট্টোপাধ্যায়

সোঁদর বনের জলায় থাকেন
হালুম হালুম বাঘ।
আছেন সুখে, হাস্য মুখে
করেন না কো রাগ ॥
সে দিন তিনি ঘুমিয়ে আছেন পাতার বিছানায়
এমন সময় কচি খোকার গন্ধ পাওয়া যায়
নোলা দিয়ে একবাটি জল
গড়িয়ে পড়ে ভুমে।
ব্যাঘ্র মশাই ব্যাঘ্র হলেন,
ব্যাঘাত হল ঘুমে ॥

বাঘ। হালুম হালুম হাই—
খোকার গন্ধ পাই
থাবাখানায় বাগিয়ে ধরে
টপাং করে খাই।



খোকা। শুভ সকাল হালুম হালুম,
পেন্নাম হই মামা।
তোমার জন্যে নিয়ে এলাম
কচি ঘাস এক ধামা।
দেখতে এলাম তোমায় রাজা,
এই মোর নজরাণা
দয়া করে গ্রহণ কর;
শুনবো নাকো মানা।

বাঘ। হালুম, হালুম, হি—
অতি সাহস! আমার সাথে
করিস ইয়ার্কি!
দাঁড়া তবে দেখাই মজা,—
আমি ইয়ার কি?
ঘাসগুলো তুই খা শয়তান,
তোকেই খাব আমি।
রাজা দেখতে আসার খোকা,
এই হল প্রণামি।



খোকা। সে তো বটেই, সে তো বটেই
তুমি খাবে মোরে
তাই শুনে যে আনন্দ আর
ধরছে না অন্তরে।
কিন্তু মামু, রেওয়ার রাজের
শ্রীমান সাদা বাঘ
এ খবরটা জানলে পরে
করবে দারুণ রাগ।
রেওয়ার রাজের ব্যাঘ্রমশাই বললে আমায় কাল
আমায় দিয়ে রাঁধবে নাকি চচ্চড়ি আর ডাল।

বাঘ। হালুম, হালুম, হান্
বটে বটে এমন কথা
কোথায় সে শয়তান?
এক থাবলে আমি যে তার
ছিঁড়েই নেব কান।
হালুম, হালুম, হল্
সেথায় নিয়ে চল।

এই না বলে বাঘ বাবাজি খোকায় নিয়ে ঘাড়ে
পশুশালায় চলে এলেন, রাতের অন্ধকারে।
লুকিয়ে ছিলো মানুষগুলো, বেজায় পাজি ওরা
গুলি মেরে ব্যাঘ্ররাজের ঠ্যাং করল খোঁড়া।
তার পরেতে খাঁচায় পুরে আটকে দিল তাকে
রেগে আগুন বাঘ বাহাদুর 'হালুম, হালুম' ডাকে।



শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

॥ এক ॥

একশো বছর আগের কথা।

মোগল বাদশাহের রাজত্ব শেষ হয়েছে। বাহাদুর শা ইংরেজের বন্দী হয়েছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাঁতিয়া টোপী ও নানা সাহেবের খবর নেই। নেতৃত্বহীন সিপাহীদের শায়েস্তা করছে ইংরেজ সেনানায়ক ও শাসনকর্তারা।

কর্নেল নীল বারাণসীর গ্রামে গ্রামে গোরা সৈন্য ছেড়ে দিয়েছে, তারা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই সিপাহী বলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট বালকেরাও বাদ যাচ্ছে না। কাশী থেকে প্রয়াগের পথে দু' সারি গাছের ডালে ডালে শুধু মৃতদেহ ঝুলছে।—বালক বৃদ্ধ নারী কেউ বাদ নেই। হাজার বছর আগের তৈমুর ও চেঙ্গিজের প্রেতাত্মা নতুনরূপে বুঝি এবার হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হয়েছে। সারা দেশ থম থম করছে।

এমন দিনে ঘর ছেড়ে যে পথে বেরুলো সে যে আবার ঘরে ফিরবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু মানুষ পথ চলে।

উত্তর বিহারের যে বনভূমি ছড়িয়ে আছে উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত অবধি, হিমালয়ের নিম্নভূমি থেকে নদীর জলধারার মত এই সবুজ পাতার সমারোহ নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। দুর্ভেদ্য এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথ ধূসর রেখার মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলে সে পথে মানুষ চলে না। আজ সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন এক প্রৌঢ় এক বালকের হাত ধরে

পথিকের আধময়লা গ্রাম্য বেশ, কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌর দেহ দেখলে মনে হয় পথিক কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ। ছেলেটিও সাধারণ ধুলো-মাখা গাঁয়ের ছেলে নয়। এভাবে পথ চলতে সে অভ্যস্ত নয়, বার বার সে হোঁচট খাচ্ছে, প্রৌঢ় শক্ত করে তার হাত ধরে আছে। ঠোক্কর খেলেও বালক পড়ে যাচ্ছে না। বালক একবার করে ঠোক্কর খাচ্ছে আর প্রৌঢ় বলছেন—দেখে চল। দেখে চল।

বালক দেখেই চলছে, তবে পথ নয় হলুদ ফুল আর প্রজাপতির রঙের খেলা। বনের সেই দিকটা হলুদ ফুলে ভরে গেছে, সাদা কালো লাল রঙের চিত্র-বিচিত্র ডানা মেলে প্রজাপতির দল ঘুরছে সেই ফুলের মাঝে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে রোদের ঝিকিমিকি, ছেলেটির চোখ পড়ে আছে সেই দিকে, পথের দিকে নজর নেই।

বালক তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না, প্রৌঢ় সেজন্যে ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। বেলা বেড়ে চলেছে।

একটি খাদের পাশ দিয়ে পথ ঘুরে গেছে। বালক বললো—বাবা, একটু বসো।

পিতা পুত্রের মুখের পানে তাকালেন, তারপর সামনেই একটি গাছের নীচে বসলেন।

একদিকে খাদ, আরেক দিকে পাহাড়। পাহাড় আকাশের অর্ধেক আড়াল করে দিয়েছে। খাদের পানে তাকালে অনেক দূর অবধি চোখে পড়ে। গাছগুলো ক্রমেই ছোট হয়ে হয়ে মাঠের সঙ্গে যেন মিশিয়ে গেছে। বালক কোন এক সময় বললো—বাবা, আমরা কতদূর যাব?

প্রৌঢ় পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—সন্ধ্যা বেলায় গাঁয়ে গিয়ে পৌছাবো।

—সেখানে ফিরিঙ্গীরা নেই?

—না, ফিরিঙ্গীরা এতো দূরে আসবে কেমন করে?

—ফিরিঙ্গীরা বড্ড পাজী, না বাবা? শুধু শুধু মানুষ খুন করে।

পিতা কিছু বলেন না, তাঁর মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে।

বালক বললো—বাবা, খিদে পেয়েছে।

—এখানে তো জল নেই বাবা, আরেকটু চল, একটা ঝর্ণার ধারে বসে হাতমুখ ধুয়ে খাবো। চল, এবার উঠে পড়ি, তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পৌছাতে হবে।

—এখনি ?

—হ্যাঁ। ঝর্ণার ধারে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে খানিক জিরুবো।

—ঝর্ণা কতদূরে বাবা ?

—এইতো পাহাড়টা পার হলেই।

বালক উঠে দাঁড়ালো। বললো—বাবা, আর চলতে ইচ্ছা করছে না।

—কাঁধে উঠবি ?

—না, তোমার কষ্ট হবে।

পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে পিতা হাসলেন। বললেন—এবার গাঁ থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে নোব, কি বলিস ?

—তোমার কাছে যে টাকা নেই বললে ?

কথাটা সত্যি। ফিরিঙ্গীদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, মধ্যরাত্রে একবস্ত্রে আধঘুমন্ত পুত্রকে কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, তখন অর্থের কথা মনে উঠেছিল কিন্তু নেবার অবকাশ ছিল না। পুত্র সে কথা জানে।

দু'জনে এগিয়ে চললো।

তিন চার দণ্ড চলার পর পাহাড় শেষ হলো, সূর্য মাথার উপর উঠলো। কিন্তু কোন ঝর্ণা তো দেখা গেল না।

বালক বললো—ঝর্ণা কোথায় বাবা ?

পিতা বললেন—আরেকটু গেলেই পাওয়া যাবে।

—আমি আর চলতে পারছি না।

—বেশ তো, তোমায় কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

পিতা অনায়াসে বালককে কাঁধে তুলে নিলেন। বললেন—তুমি আগে কাঁধে উঠলে আমরা এতক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে যেতাম।

বালক বললো—এতো বড় বন, আমি কি জানি।

প্রৌঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে চললেন।

কোন এক সময় সামনে উপত্যকা ভূমিতে একটা ক্ষীণ জলধারা চোখে পড়লো, রোদ পড়ে গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিক্‌মিক করছে। বালক বলে উঠলো—ওই যে বাবা, ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে।

পিতাও দেখতে পেয়েছিলেন। কোন সাড়া না দিয়ে আরও দ্রুত এগিয়ে চললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ঝর্ণার সামনে এসে পড়লো।

পুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে পিতা জলের ধারে এগুতে যাচ্ছেন এমন সময় একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একটা বরাহ তীরের মত ছুটে পাশ দিয়ে চলে গেল। বালক চমকে উঠে সভয়ে ডাকলো—বাবা!

পিতা পুত্রের পানে পিছন ফিরে তাকালেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি চিতাবাঘ লাফিয়ে পড়লো প্রৌঢ়ের ঘাড়ে। বাঘটি বরাহটিকে তাড়া করে আসছিল।

প্রৌঢ় এক ঝটকায় বাঘটিকে কাঁধ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। বাঘ কাঁধে কামড়ে ধরেছিল। বল্লমটা হাতে ছিল, প্রৌঢ় আপ্রাণ শক্তিতে বল্লমটা বিঁধিয়ে দিলেন বাঘের বুকে। এবার বাঘ কামড় ছেড়ে মাটিতে পড়লো। প্রৌঢ় বল্লমসুদ্ধ বাঘটিকে গেঁথে ফেললেন মাটিতে। বাঘ অনেক ছটফট করলো, কিন্তু প্রৌঢ় শক্তিমান, তাঁর বল্লম এতটুকু কাঁপলো না।

চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাঘটি স্থির হয়ে গেল। প্রৌঢ় বল্লম খুলে নিলেন। তখন বাঘের কামড়ে তাঁর বাঁ কাঁধ থেকে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

বালক এতক্ষণ ভয়ে কাঁপছিল। প্রৌঢ় মাথা থেকে পাগ্‌ড়ি খুলে ছেলের হাতে দিলেন, বললেন—এখানটা শক্ত করে বাঁধো, রক্ত না ঝরে।

বালক পাগ্‌ড়ি দিয়ে পিতার ক্ষতস্থানটা শক্ত করে বাঁধবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অপটু হাতে বাঁধা ভালো হলো না। তার উপর বাঘের কামড় তো সহজ ক্ষত নয়, বালক রক্তক্ষরণ একেবারে বন্ধ করতে পারলো না।

বাঁ হাতখানি অক্ষম হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রৌঢ় সে কথা প্রকাশ করলেন না, ঝর্ণায় নেমে হাত ও মুখের রক্ত ধুয়ে নিল, আকণ্ঠ জলপান করলেন, তারপর পুত্রের পানে তাকিয়ে সহজস্বরে বললেন—হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমরা এখানে খেয়ে নিই।

—না বাবা, আমি আর কিছু খাব না, তুমি চল, আগে বন পার হয়ে যাই।

—বেশ তো, কিছু না খাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও, সন্ধ্যের আগে তো আর গাঁয়ে পৌছাবো না।

বালক এবার জলের ধারে এলো। হাত-মুখ ধুয়ে সেও আকণ্ঠ জলপান করলো। পিতা বললেন—কিছু খাও ?

—না বাবা, দেরি হয়ে যাবে, তুমি চল।

পিতা একখানি পাথরের উপর বসেছিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—চলো !

ক্রোশখানেক গিয়ে পথটা সমতল ভুমিতে এসে পড়েছে। সেইটুকু আসতেই পিতা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, পা টলছে মনে হলো, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

হঠাৎ চোখ ছুটি ধোঁয়া হয়ে গেল। প্রৌঢ় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

প্রৌঢ় পরক্ষণেই বসে পড়লেন সেই পথের উপর।

বালক ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকলো—বাবা ! বাবা !

প্রৌঢ় কোন জবাব দিলেন না। ধীরে ধীরে পথের পাশেই শুয়ে পড়লেন। বালক ত্রস্তে পিতার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো, বললে—বাবা, অমন করছ কেন ?

প্রৌঢ়ের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

স্থর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। নিথর ছায়া বনভূমির দিবালোক ম্লান করে তুলছে।

ত্রিশূল হাতে এক ভৈরবী চলছিল বনপথ ধরে। নির্ভয় মন্থর পদক্ষেপে আনমনে চলছিল।

খাদের পাশ দিয়ে পথের বাঁক ফিরেই ভৈরবীর নজরে পড়লো—ছুটি মানুষ পড়ে আছে পথের উপর। ওরা কারা ?

ভৈরবী এগিয়ে এলো। পথের পাশে এক প্রৌঢ় পড়ে আছে, এক বালক তার বুকের উপর মাথা দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ভৈরবী বালকের গায় হাত দিল, ডাকলো—এ লেড়কা ! এ বাচ্চু !

বালক চোখ মেললো। ভৈরবীকে দেখে বললো—কে ? তুমি কে ?

—ভয় নেই, আমি সন্ন্যাসিনী। তা তোমরা এই অবেলায় পথের ধারে পড়ে ঘুমুচ্ছো কেন ? রাত হলে বন পার হবে কেমন করে ?

—বাবার জন্য। বাবা···বাবা! বালক পিতার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভৈরবীর কেমন যেন সন্দেহ হলো, জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে তোমার বাবার?

—একটা বাঘ লাফিয়ে পড়েছিল বাবার ঘাড়ের উপর, এই যে কামড়ে দিয়েছে কাঁধে।

ভৈরবী এবার ব্যাপারটা বুঝলো। বালকের হাত ধরে বললো—তুমি এসো আমার সঙ্গে।

—বাবা উঠুক?

—তোমার বাবা এখন চলতে পারবেন না। আমার গ্রামে গিয়ে ওঁর জন্য পাল্‌কি পাঠিয়ে দোব। তুমি আমার সঙ্গে চল।

—বাবা এখানে একা থাকবেন?

—যাবেন কি করে, ওঁর তো কোন জ্ঞান নেই।

পিতা মারা গেছেন একথা বলতে ভৈরবীর কেমন যেন সঙ্কোচ হলো।

বালক বললে—আবার যদি বাঘ আসে?

—আর বাঘ কোথায়? একটা বাঘ ছিল, সে তো তোমার বাবা মেরে ফেলেছে।

—এই বনে আর বাঘ নেই?

—না, ওই একটাই এখানে ছিল।

—তুমি বাজে কথা বলছ।

—আমি ঠিক বলছি, এই বনের সব খবর আমি জানি।

—তুমি বুঝি এই বনেই থাকো?

—হ্যাঁ, বনের পাশে এক পাহাড়ে।

—তাহলে আর এখানে কোন ভয় নেই, না?

—না, বাঘ নেই তো ভয় কিসের।

—বাঘটা খুব জোরে কামড় দিয়েছিল বাবার কাঁধে। তা বাবাও ছাড়েনি, বল্লমের এক খোঁচায় একেবারে মাটিতে গেঁথে দিয়েছিল। বাবার সঙ্গে চালাকি! কত বড় বড় জোয়ান জোয়ান পালোয়ান বাবার একটা ধমক খেলে ভয়ে কাঁপতো। বাবা কি কম লোক নাকি!

—তোমার বাবা বুঝি খুব বড় পালোয়ান? তোমাদেব বাড়ী কোথায়? কোথা থেকে আসছো?

—সে আমি বলবো না, বাবা বারণ করে দিয়েছে।

—আচ্ছা, বলতে হবে না, তোমার বাবার মুখ থেকেই আমি শুনবো'খন পরে। তোমার নামটা কি বল?

—আমার নাম রামশঙ্কর চতুর্বেদী।

—তোমার বাবার নাম?

—পণ্ডিত মাধবরাম চতুর্বেদী, বাবা ছিলেন রাজপণ্ডিত।

—রাজপণ্ডিত? কোন্ রাজার পণ্ডিত?

—ওই যাঃ! ভুলে তোমাকে বলে ফেলেছি। বাবা কোন রাজার পণ্ডিত নয় গো, বাবা কিছু না, আমি ভুল বলেছি। বাবা শুধু মাধবরাম চতুর্বেদী।

—আর লুকানো চলবে না. আমি জেনে ফেলেছি তোমার বাবা রাজপণ্ডিত।

—বলছি তো না, ভুল বলেছি।

—আমি সন্ন্যাসী, আমাকে তোমার এতো ভয় কিসের?

—বল তাহলে তুমি আর কাউকে বলবে না? তাহলে চুপি চুপি তোমার কানে কানে বলবো।

—কেউ জানবে না, তুমি বল।

ভৈরবী নত হয়ে কানটা রামশঙ্করের দিকে বাড়িয়ে দিল। রামশঙ্কর ফিস্ ফিস্ করে বললো—প্রয়াগে অহল্যাবাই দুর্গে আমরা থাকতাম, বাবা ছিলেন রাজপণ্ডিত। অযোধ্যার নবাব বাবাকে ভালবাসতেন।

—তা তোমরা এখানে এই বনে এলে কেন?

—সে জান না বুঝি? ওই সব ফিরিঙ্গীরা এসেছে, কোম্পানি গো কোম্পানি! ওরা নবাবকে ধরে নিয়ে গেছে কলকাতায়, কত লোককে ফাঁসী দিয়েছে, বাড়ী ঘর লুঠ করেছে, গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। যারা পালিয়ে গেছে তারাই বেঁচে গেছে, আমরাও পালিয়ে এসেছি। ওরা বাবাকে ধরতে পারলে বাবাকেও ফাঁসী দিত।

—তা তোমার মা, ভাই বোন?

—মা স্বর্গে গেছেন, আমি তখন খুব ছোট। আর ভাই বোন আমার কেউ নেই, আমি একা।

—বুঝেছি। এসো। অন্ধকার হয়ে আসছে, এখনি আবার তোমার বাবার জন্য পাল্‌কি পাঠাতে হবে তো।

রামশঙ্করের হাত ধরে ভৈরবী অগ্রসর হলো।

বালক বললো—ঝুলিটা আনলে না? বারেঃ! ওর মধ্যে যে আমার পোষাক আছে।

প্রৌঢ়ের পাশে একটা ছোট ঝোলা পড়েছিল, ভৈরবী এসে সেটা তুলে নিয়ে গেল।

আকাশে চাঁদ ছিল, সন্ধ্যার অন্ধকার সেই বনভূমিকে জমাট করে তুলতে পারলো না। ভৈরবীর কাছে সে পথ পরিচিত। রামশংকরকে হাত ধরে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

ক্রোশখানেক পথ এসে এক পাহাড়ের কোলে তারা থামলো। সেখানে গাছপালা নেই, চাঁদের আলো স্পষ্ট হয়েছে। পরপর কয়েকখানি মাটির ঘর। একখানি ঘরের সামনে এসে সন্ন্যাসিনী দরজার ঝাঁপ খুললো, বললো—ভিতরে এসো।

—অন্ধকার যে?

—আলো জ্বালছি।

চকমকি ঠুকে সন্ন্যাসিনী, একটা পিদিম জ্বাললো। রামশংকর চারিপাশে তাকিয়ে দেখলো—ছোট একখানি ঘর, ছোট্ট একটা জানালা, একপাশে খড় বিছানো, চাল থেকে একটি বাঁশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার উপর গেরুয়া কাপড় ও কম্বল ঝুলছে, এক কোণে একটা জলের কলসী আর দু'চারটে মাটির বাসন। সে বলে উঠলো—ঘরখানা কি ছোট, এইখানে তুমি থাকো বুঝি?

—হ্যাঁ। আজ থেকে তুমিও এখানে থাকবে।

—এই বনের মাঝে এখানে একা থাকতে তোমার ভয় করে না?

—না। সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি? ভয় করলে আমি মা-কালীকে ডাকি, ভয় চলে যায়।

—তুমি মা-কালীর পূজো কর? মা-কালীর ভয়ে বাঘ-ভাল্লুক তোমার কাছে আসে না। আমিও তাহলে মা-কালীর পূজো করবো।

—বেশ তো, আমার কাছে থাকবে, আমি তোমায় শিখিয়ে দোব।

—বাবা যদি তোমার মত পূজো করতে জানতো, তাহলে বাবাকে আজ বাঘে কামড়াতে পারতো না। তা, তুমি বাবার জন্যে পাল্‌কী পাঠাবে না?

—এই যে এখনি গিয়ে খবর দিচ্ছি। তুমি একটু বসো, আমি বলে আসি।

সন্ন্যাসিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রামশংকর বাইরে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। বাইরে চাঁদের আলো আছে বটে, কিন্তু ভালোমত কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের কালো পাথরগুলো সব আলোটাকে যেন আড়াল করে আছে। কোথাও মানুষ নেই, আলো নেই, শুধু গাছ আর গাছ, বন আর পাহাড়। এতো গাছ আর এতো পাথর কোথা থেকে আসে?

সারাদিনের পথ চলার ক্লান্তিতে দশ বছরের ছেলে ঢুলতে থাকে। কোন একসময় রামশংকর খড়ের উপরেই এলিয়ে পড়ে।

সন্ন্যাসিনী যখন ফিরে এলো, রামশংকর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পিদিমের আলোটা এসে পড়েছে রামশংকরের মুখের উপর। সন্ন্যাসিনী খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেই মুখের পানে। এমনি আরেকখানি মুখ তার মনে ভেসে উঠলো। সন্ন্যাসিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর ধীরে ধীরে রামশংকরকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—শংকর, ওঠো খাবে না?

ঠিক সেই সময় ঘরের দরজায় আরেক সন্ন্যাসিনীকে দেখা গেল, সে প্রশ্ন করলো—ও কে রে দেবী?

সন্ন্যাসিনী পিছন ফিরে তাকালো, হেসে বললো—ছেলেটাকে কুড়িয়ে পেলাম বনের মাঝে।

—তুইও শেষে ছেলেধরা হলি? যাক্‌ ভৈরবী খুশি হবে।

—কি বলিস তার ঠিক নেই, দেখছিস না বামুনের ছেলে, পৈতা হয়েছে।

—ভৈরবীর কাছে বামুন আর শুদ্দুর, একটা পেলেই হলো।

কয়েক মিনিট দেবী সঙ্গিনীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার মুখে একটা দুর্ভাবনার ছায়া পড়লো।

॥ তিন ॥

সকালে রামশংকরের যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দিব্যি রোদ উঠেছে।

রামশংকর উঠে বসলো, খানিকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল সেই মাদুরের ওপর।

এক সাজী ফুল নিয়ে দেবী এসে ঢুকলো, হেসে বললো—কী, এই ঘুম ভাঙলো বুঝি? আর দেখ, আমি স্নান সেরে এলাম, ফুল তুলে নিয়ে এলাম।

রামশংকর কোন জবাব দিলে না।

—নাও, ওঠো, মুখ-হাত ধুয়ে নাও।

—আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

—কেন, কি হলো?

—আমার কান্না পাচ্ছে।

—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কান্না? হলো কি?

—বাবার কাছে যাবো।

—সে তো যাবেই, আগে মন্দিরে চল, মায়ের পূজো দেখবে।

—না, পূজো আমি দেখবো না, আমি আগে বাবার কাছে যাবো।

—ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই, তুমি না বামুনের ছেলে?

—আমি আগে বাবার কাছে যাবো।

রামশংকর কথাগুলি জোর দিয়ে বললো। তার চোখ ছলছল করে উঠলো। দেবী কাছে এসে তার কাঁধে একখানি হাত রেখে বললো—আমি যে সন্ন্যাসী ভাই, আমাকে আগে মায়ের পূজা করে তবে অন্য কাজ করতে হয়।

রামশংকরের চোখের জল গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে।

দেবী বললো—ছিঃ ছিঃ, এতো বড় ছেলে, অমন করে কখনো কাঁদে? লোকে দেখলে বলবে কি! এসো মুখ-হাত ধোবে চল।

ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপর বিশেষ গাছপালা নেই। উপরে খানিকটা সমতল জায়গা, তারই একপাশে একটি গুহা, মাথা নিচু করে সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হয়। ভিতরে একটি ছোট কালীমূর্তি। মূর্তির গায় ও পায় অনেক সিঁদুর লেপা। চোখ দুটি কটমট করছে। লাল জিভটা দগ্‌দগে। মূর্তির সামনে একটি পিদিম জ্বলছে। পিদিমের ম্লান আলোয় সে মূর্তি ভয় পাবার মত।

রামশংকরের হাত ধরে দেবী ভিতরে এলো। ফুলের চুব্‌ড়িটা সামনে নামিয়ে রেখে বললো—প্রণাম কর।

রামশংকর বললো—আমার ভয় করছে।

—ভয় কি? প্রণাম কর।

রামশংকর কোনমতে একটা প্রণাম সেরে নিয়ে বললো—আমি বাইরে যাই।

রামশংকর তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে নিশির সঙ্গে দেখা, বললো—কি গো খোকা, ঠাকুর দেখলে?

রামশংকর বললো—বাবা কি অন্ধকার! এ কি মন্দির নাকি? মন্দির কত বড় হয়, কত উঁচু হয়। এখানে ঢুকলে ভয় করে।

দেবী বাইরে এলো, বললো—তুমি বড় ভীতু। বামুন-পণ্ডিতের ছেলে এমন ভীতু হলে চলবে কেন? এতো বন-বাদাড় পার হয়ে এলে, এতো লড়াই দেখে এলে, এখনও এতো ভয়?

—বন কি অমন গর্তের মত ঝুপ্‌সি অন্ধকার নাকি?

—ছেলেটি কে রে দেবী?—খনখনে গলা শোনা গেল।



মন্দিরের পিছন থেকে দেখা দিল এক বৃদ্ধা। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখ রক্তিম, পরণে রক্তাম্বর, হাতে সিঁদুর-মাখানো একটা ত্রিশূল। মাথায় এলোমেলো জটা। তাকে দেখে রামশংকর আড়ষ্ট হয়ে গেল।

—প্রয়াগের রাজপণ্ডিত মাধবরামের ছেলে রামশংকর।

বৃদ্ধা সামনে এসে রামশংকরের আপাদমস্তক একবার দেখে নিলে, তারপর বললে—বয়স কত হবে?

—বছর দশেক।

—ভালই হয়েছে, মা নিয়ে এসেছেন।

এক নিমেষে দেবীর মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললো—ব্রাহ্মণ, উপনয়ন হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা বললো—দেখেছি, গলায় উপবীত রয়েছে। মায়ের ইচ্ছায় সবই ঠিক হয়ে যাবে। মা-ই ব্যবস্থা করবেন।

বৃদ্ধা গুহা-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

রামশংকর এবার দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে বললো—এ কে? রামায়ণের রাক্ষসী?

—ছিঃ ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই, ইনি আঁমাদের গুরু-মা, এই মন্দিরের ভৈরবী।

রামশংকর দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

নিশি ধীরে ধীরে দেবীকে বললো—চিনেছে ঠিকই, মন তো অন্তর্যামী।

পূজা শেষ হতে সময় লাগলো। শাঁখ যখন বাজলো তখন এক প্রহর কেটে গেছে।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে রামশংকর বললো—এবার গাঁয়ে যাবো তো বাবার কাছে?

—আগে কিছু খাবে না, না খেয়েই যাবে?—দেবী বললো।

—যাক্ সারাদিন না খেয়ে আমি খুব থাকতে পারি।

—তুমি পারো, কিন্তু আমি যে পারি না ভাই। দু'খানা চাপাটি খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে বেরুবো, সারাদিন ঘুরবো, কোন কষ্ট হবে না।

—তুমি এখন চাপাটি ভাজবে, খাবে, তারপর যাবে? বেশ, তুমি চাপাটি খাও, আমি একা চলে যাবো।

রামশংকর ঠিকরে চলে যাচ্ছিল, দেবী তার হাত ধরলো।

রামশংকর রুদ্ধকণ্ঠে বললো—হাত ছেড়ে দাও, আমি একা যাবো।

—ছিঃ ভাই, রাগ করতে আছে, আমি তো তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো বলছি। একা গেলে কোথায় আবার বনের মাঝে হারিয়ে যাবে।

রামশংকরের চোখ ছলছল করে উঠলো।

নিশি আসছিল পিছনে, বললো—কি হলো কি? চোখে জল কেন?

দেবী বললো—এখনি গাঁয়ে যাবে বাপকে দেখতে। তা বলেছি খেয়ে-দেয়ে একেবারে বেরুবো, তাতেই কান্না।

—তা কাঁদলে কি হবে? গেলে তো আর দেখা হবে না। বগ্যিবুড়োর ব্যাপার তো জানিস, একবার অসুখ-বিসুখ হলে তার সঙ্গে সবাইকার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। গেলে তা বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে আসবে।

—বাবার কি অসুখ হয়েছে নাকি?—রামশংকর বললো—বাঘে কামড়ে দিলে কি অসুখ হয়?

—চলতে-ফিরতে না পারলেই অসুখ—নিশি বললো—সে বাঘেই কামড়াক্ আর জ্বরেই হো হো করুক। যাওয়া-আসার হয়রানিই সার হবে।

পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনলে রামশংকর কাঁদবে, তাই দেবীই সকালে নিশিকে এই কথাগুলো শিখিয়ে দিয়েছিল। এবার সে শংকরকে বললো—শুনলে তো?

রামশংকর আর কিছু বলতে পারলো না।

নিশি দেবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললো—সকালে আমি ওদিকে গিয়েছিলাম, ওখানে মানুষের চিহ্ন নেই।

—জানোয়ারে টেনে নিয়ে গেছে রাত্তিরে—দেবী বললো।

—টেনে নিয়ে গেলে ঝোপ-ঝাড়ের উপর তো দাগ থাকবে, তা-ও কোথাও চোখে পড়লো না। মানুষটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

॥ চার ॥

চাপাটি ভাজতে ভাজতে দেবী রামশংকরকে গল্প বলে।—

এক ছিল রাণী, মস্ত তার রাজ্য। কত পাহাড়, কত বন, কত গ্রাম, পাহাড়ের মাথায় ছিল এক কেল্লা, সেই কেল্লায় রাণী থাকতেন। রাণীর ছেলেমেয়ে ছিল না, একটি ছেলেকে তিনি মানুষ করেছিলেন। প্রজারা রাণীকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু রাণীর বয়স কম, বিধবা। ফিরিঙ্গীরা দেখলো মস্ত সুবিধে। মেয়েমানুষ ভালো লড়াই করতে পারবে না, ভয়

দেখিয়ে ওর রাজ্যটুকু কেড়ে নেওয়া যাক্। বলে পাঠালো—মেয়েমানুষ, রাজ্য চালাতে পারবে না। আমরাই রাজকাজ চালাবো।

রাণী বললেন—তোমরা কে? তোমাদের আমি রাজ্য ছেড়ে দেব কেন?

ফিরিঙ্গীরা বললে—সহজে না দাও কেড়ে নোব।

ফিরিঙ্গীরা রাণীর রাজ্য আক্রমণ করলো। রাণী ভয় পেলেন না। তুমুল লড়াই হলো। রাণীর সৈন্যরা প্রাণ দিয়ে লড়লো। কেল্লার ভিতর যেসব মেয়েরা ছিল তারাও বন্দুক ধরলো, কামান চালালো। ফিরিঙ্গীরা রাণীর কিছুই করতে পারলো না।

কিন্তু গোলমাল বাধিয়ে দিল এক বামুন। সেই বামুনটিকে দয়া করে রাণী কেল্লায় থাকতে দিয়েছিলেন। ফিরিঙ্গীরা তাকে লোভ দেখালো। বামুন লোভ সামলাতে পারলো না। মাঝরাতে লুকিয়ে সে কেল্লার দরজা খুলে দিলে। হুড়মুড় করে গোরাসৈন্য ঢুকে পড়লো কেল্লার মধ্যে। রাণী আর কেল্লা রক্ষা করতে পারলেন না। শেষ অবধি কেল্লা ছেড়ে রাণীকে চলে যেতে হলো।

ছেলেকে পিঠে বেঁধে পাচিল টপ্‌কে রাণী কেল্লার বাইরে বনে গেলেন। মস্ত বড় কালো একটা ঘোড়া ছিল রাণীর। বড় বিশ্বাসী ঘোড়া। সেই ঘোড়া রাণীকে পিঠে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে রাণীকে পৌছে দিলে নিরাপদ স্থানে। ফিরিঙ্গীরা কেল্লা দখল করলো। নগর লুঠ করলো, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিলে, ছেলে-বুড়ো যাকে পেলে তাকেই খুন করলে।

রামশংকর বললো—জানি জানি, ফিরিংগীরা ভারী পাজী। কাউকে দেখতে পেলেই গুলী করে, ধরলে পরেই গাছে ঝুলিয়ে দেয়, রাস্তায় আমি দেখেছি, গাছের ডালে ডালে কত মানুষকে লট্‌কে দিয়েছে।

মানুষগুলো বাতাসে দুলছে, জিভগুলো বেরিয়ে এসেছে, দেখলে ভয় করে। বাবা বলেন—ওরাই নাকি অসুর, মাঝে মাঝে পাতাল ফুঁড়ে উঠে এসে এমনি অত্যাচার করে, তারপর দেবতারা এসে ওদের মেরে শেষ করে দেয়। দেবতারা নাকি এবার আসবে। কবে আসবে তুমি জানো?

দেবী বললো—না ভাই, তা তো কিছু শুনি নি।

রামশংকর বললো—তুমি কিছু খবর রাখো না। দেবতারা এসে পড়ার আগে যে আমার একটা বন্দুক চাই।

—বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবে?

—দমাদম গুলী, ব্যস্ সব খতম! একটা ফিরিঙ্গীকেও রাখবো না।

—ওদের কত বন্দুক আছে তুমি জানো?

—থাক্ না। আমি চুপিচুপি গিয়ে আগে ওদের দলের সর্দারটাকে মেরে দোব। সর্দার মার খেলেই বাঁদরের দল পালিয়ে যায় তা তুমি জান না বুঝি? ওরাও বাঁদর, মুখগুলো দেখো, শুধু লেজ নেই। তুমি আমায় একটা বন্দুক দাও না, দেখিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন পরে দেখা যাবে, এখন গল্পটা শোনো— দেবী আবার তার গল্প সুরু করলো।

এক বামুন পণ্ডিত ছিলেন সেই নগরে। দূর-দূরান্তর থেকে ছাত্ররা আসতো তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করতো। পণ্ডিতমশাইও ছাত্রদের নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশাই বন্দুক চালাতে জানতেন, বাড়ীতে বন্দুক ছিল। ফিরিঙ্গীরা প্রথমে কোন সুবিধা করতে পারলো না, তখন তারা বাড়ীটাতে আগুন লাগিয়ে দিল।

পণ্ডিতমশাইয়ের একটি ছেলে ছিল আর একটি মেয়ে। ঠাকুরঘরের নীচে এক চোরাকুঠরী ছিল, সেইখানে তিনি লুকিয়ে রাখলেন ছেলেমেয়ে দুটিকে। বড় বড় দু' কলসী জল আর এক হাঁড়ি চিঁড়ে আর গুড় দিয়ে বললেন—আমি যখন এসে ডাকবো তখন বেরুবি, আর আমি যদি না আসি তো যতদিন এই জল আর খাবার থাকবে ততদিন এখান থেকে বেরুবি না।

তারপর সেই বাড়ীর মধ্যে লড়াই সুরু হয়ে গেল। বন্দুকের শব্দ, চেঁচামেচি, দাপাদাপি, শেষে সারা বাড়ীখানাই পুড়ে ভেঙে পড়লো। কিন্তু চোরাকুঠরীটার কিছুই হোল না। ভাইবোন তিনদিন তিনরাত সেই ঘরের মধ্যে রইল। পণ্ডিতের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে কলসীর জল তখন শেষ হয়ে গেছে। আর তো থাকা যায় না। ভাইবোন এবার সেই চোরাকুঠরী থেকে বেরুবার চেষ্টা করলো।

চোরাকুঠরীর উপর সারা বাড়ীটা ভেঙে পড়েছিল, একটা সরু পথ ছিল রাস্তার নালার পাশ দিয়ে। চিঁড়ে গুড় গামছায় বেঁধে নিয়ে ভাইবোনে রাত্রিতে সেই পথ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সারা শহর অন্ধকার, কোথাও মানুষের সাড়া নেই। মাঝে মাঝে পথের মাথায় সিপাইরা আগুন জেলে পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি করে তারা নগর থেকে বেরুবে, এই হলো ভাইবোনের ভাবনা।

অনেক ঘুরে-ফিরে, ভাঙা-চোরা বাড়ী আর দেয়ালের আড়াল দিয়ে অনেক কষ্টে ভাইবোনে নগর ছেড়ে ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়লো। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

দিনের আলোয় ফাঁকা মাঠে ভয় বেশী। সহজেই ফিরিঙ্গী ফৌজের নজরে পড়ার কথা। ভাইবোনে ছুটলো সেই মাঠের ওপর দিয়ে।

কিন্তু সেই তেপান্তরের মাঠ ছুটে কি পার হওয়া যায়। যত যায় তবু মাঠ আর ফুরায় না। বিকালের দিকে হঠাৎ দু'জনের চোখে পড়লো, মাঠের সীমানায় ধুলা উড়ছে। কোন ফৌজ আসছে মাঠের উপর দিয়ে। ভাইবোন লুকোবার জায়গা খুঁজলো কিন্তু সেখানে আর লুকোবে কোথায়? শেষে মাঠের উপরেই শুয়ে পড়লো। একটু পরেই একদল ঘোড়সওয়ার চলে গেল তাদের পাশ দিয়ে। তারা চলে যাবার পর ভাইবোনে উঠে পড়লো, আবার যেই তারা চলতে স্বরু করেছে এমন সময় ফট্‌ফট্ করে কয়েকটা গুলী এসে লাগলো তাদের গায়। কিছু ভালো করে বোঝার আগেই ভাইবোন ঘুরে পড়ে গেল।

দেবী থামলো। রামশংকর বললো—তারপর?

দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—তারপর বোনের যখন জ্ঞান হলো, বোন দেখলো জঙ্গলের মাঝে এক গাছতলায় সে পড়ে আছে। এক সন্ন্যাসিনী তার কাছে বসে আছে।

সন্ন্যাসিনী বললো—তোমার ভাইকে গুলী করে মেরেছে। তোমার পায়ে গুলী লেগেছে বলে তুমি বেঁচে গেছ।

সেইদিন থেকে বোন সেই সন্ন্যাসিনীর কাছেই রয়ে গেল।

রামশংকর বললো—বারে! এ কেমন ধারা গল্প! ভাইটাকে ফিরিঙ্গী ফৌজে গুলী করে মারলো, আর বোন কিছু করতে পারলো না?

—বোন কি করবে?—দেবী বললো—সে একা কি করতে পারে? বন্দুক নেই, কামান নেই, পাইক-পিয়াদা নেই, টাকা-পয়সাও নেই, কি করবে সে?

—তা বটে! বন্দুক না থাকলে কিছু করা যায় না। আমার একটা বন্দুক চাই। খুব জোরালো বন্দুক, একবার ছুড়বো আর দশ-বিশটি ফিরিঙ্গী মরবে। তুমি দেবে আমাকে তেমনি একটা বন্দুক।

—আমি বন্দুক কোথায় পাব ভাই, আমি তো সন্ন্যাসিনী। এখন হাত ধুয়ে খেতে বসো, চাপাটি ভাজা হয়ে গেছে।

রামশংকর হাত ধুয়ে এলো, শালপাতায় দু'খানা বড় চাপাটি আর খানিকটা তেঁতুলের চাট্‌নি দেবী ধরে দিলে তার সামনে। রামশংকর রুটিতে একটা কামড় দিয়েই বললো—এই যাঃ, মস্ত ভুল হয়ে গেল যে!

—কী?

—জপ করা হলো না।

—তাতে কিছু হয় না, খেয়ে উঠে জপ করো, নয়তো সন্ধ্যাবেলা দু'বার জপ করে নিও।

—তা কি হয়, ঠাকুর রাগ করবে।

—ছোট ছেলেমেয়ের উপর ঠাকুর রাগ করেন না, ঠাকুর তাদের ভালবাসেন।

—তাহলে খেয়ে নিই।

রামশংকর খেতে সুরু করলো।

দেবী তার খাওয়া দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল।

রামশংকর খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলো—অমন করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছ?

—দেখছি, তোমাকে দেখতে ঠিক সেই ভাইটির মত।

—আর বোনকে দেখতে ছিল ঠিক তোমার মত—ফস্ করে রামশংকর বলে বসলো।

—ঠিক তাই, কি করে জানলে বলত?

—বা রেঃ, ভাই আমার মত হলে বোন তোমার মত হবে না?

তারপর রামশংকর প্রশ্ন করলো—তোমার ওই রাণী সত্যি?

—ওই তো ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ আর ওই পণ্ডিত গঙ্গাধর মিশ্র।

—ওঃ! তুমি রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের গল্প বললে? বাবার কাছ থেকে আমি ওঁর গল্প অনেক শুনেছি। বাবা আরো অনেক গল্প জানে, নানা সাহেবের গল্প, তাঁতিয়া টোপির গল্প, কুনোয়ার সিংয়ের গল্প।

—আচ্ছা, এখন তুমি খেয়ে নাও, কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমার খিদে পেয়েছে, তোমার খাওয়া হলে তবে আমি খাব।

—বেশ, আর আমি কথা বলবো না।

॥ পাঁচ ॥

আহার শেষ করেই রামশংকর বললো—নাও, তুমি এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তারপরেই আমাকে নিয়ে যাবে বাবার কাছে।

দেবী দুর্ভাবনায় পড়লো। মাধবরাম মারা গেছে তা সে দেখেই এসেছে। বালক কান্নাকাটি করবে বলে কথাটা বলেনি। কিন্তু দশ বছরের ছেলেকে ভোলানো তো সহজ নয়।

দুর্ভাবনা থেকে দেবীকে রক্ষা করলো নিশি। সে এসে খবর দিলে—ভৈরবী তোমাকে ডাকছে।

—হঠাৎ এই সময়?

—জানিনে।

দেবী তাড়াতাড়ি আহার শেষ করলো। তারপর বললো—শংকর যাবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়? সূর্পণখার কাছে? না বাবা, আমি ওর কাছে যাবো না, ওকে দেখলে আমার ভয় করে।

—আমি ঘুরে আসি।

—তাড়াতাড়ি এসো, বাবার কাছে যেতে হবে।

দেবী বেরিয়ে পড়লো।

পাহাড়ে উঠে মন্দিরের সামনে একটি বড় বেলগাছ, এইটিই এখানকার একমাত্র গাছ। সেই গাছের গায় খড়কুটো আর ডালপালা দিয়ে একটা ঝোপ্‌ড়ির মত করা আছে। তারই মধ্যে ভৈরবী বসেছিল, দেবী এসে সামনে দাঁড়ালো, বললো—আমায় ডাকছেন?

ভৈরবী বললো—বসো।

দেবী বসে পড়লো।

ভৈরবী ভালো করে দেবীর মুখের পানে তাকালো, ধীরে ধীরে বললো—যে ছেলেটাকে বন থেকে কুড়িয়ে এনেছিস, তার কি পরিচয় বললি?

—ওর বাবার নামটা শুনেছি, রাজপণ্ডিত মাধবরাম, আর ওর নাম রামশংকর।

—কোথাকার লোক?

—বারাণসীর বোধ হয়।

—বয়স কত বলেছে ?

—দশ বছর।

ভৈরবী দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললো—রাজপণ্ডিত মাধবরামকে আমি জানি, তবে সে কাশীর নয়, সে প্রয়াগের লোক। সে তাঁতিয়া টোপির পারিষদ, তার কোন ছেলে আছে তা-ত শুনিনি। যাক্, ওর বাপকে তো বাঘে খেয়েছে বললি না ?

—হ্যাঁ—দেবী মাথা নাড়লো।

—সবই মা মহামায়ার ইচ্ছা। মা আটভুজী ওকে এনে দিয়েছেন এখানে। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !

দেবীর বুক দুরদুর করে উঠলো। ভৈরবীর মুখ থেকে সে শুনেছে, নরবলি দিয়ে মা-কালীর পূজা করলে নাকি সত্বর সিদ্ধি লাভ করা যায়। তবে ভৈরবীকে নরবলি দিয়ে পূজা করতে দেবী কখনও দেখেনি। কিন্তু এখন ভৈরবী যে ইঙ্গিত করলেন, তাতে সেই রকমই তো মনে হয়।

সোজা প্রশ্ন করতে দেবীর শঙ্কা হলো, ঘুরিয়ে বললো—কিন্তু ওর তো উপনয়ন হয়ে গেছে।

ভৈরবী বললো—সেজন্য কোন বাধা হবে না। মা ওকে এনেছেন, মা-ই বুঝবেন।

ভৈরবী হাসলো। সেই হাসিমুখের পানে তাকিয়ে দেবীর দপ্ করে একটা কথা মনে পড়লো, রামশংকরের কথা 'সূর্পণখা'। রাক্ষসী সূর্পণখার মুখখানা কি ঠিক এমনি ছিল ? দেবী ত্রাসে শিউরে উঠলো।

করুণ কণ্ঠে দেবী বললো—ছেলেটাকে দেখতে ঠিক আমার ছোট ভাইয়ের মত।

—ও তোর চোখের ভুল। সব ছেলের মুখই ছেলেবেলায় অমন এক রকম থাকে। বয়সের সঙ্গে আস্তে আস্তে বদলায়।

ভৈরবী চোখ বুজলো। কয়েক মিনিট চোখ বুজে থেকে তারপর চোখ খুললো, বললো,—আচ্ছা, তুই এখন যা।

দেবী অভিভূতের মত পাহাড় থেকে নামতে সুরু করলো।

পাহাড় থেকে কিছুটা নেমে এলেই এক পাশে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর এক পাশে একটি বড় অশত্থগাছ। সেই গাছের ছায়ায় এসে দেবী দাঁড়ালো।

বসে পড়লো গাছের নীচে। মন ভারী হয়ে উঠেছে। ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

ভৈরবীর জন্য রামশংকরকে মরতে হবে কেন? ভৈরবীর সিদ্ধি হোক বা না-হোক তাতে রামশংকরের কি? ছেলেটার মুখখানা ঠিক তার ছোট ভাইয়ের মত। তার ভাই বেঁচে থাকলে আজ ঠিক অমনিই হতো। ওই বালককে সে কোন মতেই ভৈরবীর তন্ত্রসাধনার জন্য বলি হতে দেবে না।

আজ রাত্রেই সে এখান থেকে পালিয়ে যাবে, রামশংকরের হাত ধরে সোজা চলে যাবে বনের ভিতর দিয়ে। একটা গ্রামে গিয়ে পৌছতে পারলেই হলো। তখন বোঝা যাবে ভৈরবীর ক্ষমতা কত।

॥ ছয় ॥

পাহাড়ের মাথায় একখানি বড় পাথরের আড়ালে একটি লোক বসেছিল। তাকিয়েছিল নীচের উপত্যকার পানে, দূরের দিগ্বলয়ের সীমায়।

সহসা বাঘের চীৎকারে তার চমক ভেঙ্গে গেল। সে উঠে দাঁড়ালো। হাতের পাশেই ছিল একটি দীর্ঘ বল্লম। বল্লমটি সে তুলে নিলে। তারপর গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের কিনারায়। পথের একটা অংশ এতক্ষণ আড়ালে ছিল, এবার সেইটুকু চোখে পড়লো।

খাদের পাশ দিয়ে পথটা যেখানে বাঁক ফিরেছে, সেইখানে একটি লোক একটি তীক্ষ্ণ বল্লম দিয়ে একটি চিতাবাঘকে চেপে ধরেছে। পথের উপর বাঘটা ছটফট করছে। কিন্তু মানুষটি যেভাবে তাকে গেঁথেছে, বাঘটির কোন শক্তি নেই তা থেকে মুক্ত হবার। কয়েক মিনিট হাত-পা ছুড়ে বাঘটি স্থির হয়ে গেল, এক ঝটকায় বল্লমটি খুলে নিয়ে লোকটি একপাশে সরে এলো। সেখানে একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ডেকে মাথার পাগড়িটা খুলে দিলে তার হাতে। পাগড়ি দিয়ে ছেলেটি তার বাঁ কাঁধে পাটি বেঁধে দিলে। তারপর ছেলেটিকে হাত ধরে মানুষটি এগিয়ে গেল পথ ধরে। পাহাড়ের উপর থেকে মানুষটি শান্তভাবে সব দেখলো, তারপর আপন মনে বললো—শক্তিমান পুরুষ!

আবার সে ফিরে এসে বসলো নিজের সেই পাথরখানির উপর। আবার পূর্বের মত দৃষ্টিনিবদ্ধ করলো। এবার সে দেখতে পেলে,—পথের

ওদিকে ঝর্ণার পাশে সেই মানুষটি যেন শুয়ে পড়েছে। ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। দ্রষ্টার দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠলো। আবার বল্লমটি হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। পথের সমান্তরালে সে পাহাড়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হলো।

ঝর্ণার সমান্তরালে এসে বল্লমধারী যখন নেমে আসার উপক্রম করছে,



এমন সময় পথের উপর এক গৈরিক-ধারিণী সন্ন্যাসিনী তার নজরে পড়লো, সন্ন্যাসিনী বালকের হাত ধরে চলে গেল। মানুষটি সেইখানেই পড়ে রইল।

বল্লমধারী পাহাড় থেকে নামলো। শায়িত মানুষটির পাশে এসে দাঁড়ালো। পাশে বসে তার ধমনীর গতি পরীক্ষা করলো। হাতে নাড়ী

পেল না, তার বুকের উপর কান পাতলো। তারপর দীর্ঘ বেনিয়ানের ঝুল পকেট থেকে একটি ছোট থলি বের করলো। থলির ভিতর থেকে ছোট ছোট কাপড়ে বাঁধা কয়েকটি পুরিয়া বেরুলো। একটি পুরিয়া খুলে এক টিপ রক্তাভ চূর্ণ তুলে নিয়ে অচেতন মানুষটির মুখের মধ্যে দিয়ে দিল। মানুষটির মাথার পাশে একখানি গামছা পড়েছিল, সেই গামছাখানি নিয়ে বল্লমধারী ঝর্ণার জলে ভিজিয়ে আনলো। গামছা নিংড়ে কয়েক ফোঁটা জল তার মুখে দিল; তারপর ভিজে গামছাখানা তার কপালের উপর রেখে দ্রুতপদে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বল্লমধারী ফিরে এলো, হাতে একটি গাছের ডাল। তা থেকে পাতাগুলি ছাড়িয়ে নিল। তারপর অচেতন মানুটির কাঁধের পটি খুলে ফেললো। বাঘের কামড়ে অনেকখানি দাঁতের ক্ষত। বল্লমধারী গাছের পাতাগুলি সেই ক্ষতের উপর ভালো করে বিন্যাস করে নতুন করে পটি বেঁধে দিল। তারপর আহতের বুকের উপর আবার কান পেতে শুনলো। বুকের স্পন্দন আগের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। আহতের ডান হাতখানি তুলে নিয়ে সে ধমনীর গতি ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

কোন এক সময় পথিক উপত্যকার নীচের দিকে তাকালো। মনে হলো যেন পথের শেষমুখে পাহাড়ের নীচে কালো ধোঁয়ার মত কি একটা দেখা যাচ্ছে? বল্লমধারীর দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠলো। ধোঁয়া নয়, ধুলো। ধুলোটা এগিয়ে আসছে। কোন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে এই পথে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে কিছুই ঠাহর করা গেল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অশ্বারোহী সেখানে এসে পড়লো। ঝর্ণার কিনারায় এসে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নামলো। ঝর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে, পাহাড়ের পানে মুখ তুলে চিলের মত তীব্রস্বরে ডেকে উঠলো।

এবার বল্লমধারী সাড়া দিল,—দত্তবাবু!

অশ্বারোহীর নজর পড়লো—পথের পাশে বল্লমধারীর সাদা পোষাক। এগিয়ে এসে সে বললো—গুরুজী, আপনি এখানে? এ কে? মল্লিকবাবু নাকি?

—না মল্লিকবাবু নয়, এ মাধবরাম।

—বারাণসীর মাধবরাম?

—হ্যাঁ, বাঘের হামলায় আঘাত পেয়েছে। চল, দু'জনে একে তুলে নিয়ে যাই উপরে।

দু'জনে ধরাধরি করে মাধবরামকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে সুরু করলো। কিছুটা উঠতেই একটি ঝোপের পাশে একটা গুহার মত দেখা গেল। তারই একপাশে একটি লোক বসে বসে চাপাটি ভাজছিল। দু'জনে তার পাশে এসে মাধবরামকে নামালো।

তাদের পিছু পিছু দত্তের ঘোড়াটি এসে দাঁড়ালো, পোষা কুকুরের মত। দত্ত তার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে আদর করে বললো—যা বেটা, তোর এখন ছুটি।

ইতিমধ্যে মাধবরামের ধমনীর গতি পরীক্ষা করে গুরুজী বললেন—মল্লিকবাবু, দুধ আছে তো?

—আগে একটু দুধ গরম করে দাও, একে খাওয়াতে হবে।

মল্লিকবাবুর হাতের কাছেই দুধের লোটা ছিল, টেনে নিলে।

॥ সাত ॥

বিন্ধ্য-অঞ্চলের পার্বত্য বনভূমি বহুদূর অবধি বিস্তৃত। একদিকে বরাবর পশ্চিমে গিয়ে সাতানা মাণিকপুর হয়ে মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডে গিয়ে পড়েছে, আরেক দিকে শোণ নদের তীর অবধি বরাবর চলে গেছে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ অবধি।

এই বনভূমির মধ্যে নানা দরিদ্র জাতির বাস। তাদের সরল সহজ জীবনধারাকে নগরের বিলাস-বহুল বাসিন্দারা অবজ্ঞা করে, বলে—অসভ্য, বুনো।

আমাদের এই আটভুজির মন্দিরের পাহাড়তলি ঘিরে এমনি এক বুনো জাতির বাস। এই পাহাড়টির নীচেই গঙ্গার তীরে খানিকটা জায়গা-জুড়ে ঘন গাছের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া নানাগাছের নীচে এলোমেলো অনেকগুলি মাটির ঘর।

একখানি বাড়ীর গায় লাল সাদা ও হলুদ রঙের নানা আল্পনা আঁকা। বাড়ীর সামনে উঁচু করে বেশ চওড়া খানিকটা দাওয়া, নিকানো-চুকানো তক্‌তকে। সর্দারের বাড়ী।

সন্ধ্যার পর এই দাওয়ার উপর মজলিশ বসে। মজলিশ চলে অনেকক্ষণ, চাঁদনি রাত হলে তো কথাই নেই।

আজও মজলিশ বসেছিল। মুখে বড় বড় শালপাতার চুরুট নিয়ে বসেছিল ক'জন। সামনে অর্জুন সর্দার।

ঘরের ভিতর থেকে রেড়ির তেলের লণ্ঠন এসেছে বাইরে, সেই লণ্ঠনের আলোয় এক শিল্পী হাতীর দাঁতের কাজ দেখাচ্ছে সর্দারকে। সাধারণ দাঁতের পাতের উপর দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করে তার উপর রং বুলানো। গ্রামে-সমাজে এই ধরণের পটের চাহিদা আছে, অনেকেই ঠাকুরঘরে এই পট রাখে।

অর্জুন সর্দার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। আশেপাশের পার্ষদরা। সর্দার বললো—আমি একটা কালীর পট রাখবো, মা মহামায়ার পট ঘরে রাখা ভালো।

শিল্পী সবিনয়ে বললো—যা আপনার পছন্দ হবে তাই রাখবেন, আমি তো বিক্রী করতেই এসেছি।

—তুমি প্রয়াগ থেকে আসছ?

—না, আমি এখন আসছি পাটনা থেকে।

—ওদিকে খুব লড়াই হয়েছে বলে শুনলাম?

—হ্যাঁ, কুমার সিং ওদিকে খুব লড়ছে কিন্তু জিততে পারে নি একবারও। বড্ড হুজ্জুৎ চলছে ওই দিকে, সেই সব দেখেই তো আমি সরে এলাম এই বনে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—বারাণসী।

—তোমার নাম?

—আবদুল জব্বর খাঁ।

—বছর পাঁচেক আগে বারাণসীর আরেকজন শিল্পী এসেছিল এখানে এমনি সব পট নিয়ে, তার নাম ফজলুর রহমন খাঁ। তাকে তুমি চেনো?

—ভালো চিনি। সে তো আমাদের গ্রামের লোক।

—তা তোমার এই একখানি পটের দাম কি দিতে হবে বল?

—টাকা-পয়সা চাই না সর্দারজী, আপনি মেহেরবানি করে একটা গাধা আমায় দিন। আমি আর মাল-পত্তর বইতে পারছি না।

—একখানা পটের বদলে একটা গাধা, দামটা খুব বেশি হলো না ?

—এ তসবীরের দাম নয় সর্দারজী, এ তসবীর আমি আপনাকে নজরাণা দিচ্ছি। আপনি একজন গরীব শিল্পীকে একটি গাধা খয়রাতি করুন, খোদা আপনাকে অনেক দেবেন।

সর্দার হাসলো, বললো—তুমি বেশ মিষ্টি কথাও বলতে পার।

কুর্নিশ করে জব্বর বললো—কথা আর কাজ এই দুটোই তো আমাদের সম্বল সর্দারজী। এই কথা বলার কায়দা দেখেছিলাম লখনৌর দিলখুসায়, নবাব ওয়াজেদ আলি শা'র দরবারে। আর দেখেছিলাম কানপুরে নানা সাহেবের মজলিশে।

—তুমি নবাব ওয়াজেদ আলি শা'কে দেখেছ ?

—বড় ভালো লোক ছিলেন নবাব সাহেব। যখনই গিয়ে দাঁড়িয়েছি তখনই বখশিস্ দিয়েছেন। তসবীরের দাম কখনো জিজ্ঞেস করেন নি। তা আমাদের বরাতে অমন মানুষ সইল না, ফিরিঙ্গীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল কলকাতায়।

—নানা সাহেব কেমন লোক ?

ভারী সৌখীন মানুষ। ঘোড়া চিনতে আর পোলো খেলতে তাঁর মত মানুষ হিন্দুস্থানে আর কেউ নেই। মেজাজও দিল-খোলা, দরবারে গিয়ে সেলাম দিলেই ইনাম মিলে যাবে। গরীবের উপর অতো দরদ আমি আর কারও দেখিনি সর্দারজী।

—কিন্তু নানা সাহেব তো লড়াই ভালো বোঝেন না, আজ অবধি কোন যুদ্ধ জিততে পারলেন না।

—জিতবেন কেমন করে ? অনেক রাজা-মহারাজা যে ইংরেজের সঙ্গে দোস্তি করে রেখেছে। একা মানুষ আর কি করতে পারে ?

অর্জুন সর্দার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিল্পীর মুখের পানে তাকালো, তারপর বললো—খাঁ সাহেব, তুমি শুধু শিল্পকর্মই বিক্রী করো না, রাজা-রাজড়ার খবরদারিও করো দেখছি।

—রাজা-মহারাজা নিয়েই তো আমার কেনা-বেচা সর্দারজী।

—রাজা-মহারাজার খবরও তো তুমি নিয়ে যেতে পার, তাতে উপরি রোজগার হয়।

—তাও কি আর করিনি, অনেকবার করেছি। কিছু কিছু ইনামও মিলেছে।

—এখন তুমি কার সংবাদ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

—একটা সংবাদ আছে অর্জুন সর্দারের কাছে।

—অর্জুন সর্দার ? মানে, আমার কাছে ? কি সংবাদ বলত ?

—গুরুজী অর্জুন সর্দারকে বলেছেন কুমার সিং-কে যথাসাধ্য সাহায্য করতে।

—খবর কি মুখে জানিয়েছেন না পত্র আছে ?

—পত্র আছে।

খাঁ সাহেবের হাতে একটি পাকা বাঁশের লাঠি ছিল, লাঠির মাথায় একটি টাঙ্গীর ফলা লাগানো। এইটাই ছিল তখন সাধারণ পথিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বন্দুক সবাই কিনতে পারতো না। লাঠির নীচের দিকে একটা লোহার আংটা লাগানো ছিল। জব্বর খাঁ সেই আংটাটি কৌশলে খুলে ফেললো, ভিতরে ছোট একটি কৌটার মত। তার মধ্যে থেকে গোল করে পাকানো একটুকরো কাগজ বেরুলো। কাগজখানি সর্দারের দিকে এগিয়ে দিয়ে জব্বর বললো—তাঁতিয়া সাহেবের পাঞ্জা আছে।

সর্দার চিঠিখানা হাতে নিয়ে দেখলো। চিঠির এক কোণে জোড়া তলোয়ারের ছাপ দেওয়া, এইটিই তাঁতিয়া টোপির মোহরের ছাপ। চিঠিখানি উর্দুতে লেখা। সর্দার লেখাপড়া জানতো না। চিঠিখানি জব্বরের হাতে ফেরৎ দিয়ে বললো—গুরুজী কি লিখেছেন তুমিই পড়।

জব্বর হাসলো। তারপর চিঠিখানা পড়লো—

সর্দারজী, ইংরেজের অত্যাচারের কথা আপনি শুনেছেন। তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য আমরা লড়ছি। জগদীশপুরের কুমার সিংকে আপনি সাহায্য করুন। এখনকার মত হাজার দুয়েক তীরন্দাজ হলেই চলবে। বিশ্বনাথ আপনার কল্যাণ করুন। ইতি—তাঁতিয়া টোপি।

—কোথায় সৈন্য নিয়ে যেতে হবে তা তো কিছু বলেন নি ?—সর্দার প্রশ্ন করল।

—সে কথা আমায় বলেছেন। জগদীশপুরে।

—দু'দিনের মধ্যে দু'হাজার লোক সংগ্রহ করা তো সহজ নয়। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি, কাল সকালে জবাব দোব।

॥ আট ॥

আসামের পার্বত্যভূমি থেকে যে বনভূমির সুরু তা বাংলা বিহার অতিক্রম করে মধ্যভারত থেকে গুজরাট অবধি ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে কয়েকটি বড় বড় নগর সেই বনভূমির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল শুধু। এইসব বনাঞ্চলে নানা জাতির বনবাসী বাস করতো। কোল, ভীল, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, মাউলি প্রভৃতি।

শোন ও গঙ্গার মধ্যবর্তী ব্যাপক বনাঞ্চলে বনবাসীদের সর্দার ছিল অর্জুনদাস। তার গুরু ছিল এক বাঙালী—মধু মল্লিক। মধু সন্ন্যাসী, সপ্তগ্রামের লোক। তন্ত্র সাধনা করতে এসে কয়েক মাস বিন্ধ্যাচলে রয়ে গিয়েছিল। তখনই অর্জুনদাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারই কাছে অর্জুনের রাজনীতির দীক্ষা।

অর্জুন সর্দার ভাবনায় পড়লো। চুপচাপ কয়েকটি তালপাতার চুরুট ফুঁকে নিলে, কোন কথা বললে না। পার্ষদরা চিঠিখানা সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাইল, কিন্তু সর্দারের মুখের পানে তাকিয়ে কোন কথা বলার সুযোগ পেলে না। মজলিশ আর জমলো না। সবাই একে একে উঠে গেল।

কোন এক সময় অর্জুন সর্দারও উঠে পড়লো। গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হলো। গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথ ধরলো।

রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেল। এইমাত্র শিয়ালের ডাক সমগ্র বনভূমিকে সরব করে তুলেছিল। জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি রহস্যময়। অষ্টভুজার পাহাড়টি একটা জমাট অন্ধকারের মত। পাহাড়ের মাথায় মন্দিরের সামনে একটি গুহার মুখে কাঠ-কুটোর আগুন জ্বেলে বৃদ্ধা ভৈরবী বসে আছে। অর্জুন সর্দার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। ভৈরবী এক নজরেই সর্দারকে চিনলো, বললো—কে, অর্জুন সর্দার? বসো।

আগুনের পাশে অর্জুন বসলো।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অর্জুন বললো—তোমার কাছে একটা কথা জানতে এলাম।

ভৈরবী গম্ভীরস্বরে বললো—তুমি আসবে আমি জানি।

—ব্যাপারটা গুরুতর। তাঁতিয়া টোপি আমাকে অনুরোধ করেছে জগদীশপুরে দু' হাজার তীরন্দাজ নিয়ে যাবার জন্য।

—আমি জানি।

—এখন আমার কি করা কর্তব্য ঠিক বুঝতে পারছি না। ফিরিঙ্গীরা তো দিল্লীর তখ্‌ত অবধি দখল করে বসেছে, যতগুলো লড়াইয়ের খবর জানি সব ক'টাতেই তো আমরা হেরেছি।

অর্জুন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভৈরবীর মুখের পানে তাকালো।

ভৈরবী ধীরকণ্ঠে বললো—মা বলেছেন, ফিরিঙ্গীরাই দেশের রাজা হবে। তোমরা যতই লড়ো ওদের কিছুই করতে পারবে না। নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাই—কেউ ওদের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলো না, কেউ পারবেও না। কুমার সিং আর একা কি করবে? দেবতা এদের উপর প্রসন্ন নন।

—গুরুজী চিঠি দিয়েছেন।

—তাঁতিয়া টোপি কুমার সিংয়ের সঙ্গে আছে? তাঁতিয়ার উপর ফিরিঙ্গীদের রাগ সবচেয়ে বেশী। অনেক রাজা-মহারাজা ওর শিষ্য, তাদের সবাইকে ও ক্ষেপিয়েছে। এখন এই ফিরিঙ্গীদের বিপক্ষে যে যাবে, সেই সমূলে বিনাশ হবে। নিজের ভালোমন্দ এখন নিজে বুঝে চল। চিঠির জবাব কি দিয়ে দিয়েছ?

—না, কাল সকালে দোব বলেছি।

—বেশ, বলে দিও,—'তৈরী হচ্ছি, কয়েক দিন সময় লাগবে।' তুমি ফিরিঙ্গীদের বিরোধী হলে তারা চারিদিক থেকে এই বনভূমি ঘিরে ধরবে, তখন কে তোমায় রক্ষা করবে। হঠাৎ কিছু করে বসলে পরে আর আপশোসের শেষ থাকবে না।

কথাগুলো অর্জুনের মনে লাগলো।

ভৈরবী বললো—আর ক'টা দিন চুপ করে বসে থাকো, তারপরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এই অমাবস্যায় আমি মহা-উপচারে মা আটভুজির পূজা করবো, তোমার নামে সঙ্কল্প করে তোমার কল্যাণ কামনা করবো। আমি আছি, তোমার কোন ভয় নেই। আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি জপে বসবো। মা—করালবদনা লোলজিহ্বা নৃমুণ্ডমালিনী মা, তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

ভৈরবী চোখ বুজলো। অর্জুন সর্দারও উঠে দাঁড়ালো।

পাহাড় থেকে নেমে অর্জুন বনপথে পড়লো। অন্ধকারে পথের পাশে একটি ঝোপের আড়ালে একজন মানুষ যে লুকিয়ে আছে তা অর্জুনের

নজরে পড়লো না। গঙ্গাতীর ধরে তাকে একা চলতে দেখে জব্বর খাঁ তার অনুসরণ করেছিল।

অর্জুন চলে যাবার পর জব্বর খাঁ বড় বড় পাথরের আড়াল দিয়ে অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলো।

একখানি পাথরের আড়াল থেকে চোখে পড়লো—উপরে ভৈরবী একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। জব্বর খাঁ বড় পাথরখানির আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

॥ নয় ॥

ভৈরবীর সঙ্গে লোকটির কথা হচ্ছিল। স্পষ্ট শোনা যায় না তবে কিছু কিছু টুকরো টুকরো ভেসে আসছিল, জব্বর খাঁ সেই টুকরোগুলোকে মনে মনে জোড়া দিচ্ছিল।

কয়েকবার তাঁতিয়ার নাম কানে এলো। যে মানুষ বনে থেকে দেবীর পূজা ও তন্ত্রসাধনা করে, যুদ্ধ ও তাঁতিয়ার সঙ্গে কি তার সম্পর্ক?

জব্বর খাঁর মনে উঠলো নানা প্রশ্ন।

ওদের কথা চললো অনেকক্ষণ।

কথা শেষে ভৈরবী উঠে পড়লো। তারপর লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে সামনের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হোল। জব্বর এবার পাথরের আড়াল থেকে মাথা তুললো।

জব্বর এগিয়ে চললো মন্দিরের পিছন দিকে।

মন্দিরের পিছন দিকে একটা বড় গাছের ডাল থেকে খড়ের ছাউনি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর চারিপাশে দরমার আড়াল করে কোনরকমে মাথা গোঁজবার মত একটা আস্তানা। একটু তফাতে খড়কুটোর একটা আগুন জলছিল, সেই আগুনের সামনে বসে মানুষটি কি যেন খাচ্ছিল। ছাতুই বোধহয়।

আগুনটা মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, সেই আভায় কয়েক মিনিট তাকিয়ে জব্বর চিনলো—এ মানুষ তার চেনা। এ তো রসিদ আলি।

জব্বর খাঁ রসিদ আলির সামনে এগিয়ে গেল, বললো—রসিদ আলি সাহেব, সেলাম!

রসিদ আলি চমকে উঠলো। বললো—কে ?

—আমি আবতুল জব্বর খাঁ।

রসিদ আলি ভাল করে তাকালো জব্বরের মুখের পানে, বললো—চিনতে পারলাম না।

—আপনি আমায় চিনবেন না, আমি রজব আলি সাহেবের লোক, আপনাকে আমি ঠিক চিনেছি।

লোকটি তাড়াতাড়ি ছাতুর ডেলা মুখে ভরলো, তারপর ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটি জল মুখে ঢেলে দিলে। জব্বর হেসে বললো—অত ব্যস্ত হবেন না। ধীরে-সুস্থে খান, আমি অপেক্ষা করছি।

রসিদ আলি উঠে দাঁড়ালো, ঝোপ্‌ড়ির ভিতর থেকে একখানা খাটিয়া বের করে আনলো, বললো—বসো।

জব্বর খাটিয়ার একপাশে বসলো, রসিদ আর একপাশে বসলো, বললো—এবার বল, তোমার কথা শুনি।

—নানা সাহেবকে যিনি চালান গুরুজী তাঁতিয়া টোপি—পণ্ডিত রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ। সে এখন এসেছে এই জঙ্গলে, এইখানেই আছে। এখান থেকে অর্জুন সর্দারের পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে সে যাবে জগদীশপুরের কুমার সিংকে সাহায্য করতে। খবরটা রজব আলি সাহেবের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই।

রসিদ আলি কয়েক মিনিট চুপ করে কি ভাবলো, তারপর বললো—তোমার খবরটা খুব জরুরী।

—এই খবর ফিরিঙ্গীদের কাছে একবার পৌঁছে দিতে পারলে সাহেবরা তোমায় মাথায় করে নাচবে। এখনি বেরিয়ে পড়, আর বেশী দেরী করো না।

দেখা গেল ভৈরবী আসছে।

ভৈরবী এগিয়ে এলো, বললো,—গলার আওয়াজ পেয়ে দেখতে এলাম কার সঙ্গে কথা বলছ।

—আমার এক বন্ধু এসেছে খবর নিয়ে, আমাকে এখনি চলে যেতে হবে,—রসিদ আলি বললো।

ভৈরবী জব্বর খাঁয়ের মুখের পানে তাকালো। বলে উঠলো—দোস্তের মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। দোস্তের নামটি কি ?

—আবতুল জব্বর খাঁ।

—রসিদ সাহেব, দাড়িটা ধরে টেনে দেখ তো ঝুটা কি আসল।

রসিদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। জব্বর এক লাফে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে বললো—খবরদার!

—দেখলে!—ভৈরবী বললো—ও মধু মল্লিক, তাঁতিয়ার সাগরেদ। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ঠকাতে এসেছে?

রসিদ আলি আর কথা বলার অবসর দিল না, ঝাঁপিয়ে পড়লো মধুর উপর। মধু তৈরীই ছিল। দু-পা পিছিয়ে গেল। রসিদ পর পর তিনবার তলোয়ারের আঘাত করলো, কিন্তু তিনবারই ব্যর্থ হলো। চকিতে মধু লাফিয়ে উঠে রসিদ আলির হাঁটুর উপর মারলো এক প্রচণ্ড লাথি। পাশ দিয়ে ঢালু পাহাড়ী খাদ নেমে গেছে, রসিদ আলি উল্টে গিয়ে পড়লো সেখানে, তারপর গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচে।



ভৈরবী চীৎকার করে উঠলো।

মধু ধমক দিয়ে বললো—চুপ, নারী বধ করবো না বলে বেঁচে গেলি। সন্ন্যাসী হয়েছিস্ তবু নষ্টামি বুদ্ধি যায় নি?

ভৈরবী দৌড় দিল।

মধু কয়েক মিনিট সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পাহাড় থেকে নেমে গেল।

॥ দশ ॥

দেবী ঘরে ফিরলো।

রামশংকর একখানি পাথরের উপর চুপ করে বসেছিল, বললো—দিদি, তুমি এতো দেরী করে এলে যে?

'দিদি' ডাক দেবীর কানে ভারী মিষ্টি লাগলো। এমনিভাবেই তার ছোট ভাই তাকে ডাকতো। অনেকদিন পরে সেই স্বর আবার তার কানে বাজলো। আদর করে রামশংকরের মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বললো—একটা কাজে গিয়েছিলাম কিনা, তাই দেরী হয়ে গেল।

—তুমি বললে, বাবার কাছে নিয়ে যাবে।

—তোমার বাবার খবর আনতেই তো গিয়েছিলাম। তাই তো এতো দেরী হলো।

—বাবার খবর আনতে গিয়েছিলে? তা আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?

—গাঁয়ে তো যাইনি। এইখানে বসেই গুরুমার কাছে খবর পেলাম। তোমার বাবার সন্ধানে ফিরিঙ্গী সেপাই এসেছিল গাঁয়ে। তারা তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে যেতো। তাই কবিরাজ মশাই আগে থেকে খবর পেয়ে তোমার বাবাকে গোয়াল-ঘরে বিচুলির গাদার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। ফিরিঙ্গীরা আজ এখানে আছে, কাল তারা বিদায় হবার পর আমরা যাবো।

—কাল যাবো?

—আগে খবর পাই যে ফিরিঙ্গীরা চলে গেছে।

—ফিরিঙ্গীরা বড় বজ্জাত, আমি বড় হয়ে সব ক'টাকে মেরে তাড়াবো।

—আগে বড় হও তবে তো।

দেবী হাসলো। রামশংকরের বড় হবার মুখে অলক্ষিতে যে বড় বাধা এসে দাঁড়িয়েছে, বালক তার কিছুই জানে না।

দেবী বললো—শংকর, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার?

—দাও না ঘোড়া, এক দৌড়ে এই বন পার হয়ে যাবো।

—তলোয়ার খেলতেও তো শিখেছ ?

—বা রে, আমরা বৈষ্ণব যে। তলোয়ার না খেললে কি বৈষ্ণব হয় নাকি ? বিষ্ণুর চার হাতের তিনটেতে লড়াইয়ের হাতিয়ার—শঙ্খ চক্র গদা। আর এক হাতে পদ্ম। বামুনেরও তাই একগুণ লেখাপড়া শিখলে তিন গুণ লড়াই শিখতে হবে ; তবে তো হিন্দুধর্ম রক্ষে হবে।

—তুমি দেখছি সব জানো ?

—রাজমন্ত্রীর ছেলে, সব জানতে হবে, আমি যে পরে মন্ত্রী হবো।

রামশংকর সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো।

দেবী হেসে ফেললো। বললো,—তুমি মন্ত্রী হলে আমি কি হবো ?

—তুমি কি হবে ?—রামশংকর ভাবনায় পড়লো, বললো—মন্ত্রীর দিদি কি হয় তাতো জানি না ? বল না কি হয় ?

—আমিও জানি না ভাই।

ঘরের সামনে বসে বসে দু'জনের গল্প চললো সন্ধ্যা অবধি।

॥ এগারো ॥

রাত গভীর হয়েছে।

রামশংকর ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেবী চুপ করে বসে আছে। তার চোখে ঘুম নেই। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শেয়ালের ডাক শোনার জন্য সে প্রতীক্ষা করছে। মনস্থির করে ফেলেছে। শেয়ালের ডাক শুনবে আর রামশংকরকে জাগিয়ে দেবে, তারপর হাঁটতে সুরু করবে বনের পথে।

দেবী পালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে, একখানি গামছায় ছাতু ও গুড় বেঁধে নিয়েছে। আর লোটা ও ত্রিশূল হাতের কাছেই আছে। এখন শুধু শেয়ালের ডাকের অপেক্ষা।

সহসা দরজার ঝাঁপের উপর যেন একটা ঝাঁকানি লাগলো। দেবী চমকে উঠলো।—কে ?

—আমি।—গুরুমার কণ্ঠ।

দেবী উঠে ঝাঁপ খুলে দিলে।

ভৈরবী বললো—ছেলেটা কোথায় ?

—ঘুমুচ্ছে।

—ডেকে তোল। আমি ওকে নিয়ে যাব। আমার কাছে ওকে রাখব।

—ভোরবেলা আমি পৌঁছে দিয়ে আসব'খন।

—না। এখনি নিয়ে যাবো, মায়ের আদেশ।

ভৈরবীর চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠলো যেন। ভৈরবী দু'পা এগিয়ে এসে দেবীর দুই কাঁধের উপর হাত রাখলো। দেবী থর থর করে কেঁপে উঠলো, তার মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টুপ্ করে সে সেইখানেই ঢলে পড়লো।

ভৈরবী অনায়াসে তাকে একপাশে সরিয়ে দিলে। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

রামশংকর ঘুমুচ্ছিল। ভৈরবী একখানি হাত রাখলো তার কপালে। স্থিরভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের পানে, তারপর বললে—জাগো, চোখ খোলো।

রামশংকর চোখ মেললো।

ভৈরবী বললো—ওঠো।

রামশংকর উঠে দাঁড়ালো।

ভৈরবী বললো—এসো।

রামশংকর তার অনুসরণ করলো।

ভৈরবী মন্দিরের পথ ধরলো। রামশংকর দম দেওয়া পুতুলের মতো ভৈরবীর পিছনে চললো।

ওপাশের ঘরে নিশি থাকে। ভৈরবীকে সে দেবীর ছাউনি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো। পিছনে রামশংকর। মুহূর্তে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। সে এসে ঢুকলো দেবীর ছাউনিতে।

দেবী ঘরের মধ্যে পড়েছিল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। নিশি তাকে নাড়া দিয়ে ডাকলো—দিদি—!

কোন সাড়া নেই।

কলসী থেকে জল নিয়ে নিশি তার চোখে মুখে দিলে। তারপর আবার একটা ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলো—ওঠো।

এবার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো। নিশি আবার ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলো—ওঠো।

দেবী চোখ মেললো। খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নিশির মুখের পানে। তারপর ধীরে ধীরে বললো—শংকর?

—শংকরকে গুরুমা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন—নিশি বললে।

—কোথায়?

—মন্দিরে।

—মন্দিরে? শংকরকে বলি দেওয়া হবে? আমি মন্দিরে যাবো।

দেবী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো।

নিশি বললো—কোথায় যাচ্ছ?

—মান্দরে। আমার এক ভাইকে ফিরিঙ্গীরা গুলি করে মেরেছে আর এই ভাইকে ভৈরবী খুন করবে, এ আমি হতে দেব না।

দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নিশি ডাকলো—শোনো শোনো—

দীপ্ত কণ্ঠে দেবী জবাব দিলে—না।

দেবী মন্দিরের পথ ধরলো।

নিশি ছুটলো তার পিছনে।

দু'জনে মন্দিরের সামনে এসে পড়লো। মন্দিরের মধ্যে দীপ জ্বলছে। ভিতরে সাড়া পাওয়া গেল, ভৈরবীর কণ্ঠ—ওঁ হ্রীং ক্রিং ফট।

দেবী থমকে দাঁড়ালো, নিশিও দাঁড়ালো পাশে।

দ্বারপথ দিয়ে মন্দিরের মধ্যে দেখা যাচ্ছেঃ ভৈরবী বসে আছে, পাশে রামশংকর। পরক্ষণেই ভৈরবীর উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গেল—কালী করালী লোলজিহ্বা রুধির-লোলুপা মহাশক্তি মা!

রামশংকরের কণ্ঠে শোনা গেল—কালী করালী লোলজিহ্বা রুধির-লোলুপা মহাশক্তি মা!

ভৈরবী বললো—মা—আত্মদানে তৃপ্ত হও।

রামশংকর পুনরাবৃত্তি করলে—মা আত্মদানে তৃপ্ত হও।

ভৈরবী বললো—তোমার চরণে আমি আত্মাহুতি দোব, তুমি প্রসন্ন হও, শক্তি দাও।

রামশংকর বললো—তোমার চরণে আমি আত্মাহুতি দোব তুমি প্রসন্ন হও, শক্তি দাও।

ভৈরবী বললো—এবার প্রণাম কর।

রামশংকর প্রণাম করলো।

ভৈরবী রামশংকরের কপালে সিঁদুর লেপে দিলে, তারপর হাত ধরে বললো —এসো।

ভৈরবী বেরিয়ে আসছে। নিশি তাড়াতাড়ি দেবীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো একখানি বড় পাথরের আড়ালে। পরক্ষণেই ভৈরবী রামশংকরের হাত ধরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো। পাশের ঝোপড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো, বললে—শো, এইখানে ঘুমো।

কয়েক মিনিট আর কোথাও সাড়া পাওয়া গেল না।

নিশি দেবীর হাত ধরে বললো—এসো, ঘরে যাই।

দেবী থরথর করে কাঁপছিল, প্রশ্ন তুললো—রামশংকর?—ওকে নিয়ে যাব না?

—এখন নয়, পরে ভেবেচিন্তে একটা ব্যবস্থা হবে।

দেবী বিহ্বলের মত কি যেন ভাবলো। নিশি তার হাত ধরে পাহাড় বয়ে নামতে স্থুরু করলো।

কিছুটা নেমে এসে সহসা দেবী শক্ত হয়ে দাঁড়ালো, এক ঝট্‌কায় নিশির হাত ছাড়িয়ে নিলে, বলে উঠলো—তোমাদের কোন কথা আমি শুনবো না। শংকরকে আমি কোনমতেই খুন হতে দোব না। ওই ভৈরবীকে আমি খুন করবো, ওকে আগে মায়ের কাছে বলি দোব।

—তা দিও, এখন চল।

নিশি আবার দেবীর হাত ধরলো। দেবী হু-হু করে কেঁদে উঠলো। নিশি জোর করে তাকে টেনে নিয়ে চললো ঘরের পানে।

॥ বারো ॥

রাত দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেছে। পাহাড়ের উপর একটি গুহার মুখে তাঁতিয়া টোপি মাধবরামের শুশ্রূষা করছেন। একটা কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে কি একটা পাতার রস ছেঁচে নিয়ে ফোঁটা ফোঁটা নিংড়ে দিচ্ছেন মাধবরামের মুখে।

ওদিকে মধুসূদন একটা পাহাড়ের গায় হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। দ্বিতীয় প্রহরের শিয়ালের ডাকে তার তন্দ্রা টুটে গেল, বললে—গুরুজী, আমি বসছি, আপনি বাকি রাতটুকু বিশ্রাম করে নিন।

তাঁতিয়া হাসলেন, বললেন—রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে মল্লিক, তুমি সারাদিন খেটেছ তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও।

তাঁতিয়া বেশি কথা বলার মানুষ নন, মধুসূদন আবার চোখ বুজলো।

খানিক পরেই একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল। তাঁতিয়া ভালো করে শোনবার চেষ্টা করলেন, তারপর ডাকলেন—মল্লিক !

মধু সোজা হয়ে বসলো, বলল,—কি ?

—কিসের যেন একটা আওয়াজ পাচ্ছি, দেখ তো।

বল্লমটা পাশেই ছিল, হাতে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে মধু উঠে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে শুনলো। এবার শব্দটা যেন আগের চেয়ে স্পষ্ট। চাঁদের আলোর নীচের উপত্যকার পানে তাকালো, তারপর বললো—একজন ঘোড়সওয়ার আসছে। মণিরাম বোধ হয়।

গুহা বরাবর এসে, অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নামলো। তারপর ঘোড়ার রাশ ধরে এঁকে-বেঁকে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলো।

অশ্বারোহী উপরে উঠে এল। একটা গাছের ডালে ঘোড়ার রাশটা জড়িয়ে দিয়ে সোজা তাঁতিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বললো—গুরুজী নমস্তে !

তাঁতিয়া মুখ তুলে তাকালেন, বললেন—এখনি ফিরে এলে যে ?

—থেকে কোন লাভ হতো না, অর্জুন সর্দারের কাছ থেকে কুমার সিং কোন সাহায্য পাবে না।

তাঁতিয়া বললেন—বসো, সব কথা শুনি।

মণিরাম তাঁতিয়ার সামনে বসলো। তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলো, আবদুল জব্বর খাঁ সেজে অর্জুন সর্দারের বৈঠকে উপস্থিত হবার কাহিনী। শেষে বললো,—এ ভৈরবী আমাদের চেনা—রামনগরের শ্মশানে নরবলি দিতে গিয়ে গুরুজীর কাছে ধরা পড়েছিল, নারীহত্যা করবেন না বলে গুরুজী তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, এ সেই গঙ্গা ভৈরবী। ওর শরীরে দয়া-মায়া কিছু নেই, ও একটা ডাকিনী।

তাঁতিয়া বলে উঠলেন—স্ত্রী-হত্যা না করে তুমি ভালই করেছ মণিরাম।

তাঁতিয়া কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সামনের অন্ধকারের পানে। মাথার উপর এক আকাশ তারা, দেবতার চোখের মত নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত কর্মধারা ওরা দেখছেন।

মণিরাম দত্ত ও মধুসূদন মল্লিক ব্যারাকপুরের ব্যারাকে মঙ্গল পাঁড়ের

হত্যাকাণ্ডের সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল তাঁতিয়ার কাছে, তারপর থেকেই দু'জনে তাঁতিয়ার পাশে পাশে আছে।

তারা জানতো, এই মারাঠি ব্রাহ্মণের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন…কিন্তু কানপুরের বিবিগড় প্রাসাদের হত্যাকাণ্ডের পর মানুষটি যেন একেবারে বদলে গেছে। হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন, ঘরে ঘরে রক্তের দাগ দেখে, কূপভর্তি মৃতদেহ দেখে তাঁতিয়া মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, সারারাত বিনিদ্র থেকে তিনি শুধু বার বার আর্তস্বরে প্রার্থনা করেছেন— ভগবান, তুমি আমাদের ক্ষমা করো—শংকর ক্ষম মম অপরাধ!…

॥ তেরো ॥

গঙ্গাতীরে বিশাল এক নিমগাছ, নিমগাছের অদূরেই শ্মশান। সেদিন উষালোকের আগেই এই নিমগাছের নীচে দু'জন কৌপীনধারী সন্ন্যাসীকে দেখা গেল। গায় ছাই মাখা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী— কে গুরু, কে চেলা বোঝার উপায় নেই।

অদূরে স্নানের ঘাট। দু-চারজন বনবাসী রমণী এলো ঘাটে, তাদের নজরে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাধু সমাগমের কথা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আসতে লাগলো সাধু দেখতে।

প্রধান সাধু মৌনী, কোন কথা বলেন না, অপরজন দু-একটি কথা বলেন, কেউ কিছু বললেই বলেন—সবই শংকর করাচ্ছেন, সব তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁকে স্মরণ কর—তিনি সব ঠিক করে দেবেন।

অর্জুন সর্দার এসেছিল স্নান করতে। এদিকে ভীড় দেখে এগিয়ে এলো। রমণী ও বালক-বালিকারা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালো। চেলা বললো—বসো।

অর্জুন উবু হয়ে বসলো। চেলা আর কিছু না বলে অগ্নিকুণ্ডের কাঠগুলি জড়ো করতে সুরু করলো। সর্দারের এক সহচর বললো—সাধুজী, ইনি আমাদের সর্দারজী।

চেলা মুখ তুললো। কয়েক মুহূর্ত সর্দারের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে সহসা সর্দারের থুত্‌নি ধরে বললো—আকাশের পানে তাকাও।

সর্দার আকাশের পানে মুখ তুললো। সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের

পানে তাকালো, তারপর বললো—লড়াই করবি ?—না, তুই লড়াই করবি না। লড়াই করলেই তোর শেষ। তোকে লড়াই করার কথা কেউ বলেছে ?

—জগদীশপুরের কুমার সিং দু' হাজার তীরন্দাজ চেয়েছে।

—কুমার সিংয়ের লড়াইয়ের সঙ্গে তোর কি ? পরের লড়াই ঘরে ডেকে আনবি কেন ? যেমন আছিস থাক, খা-দা ঘুমো।

কথাটা অর্জুনের মনের মত হলো, হেসে বললো—আমিও তাই ভেবেছি।

—ঠিক আছে, যা, এখন ওঠ।

সর্দার নমস্কার করে বিদায় হলো।

দেখতে দেখতে দুপুরের রোদ তীব্র হয়ে উঠলো। সমবেত নারী ও শিশুরা উঠে গেল। সর্দারজীর কাছ থেকে একটি লোক ছোট একটি কলসী ভরে দুধ নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে চেলা স্নান করে এসে গঙ্গামাটি দিয়ে একটা শিবলিঙ্গ গড়ে ফেললো। গুরুজী স্নান করে এলেন। তারপর সেই শিবের সামনে বসে, তার মাথায় অল্প অল্প দুধ দিতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন—ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায় !

বেশ কিছুক্ষণ পূজা চললো। শেষে গুরুজী পিছিয়ে বসলেন। এবার চেলার পূজা স্বরু হলো।

চেলাও ঐ ভাবে কিছুক্ষণ পূজা করে শিবলিঙ্গটি মাথায় তুলে নিলেন, তারপর গঙ্গাগর্ভে সেটি ভাসিয়ে দিয়ে একটা ডুব দিয়ে উঠে এলেন।

এবার গুরুজী ও চেলা কলসীর দুধটুকু কমণ্ডলুতে পূর্ণ করে গলায় ঢেলে দিল।

স্নান করে দুই সন্ন্যাসীর গা পরিষ্কার হয়েছিল, আবার কুণ্ডের ছাই নিয়ে তারা মাখতে বসলো।

ইতিমধ্যে গঙ্গার তীর ধরে এক ভৈরবীকে আসতে দেখা গেল।

গুরু বললো—ওই আবার এক গেরুয়াধারী আসছে, তুমি ঠিকমত সামলে নিও, আমি মৌনী হলাম।

চেলা হাসলো, বললো—কুছ ডর নেহি, মহারাজ।

ভৈরবী আমাদের পরিচিত অষ্টভুজা মন্দিরের নিশি।

সামনে এসে ভুমিষ্ঠ হয়ে সে প্রণাম করলো, তারপর বললো—মহারাজ, কোথা থেকে আসছেন ?

চেলা বললো—আমরা এই জঙ্গলেই থাকি, এদিকে ওদিকে ঘুরি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন ?

—কিছু ঠিক নেই, গুরুজীর ইচ্ছা।

—কিন্তু আমি আসছি ভৈরবীর কাছ থেকে, তিনি বলেছেন, আপনারা অবশ্য যাবেন মা অষ্টভুজাকে একবার দর্শন করতে। সেখানে তিনদিন থাকবেন। অমাবস্যার রাত্রে মায়ের মহাপূজা হবে।

—মহাপূজাটি কি নরবলি ?—এখানে তো নরবলি হয় বলে শুনছি।

—হ্যাঁ, এবারও নরবলি আছে, একটি ছোট ছেলেকে বনের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। সে এবার মায়ের কাছে আত্মোৎসর্গ করবে।

—বল কী ? ক' বছরের ছেলে ?

—বয়সে কি হবে ? সে মায়ের কাছে আত্মদান করবে। ভৈরবী সিদ্ধিলাভ করবেন।

—এ তো পৈশাচিক ব্যাপার। মা তো শংকরের অংশ, শংকর হচ্ছেন—সত্য শিব ও সুন্দর, আর মা হচ্ছেন—মহাকালী, অতীত থেকে ভবিষ্যতের অনন্ত অন্ধকার—অজ্ঞাত মহাকাল, খড়্গ দিয়ে তিনি অসুরের মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন, অর্থাৎ জ্ঞান দিয়ে তিনি তামসিক ভাবকে ধ্বংস করেছেন।

—ওসব তত্ত্বকথা রাখুন সাধুজী। আপনাদের ওসব তত্ত্ব এখানে কোন কাজে লাগবে না। তবে আপনারা পূজা দেখতে আসবেন কি না তাই বলুন ?

—না। নরবলি দেখতে যাবো না। বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করে আমরা চলে যাবো।

—বেশ, আমি তাহলে ভৈরবীকে সেই কথাই বলবো।

নিশি চলে গেল। গুরু বললো—তুই আসল ব্যাপারটাই ভেস্তে দিলি, ছেলেটার পুরো পরিচয়টা জেনে নিলি না ?

—যেটুকু জেনেছি তাতেই হবে, ওই মাধবরামের ছেলে। রাত দুপুরে অতর্কিতে গিয়ে হাজির হবো, আর ছেলেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসবো, রুখে দাঁড়াবার সময় দোব না। আজ রাত্রেই যাব।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্যাস্তের পর পশ্চিমের আবির-ঢালা আকাশ ধীরে ধীরে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

বল্লম হাতে এক অশ্বারোহী কদমতালে এগিয়ে আসছে, গঙ্গা-তীরের পথ ধরে। ঘোড়ার মুখে ফেণা, দীর্ঘপথ অতিক্রম করার জন্য গতি শ্লথ।

সন্ন্যাসী দু'জনকে দেখে অশ্বারোহী বারেক থামলো, জিজ্ঞাসা করলো—সাধুজী, সামনের ওই পাহাড়টাই আটভুজীর মন্দির না ?

—জী হ্যাঁ,—চেলা জবাব দিল।

ঘোড়সওয়ার এগিয়ে গেল।

গুরুজী বললো—চিনতে পারলে! কে ?

চেলা বললো,—অমর সিং ?

—কিন্তু একা এভাবে এখানে ছুটে এলো কেন ? জগদীশপুরের খবর কি ?

—বোধ হয় সাহায্য চাইতে এসেছে।

—অর্জুন সর্দারের মজলিশের খবরটা নিতে হবে আগে, তারপর আর সব ব্যবস্থা। আরেকটু রাত হোক।

॥ চৌদ্দ ॥

সন্ধ্যারতি শেষ হলো।

ভৈরবীর পাশেই ছিল রামশংকর। পূজা শেষে রামশংকরকে দিয়ে ভৈরবী যথারীতি দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়ে উচ্চারণ করালো—মা, করালবদনা, লোলজিহ্বা, বিকটদশনা, মহাশক্তি, মহামায়া, তোমার তৃপ্তির জন্য আমি আত্মদান করবো, তুমি প্রসন্না হও।

তারপর দেবীর প্রসাদ বলে ঢক্ঢক্ করে খানিকটা তাড়ি তার গলায় ঢেলে দিলে। সম্মোহিত রামশংকর পুতুলের মত নির্বিকার। ভৈরবী তার হাত ধরে নিয়ে এসে, নিজের ঝোপ্ড়ির মধ্যে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল। বললো—ঘুমো।

রামশংকর ঘুমিয়ে পড়লো।

নিশি বাইরে দাঁড়িয়েছিল, ভৈরবী বললো—দেবী আজ দু'বারই পূজায় আসে নি কেন ?

—সারাদিন কিছু খায়নি, চুপ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে—নিশি বললো।

—বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। মায়ের পূজায় অবহেলা আমি কোনমতে সহ্য করবো না। তুমি এখনি গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দাও গে, আমি গুহায় আছি।

মন্দির থেকে একটু তফাতে গুহা। এই গুহা ভৈরবীর গুপ্তভাণ্ডার। এখানে নানা জরী-গুটি সঞ্চিত আছে। ছোট গুহামুখ পার হয়ে মাথা নত করে নীচে নেমে যেতে হয়, অনেকটা গর্তের মত। যেতে ভয় করে।

সেই গুহার মধ্যে কাউকে খুন করে ফেললেও বাইরে কেউ জানবে না। নিশি দেবীকে গিয়ে বললো,—দেবী, গুরুমা তোমাকে এখনি ডাকছেন, গুহায় যেতে হবে।

—আমি যাব না।

—ইচ্ছা করে ফ্যাসাদ বাধাচ্ছিস্, ডাকছেন, একবার দেখা করে আয় না বাপু, কি বলছেন শুনে চলে আসবি।

—যাবো না।

নিশি আর কিছু বললো না, দেবীর সামনে থেকে সরে এলো।

বাইরে এসে দেখে ভৈরবী আসছে। নিশি থমকে দাঁড়ালো।

ভৈরবী দিবার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, ডাকলো—দিবা!

দিবা কোন সাড়া দিলে না।

ভৈরবী ভিতরে ঢুকলো, দিবার হাত ধরলো, বললো—উঠে আয়!

সেই স্পর্শে কি ছিল কে জানে, দিবা একবার শিউঁরে উঠলো, তারপর বিনা বাক্যে-উঠে দাঁড়ালো। ভৈরবী তার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, নিয়ে চললো মন্দিরের দিকে। নিশি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চললো তাদের পিছু পিছু।

গুহার সামনে এসে ভৈরবী থামলো। দেবীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললো—ভিতরে চল্।

দেবী থমকে দাঁড়ালো। ভৈরবী দেবীর কাঁধে একটা ঝাকানি দিয়ে বললো—নাম্।

দেবী নীরবে নামতে স্বরু করলো।

কয়েকটা ধাপ নেমে নিচে একখানি প্রশস্ত ঘরের মতো। একধারে পিদিম জ্বলছিল। সেই পিদিমের সামনে এসে দেবী দাঁড়ালো।

ভৈরবী নেমে এলো দেবীর পিছনে। বললো—তুই আজ সকাল-সন্ধ্যা মায়ের পূজায় হাজির হলিনি কেন? ভেবেছিস্ আমার এখানে থেকে যা মন চায় তাই করবি? তা চলবে না। আমার এখানে অবাধ্যতা সারাবার খুব সোজা দাবাই আছে, তাই দেখাতে আনলাম তোকে, দেখে যা।

ভৈরবী ঘরের কোণ থেকে একটা মাটির ভাঁড় তুলে আনলো। পিদিমের সামনে ধরে ভাঁড়ের মুখের সরাখানি তুলে ধরলো। তিন চারটি কালো কালো পাহাড়ী বিচ্ছু তার মধ্যে পড়ে আছে। ভাঁড়ে একটা ঝাঁকানি দিতেই

বিচ্ছুগুলো সজাগ হয়ে উঠলো, হুল তুললো মাথার উপর, ভাঁড়ের মধ্যে একটা কড় কড় শব্দ উঠলো। ভৈরবী বললো—দেখেছিস্? আমার সঙ্গে নষ্টামি করলে একটা কামড়েই সিধে হয়ে যাবি—পুরো তিনটি দিন যাতনায় ছট্‌ফট্ করবি।

একটা বিচ্ছু ভাঁড়ের কিনারা অবধি এসে পড়েছিল, আঙুলের এক ঝট্‌কায় তাকে নামিয়ে দিয়ে ভৈরবী আবার ভাঁড়ের মুখে সরা চাপা দিয়ে ভাঁড়টি যেখানে ছিল, রেখে এলো।

তারপর বেতের ঝুড়িটি টেনে নিয়ে বললো—ওতেও যদি তোর ব্যারাম না সারে তো শেষ ওষুধ আমার কাছে আছে। তা-ও তোকে দেখিয়ে রাখি।

ভৈরবী ঝুড়ির ঢাক্‌না খুললো। মুখে শিষ দিয়ে উঠলো। সরসর করে একটা গোখরো সাপ ঝুড়ির ভিতর থেকে মাথা তুললো। ভৈরবী আবার শিষ দিল, সাপটা ফণা ধরে দুলতে সুরু করলো।

কোমরের কাপড়ের ফাঁকে কোথায় যেন একটা ব্যাঙ গোঁজা ছিল, ভৈরবী চকিতে ব্যাঙটিকে বের করে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল, সাপটা চমকে উঠে একটা ছোবল দিল, ঢাকনাটা দিয়ে ভৈরবী ছোবলটা আটকালো, তারপর ঢাকনাটাকে আবার চেপে বন্ধ করে দিলে। বললো—এই তোর শেষ দাবাই, এই দাবাইয়ে অনেক রথী-মহারথীকে সোজা করেছি, দরকার হয় তোকেও করবো! এখন যা—

দেবী যেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, তেমনি নীরবে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসেই সে থমকে দাঁড়ালো, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বল্লমধারী পুরুষ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করার আগেই পুরুষটি বললো—আমি অর্জুন সর্দার! গুরুমা কোথায়?

গুহার দিকে হাতের ইশারা করে দেবী সর্দারকে পাশ কাটালো।

নিশি একখানি পাথরের আচাল থেকে এগিয়ে এলো, বললো—কি বললে?

—কিছু না—দেবী বললো—একটা গোখ্‌রো সাপ আর গোটা চারেক বিচ্ছু দেখালে।—আমাকে কামড়াবে।

—তোকে কামড়াবে? কেন?

—আমাকে শায়েস্তা করার জন্য।

—সাপে কামড়ালে তো মরে যাবি?

—যাব।—দেবী হাসলো, বললো—যতই বলুক আর যে ভয় দেখাক্

শংকরকে আমি কিছুতেই বলি দিতে দোব না। শংকরকে নিয়ে আজ রাতেই পালাবো। তুই দেখিস্।

দেবীর পিছনে ভৈরবী গুহামুখে এসে দাঁড়ালো। সামনেই অর্জুন সর্দার। ভৈরবী বললো—খবর কি সর্দার ?

কোনরকম ভূমিকা না করে সর্দার বললো—কুমার সিংয়ের ভাই অমর সিং এসেছে। বলছে দু' হাজার তীরন্দাজ চাই।

—ফিরিঙ্গীদের কামানের সামনে তীরন্দাজ কী করবে ? শুধু গুলী খেয়ে মরবে। তুমি কিছু বলেছ ?

—বলেছি সাতদিন সময় চাই। তিনি বলেছেন—একদিনও নয়, কাল সন্ধ্যায় দু'হাজার লোক চাই।

—এ কি জুলুম নাকি ? বলে দাও—এতো তাড়াতাড়ি লোক জোগাড় হবে না, তুমি পারবে না। যে শক্তিমান তারই দলে ভিড়তে হবে, এই হোল রাজনীতি। ইংরেজকে খুসি রাখো, তোমার ভালো হবে।

—তাতো বুঝি, কিন্তু এখন অমর সিংকে কি বলি ?

ভৈরবী খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কি যেন ভেবে নিলে। তারপর বললে—কিছু বলতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।

ভৈরবী গুহার ভিতর নেমে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সাপের চুব্‌ড়িটা হাতে নিয়ে উঠে এলো। বললো—এই নাও, এর মধ্যে একটা বিষধর গোখ্‌রো আছে, এইটি নিয়ে যাও, আজ রাতে অমর সিং অতিথ্‌শালায় শোবে, সেই ঘরে রাত্রে এই সাপ ছেড়ে দেবে। সাপের কামড়ে মৃত্যু ঘটলে কারও কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। যাও, আমি এবার জপে বসবো।

চুব্‌ড়িটা হাতে নিয়ে অর্জুন সর্দার নীরবে বিদায় নিলে।

॥ পনেরো ॥

গঙ্গার তীরে অতিথ্‌শালা, মানে একখানি মাটির ঘর, ঘরের পিছন দিকে দুটি ছোট ছোট গবাক্ষ আছে। রাত্রির অন্ধকারে সেই গবাক্ষের নীচে এসে দাঁড়ালো অর্জুন সর্দার, হাতে সেই ঝাঁপি।

ঘরের ভিতর অমর সিং ঘুমুচ্ছিল। বন্ধদ্বারের ভিতর থেকে তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। অর্জুন সর্দার চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল,

তারপর একটি গবাক্ষের কাছে এসে হাতের ঝাঁপিটা তুলে ধরলো গবাক্ষের কিনারায়। এমন নিবিষ্ট মনে সে কাজ করছিল যে তার পিছনে একটি লোক যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কাছে এসে পড়েছে তা সে খেয়াল করেনি। ঝাঁপির ঢাক্‌নাটা খুলতে গেছে, এমন সময় পিছনের মানুষটি এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরলো, বললো—কি করছ সর্দার?

সর্দার চমকে উঠলো।

—ঝাঁপিতে কি? সাপ?

সর্দার মুখ ফেরালো, বললো—জব্বর খাঁ, তুমি এখানে?

জব্বর ওরফে মণিরাম ঝাঁপিটা এক ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে দিল। মাটিতে পড়েই ঢাকনাটা খুলে গেল, একটি মস্ত গোখরো সাপ মাথা তুললো ঝাঁপির ভিতর থেকে। ঝাঁকানি লেগে সাপটি ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সামনেই সর্দারকে দেখে লাফিয়ে পড়লে সর্দারের উপর। সর্দার আর্তনাদ করে উঠলো। সাপটি সরাসরি বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

ঘরের মধ্যে অমর সিংয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, বল্লম হাতে নিয়ে দ্বার খুলে সে ত্বরিৎ পদে বেরিয়ে এলো, বললো—কে? কে এখানে?

সর্দার তখন বসে পড়েছে।

মণিরাম বললো—আপনাকে খুন করার জন্য মন্দিরের ভৈরবীর কাছ থেকে সাপ নিয়ে এসেছিল। আপনার ঘরে সেই সাপ ছাড়তে গিয়ে নিজেই তার কামড় খেয়েছে।

অমর সিং মণিরামের মুখের পানে ভালো করে তাকিয়ে বললো—তুমি কে? তোমাকে তো চিনি বলে মনে হচ্ছে?

—আমি তাঁতিয়াজীর গোমস্তা, মণিরাম দত্ত।

—তোমরা দু'জন ছিলে না?

—তিনিও আছেন।

—তাঁতিয়াজী কি তাহলে এখানেই আছেন?

এবার সর্দার আর্তস্বরে বলে উঠলো,—একবার রোজাকে খবর দাও, আমাকে বাঁচাও, নাহলে আমি এখনি মরে যাবো।

—বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুই ভাল।

-আমি আর কখনো অন্যায় করবো না, আমাকে বাঁচাও।

মণিরাম দু'হাত দিয়ে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে।

গঙ্গার কিনারায় মাটির উপর সর্দারকে শুইয়ে দিলে, অমর সিংকে বললো,—আপনি এর মাথায় মুখে জল দিন, আমি ততক্ষণ একবার ভৈরবীর কাছে যাই, যদি কোন ওষুধ থাকে।

অমর সিং বললো—বিশ্বাসঘাতককে বাঁচিয়ে কি হবে? ও তো সুবিধা পেলে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

মণিরাম হেসে বললো—আমরা সন্ন্যাসী চাচাজী, গুরুজী বলেন বিপন্নের সঙ্গে বিবাদ করবে না, আর্তের সেবা করবে। আপনি একে দেখুন, আমি আসছি।

মণিরাম গঙ্গার তীর ধরে দৌড়তে সুরু করলো।

॥ ষোলো ॥

ভৈরবী তাড়ির কলসীটা শেষ করে ঝোপ্‌ড়ির দরজার খুঁটিটায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল, এমন সময় ধীরপদে দেবী এসে দাঁড়ালো সামনে। ভৈরবীর বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, সে চোখ মেললো না। দেবী একবার ভৈরবীর মুখের পানে তাকিয়ে ত্বরিত পদে ভিতরে ঢুকে গেল। রামশংকর একপাশে একটা মাদুরের উপর জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল, দেবী তাকে কোলে তুলে নিলে।

তাড়ি খাওয়ানোর জন্য রামশংকরের মুখে ফেণা জমেছিল, ঝাঁকানি খেয়ে গলার মধ্যে একটা ঘরঘর শব্দ হলো। সেই শব্দে ভৈরবীর তন্দ্রা টুটে গেল। ভৈরবী চোখ মেললো, বললো—কে?

—আমি।—দেবী সাড়া দিল।

—এখানে কী?

—রামশংকরকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—ওকে এখন কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না, ও এখানে থাকবে।

—আমি ওকে বলি দিতে দোব না।

—ও মায়ের চরণে আত্মোৎসর্গ করেছে!

—ও কিছুই করে নি।

—মা রক্ত চান, তুই ওকে রেখে যা।

—না।

—না? আমার কথার উপর কথা!

ভৈরবী চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দেবীর গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

—কি আমায় মারলে?

—আরো মারবো।—খুন করে ফেলবো। ওকে রেখে যা—

ভৈরবী পাশ থেকে ত্রিশূলটা তুলে নিলে। দেবী বেপরোয়া হয়ে ভৈরবীকে এক ধাক্কা মেরে সেই ঝোপ্‌ড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ভৈরবী ত্রিশূলের এক ঘা বসিয়ে দিলে দেবীর হাতে। বাঁ হাতখানি অবশ হয়ে গেল। বাঁ কোলে রামশংকর ছিল, কোল থেকে পড়ে গেল। ভৈরবী



হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললো। বললে,—যা, সামনে থেকে দূর হয়ে যা—

দেবী সামনে জলন্ত কাঠগুলোর পানে তাকালো। চকিতে কাঠখানি তুলে নিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল ভৈরবীর উপর। মাথায় না লেগে কাঠের জলন্ত

মুখটা পড়লো ভৈরবীর কাঁধের উপর। ভৈরবী সেইখানেই পড়ে গেল, ভৈরবীর কাপড়ে আগুন ধরে গেল, সে হাউ হাউ করে উঠলো—রাক্ষসী! পুড়িয়ে মারলে!

দেবী শঙ্করের হাত ধরে বললো—চল্‌।

ঠিক সেই সময় মণিরামও পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। দেবীকে সামনে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করলো—ভৈরবী কোথায়?

—কেন?—আমি তাকে খুন করেছি। ওই পড়ে আছে।

—তাহলে তো এতটা দৌড়ে আসা পণ্ডশ্রম হলো,—মণিরাম থমকে দাঁড়ালো।

ভৈরবীর গাত্রবস্ত্র তখন পুড়ে গেছে, ভৈরবীর সর্বাঙ্গ ঝলসে কালো হয়ে গেছে। জড়সড়ো হয়ে সে পড়েছিল, শুধু একটা গোঁ গোঁ শব্দ।

মণিরাম কাছে গিয়ে ডাকলো—ভৈরবী! ভৈরবী!

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মণিরাম বললো—অনেক পাপ করেছিল, এইভাবেই তার প্রায়শ্চিত্ত হলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। গুরুজীর কাছে গিয়ে খবরটা দিই গে।

॥ সতেরো ॥

পরের ঘটনা, সংক্ষিপ্ত।

মধু মল্লিকের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তাঁতিয়া ছুটে এলেন। পরদিন সকালেই বনবাসী মাতব্বরদের সভা ডাকা হলো। মাতব্বরদের সামনে অর্জুন সর্দার ও ভৈরবীর মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

সর্দারের ছেলেরই সর্দার হবার কথা। কিন্তু অর্জুনের ছেলের বয়স মাত্র আট বছর, তাঁতিয়া মাধবরামকে তার অভিভাবক নিয়োগ করলেন। আর দেবী হলো অষ্টভুজা মন্দিরের ভৈরবী।

সব বন্দোবস্ত ঠিক রাখার জন্য তাঁতিয়া সেইখানেই কয়েকদিন রয়ে গেলেন। সেই রাত্রেই দু'হাজার তীরন্দাজ নিয়ে অমর সিং জগদীশপুর যাত্রা করলেন।

অষ্টভুজা মন্দিরে সেই থেকে নরবলি বন্ধ হলো এবং রামশংকর সুস্থ দেহে তার বাবার কাছে ফিরে গেল। এইখানেই এই গল্পের শেষ।

কিন্তু সিপাহীযুদ্ধের সঙ্গে যোগ থাকার জন্ত সেদিকের কথাও একটু বলা ভালো। জগদীশপুরের যুদ্ধে কুমার সিং জিতলেন। ইংরেজরা সেখানে যে মার খেল, তা কোনদিন তারা ভুলতে পারেনি, কিন্তু সেই তাঁর শেষ যুদ্ধ। কুমার সিং নিহত হলেন। অমর সিং ফিরে এলেন তাঁতিয়ার কাছে পরামর্শ করতে। কিন্তু সেই বনাঞ্চল থেকে তিনি আর বেরুবার সুবিধা পেলেন না। তবে অল্পদিনের মধ্যেই সেই বনভূমি ফিরিঙ্গীদের এক ভীতিকর শত্রুক্ষেত্রে পরিণত হলো এবং অমর সিং যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ফিরিঙ্গীরা সেই অঞ্চলে স্বস্তি পায়নি।

এই সংগ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে দুটি বালক বর্ধিত হয়, রামশংকর ও অর্জুন সর্দারের পুত্র বিশ্বনাথ। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে এরা কোনদিনই আপোষ-রফায় আসতে পারেনি। বড় হয়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে এরা মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছিল, ইতিহাসের পাতায় তা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। সে আর এক কাহিনী।

চাঁদপুরের তিতুমির, মক্কা থেকে ফিরলো হাজী হয়ে। যশোর ও নদীয়ার বহু মুসলমান চাষী তার শিষ্য হলো। জমিদার কৃষ্ণ রায় নতুন খাজনা বসালো। চাষীরা বিদ্রোহ করলো। লাঠালাঠি সুরু হয়ে গেল। তিতুমির হলো তাদের নেতা। চব্বিশ পরগণার নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরী করে ফেললো। কলকাতা থেকে ফৌজ গেল, কিন্তু হেরে ফিরে এলো। এবার গেল গোলন্দাজ বাহিনী। লড়াই হলো, তিতু মারা পড়লো। ৩৫০ জন বন্দী হলো। তিতুর প্রধান সাকরেদ গোলাম রসুলের ফাঁসী হয়ে গেল আর ১৪০ জনের হলো কঠোর কারাদণ্ড।

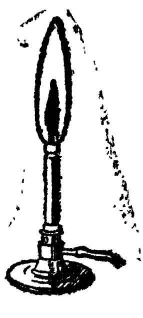


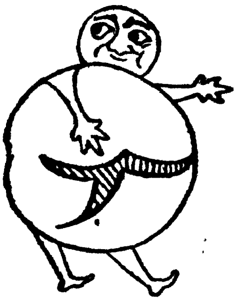
চড়াই

*

শ্রী রেবতীভূষণ ঘোষ

ছবি দেওয়া চলবে নাকো
নেবেন শুধু ছড়া-ই
এমনতরো কড়ার, দাদা,
রীতিমতো কড়া-ই।
ছড়ার অঙ্গে ছবির ছিটে
অম্ল মধুর কড়া-মিঠে
শূন্য যেমন দশের পিঠে
একশো হওয়ার বড়াই।
এলোমেলো ছড়ার কথা
ছড়িয়ে বেড়ায় যথা-তথা
কুড়িয়ে খুঁটে থাক্‌না এসে
রেখায় আঁকা চড়াই।





হাট্টিমা টিম্ টিম্

*

শ্রী গৌর আদক

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
মাঠের ধারে বটের ছায়,
দুপুর বেলা দক্ষিণ বায়
বসে থাকে আদুর গায়
চক্ষে ধরে ঝিম।

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
ধরলে মাথা সাঁঝের কালে
আঁধার হলে আকাশ ভালে,
আবছা কালো মেঘের থালে
খায় সে গুলে হিম।



লেখাপড়া কল্লে যেই…

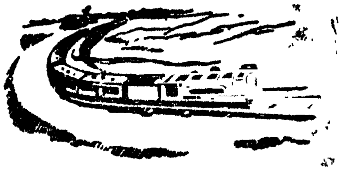
শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী



"লেখাপড়া করে যেই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই—"
—লেখাপড়া করা কি মা গাড়ী ঘোড়া চড়তেই ?
তার বেশী কিছু নয় ?
যদি বল,—নিশ্চয়
লেখাপড়া আমি মাগো এখ্‌খুনি ছেড়ে দেই !
জান ত মা, ও পাড়ার
ক্যাবলা ও ভ্যাবলার
ক্লাসে পড়া কোনদিন হয় নাকো কারুরি,—
ইস্‌কুলে আসে ওরা
চড়ে গাড়ী-জুড়ী-ঘোড়া
লেখাপড়া না করে যে ওরা চড়ে গাড়ী-জুড়ী ?
তুমি বল, রামদাস
করেছেন কত পাশ,
বিদ্যেতে ওঁর নাকি কোথ্‌থাও জুড়ি নেই,
তবু তিনি অফিসেতে
রোজ যান হেঁটে হেঁটে
লেখাপড়া এত ক'রে হ'ল তার ফল এই ?
মিছে কথা ব'লে ব'লে
এতদিন কত ছলে
ভুলিয়েছ,—আর মোরা ভুলব না কিছুতেই,
আমরা ত ছোট নই,
লেখাপড়া করবই,
সে ত শুধু নয় ওই গাড়ী-ঘোড়া চড়তেই ?

কেউ যদি শুধু দেয় বলে * শ্রী শৈলশেখর মিত্র

আমি যদি রেলগাড়ি হয়ে
মাঝ রাতে ছুটি দূর দেশে
তবে আর থামছিনা জেনো
কোনোদিন কোনোদিকে এসে।



কতগিরি পথ, নদী বন,
শুধু মরু হয়ে যাব পার ;
চলা আর চলা—প্রশ্নই
উঠবে না কখনো থামার।

পার হয়ে পৃথিবীর সীমা,
নতুন পৃথিবী যদি পাই,
কি মজাই হবে—তাই ভাবি
মাঝরাতে রেল হয়ে যাই।

স্টেশানের লাল সিগন্যালে
থামবো না, ছুটে যাব চলে।
কি কোরে যে রেল হওয়া যায়
কেউ যদি শুধু দেয় বলে।

ফুস্ মন্তর * শ্রী শৈলেন দত্ত



ফুস্ মন্তর ফুঃ
টু থাউসেণ্ড রূপিয়া আজ হচ্ছে টুয়েন্টি-টু।
হাউই হয়ে পয়সা-টাকা শূন্যেতে খায় লাট,
চাকরিজীবী হাতড়ে মরে পকেট গড়ের মাঠ।
মন্ত্রগুণে হয়গো এসব নেইকো লেখা-জোকা,
গুদাম গুদাম চাল খেয়ে যায় ছ'লাখ ধেনো পোকা।
একটি টাকার লিচুর কুড়ির তিন টাকা দাম।
আনায় জোড়া সব্রি কলা টাকায় দেখিলাম।
ফুস্ মন্তর ফুস্ মন্তর ফুস্ মন্তর—চুপ!
মশলা পটির লংকাগুদাম হলো সোনার স্তূপ।
মন্ত্রগুণে হয়রে এসব, হচ্ছে হবে হুঃ,
বিরাট বিরাট প্রকল্প ব্যয় হচ্ছে কোথায় ফুঃ।
হাজার রকম মন্ত্র আছে, লাখো গুণের হাড়,
মন্ত্রবলে টগবগিয়ে ছুটছে রে কারবার।



শ্যামলা মেয়ে

*

শ্রীমতী মায়া ঘোষদস্তিদার

ঘুম ঘুম চোখ শ্যামলা মেয়ে
ভরতে চলেছে জল
ঝুম্ ঝুম্ তার কালো পায় পায়
বাজে ক্ষণে ক্ষণে মল।
মেঘ মেঘ তার চুলের রাশিতে
পিঠখানি গেছে ছেয়ে
দুলে দুলে চলে মেঠো পথ ধরে
ময়না পাড়ার মেয়ে॥
নীল নীল শাড়ী, চুড়ি বেলোয়াড়ী,
নোলক দুলিছে নাকে
ছোট ছোট হাতে জড়ায়ে রেখেছে
ছোট কলসীটি কাঁখে।
হাট ভেঙে গেছে হাটুরেরা ফেরে,
সূর্য নামিছে পাটে,
শ্যামলা সে মেয়ে অলস চরণে
চলেছে পুকুর ঘাটে॥
দূর হতে দূরে পল্লীর পথ
চলে গেছে এঁকে বেঁকে,
নেশা ভরা চোখে শুধু চেয়ে থাকি
গরুর গাড়ীটি থেকে।



কি পড়া যে পড়

*

স্বামী প্রেমানন্দ

এত্তো এত্তো বই
খোকা—পড়ছ তুমি কই?
এত্তো এত্তো খাতা
কি লিখছ মুণ্ডু মাথা?
ভর্তি দোয়াত কালি
বলি, হচ্ছে কিসে খালি?
সন্ধ্যে থেকে আলো
বই খুলে যে জ্বালো
কি পড়া যে পড়—
ডজন খানেক বই করেছ জড়।
দুলে দুলে কর কেবল হল্লা,
পরীক্ষাতে খেতে দেখি গোল্লা।

ছড়া

শ্রী শৈলেনকুমার দত্ত

শালিখ শালিখ শালিখটি
কোথায় তোমার মালিকটি—
এই দুপুরে করছো কি
পোকা মাকড় ধরছো কি ?
কিংবা বুঝি খুকুর কাছে জানাও তোমার নালিশ কি ?



ময়না ময়না ময়ননারে
গলায় কিসের গয়নারে—
মিষ্টি সুরে গাস কি গান
একটি মিঠে খাস কি পান ?
তাই কি খুকু আমার সঙ্গে একটি কথাও কয় না রে ?

চড়াই চড়াই চড়াইরে
কিসের যে তোর বড়াইরে—
ওই তো ছোট ঠোঁট দুটো
খুঁজিস তো তুই খড়কুটো
তোর মত কি পুষি এলেই আমি অমন ডরাইরে ?



ত্যাগী ও ভোগী

*

শ্রী হিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

ত্যাগে লোক বড় হয় ভোগে নাহি হয়,
ত্যাগীর সুনাম রটে সারা বিশ্বময়।
ভোগী বড় হতে চায় ঠকায়ে সবায়,
ত্যাগী লোক সুখ পায় অন্যের সেবায়।

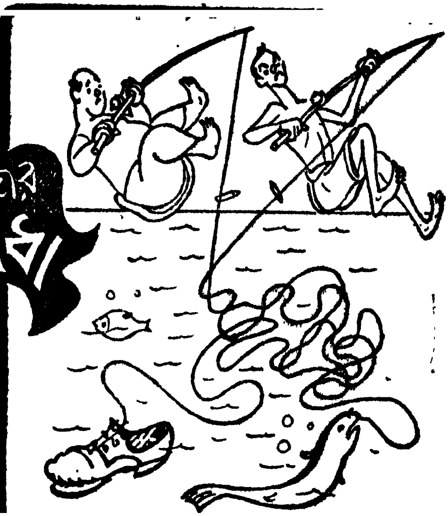


এসো এসো, দেখে যাও
রকমারি ধাঁধারে—
ছবি যদি ভালো লাগে
নেই দেখা বাধারে!

বুদ্ধির মারপ্যাঁচ—
ছবিতে যে লুকানো,
তাই ধাঁধা ভুয়া নয়
রঙে আছে ডুবানো।

যেই রঙ ধরা দেয়—
ভালো-লাগা-চোখেতে
সেই চোখ গড়ে দেবো,
কাচি-কাঁচা মুখেতে।





বলতে পারো? কার ছিপেতে উঠলো কি!



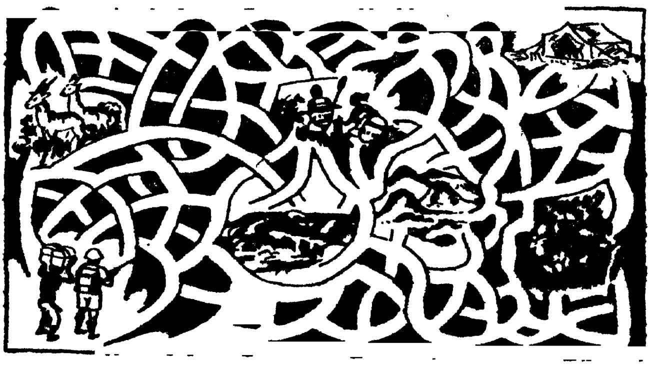
আচ্ছা! কোন বইতে আছে এসব মানুষ?



একবার দেখো, একটি গাছের মজার ছবি
যাকে বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট!



এঁকেছেন শ্রী পান্নালাল সেন, ছবিটি কি বলত ?*



সৈনিক যাচ্ছে তাঁবুতে, কোন পথে নিরাপদে যাবে দেখ তো ?

* রবীন্দ্রনাথের ছবি, দূরে রেখে দেখ।

বুদ্ধির প্রশ্ন

১। লিখতে লিখতে শেষের সংখ্যাগুলি লেখা হয়নি, তোমরা সেই সংখ্যাগুলি পূরণ করে দাও—

ক] $\frac{১০}{১৫}$ $\frac{৮}{১২}$ $\frac{৬}{৯}$ $\frac{?}{?}$

খ] $\frac{৯}{১০}$ $\frac{৮}{১৩}$ $\frac{৭}{১৮}$ $\frac{?}{?}$

গ] ৪ ৭ ১০ ১৩ ?

২। উপরের কোন শব্দটি নিচের শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে?

ক] বিশাল সুন্দর অসীম

পৃথিবী জলরাশি পাহাড় বনভূমি রাজ্য গৃহ

খ] রক্তিম শুভ্র সুনীল বঙ্কিম

বর্ণ আভা চন্দ্র মেঘ পথ পুষ্প

৩। রামবাবু আপিসে চাকরী করেন। হাজিরের সময় ১০টা। রামবাবু পর পর ৫ দিন দেরীতে হাজির হলেন।—

প্রথম দিন গেলেন ১০টা ১০ মিনিটে
দ্বিতীয় " " ১০টা ৩০ "
তৃতীয় " " ১১টা
চতুর্থ " " ১১টা ৪০ "
পঞ্চম দিনে কখন তিনি আপিসে গেলেন?

৪। পর পর সাজাও দিকি—কে কার আগে জন্মেছিলেন?
রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্র।

৫। বলত কোথায় কি মাতৃভাষা?
বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরল।

৬। কোন্‌টি কোথায় জান?
ইলোরা, অজন্তা, এলিফ্যান্টা, খুনী দরওয়াজা, ভেটদ্বারকা, ধনুকোটি।

উত্তর

১। ক] ১৬ উপরের সংখ্যা ২ করে কমছে।
নিচের সংখ্যা উপরের বর্গ সংখ্যা।

খ] ৩৫ উপরের সংখ্যা ১ করে কমছে।
নিচের সংখ্যা উপরের সংখ্যার বর্গ সংখ্যা থেকে (—১)।

গ] ১৬ আগের সংখ্যার সঙ্গে+৩ হয়ে পরের সংখ্যাটি হয়েছে।

২। ক] অসীম আকাশ। বিশাল পৃথিবী। অসীম জলরাশি। সুন্দর পাহাড়। বিশাল বনভূমি। বিশাল রাজ্য। সুন্দর গৃহ।

খ] রক্তিম বর্ণ। রক্তিম আভা। শুভ্র বর্ণ। শুভ্র চন্দ্র। শুভ্র মেঘ। বঙ্কিম পথ। বঙ্কিম চন্দ্র।

৩। ১২টা ৩০ মিনিট—দিনের সংখ্যার সঙ্গে ১০ গুণ করে মিনিটের সংখ্যা নির্ণীত হচ্ছে এবং আগের সময়ের সঙ্গে যোগ হচ্ছে।

প্রথম দিন—১০ মিনিট=১০টা ১০ মিনিট।
দ্বিতীয় দিন—২×১০=২০=১০।১০+২০=১০টা ৩০ মিনিট।
তৃতীয় দিন—৩×১০=৩০=১০।৩০+৩০=১১টা।
চতুর্থ দিন—৪×১০=৪০=১১টা+৪০=১১টা ৪০ মিনিট।
পঞ্চম দিন—৫×১০=৫০=১১।৪০+৫০=১২।৩০ মিনিট।

৪। রামমোহন—বিদ্যাসাগর—শ্রীরামকৃষ্ণ—রবীন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ—সুভাষচন্দ্র।

৫। বাংলা। হিন্দী। গুরুমুখী। কানাড়ী। তামিল। মালয়ালম।

৬। ইলোরা ও অজন্তা—মধ্যভারতে—ঔরঙ্গাবাদ থেকে বাসে যেতে হয়।
এলিফ্যাণ্টা—বোম্বাইর কাছে সমুদ্রে একটি দ্বীপ।
খুনী দরওয়াজা—দিল্লীর এক তোরণ।
ভেটদ্বারকা—দ্বারকার কাছে সমুদ্রে একটি দ্বীপ।
ধনুষ্কোটি—রামেশ্বরম্ দ্বীপের সমুদ্র-বন্দর।